পঞ্চম সংখ্যা।

জীবনীকোষ

ভারতীয় ঐতিহাসিক)

শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার

১ম সংস্করণ

১৯৪০

Printed at the Jibanee-Kosh Press, 209, Cornwallis St., Calcutta,
By Sasi Bhusan Vidyalanker.

Published from 210-3-2, Cornwallis St., Calcutta,
By Debabrata Chakravarti, M. A.

জীবনীকোষ

ভারতীয়-ঐতিহাসিক

ককাই সান্তরা, মহাপাত্র—তিনি উড়িষ্যার বিখ্যাত সূর্য্যবংশীয় নরপতি কপিলেন্দ্রের (১৪ . . . . খ্রীঃ) অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। তিনি বাহমনি-বংশের নবাব হুমায়ুন শাহ বাহমনির প্রেরিত সেনাপতি খাজা জাহানকে পরাজিত করেন। কপিলেন্দ্র দেখ।

ককুস্থ— তাঁহার অন্য নাম কক্কুব। তিনি কনৌজের প্রতীহারবংশের প্রতিষ্ঠাতা নাগভটের ভ্রাতা কক্কের পুত্র। নাগভট কনৌজের বর্ম্মাবংশীয় শেষ নরপতি চক্রায়ুধকে পরাস্ত করিয়া, কনৌজে ৭২৮ হইতে ৭৪০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ককুস্থ ৭৪০—৭৫৫ খ্রীঃঅব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। নাগভট দেখ।

কক্ক — তিনি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-বংশীয় নরপতি খোট্টিকের ভ্রাতা নিরুপমের পুত্র। তিনি দ্বিতীয় কক্ক বা চতুর্থ অমোঘবর্ষ নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি খুব বীর পুরুষ ছিলেন এবং গুর্জ্জর, চোল, হুনবি, পাণ্ড্য প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন। ৯৭২ খ্রীঃ অব্দে খোট্টিক নিত্যভের মৃত্যুর পরে তিনি রাজা হন। কিন্তু মালবদেশের অধিপতি হর্ষ ও মুঞ্জের আক্রমণে তিনি শেষে বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। এই সময়ে ৯৭৪ খ্রীঃ অব্দে চালুক্যবংশীয় তৈলপ তাঁহাকে পরাস্ত ও রাজ্যচ্যুত করেন। তৈলপ পরে তাঁহার কন্যা জক্কবাকে বিবাহ করেন। দন্দীবর্ম্মা দেখ।

কক্কল — তিনি রাষ্ট্রকূটবংশের শেষ নরপতি। যদিও তিনি একজন বীর পুরুষ ছিলেন, তথাপি মালব দেশের অধিপতি হর্ষ ও মুঞ্জের আক্রমণে অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছিলেন। এই সময়ে চালুক্য বংশীয় তৈলপ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন।

তৈলপ পরে তাঁহার কন্যা জক্কাকে বিবাহ করেন।

কঙ্ক—তিনি সিন্ধুদেশের অধিপতি দাহিরের ভ্রাতা চন্দ্রের পুত্র। তিনি দাহিরের সঙ্গে থাকিয়া আরব সেনাপতি মোহাম্মদ বিন কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দাহিরের মৃত্যুর পর তিনি নিরাশ হৃদয়ে কাশ্মীরে প্রস্থান করেন। দাহির দেখ।

কঙ্ক—ময়মনসিংহ জিলানিবাসী এক জন কবি। তাঁহার রচিত একখানি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য পাওয়া গিয়াছে। উহাতে রুচি বিগর্হিত বর্ণনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া কথিত হন।

কঙ্কুল — দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজী কর্তৃক অশির নগর আক্রান্ত, বিধ্বস্ত এবং তত্রত্য চৌহান-রাজ রাওচাঁদ হত হইলে সার্দ্ধদ্বিবর্ষ বয়স্ক পুত্র রণসিংহকে লইয়া রাজ-মহিষী স্বীয় ভ্রাতা চিতোরের রাণার আশ্রয়ে চলিয়া যান। রণসিংহ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া ভঙ্গা নামক ভীল সর্দ্দারকে পরাস্ত করিয়া ভিন-সহর অধিকার করেন। এই রণ-সিংহের পুত্র কলূন ও কঙ্কুল। কলূন মধ্যভারতবর্ষের পথর নামক উন্নত ভূভাগ, মীনদিগকে পরাস্ত করিয়া অধিকার করেন এবং নববিজিত রাজ্যের দশমাংশ কনিষ্ঠ কঙ্কুলকে প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, ভিন সহরও তাঁহার অধিকারে ছিল। এই কঙ্কুলজী হইতেই ক্রোরিয়া ভাটগণের উদ্ভব হইয়াছে।

কচুরায়—ইঁহার প্রকৃত নাম রাঘব রায়। তিনি যশোহরের স্বাধীন নরপতি প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্যপুত্র। প্রতাপের পিতামহ ভবানন্দের শ্রীহরি ও জানকী বল্লভ নামে দুই পুত্র ছিল। প্রতাপা-দিত্যের পিতা শ্রীহরি গুহ (নামান্তর বিক্রমাদিত্য রায়) ও পিতৃব্য জানকী বল্লভ গুহ নামান্তর বসন্ত রায় নবাব সরকারে সেনাপতির কাজ করিয়া প্রভূত ধন সঞ্চয় করেন। নবাব সুলে-মান শাহ কররাণী (১৫৬৪-১৫৭৩খ্রীঃ) শ্রীহরি ও জানকী বল্লভকে বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় উপাধি প্রদান করেন। রাজা প্রতাপাদিত্য কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া পিতৃব্য বসন্তরায় ও তাঁহার সাত পুত্রকে অসিমুখে অর্পণ করেন। কেবল একমাত্র শিশুপুত্র রাঘবকে লইয়া তাঁহার জননী কচুবনে পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। তদবধি তিনি কচুরায় নামেই খ্যাত হন। বয়ঃ-প্রাপ্ত হইয়া কচুরায় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রূপরামের সহিত দিল্লীতে উপস্থিত হন। তখনকার দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহের সেনাপতি মানসিংহ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। তৎপূর্ব্বেই

প্রতাপাদিত্য দিল্লীর সম্রাটের রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিয়া স্বয়ং স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি কয়েক স্থানে মুঘল সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় ক্ষমতা আরও বর্দ্ধিত করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রতাপের দর্প খর্ব্ব করিবার জন্য মানসিংহকে বঙ্গে প্রেরণ করেন। এই সময়ে কচুরায় প্রতিশোধ লইবার জন্য মানসিংহের পক্ষাবলম্বন করেন। মানসিংহ তাঁহারই সাহায্যে প্রতাপাদিত্যকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন এবং পরে দিল্লীতে প্রেরণ করেন। কিন্তু পথেই বন্দী অবস্থায় কাশীতে প্রতাপের মৃত্যু হয়। তৎপরে সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহ কচুরায়কে যশোহরজিৎ উপাধি প্রদানপূর্ব্বক যশোহরের সিংহাসনে স্থাপন করেন।

কচ্চায়ন — তাঁহার প্রকৃত নাম কাত্যায়ন। 'সুসন্ধি কপ্‌প' নামক পালি ব্যাকরণ তাঁহারই রচিত। তাঁহার ব্যাকরণ সাধারণতঃ 'কচ্চায়ন-ব্যাকরণ' নামেই খ্যাত। তিনি মহাত্মা বুদ্ধের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। বুদ্ধের উপদেশাবলী পালি ভাষায় সংগৃহীত হয়। বুদ্ধের মৃত্যুর পরে সেই সমুদয় পুস্তক বুঝিতে অনেক অসুবিধা হইতে লাগিল। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কাত্যায়ন ঋষি পালি ব্যাকরণ রচনা করেন। কচ্চায়ন ব্যাকরণের যোগসূত্র কাত্যায়নপ্রণীত, টীকা সঙ্ঘনন্দী, উদাহরণ ব্রহ্মদত্ত এবং প্রয়োগ বিমলবুদ্ধি কর্তৃক রচিত হয়। তিনি মথুরাদেশবাসী ছিলেন।

কটন, সার হেনরী জন ষ্টেড-ম্যান—(Sir Henry John Stedman Cotton) তাঁহার পিতা জে, জে, কটন (J. J. Cotton) মান্দ্রাজ প্রদেশে সিবিলিয়ান ছিলেন। ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ব্রাইটনের স্কুলে ও লণ্ডনের কিংস কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি বেঙ্গল সিবিল সার্ভিসে কর্ম্মগ্রহণ করেন। নানা বিভাগে যোগ্যতার সহিত কর্ম্ম করিয়া ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি বঙ্গের রাজস্ববিভাগের সেক্রেটরী হন। ১৮৯৬-১৯০২ সাল পর্য্যন্ত আসামের চীফ কমিশনার থাকিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার New India গ্রন্থ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি ভারতের একজন প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ৺রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁহার New India গ্রন্থ 'নবভারত' নাম দিয়া বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। হেনরী কটনের পূর্ব্ব-পুরুষেরাও রাজকার্য্য উপলক্ষে ভারত-বর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রপিতা-মহ, পিতামহ এবং পিতা, সকলেই ভারতের নানা স্থানে নানারূপ রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। সার হেনরীর পিতা যখন

মান্দ্রাজ প্রদেশে শাসন বিভাগে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন কুম্ভকোনম নগরীতে তাঁহার জন্ম হয়। এ দেশে যে সকল ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী কর্ম্মকুশতার জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সার হেনরী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। অধিকন্তু এদেশবাসীদের দুঃখ দারিদ্র্যের জন্য তিনি তাহাদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিশীল ছিলেন বলিয়া স্ব-জাতীয় অন্যান্য কর্ম্মচারীদের নিকট তাদৃশ প্রিয় হইতে পারেন নাই। কিন্তু উপর ওয়ালাদের বিরক্তির ভয়েও তিনি কখন বিবেকানুমোদিত কাজ করিতে বা কথা বলিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। আসামের চা-বাগানের নির্য্যাতিত কুলীদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করাতে এবং তাহাদিগকে অন্যায় অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করাতে, তিনি আসামের স্বজাতীয় চা-কর সাহেব এবং অন্যান্য পদস্থ রাজপুরুষদের বিশেষ বিরাগ ভাজন হন। তৎফলে, যোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি উচ্চতর পদলাভ করিতে পারেন নাই। আসামের চিফ-কমিশনার রূপেই তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে এই মহানুভব পুরুষের মৃত্যু হয়

কণাদ — (১) বৈশেষিক দর্শনকার কণাদ ঋষি খ্রীঃ পূঃ ১২শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম কণাদ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম উলূক বলিয়া তাঁহার প্রণীত দর্শন 'ঔলূক্যদর্শন' নামে খ্যাত। তিনি প্রভাসক্ষেত্রে বাস করিতেন এবং তাঁহার গুরুর নাম সোমশর্ম্মা ছিল। কণাদের মতে ভাব-পদার্থ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় — এই ছয়টী। তাঁহার মতে এই ষট্-পদার্থ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই মুক্তি লাভ হয়। কণাদ পরমাণু-বাদী ছিলেন। তাঁহার মতে—অদৃষ্ট কারণ বিশেষ দ্বারা পরমাণুর সংযোগ বিয়োগের দ্বারাই জগতের উৎপত্তি। তেজঃ ও আলো একই মূল পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। ইহা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে পরমাণুবাদ সর্ব্বত্র গৃহীত। এই পরমাণুবাদ আমাদের দেশেই সর্ব্ব প্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহর্ষি কণাদই ইহার আবিষ্কর্ত্তা। মহর্ষি কণাদের জড়পদার্থের জ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক দৃষ্টি ছিল। সেই জন্যই তিনি পরমাণুবাদ স্থাপন করেন। মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প, করকা, হিমশীলা, বৃক্ষের রস সঞ্চার, চুম্বক ও চুম্বকার্ষণ, গতি, জড়ের সংযোগ ও বিয়োগাদি গুণ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে

তাঁহার চিন্তা ধারা ধাবিত হইয়াছিল। বড়ইদুঃখের বিষয় যে পরবর্ত্তীকালে আর কোনও পণ্ডিতের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং জড়-বিজ্ঞানের উন্নতি ভারতবর্ষে আর হইল না। গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত ডেমক্রিটাস ইউরোপে প্রথম পরমাণুবাদ আবিষ্কার করেন। তিনি কণাদের পরবর্ত্তী। (২) জৈনদর্শনাচার্য্য। তিনি জৈন-মতে বৈশেষিকদর্শন প্রণয়ন করেন। তাঁহার গুরুর নাম রোহ গুপ্ত। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৭১ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। (৩) কণাদ নামে একজন জ্যোতিষ সংহিতার রচয়িতাও ছিলেন। (৪) তিনি নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের অন্যতম ছাত্র। তিনি 'অনুমান মণি ব্যাখ্যা' গ্রন্থের রচয়িতা। খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

কণাদ গুপ্ত— তিনি খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে বৈশেষিক দর্শনকার কণাদ ঋষির মতানুবর্ত্তী একজন দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্ম্মকীর্ত্তি তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় মতে আনয়ন করেন।

কণাদ তর্কবাগীশ— তিনি একজন নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। কণাদ তর্কবাগীশের গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণির উপর 'মণি ব্যাখ্যা' নামক এক প্রসিদ্ধ টীকা আছে। এতদ্ব্যতীত 'ভাষারত্নম' 'আপশব্দ খণ্ডনম' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

কণিষ্ক—প্রাচীন ভারতের এক সুপ্রসিদ্ধ নরপতি। কিন্তু তাঁহার রাজত্ব কাল, রাজ্যসীমা প্রভৃতি বিষয় এখনও পণ্ডিতগণের বিচার্য্য রহিয়াছে। কয়েকটি অনুশাসনলিপি এবং বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত মুদ্রা হইতে তাঁহার সম্যক্ পরিচয় সংকলন করা এখনও সম্ভব হয় নাই। কণিষ্ক শকনামক এক অনার্য্য জাতীরই 'কুশন' শাখার অন্তর্গত রাজন্য-বর্গের অন্যতম। তাঁহার রাজত্বকাল সাধারণতঃ খ্রীঃ পূর্ব্ব ১ম ও খ্রীঃ ২য় শতাব্দীর মধ্যে গণনা করা হয়, যদিও এই বিষয়ে ঘোরতর মতভেদ রহিয়াছে। কণিষ্কের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট দ্বিতীয় ক্যাডকাইসিস কর্ত্তৃক রোম সম্রাট অগষ্টস সমীপে দূত প্রেরিত হয়। তদনুসারে, কণিষ্ককে, অগষ্টসের পরবর্ত্তী রোম সম্রাট মার্কাস অরেলিয়সের সমকালবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করা বিশেষ ভ্রমাত্মক হইবে না। সুতরাং কণিষ্কের রাজ্যকাল খ্রীঃ ২য় শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

কণিষ্কের নামাঙ্কিত মুদ্রা হইতে তাঁহার রাজ্যসীমা, রাজত্বকালের সময়,

ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচনা করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। ঐ মুদ্রা আলোচনার দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে মহারাজ কণিষ্কের রাজ্যসীমা পূর্ব্বদিকে বারাণসীর সন্নিকট পর্য্যন্ত; উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত ও পশ্চিমে ভারতের বর্ত্তমান ভৌগলিক সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিনীতে' উল্লেখ আছে যে কণিষ্ক কাশ্মীর বিজয় করিয়া, তথায় কণিষ্কপুর নামক রাজ্য স্থাপন করেন। বর্ত্তমান পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী পুরুষপুর নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। তিব্বতীয় বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তারানাথ বলেন যে,-কনিষ্ক মগধ রাজধানী পাটলিপুত্র (নামান্তর কুসুমপুর) অধিকার করিয়া, তত্রত্য রাজকবি অশ্বঘোষকে নিজ রাজধানীতে লইয়া যান। ভারতের সীমার বাহিরে চীন সম্রাটের অধিকারভুক্ত স্থানেও তিনি অভিযান করেন এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ নিজ সকাশে রক্ষা করেন। পার্থীয়গণ যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন কণিষ্ক তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া, পশ্চাদ্ধাবনপূর্ব্বক বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাদের রাজ্যাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন বলিয়াও কথিত হয়। কণিষ্ক বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়া ছিলেন তাঁহার কতকগুলি মুদ্রাতে গ্রীক অক্ষর ক্ষোদিত। পরবর্ত্তী কালের অনেকগুলিতে গৌতমবুদ্ধের মূর্ত্তি এবং গ্রীক অক্ষরে তাঁহার নাম ক্ষোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি চৈত্য, বিহার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করান। বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্তির ফলস্বরূপ একটি ত্রয়োদশতলবিশিষ্ট, সু-উচ্চ কাষ্ঠ নির্ম্মিত কারুকার্য্যময় সৌধ (tower) নির্ম্মিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এবং হিউয়েন-সাং ঐ সৌধ দর্শন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ পর্য্যটক আল বেরুণীর ভ্রমণকালেও উহা বর্ত্তমান ছিল। খ্রীঃ নবম ও দশম শতাব্দীতে উহা বৌদ্ধ শাস্ত্রালোচনার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হইয়াছিল কণিষ্কের রাজ্যকালে একটি বৌদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। উহা ইতিহাসে চতুর্থ বৌদ্ধসঙ্গীতি নামে পরিচিত। ঐ সঙ্গীতিতে বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহ সংগৃহীত, পরিশোধিত, পরিমার্জ্জিত ও ও নূতনভাবে সংকলিত হয়। সর্ব্বাস্তিবাদ ও বৈভাষিক মতানুসারে বৌদ্ধ শাস্ত্র সমূহের যে সকল টীকা রচিত হইয়াছিল, ঐ সঙ্গীতিতে তাহারই সমর্থন করা হয় হিউয়েন সাং বলেন, "ঐ সঙ্গীতিতে যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়, তাহাদের নাম তাম্রফলকে ক্ষোদিত হইয়া স্তূপতলে সংস্থাপিত হয় — বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্য বসু'মিত্র এই সঙ্গীতির প্রধান অধ্যক্ষতার কার্য্য করেন।"

কণ্ঠহার— ধেনুকর্ণ নামে গোকর্ণকুল সম্ভূত একজন রাজা, তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে যশোহরে গমন করেন এবং তথায় রাজ্য স্থাপন করেন। ধেনুকর্ণের পুত্র কণ্ঠহার অতিশয় বীর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল 'বঙ্গভূষণ'। যশোহর জিলার উত্তর অংশে তিনি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার নামানুসারে সেই পরগণাও 'ভূষণ' নামে পরিচিত হয়। উহাই পরে 'ভূষণা' নামে খ্যাত হয়। কণ্ঠহার দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন।

কণ্ডুল—১৪০৯ খ্রীঃ অব্দে রাণা চণ্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্র রণমল্ল পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার চতুর্ব্বিংশতি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাণাযোধ রাজা হইয়া যোধপুর নগর ১৪৫৯ খ্রীঃ অব্দে স্থাপন স্থাপন করেন। দ্বিতীয় পুত্র কণ্ডুল বিকানীর অধিকার করিয়া, স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র (রাণা যোধের জ্যেষ্ঠ পুত্র) বিকাকে প্রদান করেন। কণ্ডুল আরও উত্তরদিকে অগ্রসর হইয়া আশিয়াধ, বেণিবল ও সারণ নামক তিনটী স্থান অধিকার করেন। এই সকল স্থানে তাঁহার বংশীয় কণ্ডুলোট রাঠোরেরা এখনও বাস করিতেছেন।

কনক— তিনি কাশ্মীরপতি হর্ষদেবের (১০৮০-১১০২ খ্রীঃ) মন্ত্রী চম্পকের ভ্রাতা। তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া, মহীপতি হর্ষদেবের নিকট হইতে এক লক্ষ স্বর্ণ দিন্নার পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সাতবাহনবংশীয় নরপতি উচ্চলের রাজত্বকালে (১১০২-১১১২ খ্রীঃ) তিনি কাশ্মীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাশীবাসী হন। এবং তথায়ই তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

কনকমুনি—থেরবাদী বৌদ্ধগণের মতে গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত চব্বিশজন বুদ্ধের অন্যতম। বুদ্ধ দেখ।

কনকসেন — অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় একজন রাজকুমার। খ্রীঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি সৌরাষ্ট্র দেশের অন্তর্গত 'বীরনগরে' একটি রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি বল্লভীবংশের আদি পুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হন। তাঁহার অধস্তন চতুর্থ পুরুষ বিজয়সেন 'বিজয়পুর' (বর্ত্তমান নাম ঢোলকা) নামে নগরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরদিগের দ্বারা বল্লভীপুর স্থাপিত হয়। তাঁহারা প্রথমে গুপ্ত সম্রাটদের সামন্ত নরপতি ছিলেন। পরে গুপ্তদের প্রাধান্য লুপ্ত হইলে স্বাধীনতা লাভ করেন। (গুহসেন দেখ।)

কন্দর্প—তিনি মহীপতি বরাহদেবের ভ্রাতা। কাশ্মীরেশ্বর কলশরাজ তাঁহাকে দ্বারপতি নিযুক্ত করিয়া ডামরদিগকে নিঃশেষ করেন। কন্দর্প অতি বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি একবার অতি

অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া রাজপুরীর অধিশ্বর সংগ্রামপালকে পরাস্ত করেন। বিজয়ী কন্দর্প কাশ্মীর প্রবেশকালে রাজা হর্ষদেব, (তখন হর্ষদেব রাজা ছিলেন) তাঁহাকে স্বয়ং প্রত্যুদ্গমন করেন। ইহার পরে লোহররাজ্য শত্রু সমাকুল ছিল বলিয়া, উক্ত রাজ্যরক্ষার্থ হর্ষদেব তাঁহাকে তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। কুমন্ত্রীদিগের পরামর্শে রাজা হর্ষদেব ইঁহার প্রতি, শেষে অবিশ্বাসী হইয়া তাঁহার প্রাণসংহারের সঙ্কল্প করেন। কন্দর্প ইহা জানিতে পারিয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বারাণসী অভিমুখে গমন করেন। তিনি গয়াধামে যাইয়া তৎপ্রদেশের এক সামন্ত রাজাকে পরাজিত ও দূরীভূত করিয়া তৎপদে অন্য একজনকে স্থাপন করেন। তিনি কাশ্মিরীদিগকে অত্যধিক 'শ্রাদ্ধকর' হইতে অব্যাহতি দেন এবং পথের একজন দস্যু সর্দ্দারকে বিনাশ করিয়া তীর্থযাত্রীদের উপকার করেন। বারাণসী অবস্থানকালে একটী বৃহৎ ব্যাঘ্র বিনাশ করিয়া, উক্ত স্থানকে তিনি নিরাপদ করেন এবং উক্ত স্থানে বহু মঠ নির্ম্মাণ করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল তথায়ই ক্ষেপণ করেন।

কন্দর্পনারায়ণ রায়—(১) তিনি চন্দ্রদ্বীপের রাজা এবং বঙ্গের প্রসিদ্ধ দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ছিলেন। ১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি হুশেনপুরে মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারই পুত্র রামচন্দ্র রায় যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতিকে বিবাহ করেন। (২) তিনি যশোহর জিলার চাঁচড়ার জমিদার বংশের স্থাপয়িতা ভবেশ্বর রায়ের পৌত্র মাতাবরাম রায়ের পুত্র ছিলেন। ১৬১৯ খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যুর পরে তিনি রাজা হন এবং ১৬৪৯ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি স্বীয় জমিদারীর আয়তন অনেক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র মনোহর রায় রাজা হইয়াছিলেন।

কন্‌হোবা রণ ছোড়দাস কীর্ত্তিকর—মহারাষ্ট্রীয় মনস্বী ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারী। ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। স্কুল ও কলেজে তিনি যশস্বী ছাত্র ছিলেন। বোম্বাইতে মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময়েই উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। সেইখানে নানাস্থানে প্রতিষ্ঠার সহিত অধ্যয়ন সমাপন করিয়া ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগে (Indian Medical Service) কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৭৭৮-১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের আফগান যুদ্ধে তিনি সৈন্যদলের চিকিৎসক হইয়া রণক্ষেত্রে গমন করেন। তথায় বিশেষ সাহস ও তৎপরতার সহিত আহতদিগের সেবা ও চিকিৎসা

করিয়া বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দ হইতে দীর্ঘকাল তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন এবং উহার নানাপ্রকার কার্য্যের সহিতও ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকিতেন। কর্ম্মজীবনেও তিনি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া ব্রিগেড সার্জ্জন লেফটেনেণ্ট কর্ণেলের (Brigade Surgeon, Lieutenant Colonel) পদ লাভ করেন। তিনি কিছুকাল ব্রহ্মদেশের সিংহাসনচ্যুত রাজা থিব'র চিকিৎসক ছিলেন।

ডাঃ কীর্ত্তিকর মারাঠী ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তদ্রচিত বহু মারাঠী কবিতা ও গান এখনও বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকে। তিনি উদ্ভিদ-বিদ্যায়ও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং কিছুকাল বোম্বাই নগরীর ন্যাচারাল হিষ্ট্রী সোসাইটি (Natural History Society) এবং উদ্ভিদ-বিদ্যা বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁহার অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। বোম্বাই প্রদেশের বিষাক্ত উদ্ভিদ বিষয়ক প্রবন্ধ বৈদেশিক পণ্ডিত মণ্ডলীরও প্রশংসা লাভ করে। তিনি একাধিক বৈদেশিক বিদ্বজ্জন পরিষদের ও সদস্য ছিলেন। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "উইলসন ভাষাতত্ত্ব অধ্যাপক" (Wilson Philological Lecturer) নিযুক্ত করেন। উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি যে সকল সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন, তৎফলে মারাঠী ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাদর লাভ করে। তিনি দাক্ষিণাত্যের নানা জনহিতকর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার নিজস্ব পুস্তকাগারে বহু ভাষার এবং নানাপ্রকার জ্ঞানপ্রদ পুস্তকের সংগ্রহ ছিল।

কপিল—মহর্ষি কপিল সম্ভবতঃ খ্রীঃপূঃ ৬৫০—৫৭৫ সালের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' কেন না ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। অতি প্রাচীন কালে হিন্দু সভ্যতার ও জ্ঞানের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহা এই সাংখ্য-দর্শন পাঠ করিলেই সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। যে বিবর্ত্তন-বাদ (Theory of Evolution) বর্ত্তমান ইউরোপীয় পণ্ডিতের আবিষ্কার বলিয়া আমরা পাঠ করিয়া থাকি, বহু পূর্ব্বে এদেশের কপিল মুনি তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। (সাংখ্য প্রবচন-১।৬৪ সূত্র দ্রষ্টব্য)। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না ; সুতরাং নাস্তিক। তাহা হইলেও তিনি বেদের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কপিলের মতে সমস্ত জগৎ প্রকৃতি (জড় প্রকৃতি) হইতে উদ্ভূত।

পরমাত্মা ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি। তিনি সৃষ্টি করেন না, দ্রষ্টা মাত্র। মানবের কর্ম্মফলানুসারে আত্মা দেহান্তর আশ্রয় করে। কর্ম্মক্ষয়ে দেহান্তরে প্রবেশ করে না, পৃথক অবস্থান করে। কপিলের মতে বস্তু মাত্রই সৎ, সৎ হইতে সতের উৎপত্তি। বীজ ভূমিতে উপ্ত হইলে বীজের ধ্বংস হয় বটে কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না। বীজের অবয়ব বর্ত্তমান থাকে। এই ভাবভূত অবয়ব হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। কপিলের মতে দুঃখ ত্রিবিধ — আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। মাতপিত্তাদির বৈষম্য-নিবন্ধন শারীরিক এবং ক্রোধাদিজনিত মানসিক দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। মনুষ্য-পশ্বাদি হইতে জাত দুঃখ আধিভৌতিক এবং যক্ষ, পিশাচাদি হইতে অথবা ভূমিকম্পাদি প্রভৃতি হইতে জাত দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে। এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি। এই মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় জ্ঞান লাভ। সাংখ্য মতে জগৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুই ভাগে বিভক্ত। ব্যক্ত শব্দে প্রতীয়মান জগৎ এবং অব্যক্ত শব্দে প্রকৃতি বুঝায়। সাংখ্য মতে জগৎ সত্য কিন্তু ক্ষণিক। বেদান্ত মতে জগৎ মিথ্যা। বৈদান্তিক মতে রজ্জুতে সর্প জ্ঞানের ন্যায় ভ্রান্তি মাত্র। ইহার উত্তরে সাংখ্য বলেন,—সর্পের স্থানে যেমন রজ্জু আছে, তদ্রূপ সংসার স্থানে একটা কিছু থাকা চাই এবং ইহাই প্রকৃতি। (২) অগ্নিপুরাণের ২৯ অধ্যায়ে শিল্প শাস্ত্রকার এক কপিলের উল্লেখ আছে। (৩) কাশ্মীরপতি হর্ষদেব (১০৮৯—১১০২ খ্রীঃ) লোহর প্রদেশের সামন্ত নরপতি উদয়সিংহের মৃত্যুর পরে তাঁহার অন্যতম সেনাপতি ক্ষেমের পৌত্র কপিলকে লোহার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উচ্চল কাশ্মীর সিংহাসন অধিকার করিবার উদ্যোগী হইলে, কপিল উচ্চলের সৈন্য-দলকে বাধা দিতে যাইয়া পরাজিত হন। পরে বিদ্রোহী গর্গের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

কপিলেন্দ্র—উড়িষ্যার একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি। তাঁহার নামান্তর কপিলেশ্বর। তিনি ১৪৩৫ হইতে ১৪৭০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৪৭৫ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে তিনি সমস্ত পূর্ব্ব-উপকূল অধিকার করেন। সম সাময়িক দাক্ষিণাত্যের পাঠান রাজা-সমূহ তাঁহার পরাক্রমের বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন। 'বুরহান-ই-মা-আসির' নামক ইতিহাসের গ্রন্থকার, তাঁহার পুস্তকে কপিলেন্দ্রের পরাক্রমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ফিরিস্তা গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে হুমায়ুন শাহ বাহমনির সেনাপতি খাঁ জাহান, বরঙ্গল (একশিলা) নগরী আক্রমণ করিলে,

তথাকার রাজা কপিলেন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কপিলেন্দ্র, খাঁ জাহানকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত ও বিতাড়িত করেন। তদবধি তাঁহার জীবিতকালে বাহমণি রাজারা আর শক্তিশালী হইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র পুরুষোত্তম রাজা হন।

কবচসেন—বাংলার বল্লালসেন বংশীয় বাহুসেন খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাঞ্জাবের অন্তর্গত; বর্ত্তমান শিমলা পাহাড়ের নিকটস্থ) কুলু প্রদেশে যাইয়া বাস করিতে থাকেন. তাঁহার অধস্তন দশম পুরুষ কবচসেন কুলুর রাজা কর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহার গর্ভবতী পত্নী পলায়ন করিয়া শিবকোট নামক স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করেন। তথায় তাঁহার গর্ভজাত পুত্র বাণসেন জন্মগ্রহণ করেন। এই বাণসেনই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পরে শিবকোটের রাজা হন।

কবিকর্ণপুর—চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত শিবানন্দের পুত্র পুরী গোস্বামীর অন্য নাম। তিনি কবিকর্ণপুর নামেই বিশেষ পরিচিত। নদিয় জিলার কাঁচড়া পাড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম স্থান। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'। পরমানন্দ দেখ। শিবানন্দ উড়িষ্যা প্রদেশের অনেক সামন্ত নরপতির গুরু ছিলেন। তাহার প্রভাবে অনেকে বৈষ্ণব হইয়াছিলেন।

কবিচন্দ্র—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। 'চিকিৎসা রত্নাবলী' নামক গ্রন্থ তাহারই রচিত।

কবিচন্দ্র মিশ্র—একজন কবি। তিনি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের অগ্রজ ছিলেন। তাঁহার রচিত 'দাতাকর্ণ' ও 'কলঙ্কভঞ্জন' নামক গ্রন্থ এককালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। কবিত্ব হিসাবে ইহা অতি মনোহর। মুকুন্দরাম দেখ।

কবিবল্লভ—(১) উত্তর বঙ্গের একজন কবি। তিনি বগুড়া জিলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রাজবল্লভ, মাতার নাম বৈষ্ণবী। তিনি খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তদ্রচিত গ্রন্থের নাম 'রসকদম্ব' ও 'আদিরস'। (২) মধ্য যুগের ঐ নামে অনেক কবি ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কবি বল্লভ তাহাদের উপাধি। আসল নাম অন্য কিছু।

কবিবল্লভ রায়—খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীহট্টের সর্ব্বানন্দ নামীয় এক ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার নাম সরওয়ার খাঁ হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ঐ বংশে কবিবল্লভ নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পারস্য ভাষায় অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ

হইয়া তাঁহাকে "রায়" উপাধি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে শ্রীহট্টের কাননগু ও দস্তিদার পদে নিযুক্ত করেন। কবিবল্লভের সুবিদ রায় ও শ্যাম দাস রায় নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে সুবিদ রায় পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। সুবিদ রায়ের পুত্র সম্পদ রায়, সম্পদ রায়ের পুত্র যাদব রায়। ইহাঁরা উভয়েই শ্রীহট্টের কাননগু ও দস্তিদার ছিলেন। নিঃসন্তান যাদব রায়ের পরে, শ্যাম দাস রায়ের পৌত্র, লক্ষ্মী নারায়ের পুত্র হরকৃষ্ণ রায় শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। হরকৃষ্ণ রায়ের কৃষ্ণ রায় নামে এক জ্যেষ্ঠ সহোদরও ছিলেন।

কবিরত্ন সরস্বতী—তাঁহার পিতা চক্রপাণি কায়স্থ এবং আসামের কামরূপের রাজা দুর্লভ নারায়ণের একজন রাজস্ব আদায়কারী ছিলেন। কবিরঞ্জন সরস্বতী তাঁহার পুত্র রাজা ইন্দ্রনারায়ণের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি আসামী ভাষায় 'জয়দ্রথ বধ' কাব্য রচনা করেন।

কবিরাজ—একজন অসমীয়া কবি। তিনি জয়ন্তিয়া-রাজ কামদেবের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। তৎরচিত গ্রন্থের নাম 'রাঘব পাণ্ডবীয়'। তিনি খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

কবিরাজ চক্রবর্ত্তী—তিনি আসামের অন্তর্গত কামরূপের অধিবাসী। তাঁহার রচিত জ্যোতীষ সম্বন্ধীয় 'ভাস্বতী' নামে একখানা গ্রন্থ আছে।

কবিশূর—রাঢ়দেশের একজন রাজা। তিনি খুব সম্ভব খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণাঞ্চল হইতে আসিয়া রাঢ়দেশে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। কবিশূরের পুত্র মাধবশূর। তৎপুত্র আদিশূর। (ইনি বাঙ্গালার অন্যতম প্রসিদ্ধ নরপতি আদিশূর নহেন।) এই গ্রন্থেব শ্লোক সমূহ দ্ব্যর্থ বোধক। এক অর্থে রাঘববংশীয়দিগের এবং অপর অর্থে পাণ্ডবদিগের গৌরব গৃহীত হয়।

— 'গোরক্ষবিজয়' অথবা 'মীনকেতন' নামক গ্রন্থের রচয়িতা একজন কবি। গোরক্ষনাথের মাহাত্ম্য প্রচার জন্যই উক্ত গ্রন্থ রচিত হয়। গোরক্ষনাথ দেখ।

কবীর—মধ্যযুগে মুসলমান রাজত্বের সময়ে ভারতে অনেক ধর্ম্ম-সংস্কারক-জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে রামানন্দের শিষ্য কবীর একজন প্রধান। তাঁহার পরবর্ত্তী ধর্ম্ম সংস্কারকদের উপরও তাঁহার প্রভাব বহুল পরিমাণে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কবীর ১৩৯৮ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫১৮ সালে (মতান্তরে ১৪৫০) পরলোক গমন করেন। তিনি মুসলমানজাতীয় জোলার (তাঁতির) ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নীরু ও মাতার নাম নীমা ছিল। মুসলমান আমলে অনেক হিন্দু তাঁতি মুসলমান হইয়া

ছিল। তিনি রামানন্দের নিকট নূতন সংস্কারমূলক ধর্ম্ম লাভ করেন। সকল প্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করেন। এসম্বন্ধে হিন্দু, মুসলমান কাহাকেও তিনি ক্ষমা করেন নাই। সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার সরল-নির্ভীক ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এসম্বন্ধে তাঁহার উপর নির্য্যাতনও কম হয় নাই। সম্রাট সেকেন্দর লোদি (১৪৮৮-১৫১৭ খ্রীঃ) তাঁহাকে ১৪৯৫ খ্রীঃ অব্দে আহ্বান করেন কিন্তু তাঁহার উচ্চ ধর্ম্মভাব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে বিরত হন। জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, তীর্থ, ব্রত, মালা, তিলক, মর্কট বৈরাগ্য প্রভৃতি সকল প্রকার কুসংস্কারের মূলেই তিনি প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিলেন। তিনি সাধক হইয়াও বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল লোই। তাঁহার কমাল নামে এক পুত্র ও কমালী নামে এক কন্যা জন্মে। কমালীর সঙ্গে এক ব্রাহ্মণ যুবকের বিবাহ হয়। কমালও একজন উচ্চদরের সাধক ছিলেন। কবীরের মৃত্যুর পরে অনেকে তাঁহাকে একটী সম্প্রদায় গঠন করিতে বলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা কোন প্রকার সম্প্রদায় গঠনেরই বিরোধী ছিলেন বলিয়া, তিনি এই প্রকার দল গঠন করিয়া পিতার আচরিত মতের বিরোধী হইতে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন। কবীরের মৃত্যুর পরে তাঁহার হিন্দু শিষ্যেরা নানাপ্রকার কৌশলজাল বিস্তর করিয়া তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে ভক্তমাল গ্রন্থকারও তাহার টীকাকারেরা প্রসিদ্ধ।

যদিও কবীর সম্প্রদায় গঠনের অতিশয় বিরোধী ছিলেন, তথাপি তাঁহার, মৃত্যুর পরেই তাঁহার অনুবর্ত্তীরা দুইটী দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। কবীরের বাণী সংগ্রহ করিয়া 'বীজক' নামক গ্রন্থ রচিত হইল। সুরতগোপাল নামক তাঁহার এক শিষ্য ইহা লইয়া কাশীতে কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে হিন্দু শাস্ত্র ও বেদান্তের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। বাঘেলখণ্ডের রাজা বিশ্বনাথ সিংহজী এই বীজকের এক উৎকৃষ্ট টীকা লিখিয়াছেন। ইহা 'বঘেলখণ্ডী' টীকা নামে প্রসিদ্ধ। কবীরের বণিকজাতীয় শিষ্য ধর্ম্মদাসজী ছত্রিশগড়ে আর একটী শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি স্বীয় গুরুর ন্যায় বিবাহিত ছিলেন। এই ধারার গুরুরা বরাবরই বিবাহিত। কবীরের অপর শিষ্য বিজলী খাঁ তাঁহার মৃত্যুস্থান মগহরে (বস্তী জিলা) একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিয়াছিলেন।

কবীরপন্থী দ্বারা হিন্দী ভাষারও বহুল প্রচার ও উন্নতি হইয়ছিল। কারণ

কবীরের বাণী সমস্তই হিন্দী ভাষায় রচিত ও প্রচারিত।

কবীর লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু সহজজ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধিবলে ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব, শাশ্বত সত্য ও মধুর কবিতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভগবানকে রাম (আনন্দময়), প্রভু, সাঁই (স্বামী) আল্লা, খোদা (স্বধা বা আত্মপ্রতিষ্ঠ), পুরাসাহেব (পূর্ণব্রহ্ম), অনগঢ়িয়া দেবা (অগঠিত, স্বয়ম্ভু দেবতা) এই সকল নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কবীরের সময়ে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর প্রতিবেশী হওয়াতে পরস্পরের ধর্ম্মমতের প্রভাব পরস্পরের উপর পড়িয়াছিল। কিন্তু মুসলমান তখন দেশের রাজা। তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের ও গোঁড়ামীর জোর রাজশক্তির সাহায্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল। সেইজন্য আত্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণ আপনাদের আচার ও সামাজিক বিধি দৃঢ়তর নিয়মে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই অতি কঠোর নিয়মের গণ্ডিতে সমাজের প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। এই সময়েই রামানন্দ ও তাঁর শিষ্যগণ ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করিয়া সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করবার চেষ্টা করেন। কবীরের প্রভাব তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী বহু সাধুভক্তের জীবনের উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল। আহমদাবাদের দাদূ এক কবীরপন্থীর শিষ্য ছিলেন, প্রসিদ্ধ হিন্দি কবি তুলসীদাস, রাজপুতানার সাধিকা মীরাবাই, শিখধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক প্রভৃতি তাঁহার বিশেষ গুণগ্রাহী ও ভক্ত ছিলেন। গুরু নানক তীর্থ পর্য্যটন ব্যপদেশে কাশীতে উপস্থিত হইয়া কবীরের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করেন। শিখ ধর্ম্মশাস্ত্র 'গ্রন্থসাহেব' কবীরের বাণীতে পরিপূর্ণ।' তদ্ভিন্ন অযোধ্যার জগজ্জীবন দাস প্রতিষ্ঠিত সৎনামী সম্প্রদায়, মালব দেশের বাবালাল প্রতিষ্ঠিত বাবালালী সম্প্রদায়, গাজীপুরের শিবনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত শিবনারায়ণী সম্প্রদায় প্রভৃতি বহু সাধকসঙ্ঘ কবীরের উদার মতের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এই সকল সাধু মহাত্মাদের চেষ্টায় উত্তর ভারতের হিন্দু-মুসলমানের গোঁড়ামী ও অন্ধ কুসংস্কার বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কবীর ধর্ম্মভাবের ব্যাকুলতায় দূর দুরান্তর দেশসমূহে পর্য্যটন করিয়া, অবশেষে গোরখপুরের নিকটবর্ত্তী হিমালয়ের পাদমূলে মগহর গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তৎকালীন লোকের অন্ধবিশ্বাস ছিল যে, ব্যাসকাশীর ন্যায় মগহরে মৃত্যু হইলে মানুষ পরজন্মে গর্দ্দভযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার হিন্দু ভক্তগণ তজ্জন্য তাঁহাকে স্থানান্তরে গমন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন,—"কাশীতে দেহত্যাগ করিয়া, স্থান

মাহাত্ম্যে মুক্তিলাভ, আমি চাই না। যদি ভগবদ্ভক্তি থাকে, তবে সেই মূল্য দিয়াই আমি মগহর বাসেই মুক্তির অধিকারী হব।” কবীরের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহের সৎকার লইয়া হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যগণের মধ্যে ঘোরতর কলহের সৃষ্টি হয়। কিম্বদন্তী আছে যে তাঁহার দেহের আচ্ছাদন অপসারিত করিলে দেখা যায় যে, তথায় মৃতদেহের পরিবর্ত্তে কতকগুলি ফুল পড়িয়া আছে। সেই ফুল বণ্টন করিয়া হিন্দু শিষ্যগণ একভাগ কাশীতে লইয়া দাহ করেন এবং কাশীস্থিত কবীরচৌরা নামক স্থানে সেই ভস্ম সমাধিস্থ করেন। মুসলমান ভক্তগণ ফুলের অপর অর্দ্ধাংশ মগহরেই কবর দিয়া রাখেন। তজ্জন্য ঐ উভয় স্থানই কবীরপন্থীদের তীর্থ-স্থান হইয়া রহিয়াছে।

কবীর, শেখ—তিনি দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুনের সময়ের একজন বিখ্যাত ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। আমীর হিন্দু-বেগ ও তাঁহার পুত্র বাবা বেগ জলায়িরি উভয়েই শেখ কবীরের শিষ্য ছিলেন। হুমায়ুন, বাবা বেগ জলায়িরকে জৌন-পুরের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। তিনি জৌনপুরে আসিয়াই স্বীয় গুরু শেখ কবীরের জন্য শিক্ষামন্দির, ভজনালয় ও বাসস্থানের জন্য একটী সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া, অতীত কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

কমরউদ্দিন খাঁ — দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহের প্রধান মন্ত্রী। তিনি তুরাণ দেশের (তুর্কিস্থান) অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা মোহাম্মদ আমীন খাঁ আওরঙ্গজীবের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি তাঁহার পিতার জীবিতকালে গোসলখানার দেওয়ান ছিলেন। চিন-ক্লিস খাঁ দাক্ষিণাত্যে চলিয়া গেলে, তিনিই মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু তিনি মন্ত্রী পদের উপযুক্ত ছিলেন না। আহাম্মদ শাহ আবদালীর সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। মন্ত্রী কমরউদ্দিনের মৃত্যুর পরেও তাঁহার পুত্র মীরমন্নু প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারই বিক্রমে আহাম্মদ শাহ আবদালী যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, কান্দাহারে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। মোহাম্মদ শাহ এই বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ বহু খিলাতসহ তাঁহাকে লাহোর ও মুলতানের সুবাদারের পদে নিযুক্ত করেন।

কমলকৃষ্ণ দেব, মহারাজা—তিনি কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা রাম-কৃষ্ণের ষষ্ঠ পুত্র। ১৮২০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি তাৎকালীন হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সাহিত্যানুরাগীও ছিলেন। ‘গুণাকর’ ও ‘ভাস্কর’ নামে দুইখানি পত্রিকা তাঁহারই

অর্থানুকল্যে প্রকাশিত হইত। তিনি নিজেও তাহাতে লিখিতেন। বিদ্যালয় চিকিৎসালয়, অন্নসত্র প্রভৃতি অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে ও তাঁহার খুব অনুরাগ ছিল এবং তজ্জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়ও করিয়াছেন। তাঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ তিনি ১৮৭৭ সালে রাজা ও ১৮৮০ সালে মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। নীলকৃষ্ণ ও বিনয় কৃষ্ণ নামে দুই পুত্র রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন।

কমলকৃষ্ণ সিংহ, রাজা—তিনি ময়মনসিংহের অন্তর্গত সুসঙ্গের রাজা প্রাণকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ১২৪৬ বাংলার (১৮৩৯ খ্রীঃ) আষাঢ় মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে উর্দ্দু ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট শিকারী ছিলেন। গারো পাহাড় তখনও তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয় নাই। তিনি তথায় হাতী ধরিবার খেদা করিয়া হাতী ধরিতেন। এই প্রকার শিকারে তিনি কয়েকবার নিজের জীবনও বিপন্ন করিয়াছিলেন। সঙ্গীতেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। এই রাজ পরিবার পুরুষানুক্রমেই বিদ্যাচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের রচিত 'সঙ্গীত শতক' 'তূর্য্য-তরঙ্গিনী' (সেতার শিক্ষা), অশ্বতত্ত্ব' 'গোপালন' 'আম্র' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার বহু বিষয়িনী প্রতিভার পরিচায়ক। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের (১৯১২ খ্রীঃ) ২৩শে ফাল্গুন তিনি পরলোক গমন করেন।

কমললোচন, দ্বিজ—উত্তর বঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ কবি। তাঁহার পিতা যদুনাথও কবি ছিলেন। রংপুর জিলায় তাঁহাদের নিবাস ছিল। কমললোচনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'চণ্ডিকা বিজয়' রংপুর সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

কমলাকর—(১) একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যেও বহু খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিৎ জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৫৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রচলিত মত-সম্মত 'সিদ্ধান্ততত্ত্ব বিবেক' নামক জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থের কোনও কোনও স্থানে তিনি ভাস্করাচার্য্যের মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পান। তাঁহার রচিত অপর গ্রন্থের নাম 'অপূর্ব্ব ভাবনোপপত্তি।' (২) 'জাতক তিলক' নামক গ্রন্থের রচয়িতা আর একজন কমলাকরের নামও পাওয়া যায়। তাঁহার অন্য পরিচয় অপ্রাপ্য।

কমলাকর ভট্ট—একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত তিনি নির্ণয়াসিন্ধু নামক স্মৃতিগ্রন্থ ১৬১৬ শকে (১৬৯৪ খ্রীঃ) রচনা করেন।

তাঁহার পিতা রামকৃষ্ণ ভট্ট এবং অগ্রজ দিনকর ভট্টও বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। আরঙ্গাবাদের নিকটবর্ত্তী গোদাবরী নদী-তীরস্থ পৈঠানপুরে (প্রতিষ্ঠাপুর) কমলাকর ভট্টের জন্ম হয়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গাগা ভট্ট (দিনকর ভট্টের পুত্র) ছত্রপতি শিবাজীর অভিষেকে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য — বর্দ্ধমান জিলার একজন পণ্ডিত ও কবি। তিনি কিছুকাল বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কমলাকান্ত শ্যামাভক্ত সাধক ছিলেন। তাঁহার রচিত শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতগুলি বর্দ্ধমান অঞ্চলে সবিশেষ খ্যাত। শেষ জীবনে মহারাজ কর্ত্তৃক তিনি গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন। খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম — 'দ্বিগঙ্গ রাজবংশম্' নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থের রচয়িতা। উক্ত পুস্তকে বরিশালের সন্নিকটস্থ বারোকাটী নামক স্থানের রাজা রুদ্রনারায়ণ সেনের বংশাবলী বর্ণিত আছে। তিনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

কমলাদেবী, রাণী — বর্ত্তমান কাছাড় জিলা ও তৎসংলগ্ন স্থান পূর্ব্বে হৈড়ম্ব দেশ নামে খ্যাত ছিল। খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুলসীধ্বজ কাছাড়ের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার রাজ্যপ্রান্তে শ্রীহট্টের অন্তর্গত প্রতাপগড় রাজ্য ছিল। প্রতাপগড়ের মুসলমান রাজা আফতাবউদ্দিন কাছাড় আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন। পরে কাছাড়পতি তুলসীধ্বজ প্রতাপগড় আক্রমণ করেন কিন্তু স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। তুলসীধ্বজের পত্নী রাণী কমলাদেবী স্বামীর মৃত্যুতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, স্বয়ংই সৈন্য পরিচালন-পূর্ব্বক প্রতাপগড় আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে আফতাব উদ্দিন ও তাঁহার কয়েকজন ভ্রাতা নিহত হন। এইরূপে প্রতাপগড় একেবারে জনশূন্য হয়। (২) মিবারের রাণা জয়সিংহের (১৬৮১—১৭০০ খ্রীঃ অব্দ) অন্যতমা মহিষী। তিনি প্রাচীন প্রমার কুলের দুহিতা এবং অতিশয় রূপবতী ছিলেন। রাজা জয়সিংহ কমলাদেবীর প্রতি অতিশয় আশক্তি নিবন্ধন, প্রথমা রাণীর ও তাঁহার গর্ভজাত পুত্র রাণা অমরসিংহের প্রতি সদয় ছিলেন না। রাজ্যের প্রায় সমস্ত সামন্ত নরপতিরা রাজার এই ব্যবহারে অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। সেজন্য পিতা পুত্রে অচিরে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং জয়সিংহ পরাজিত হইয়া, গদবার রাজ্যে পলায়ন করেন। পরে পিতাপুত্রে সন্ধি স্থাপিত হইলে, আবার জয়সিংহ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৭০০ খ্রীঃ অব্দে জয়সিংহের মৃত্যুর পরে অমরসিংহ রাজা হন।

কমলা নেহরু — স্বদেশ প্রেমিকা মহিলা। প্রসিদ্ধ জননায়ক জবাহরলাল নেহরুর পত্নী। সম্ভ্রান্ত কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ডাঃ জবাহরলাল কাউল, গৃহে উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে তাঁহার শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। কমলা গৃহশিক্ষকের নিকট ইংরেজ, হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করেন। সতের বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। নম্রতা, বিলাসিতাশূন্যতা, কর্ম্মঠতা প্রভৃতি গুণে তিনি ধনী শ্বশুর-কুলের স্নেহের পাত্রী হইয়াছিলেন।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে, তিনি শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী সকলের সহিত উৎসাহের সহিত যোগদান করেন এবং একাধিকবার কারাবরণ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত 'সত্যাগ্রহ', 'আইন অমান্য' প্রভৃতি আন্দোলনেও তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগ দিয়া যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহ্য করেন। কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠা সেবিকারূপে তিনি কিছুকাল এলাহাবাদ কংগ্রেস কমিটির নেত্রীপদও লাভ করেন। বারংবার এবং দীর্ঘকাল কষ্টসাধ্য রাজনীতিক আন্দোলনে যুক্ত থাকায়, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় এবং দীর্ঘকাল পীড়িতা থাকিয়া ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার গুরুতর পীড়ার সময়েও তিনি স্বামীকে দেশের কার্য্যে যোগ দিতে উৎসাহ দিতেন। ১৯৩৫ সালের মধ্যভাগে জবাহরলাল যখন রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ ছিলেন, তখন কমলাকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার কিছুকাল পরেই জবাহরলালকে অকস্মাৎ মুক্তি দেওয়া হয় এবং তিনি বিমানপোত-যোগে পীড়িতা পত্নীর নিকট উপস্থিত হন। তথায় কয়েকদিন পরেই কমলার মৃত্যু ঘটে।

কমলুক — কাবুলের হিন্দু শাহীবংশীয় রাজা সামন্তের পুত্র। তিনি কাশ্মীরের শৌণ্ডিকবংশীয় নরপতি গোপাল বর্ম্মার রাজত্বকালে (৯০২-৯০৪খ্রীঃ) বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম তোরমান। কাশ্মীরপতি গোপালবর্ম্মার মন্ত্রী প্রভাকরদেব কাবুলের শাহী রাজ্য জয় করিয়া তোরমানকে প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কমলুক নামে অভিহিত করেন (৯০৩ খ্রীঃ)। ভীম শাহী এই কমলুকের পুত্র। ভীমের দৌহিত্রী দিদ্দা, কাশ্মীরপতি ক্ষেমগুপ্তের (৯৪৯-৯৫৮ খ্রীঃ) মহিষী ছিলেন। কাবুলের শাহীবংশীয় রাজাদের বংশ তালিকা এরূপ— (১) কল্লর বা লল্লিয়। (৮৮০-৯০০)। (২) সামন্ত—(৯০০)। (৩) কমলুক -(৯০৩)। (৪) ভীমশাহী —(৯৪০-৯৬০)। (৫) জয়পাল — (৯৬০-৯৮০)। (৬) আনন্দপাল —

(৯৮০-১০০০)। (৭) ত্রিলোচন পাল — (১০০১-১০২১)। (৮) ভীমপাল —(১০২১ ১০২৬)। (৯) রুদ্রপাল। ভীমপালের পুত্র রাজ্যচ্যুত হইয়া কাশ্মীররাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি কাশ্মীরপতি অনন্তদেবের (১০২৮-৮১) অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন।

কমলেশ্বর সিংহ—আসামের আহম্-বংশীয় একজন রাজা। ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে গৌরীনাথ সিংহ পরলোক গমন করিলে, তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী বুড়া গোঁহাই স্বীয় প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বড় বড়ুয়াকে হত্যা করিয়া, গদাধরের বংশধর কেনারামকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কেনারাম রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া, কমলেশ্বর সিংহ ও সুকালিসিংহ ফা নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বুড়া গোঁহাই পূর্ণানন্দই প্রকৃতপক্ষে সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। কোনও সময়ে হরদত্ত ও বীরদত্ত নামক দুই ব্যক্তি আপনাদিগকে উত্তর কামরূপের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। বড় গোঁহাই তাঁহাদিগকে পরাজিত ও নিহত করেন। মোয়ামারিয়া বিদ্রোহী-দের অন্যতম নায়ক পিতাম্বরকে পূর্ণানন্দ পরাজিত করেন। ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে মোয়ামারিয়ারা আবার বিদ্রোহী হয়। ঐ বিদ্রোহও অচিরে দমিত হয় এবং বিদ্রোহীদের নায়ক ভারতী রাজা নিহত হন। মোরাণজাতীয় মোয়ামারিয়ারা ডিব্রুনদীর পূর্ব্বভাগে সর্ব্বানন্দ সিংহের অধীনায়কত্বে বিদ্রোহী হয়। কিন্তু তাহারাও পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। কৃষ্ণনারায়ণ কমলেশ্বরের বিরাগভাজন হইয়া রাজ্য-চ্যুত হন। ১৮১০ খ্রীঃ অব্দে কমলেশ্বর পরলোক গমন করিলে, বুড়া গোঁহাই তৎপদে কমলেশ্বরের ভ্রাতা চন্দ্র-কান্তকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কমাল—প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-সংস্কারক কবীরের পুত্র ও সাধক ছিলেন। কবীর দেখ।

করণরায় বাঘেলা — গুজরাতের বাঘেলাবংশীয় রাজপুত রাজা। তিনি অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির ছিলেন বলিয়া, সকলে তাঁহাকে 'ঘেলো মহারাজ' বলিয়া ডাকিত (ঘেলো অর্থ পাগল)। করণ রায় দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া নিজ মন্ত্রী মাধবের সুন্দরী পত্নীকে বলপূর্ব্বক হরণ করেন। তৎফলে মাধবের সহিত তাঁহার ঘোরতর শত্রুতার সৃষ্টি হয়। মাধব অন্যোপায়ে প্রতিশোধ লইতে না পারিয়া, দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিনের শরণাপন্ন হন। পাঠানরাজ এই সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিয়া নিজ ভ্রাতা আসফ খাঁকে মাধবের সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। করণরায় পরাজিত হইয়া কনিষ্ঠা কন্যা দেবলাদেবীকে সঙ্গে লইয়া পলায়নপূর্ব্বক দেবগিরির রাজা রাম-দেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রামদেব

করণরায়কে নাসিক জিলার বাগনান নামক দুর্গ বাসার্থ প্রদান করেন। করণ রায় যখন পলায়ন করেন, তখন তাঁহার প্রধানা মহিষী কমলাদেবী বন্দিনী হইয়া পাঠান রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করেন। কিছুকাল পরে কমলা দেবীর অনুরোধে আলাউদ্দিন দেবলাদেবীকে আনয়ন করিবার জন্য পুনরায় আসফ খাঁকে প্রেরণ করেন। আসফ খাঁ বাগনানে উপস্থিত হইয়া, করণরায়কে সুলতান আলাউদ্দিনের আদেশ জ্ঞাপন করিলে, করণরায় তাহা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করেন। তৎফলে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে করণরায় পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। কিছুকাল পূর্ব্বে দেবগিরির রাজা রামদেব স্বীয় পুত্রের সহিত দেবলা দেবীর বিবাহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। করণরায় তখন সেই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। এক্ষণে, পাঠান অন্তঃ-পুরচারিণী হওয়া অপেক্ষা রামদেবের পুত্রবধূ হওয়া কন্যার পক্ষে শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া, তিনি দেবলাদেবীকে দেবগিরি অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে দৈববশতঃ সানুচর দেবলাদেবী পাঠান সেনাপতি আসফ খাঁর দৃষ্টিপথে পতিত হন এবং আসফ খাঁ বলপ্রয়োগে দেবলাদেবীকে বন্দিনী করিয়া, দিল্লীতে প্রেরণ করেন। দেবলাদেবী তথায় আলাউদ্দিনের পুত্র খিজির খাঁর সহিত পরিণীতা হন।

করসণ্‌দাস মূলজী— একজন গুজ-রাতি সমাজ-সংস্কারক ও সাহিত্যিক। ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি মাতৃ-পিতৃহীন হওয়ায় খুল্লতাতপত্নী কর্ত্তৃক পালিত হন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি বিধবাবিবাহ সমর্থন করিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশ করাতে তাঁহার খুল্লতাতপত্নী তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পরে একটি ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া কিছুকাল তিনি কলেজে অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি 'সত্যপ্রকাশ' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৫৫ খ্রীঃ)। ঐ পত্রিকায় গুজরাতি বণিক-সমাজের নানারূপ কুরীতি ও কুনীতির তীব্র সমালোচনা করিতে থাকেন। গুজরাত প্রদেশে বল্লভাচারী বৈষ্ণব গুরুরা 'মহারাজ' নামে অভিহিত হন। তাঁহাদের অনেকের নৈতিক জীবন অতি জঘন্য। করসণ্‌দাস নিজ পত্রিকায় ঐ সকল মহারাজদিগের জীবনচর্য্যাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন। তৎফলে কতিপয় মহারাজ তাঁহার বিরুদ্ধে মানহানীর মোকর্দ্দমা আনয়ন করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে এই ঘটনা ঘটে। করসণ্‌দাসের কতিপয় সহৃদয় বন্ধু, এই সকল ধনী ও প্রতিপত্তিশালী মহারাজ-দিগের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমার ব্যয় নির্ব্বা-হের জন্য তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করেন।

পরিশেষে তাঁহারই জয় হয়। তিনি দুইবার ইংলণ্ডে গমন করেন। গুজরাতি ভাষায় তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে গুজরাতি-ইংরেজি অভিধানই সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

করিম—মীর মহম্মদ কাজিমের কবি-জন সুলভ নাম। তিনি এক ফকিরের পুত্র। তিনি দাক্ষিণাত্যের কুতব-শাহের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন। তদ্‌রচিত একখনি কাব্যগ্রন্থ আছে।

করিমচাঁদ—প্রামারবংশীয় করিমচাঁদ আজমীরের নিকটস্থ শ্রীনগরের একজন সর্দ্দার ছিলেন। তিনি তৎকাল প্রচলিত দস্যু-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। মিবারের রাণা রায়মল্লের পুত্র রাণা সংগ্রামসিংহ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়েই রাণা সঙ্গ (সংগ্রাম সিংহ) তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। করিমচাঁদ তাঁহাকে রাজ্যলাভেও যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। রাণা সঙ্গ পিতৃরাজ্য (১৫০৯ খ্রীঃ) লাভ করিয়া করিমচাঁদকে ভূমিবৃত্তি দান করিয়াছিলেন। করিম-চাঁদের পুত্র জগমলও রাণা সঙ্গকে সাহায্য করিয়া বৃত্তি লাভ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু রাণা সঙ্গের অযোগ্য পুত্র বিক্রমজিৎ এই পিতৃবন্ধুকে অব-মাননা করিয়া রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন।

কর্ক—তিনি রাষ্ট্রকূটবংশীয় নরপতি ইন্দ্ররাজের পুত্র ও তৃতীয় গোবিন্দ অথবা প্রথম জগত্তুঙ্গের (৮০৮ খ্রীঃ অব্দ) ভ্রাতুষ্পুত্র। গুর্জ্জরগণকে শাসনে রাখিবার জন্য পিতৃব্য গোবিন্দ তাঁহাকে গুজরাতের সামন্ত নরপতির পদে স্থাপন করেন। তিনি তথাকার রাজা নাগাবলোককে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই গুজরাতে রাষ্ট্রকূটবংশের এক শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্কের পুত্র পরবলের কন্যা রন্নাদেবীকে বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি ধর্ম্মপাল বিবাহ করিয়াছিলেন। পরবলের পুত্র বাউক ও কক্কুক।

কর্জ্জন, লর্ড—ভারতবর্ষের একজন খ্যাতনামা রাজপ্রতিনিধি। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম জর্জ্জ ন্যাথানিয়েল, কর্জ্জন অব কেডলষ্টন (George Nathaniel, Curzon of Kedlestone) ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে তাঁহার জন্ম হয়। স্বদেশে প্রসিদ্ধ স্কুল ও কলেজে তাঁহার শিক্ষালাভ ঘটে। সর্ব্বত্রই তিনি কৃতী ছাত্ররূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শিক্ষা সমাপন করিয়া কয়েক বৎসর ইংলণ্ডেই দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দে ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও প্রধান শাসনকর্ত্তা (Viceroy and Governor General) পদ লাভ করিয়া এদেশে

আগমন করেন। অতি বিচক্ষণ, পরিশ্রমী, কর্ম্মকুশল এবং রাজনীতি-বিশারদ শাসনকর্ত্তারূপে তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ভারতের সীমান্ত প্রদেশে ইংরেজ শাসন সুদৃঢ় করিবার জন্য তিনি "উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ" (North West Frontier Province) নামে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ সৃষ্টি করিয়া রাজনীতিজ্ঞান ও দূর-দর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন। স্থলপথে রুশীয়া যাহাতে, আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া ভারত আক্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি নানাবিধ রাজনৈতিক ব্যবস্থা করেন। ঐ সংশ্রবে তিনি, ইংরেজ জাতির স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার জন্য পারস্য উপসাগরে ইংরেজ অধিকৃত স্থানসমূহ পরিদর্শনে গমন করেন। তিব্বতে ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা এবং তৎসংশ্রবে রুশীয় ও চীন প্রভুত্বের প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি তিব্বতে ইংরাজ দূত প্রেরণ করেন। তৎফলে ইংরাজের সহিত তিব্বতের এক সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর দ্বারা ঐ বিরোধের অবসান হয়।

আভ্যন্তরিণ শাসন ব্যাপারেও তিনি বহুক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদান করেন। নানা বিভাগে কার্য্যপ্রণালীর, বহু উৎকর্ষ সাধন ও ব্যবস্থার বিস্তৃতি সাধন, তাঁহার শাসনকালে সম্পন্ন হয়। তাঁহার শাসন সময়ে তাজমহলের অনুকরণে কলিকাতায় 'ভিক্টোরিয় স্মৃতি মন্দিরের' নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। ১৯০২ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দিল্লীতে এক দরবার হয়। দেশীয় রাজ্যসমূহের সহিত কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের সম্পর্ক যাহাতে আরও সুদৃঢ় ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তিনি তাহার ব্যবস্থা করেন। দেশীয় রাজন্যবর্গের পুত্র ও অন্যান্য নিকট আত্মীয় যুবকদিগের দ্বারা তিনি একটি স্বেচ্ছামূলক সেনাবাহিনী (Imperial Cadet Corps) গঠন করেন। শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতির জন্য একাধিক পরামর্শ সমিতি (Commission) গঠন করিয়া, তিনি তদ্বিষয়ে তাঁহার আগ্রহের পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহারই শাসন সময়ে বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দুইটি প্রদেশ সৃষ্ট হয় এবং তৎফলেই প্রসিদ্ধ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় (কৃষ্ণকুমার মিত্র ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রঃ) ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে এপ্রিল মাসে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকাল শেষ হইলে, স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন কিন্তু ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে পুনরায় পূর্ব্বপদে নিযুক্ত হইয়া পুনরাগমন করেন কিন্তু এবারে দীর্ঘকাল কাজ করিতে পারেন নাই। ভারতের সমর বিভাগে

কোনও কোনও ব্যবস্থা প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ উপলক্ষে এদেশের তৎকালীন প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচনারের (Lord Kitchner) এর সহিত তাঁহার মতবিরোধ হয়। ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত ব্যাপারে তাহার প্রস্তাব গ্রহণ না করায়, তিনি নির্দ্দিষ্টকাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কর্ম্মত্যাগ করেন। এদেশের পুরাতত্ত্ব বিভাগকে (Archeological Department) পুনর্গঠন করিয়া প্রাচীন মন্দির হর্ম্ম্য, প্রভৃতিকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া, তিনি এদেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতি রক্ষার নামে তিনি অন্ধকূপের আনুমানিক প্রতিষ্ঠার স্থানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দেশবাসীর বিরাগভাজন হন।

লর্ড কর্জ্জন নিজ কার্য্যক্ষমতাতে দৃঢ়বিশ্বাসী দাম্ভিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উপাধি বিতরণের সভায় তিনি সমগ্র প্রাচ্য দেশবাসীদিগকে মিথ্যা-ভাষণপটু বলিয়া কটূক্তি করেন। তৎফলে দেশে তুমুল আন্দোলন হয় এবং রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ মনস্বীগণও নানা তথ্য ও যুক্তি সংবলিত বক্তৃতা দ্বারা তাঁহার অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক তাহা প্রমাণ করেন। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি যে সংস্কার সাধন করেন, তদ্দ্বারা এদেশে উচ্চশিক্ষার গতি ব্যাহত হইবে এই আশঙ্কা করিয়া শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ তাঁহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। বঙ্গবিভাগ উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করিয়াছিলেন এই সন্দেহে হিন্দুদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি ও স্থানে স্থানে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে গমন করিয়াও তিনি ইংলণ্ডীয় রাজনীতির সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কর্ণ — (১) দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কলচুরির তিনি রাজা ছিলেন। তাঁহার পিতারনাম গাঙ্গেয় দেব। সম্ভবতঃ তিনি ১০৩৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে রাজা হন। তিনি কলহপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার ভয়ে বঙ্গ ও কলিঙ্গদেশ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে লিখিত আছে যে, বঙ্গদেশের অধিপতি বিগ্রহপাল তাঁহাকে পরাজিত করিলে, কর্ণ স্বীয় দুহিতা যৌবনশ্রীকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই কর্ণদেবের অপরা কন্যা বীরশ্রীকে চন্দ্রদ্বীপের রাজা বজ্রবর্ম্মার পুত্র জাতবর্ম্মা বিবাহ করিয়াছিলেন।

কর্ণ— (২) চিতোরপতি সমরসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র। পিতার মৃত্যুর সময়ে তাঁহার বয়স অতি অল্প ছিল বলিয়া, তাঁহার মাতা কর্ম্মদেবী রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তিনি ১১৯৩ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কর্ণ চৌহানবংশীয়া এক রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে মাহুপ নামে এক অকর্ম্মণ্য পুত্র জন্মে। মাহুপ মাতুলালয়েই থাকিতেন। এমন কি পিতার মৃত্যুর পরেও তিনি চিতোরে না আসায় কর্ণের দৌহিত্র শনিগুরুবংশীয় রণধবল চিতোরের সিংহাসন অল্প-কালের জন্য অধিকার করিয়াছিলেন।

কর্ণ — (৩) মিবারপতি রাণা প্রতাপ সিংহের পৌত্র ও রাণা অমর সিংহের পুত্র। রাণা অমরসিংহ দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াই মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রাণা কর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৬২১ খ্রীঃ)। তিনি রাজা হইয়াই দেখিলেন যে, রাজকোষ শূন্য। সেজন্য তিনি সুরাট নগর লুণ্ঠনপূর্ব্বক প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিলেন। ইহার পরে, জাহাঙ্গীরের পুত্র খুরম স্বীয় সহোদর ভ্রাতা পারভেজকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পিতার ভয়ে কিছুদিন রাণা কর্ণের আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। রাণা কর্ণ ১৬২৮ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎসিংহ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

কর্ণ— (৪) তিনি বিকানীর-রাজ রায় সিংহের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৬৩২ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজা হন। তিনি সম্রাট শা-জাহানের পুত্র দারা শেকোর পক্ষাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার পদ্মসিংহ, কেশরীসিংহ, মোহনসিংহ ও অনুপসিংহ নামে চারিপুত্র ছিল। মোহনসিংহ, পদ্মসিংহ, কেশরীসিংহ ক্রমে গতায়ুঃ হইলে, অনুপসিংহ পিতার মৃত্যুর পর ১৬৭৪ খ্রীঃ অব্দে বিকানীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কর্ণওয়ালিস, লর্ড— (Lord Cornwallis) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধিকার কালের একজন প্রধান শাসনকর্ত্তা (Governor General)। ১৭৩৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। পূর্ব্বে ভারতশাসন কার্য্যে কোম্পানীর অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীদিগকেই বড় লাটের কার্য্য দেওয়া হইত, কিন্তু তাঁহারই স্থলে ইহার প্রথম ব্যতিক্রম হয়। তিনি ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ডে নানা বিভাগে, নানা দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্য করিয়া বিশেষ যশ ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ভারতের বড় লাট হইয়া এদেশে আগমন করেন। তাঁহার শাসনকালে প্রথম তিন বৎসর কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের উৎকোচ-গ্রহণ প্রভৃতি অনাচার নিবা-

রণের জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত থাকিতে হয়। সেই সময়ে জেলার শাসনকর্ত্তাই জেলার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তিনি স্বীয় কোন আত্মীয়ের নামে ব্যবসায় করিতেন। তদ্দ্বারা তাঁহার বেতন অপেক্ষা অনেক-গুণ বেশী আয় হইত। ইহাতে কি রকম অর্থশোষণ হইত, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। প্রধান সেনাপতি তাঁহার দুইজন প্রিয়পাত্রকে দুইদল সৈন্য গঠনের অনুমতি দেন। বড়লাট সেই সৈন্যদলকে বিদায় দেন। কিন্তু তাঁহারা ক্ষতিপূরণের দাবী করেন। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে, ইহা একবারেই মিথ্যা, সৈন্যদল গঠিতই হয় নাই। কাশীরাজের রেসিডেণ্ট মাসে এক হাজার টাকা বেতন পাইতেন; কিন্তু ব্যবসায় করিয়া বৎসরে চারিলক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। এই সমস্ত অন্যায় কার্য্যের দ্বারা ইংরেজ জাতির সুনাম বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া তিনি দৃঢ়হস্তে তাহার মূলোৎপাটন করিলেন। তিনি এক-দিকে দুরাচার নিবারণ করিলেন এবং অপরদিকে অল্প বেতনভুকী কর্ম্মচারী-দিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া তাহাদেরে মিতব্যয়ী হইতে শিক্ষা দিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। পূর্ব্বে ৫ পাচ বৎসরের জন্য কোনও লোককে নির্দ্দিষ্ট হারে রাজস্ব দিবার বন্দোবস্তে ভূমি ইজারা দেওয়া হইত। প্রতি পাঁচ বৎসর পরে অতিরিক্ত রাজস্ব দিতে অসম্মত হইলে অপরকে তাহা অর্পণ করা হইত। ইহার কুফল হইত এই যে, জমিদার এই পাঁচ বৎসরে প্রজাদের উপর অত্যাচার করিয়া যত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিতেন। এইরূপে প্রজারা সর্ব্বস্বান্ত হইত। সাধু লর্ড কর্ণওয়ালিস ইহা দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, প্রথমে দশ বৎসরের জন্য বন্দো-বস্ত করেন এবং পরে তাহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয় (১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দ)। ইহার ফলে বাঙ্গালা ও বিহারের রাজস্ব তিন কোটী টাকা অবধার্য্য হইয়াছিল। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেও তখন প্রজাদের অনুকূলে স্থায়ীফল কিছুই হয় নাই, উহা পরে হইয়াছে। তাঁহার সময়ে সমস্ত দেশ কতকগুলি জিলাতে বিভক্ত হইল। জিলাগুলি দেশ শাসনের কেন্দ্র হয় এবং প্রতি জিলায় একজন ইংরেজ বিচারক ও তাঁহার অধীনে এক জন দেওয়ানী বিচারক নিযুক্ত হন। তাহার আপিল বিচারের জন্য চারিটী কেন্দ্রে—কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনায়—চারিটী আপিল আদালত স্থাপিত হইল। শেষ আপিল বিচারের জন্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হইল। ইহা বড় লাটের অধীন ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবাসীকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োগের বিরোধী

ছিলেন। সে জন্য তাঁহার অনেক সংস্কার সুফল প্রসব করিতে পারে নাই। তাঁহার সময়ের আর একটী প্রধান ঘটনা—তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ। টিপু সুলতান দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধের পর ক্রমশঃ বল সঞ্চয় করিতেছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস টিপু সুলতানের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। ইতিমধ্যে ইংরেজের আশ্রিত ত্রিবাঙ্কুররাজ, ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে কয়েকটি স্থান ক্রয় করিয়া, তন্মধ্যস্থ দুর্গ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। টিপু সুলতান সেই সকল স্থান তাঁহার বলিয়া দাবী করিয়া ত্রিবাঙ্কুর রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে টিপু সুলতান কুর্গ ও কানাড়া প্রদেশের বহু হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করিয়াছিলেন। দুই হাজারের উপর ব্রাহ্মণ মুসলমান হইবার ভয়ে আত্মহত্যা করেন। এই সকল কারণে পেশোয়ার মন্ত্রী নানাফড়নবিশ টিপু সুলতানের ঘোরতর বিরোধী হইয়াছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস, নানাফড়নবিশ ও নিজামের সহিত সন্ধি করিয়া টিপু সুলতানকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহাদের মিলিত শক্তির নিকট টিপু সুলতান পরাস্ত হইলেন। তিনি তিন কোটী ত্রিশ লক্ষ টাকা নগদ ও রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। পাছে টিপু সুলতান সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ করেন, সেই জন্য প্রতিভূস্বরূপ তাঁহার দুই পুত্রকে লর্ড কর্ণওয়ালিস কলিকাতায় আনয়ন করেন। টিপু সুলতানের প্রদত্ত রাজ্য ইংরেজ, নিজাম ও মহারাট্টা এই তিন শক্তি সমান অংশে ভাগ করিয়া লইলেন। তাঁহার সময়ের আর একটী ঘটনা এই —১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আবার ২০ বৎসরের জন্য সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সালেই তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু ওয়েলেসলীর রাজ্য শাসনে অসন্তুষ্ট ইংলণ্ডীয় শাসনকর্ত্তাগণ লর্ড কর্ণওয়ালিসকে ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে পুনর্ব্বার বড় লাট করিয়া প্রেরণ করেন। তিনি এদেশে আসিয়া তিন মাস অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই গাজীপুরে পরলোক গমন করেন।

কর্ণদেব—চেদিবংশীয় গাঙ্গেয় দেবের পুত্র কর্ণদেব একজন প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন। তিনি সপ্ততিবর্ষ (৭০ বৎসর) রাজত্ব করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন।

কর্ণবতী—চিতোরের রাণা সংগ্রাম-সিংহের অন্যতমা মহিষী ও রাণা উদয় সিংহের জননী। ১৫৩৩ খ্রীঃ অব্দে গুজরাতের পাঠান নরপতি সুলতান বাহাদুর চিতোর আক্রমণ করেন। তখন উদয়সিংহ শিশু মাত্র। রাণী কর্ণবতী উপায়ান্তর না দেখিয়া, রাজপুত প্রথামত দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুনের নিকট

'রাখী' প্রেরণ করেন। রাজপুতদিগের মধ্যে এই রাখী প্রেরণ একটি পবিত্র অনুষ্ঠান। কেহ বিপদগ্রস্ত হইয়া সাহায্যপ্রার্থী হইয়া অপর কাহারও নিকট রাখী প্রেরণ করিলে, প্রাপক প্রেরককে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য থাকিতেন। রাজপুতেরা এইভাবে রাখী পাওয়া গৌরবজনক মনে করিতেন এবং ঐরূপ রাখী প্রেরণের ফলে প্রেরক ও প্রাপক পরস্পরে ধর্ম্মসম্পর্কে সম্পর্কিত হইতেন। হুমায়ুন কর্ণবতীর রাখী পাইয়া তাঁহার ধর্ম্মভগিনী কর্ণবতীর সাহায্যের জন্য যাইতে প্রস্তুত হন। কিন্তু তখন তিনি বাঙ্গলাদেশে থাকায় যাইতে বিলম্ব হইতে লাগিল। কর্ণবতী এদিকে বিপন্ন হইয়া স্বয়ংই সামন্ত নরপতিগণসহ যুদ্ধে গমন করিলেন। সেই যুদ্ধে রাজপুতদিগের পরাজয় ঘটিলে, কর্ণবতী বহু রাজপুতমহিলাসহ 'জহরব্রত' অবলম্বন করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। কিছুকাল পরে হুমায়ুন চিতোরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গুর্জ্জর-পতিকে পরাজিত করিয়া মিবার হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। মালবপতি সুলতান বাহাদুরকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া, হুমায়ুন তাঁহাকেও রাজ্যচ্যুত করেন এবং তাঁহার রাজধানী মান্দুনগরে বিক্রমজিতকে অভিষিক্ত করেন।

কর্ণিধন — তিনি মারবারের একজন শ্রেষ্ঠ ভট্ট-কবি। তাঁহার রচিত কাব্যের নাম 'সূর্য্যপ্রকাশ'। তিনি যোধপুরপতি অভয়সিংহের রাজত্বকালে (১৭২৭ খ্রীঃ-১৭৫০ খ্রীঃ অব্দ) বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি কেবল অসাধারণ কবি ছিলেন না— একাধারে বিচক্ষণ মন্ত্রী ও যোদ্ধা ছিলেন। অম্বররাজ জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে তিনি অভয়সিংহের ভ্রাতা ভক্তসিংহের সহিত থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

কর্ম্মদেবী—(১) মারবারের সামন্ত রাজ ঔরন্তিনগরের অধিপতি মাণিক রায়ের কন্যা। সেই সময়ে মারবার রাজ্যে মহারাজ চণ্ড রাজত্ব করিতে ছিলেন এবং পুগলনগরে রনঙ্গজিৎ রাজা ছিলেন। তিনি রাওচণ্ডের সামন্ত নরপতি ছিলেন। রনঙ্গদেবের পুত্র সাধু একজন বীর পুরুষ ছিলেন। নাগোর হইতে সিন্ধু দেশের তীরভূমি পর্য্যন্ত সমস্ত দেশেই তিনি জয় করিয়াছিলেন। একবার এইরূপ দেশ লুণ্ঠন করিয়া ঔরিন্তনগরের প্রান্ত ভাগ দিয়া স্বনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে ঔরিন্তপতি মাণিক রায় সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে সাদরে আমন্ত্রণ করিলেন। পান ভোজনের আয়োজন হইতে লাগিল। মাণিকরায় সাধুর বীরত্ব কাহিনী শুনিতে লাগিলেন। এদিকে মাণিক রায়ের কন্যা কর্ম্মদেবী

সেই সকল বীরত্ব কাহিনী নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে রাওচণ্ডের চতুর্থ পুত্র অরণ্যকমলের সহিত কর্ম্মদেবীর বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছিল। কর্ম্মদেবী এই বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, সাধুকে বিবাহ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। পিতা ইহার বিষময় ফলের কথা অবগত হইয়াও, কর্ম্মদেবীর মতেই মত দিলেন। অচিরে সাধুর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। সাধু পত্নীসহ শ্বশুর-গৃহ হইতে, স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে অরণ্যকমল কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাঁধিল। কর্ম্ম দেবী বীর রমণীর ন্যায় স্বীয় স্বামীকে উৎসাহিত করিলেন। কিন্তু সেই ভীষণ যুদ্ধে সাধু রণক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। কর্ম্মদেবী স্বীয় দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া, স্বীয় শ্বশুর রণঙ্গদেবের নিকট এবং বাম হস্ত ছেদন করাইয়া, পিতৃ-ভবনের ভট্ট কবির নিকট প্রেরণ করিয়া স্বামীর চিতায় আরোহণ করিলেন। (১৪০৭ খ্রীঃ)

কর্ম্মদেবী—(২) রাজপুত বীরাঙ্গনা ও মিবারপতি সমরসিংহের মহিষী। মোহাম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধে সমরসিংহ যখন নিহত হন, তখন তাঁহার পুত্র কর্ণ অতি অল্প বয়স্ক ছিলেন। রাজমহিষী কর্ম্মদেবী পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া (১১৯৩ খ্রীঃ) স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তিরৌরী রণক্ষেত্রে সমরসিংহের মৃত্যুর পর পাঠান সেনাপতি কুতবুদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন। কর্ম্মদেবী পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি বহু সামন্ত সর্দ্দার ও বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া শত্রুর সম্মুখীন হন এবং স্বয়ংও যোদ্ধৃবেশে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সৈন্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁহার অসীমবীরত্বে শত্রুসৈন্য পরাজিত ও দেশ হইতে বিতাড়িত হয়। কুতবুদ্দিন অতিকষ্টে পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষা করেন।

কলহস্তম্ভ — উড়িষ্যার শুল্কিবংশীয় অন্যতম নরপতি। তাঁহার অন্য নাম কণাদস্তম্ভ ও উপাধি বিক্রমাদিত্য ছিল। কাঞ্চনস্তম্ভ দেখ।

কলিবিষ্ণুবর্দ্ধন—তিনি বেঙ্গির চালুক্য-বংশীয় নরপতি দ্বিতীয় বিজয়াদিত্যের পুত্র। ৮৪২—৮৪৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত মাত্র দেড় বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাহার পুত্র গুণক বিজয়াদিত্য রাজা হন। কুজবিষ্ণু বর্দ্ধন দেখ।

কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়—একজন সাহসী বাঙ্গালী উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্ম-চারী। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে এদেশে মেডিকেল কলেজের পাঠ সমাপন করিয়া তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ১৯১০

খ্রীঃ অব্দে তথায় উচ্চতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগে (Indian Medical Service এ) কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে ইউরোপের মহাসমর আরম্ভ হইলে, কল্যাণকুমার সৈনিক বিভাগের চিকিৎসকরূপে মেসোপটেমিয়া গমন করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে নানা স্থানে রোগীর শুশ্রূষা প্রভৃতি কাজের মধ্যে সাহস, বিচক্ষণতা, ধীরতা, কর্ম্মতৎপরতা প্রভৃতি প্রভূত সদ্‌গুণের জন্য তিনি উচ্চ কর্ম্মচারীদিগের প্রশংসা লাভ করেন। একাধিক সেনাপতি তাঁহাদের প্রেরিত সরকারী বিবরণীতে (Despatch) তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁহার পদোন্নতি ও পুরস্কার প্রদানের জন্য রাজসরকারে অনুরোধ করেন। ১৯১৭ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে মহামারী রোগে যুদ্ধক্ষেত্রে এই সাহসীক সন্তানের অকালে মৃত্যু হয়।

কল্যাণচন্দ্র—(১) তিনি একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ১১৭৯ খ্রীঃ অব্দে (১১০১ শকে) বর্ত্তমান ছিলেন। (২) তিনি কাশ্মীরপতি রাজা সুস্‌লের (১১১২-১১২৮ খ্রীঃ) সেনাপতি গর্গের পুত্র। দুষ্ট কর্ম্মচারীরা তাঁহার ঐশ্বর্য্যে ও বীরত্বে ঈর্ষান্বিত হইয়া রাজার সহিত তাঁহার বিবাদ সংঘটন করাইয়া দেয়। এই বিবাদে গর্গ, কল্যাণচন্দ্র ও বিদেহ নিহত হন। (৩) একজন জৈন দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য, ধর্ম্মকীর্ত্তির "প্রমাণ বার্ত্তিকের" এক টীকা রচনা করেন। সম্ভবতঃ তিনি ১০০০ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

কল্যাণবর্ম্মা — (১) তিনি একজন জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থকার। তিনি আপনাকে বটেশ্বর নামেও অভিহিত করিয়াছেন। তিনি ৮৯৯ খ্রীঃ অব্দে (৮২১ শকে) বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'সারাবলী'। ইহা একখানা বৃহৎ জাতকগ্রন্থ। কিন্তু মহারাষ্ট্রের পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী বলেন যে তিনি অনুমান ৫০০ শকে (৫৭৮ খ্রীঃ অব্দে) বর্ত্তমান ছিলেন। রীবাপ্রদেশের অন্তর্গত দেবগ্রামে (বর্ত্তমান দেবরা) কল্যাণবর্ম্মা যবন বিরচিত হোরাশাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া, তাঁহার সারাবলী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। (২) এই কল্যাণবর্ম্মা ১১৬৫ শকে (১২৪৩ খ্রীঃ) কেশববার্ক বিরচিত 'বিবাহবৃন্দাবন' নামক গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। তিনি ১১৬৫ শকের পর ১৬৫৩ শকের (১৭৪১ খ্রীঃ) পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। (৩) প্রাগজ্যোতিষপুরের নরপতি। তিনি বলবর্ম্মার পরে রাজা হন এবং তাঁহার পরে গণপতিবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন। কল্যাণবর্ম্মার মহিষীর নাম গন্ধর্ব্ববতী ছিল। পুষ্যবর্ম্মা দেখ।

কল্যাণমাণিক্য — তিনি স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা যশোধর মাণিক্যের জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। যশোধর মাণিক্যের মৃত্যুর পরে ১৬২৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজা হন। মহারাজ কল্যাণ-মাণিক্য বিদ্বান্, বুদ্ধিমান ও বাহুবল-সম্পন্ন নরপতি ছিলেন। তিনি ত্রিপুরার বিচ্ছিন্ন সৈন্যদিগকে একত্রিত করিয়া সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। তৎকালীন বাঙ্গালার নবাব সুলতান সুজা (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রীঃ) একবার ত্রিপুরা রাজ্য আক্র-মণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা কল্যাণ-মাণিক্যের বাহুবলে মুঘল সৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। তাঁহার রাজত্ব কালে ত্রিপুরার রাজ্যসীমা বহু-দূর বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারই সময়ে কল্যাণ-গড় দুর্গের (বর্ত্তমান কসবা কালী বাড়ী) কালী বাড়ী নির্ম্মিত হয়। এই মন্দির যে একজন সুদ্ধবিস্থাবিশারদ ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা মন্দির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেই বুঝা যায়। পশ্চিমদিকস্থিত সমতলক্ষেত্র হইতে মন্দির দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেই বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ১৬৫৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে তাঁহার জেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দমাণিক্য রাজা হন।

কল্যাণরক্ষিত — তিনি একজন বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। ৮২৯ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গের মহারাজ ধর্ম্ম-পালের রাজত্বকালে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'সর্ব্বজ্ঞ সিদ্ধি কারিকা', 'বাহ্যার্থ সিদ্ধি কারিকা', 'শ্রুতি পরীক্ষা' 'অন্যাপোহ বিচার কারিকা', 'ঈশ্বরভক্ত কারিকা' প্রভৃতি। এই সমস্ত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ আছে কিন্তু মূল সংস্কৃত গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় নাই। তাঁহারই শিষ্য প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য।

কল্যাণসিংহ— চিতোরের মহারাজ সমরসিংহের পুত্র। ১১৯৫ খ্রীঃ অব্দে সমর সিংহ ও তাঁহার তনয় কল্যাণ সিংহ পৃথ্বীরাজের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক সাহাবুদ্দিন ঘোরীর বিরুদ্ধে তিরৌরী ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধেই তাঁহারা গতায়ু হন। সমর সিংহ দেখ।

কল্যাণসিংহ, রাজা — মুঘল সম্রাট আকবরের অন্যতম সেনাপতি রাজা তোড়রমল্লের পুত্র। বঙ্গের নবাব ইসলাম খাঁর অনুরোধে তিনি উড়িষ্যার সুবাদারের পদ লাভ করেন। একবার তিনি খুর্দ্দা রাজ্য আক্রমণ করিতে ও জগন্নাথের মন্দির লুণ্ঠন করিতে অভিলাষী হন। এমন সময়ে দক্ষিণদিক হইতে গোলকুণ্ডার অধি-

পতি খুর্দ্দারাজ্য আক্রমণ করিলেন। খুর্দ্দার রাজা পুরুষোত্তম কল্যাণসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা কর দিতে সম্মত হইলেন এবং স্বীয় কন্যাকে দিল্লীর সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। কল্যাণ সিংহ ১৬১১ — ১৬১৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন। তৎপরে মোয়াজ্জম খাঁর পুত্র মোকরাম খাঁ উড়িষ্যার সুবাদার হন।

কল্লট ভট্ট—তিনি একজন স্পন্দবাদী দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কল্লটেন্দু ভট্ট নামেও খ্যাত ছিলেন। কাশ্মীরের নরপতি অবন্তী বর্ম্মার সময়ে (৮৫৫-৮৮৪ খ্রীঃ) তিনি বর্ত্তমান ছিলেন এবং তাঁহার জন্মস্থানও কাশ্মীর। তাঁহার রচিত স্পন্দকারিকা ৫২টী কারিকায় বিভক্ত। তাঁহার পূর্ব্বে বসুগুপ্তের 'স্পন্দামৃত' ও সোমানন্দের 'শিবাদৃষ্টি' প্রণীত হয়।

কল্লার — তিনি কাবুলের হিন্দু রাজার মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। তিনি স্বীয় অত্যাচারী প্রভুকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। সম্ভবতঃ ৮৮০ খ্রীঃ-৯০০ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন।

কহ্লন—একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। তিনি ১০৭০ শকে (১১৪৮ খ্রীঃ) বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম চম্পক মিশ্র। কাশ্মীরপতি মহারাজ জয়সিংহ দেবের সময়ে (১১২৫-২১৫০খ্রীঃ) তাঁহার বিখ্যাত ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী রচনা করেন। তাঁহার পিতা চম্পক কাশ্মীরপতি হর্ষের একজন অনুগত অমাত্য ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা শৈব মতাবলম্বী ছিলেন। কহ্লন ও শৈব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচনাবলী হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি বৌদ্ধমতের প্রতিও শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, কহ্লন তাঁহার গুরু অলকদত্তের নির্দ্দেশে রাজতরঙ্গিণী রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থ পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের গ্রন্থাবলীর সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল।

কহ্লনের রাজতরঙ্গিনী একখানি নিরপেক্ষ প্রামাণিক ইতিহাস। কবি তাঁহার গ্রন্থে স্বদেশবাসীদিগের দোষ ক্রটী উপেক্ষা করেন নাই। এমন কি বিশেষ তীব্র ভাষায় তিনি তাহাদের নানারূপ অন্যায় ও অত্যাচারের বিষয়ে নিন্দা করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভেই স্বীকার করিয়াছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী কবি ও ঐতিহাসিকদের গ্রন্থাবলী-হইতে তিনি প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি নূতন ও নিজ সংগৃহীত তথ্যও যোজনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও স্থানে স্থানে কবিত্ব পূর্ণ।

কশ্যপ – (১) একজন জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থকার। বরাহের বৃহৎসংহিতার টীকাকার উৎপল ভট্ট কশ্যপের বচন স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু কশ্যপের গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীঃ পূ ১৪০০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। উৎপলভট্ট দেখ।

কশ্যপ—(২) একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি মজ্ঝিমের সহিত হিমবন্ত প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন। অশোক (৮৭ পৃঃ) দেখ।

কাউয়েল, এডয়োয়ার্ড বাইলস্—(Cowell Edward Byles) ১৮২৬ খ্রীঃ অব্দের ২৩শে জানুয়ারী ইংলণ্ডে তাঁহার জন্ম হয়। ইউলিয়ম জোনসের গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার মনোযোগী হন। প্রথমেই তিনি পারশ্য দেশীয় ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮৫৩ সাল হইতে তিনি প্রসিদ্ধ উইলসন সাহেবের (H. H. Wilson) নিকট প্রাচ্য বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাসের ও অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫৮ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। তিনি বরাবর সংস্কৃত ভাষার আলোচনায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ১৮৬৪ সালে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, স্বদেশে প্রতিগমন করেন এবং ১৮৬৭ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংস্কৃত অধ্যাপক তাঁহার অধ্যাপক হইবার পর হইতে তথায় সংস্কৃত চর্চ্চা বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এল, ডি (Docter of laws) এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি,সি,এল (Docter of Civil Laws) ছিলেন। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাটীর পত্রিকা, কলিকাতা রিভিউ প্রভৃতি বহু পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৯৮ সালে তিনি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। ১৯০৩ সালের ৯ই ফব্রুয়ারী তিনি পরলোক গমন করেন।

কাঞ্চন স্তম্ভ—তিনি উড়িষ্যার শুলকি (শূলক) বংশীয় নরপতি ছিলেন। ৫৫৪ খ্রীঃ অব্দের (সম্বৎ—৬১১) মৌখরী বংশীয় রাজা ঈশানবর্ম্মার একখানা তাম্র লিপিতে এই শুল্‌কিদের প্রবল পরাক্রমের বিষয় অবগত হওয়া যায়। শুল্‌কি বংশের যে কয়েক খানি তাম্র শাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার এক খানিতে মাত্র ৩৩ সাল লেখা আছে। ইহা যদি হর্ষ সম্বৎ হয়, তবে (৩৩ + ৬০৫)

৬৩৮ খ্রীঃ অব্দ হয়। কাঞ্চনস্তম্ভের পুত্র কলহস্তম্ভ বিক্রমাদিত্য (অন্য নাম কণাদস্তম্ভ), তৎপুত্র রণস্তম্ভ (অন্য নাম আলানস্তম্ভ), তৎপুত্র কুলস্তম্ভ ও জয়স্তম্ভ। এই বংশের মাত্র এই কয়টী নামই এপর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। কোদালোক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। ইহার বর্ত্তমান নাম কেদালোক, ইহা উড়িষ্যার উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল। মেদিনীপুরের অধিকাংশ স্থান এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মহাদেবের শক্তি দেবী স্তম্ভেশ্বরী তাঁহাদের কুল দেবতা ছিলেন।

কাজী আবদুল গফুর—তাঁহার জন্ম স্থান খুলনা জিলার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে। তাঁহার পিতামহ ও প্রপিতামহ বাঙ্গলার নবাবের অধীনে কাজির কাজ করিয়া বিস্তৃত জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতার অকাল মৃত্যুতে সে সমস্ত নষ্ট হয়। তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া পরে ১৮।১৯ বৎসর বয়সে গুরু ট্রেনিং পরীক্ষা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন শিক্ষকের কাজ করেন। তৎপর কম্পাউণ্ডারী শিক্ষা করেন। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া তিনি ডাক্তারি পড়িতে অভিলাষী হইয়া ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই সময়েই ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে সেই দিকে আকৃষ্ট হন। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালী সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি বিবাহ করেন। ঢাকা মেডিকেল স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রথমে পূর্ণিয়া জিলায় সরকারী কাজে নিযুক্ত হন। এই সময়ে পূর্ণিয়া রেল বিভাগে নিযুক্ত থাকার কালে, মিল নামক একজন সহকারী ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সহিত তাঁহার মত ভেদ হয়। ইহাতে মিঃ মিল ক্রোধান্ধ হইয়া অনুচিত ভাষায় তাহাকে তিরস্কার করেন। কাজী সাহেবের আত্মসম্মানে ইহাতে আঘাত লাগিল। তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া দুইশত টাকা ক্ষতি পুরণ আদায় করেন। একজন অল্প বেতনের কর্ম্মচারীর পক্ষে তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে এইরূপে বিবাদ করা, তখনকার দিনে কম সাহসের কাজ ছিল না। ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি ভাগলপুরে বদলি হন। তথায় উর্দ্ধতন সিবিল সার্জ্জন সাহেবের অন্যায় ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া কার্য্য পরিত্যাগ করেন এবং স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। একদিন রোগী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিবার পথে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া একবারে অচল হইয়া গেলেন। অনেক চিকিৎসার পরও তাহার দক্ষিণ শরীরার্দ্ধ আরোগ্য হইল না। ঘোর দারিদ্রের মধ্যে পড়িলেন। এই সংগ্রামে তিনি বিচলিত

হইলেন না। এই সময়ে তাঁহার সাধ্বী পত্নী তাঁহার সহায় হইলেন। তিনি ডাক্তারি শিক্ষা করিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বামীর অবস্থার পরিবর্ত্তন করিলেন। এই সময়ে আগরতলায় যাঁহারা তপস্বী নিরামিষাশী ডাক্তার কাজী সাহেব ও তাঁহার সাধ্বী পত্নী ডাক্তার কাজীপত্নীকে দেখিয়াছেন তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের উদ্যানাস্থিত ফল পুষ্প শোভিত বাটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, প্রাচীন কালের ঋষিদের কথাই স্মৃতি পথে উদিত হইত। এই আদর্শ তপস্বী ১৩৪৪ সালের ২৪শে আষাঢ় দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার দেহ অগ্নিতে দাহ করা হয়। তাঁহার কন্যা কুমারী সফিয়া বি এ, বি, টি সহ-কারী স্কুল পরিদর্শিকা, পুত্র রবি কাজি একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পী।

কাঞ্চীপূর্ণ—একজন শূদ্র জাতীয় পরম বৈষ্ণব ভক্ত। মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত কাঞ্চীনগরের সমীপে পলামেলী গ্রামে তিনি বাস করিতেন। তিনি উক্ত প্রদেশে পরম ভাগবত বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ রামানুচার্য্যের সমসাময়িক ও তাঁহা হইতে বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম-নিষ্ঠা ও ভক্তি রামানুজকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। এমন কি রামানুজ এক সময়ে তাঁহাকে গুরুর পদে বরণ করিতেও আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন।

কাত্যায়ন—(১) একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতার উৎকল ভট্ট কৃত টীকায় তাঁহার বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে। (২) একজন বৈয়া-করণিক। তিনি কলাপ 'ব্যাকরণে উনাদি ও কৃৎসংযোগ করিয়াছিলেন। (৩) একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণিক। বাজিন নামক শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় আচার্য্যদিগের সূত্র সমুদয়, সামবেদের উপগ্রন্থ, স্মৃতির শ্লোক, আথর্ব্বন্‌দিগের সম্যক্ ব্রহ্মকারিকা, এবং পাণিনি সূত্র-রূপ মহাসাগরের পোতস্বরূপ মহা-বার্ত্তিক সূত্র তাঁহারই রচিত। (৪) আর এক কাত্যায়নের উল্লেখ আমরা কথা-সরিৎসাগর গ্রন্থে পাই। তিনি ব্রাহ্মণ সোমদত্তের পুত্র। তাঁহার নাম কাত্যায়ন বররুচি। তিনিও অসাধারণ বৈয়াকরণিক ছিলেন। তিনি বৎস দেশের রাজধানী কৌশাম্বী নগরে বাস করিতেন। মহারাজ যোগানন্দের তিনি মন্ত্রী ছিলেন। (৫) গোভিল ঋষির পুত্র কাত্যায়ন, 'গৃহ্য সংগ্রহ' ও 'ছন্দ পরিশিষ্ট' বা 'কর্ম্ম-প্রদীপ' প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত গ্রন্থে শ্রাদ্ধ হোমাদির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। (৬) বিশ্বামিত্রের বংশধর কাত্যায়ন বেদের অনুক্রমণী ও সংহিতার প্রণয়নকর্ত্তা ছিলেন।

কাত্যায়নী সিংহ, রাণী — তিনি মুরশিদাবাদের অন্তর্গত কান্দির দেওয়ান প্রসিদ্ধ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র লালা বাবুর (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ) স্ত্রী ছিলেন। লালা বাবু ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হন। সেই সময়ে তাঁহার এক মাত্র পুত্র শ্রীনারায়ণ অল্পবয়স্ক ছিলেন। রাণী কাত্যায়নী সেই সময়ে সমস্ত বিষয় কার্য্য পরিচালন করিতেন। শ্রীনারায়ণ দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম তারাসুন্দরী ও দ্বিতীয়া পত্নীর নাম করুণাময়ী। তিনি অপুত্রক অবস্থায় গতায়ু হইলে, তাঁহার মাতা, রাণী কাত্যায়নী, স্বীয় ভ্রাতার প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র নামক দুই পুত্রকে, পুত্রবধূ রাণী তারাসুন্দরী ও করুণাময়ীর জন্য যথাক্রমে দত্তকপত্র গ্রহণ করিলেন। এই পোষ্যপুত্রদ্বয় সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত, রাণী কাত্যায়নীই বিষয় পরিচালনা করিতেন। তাঁহারই সময়ে কলিকাতার উপকণ্ঠে পাইকপাড়ার বাড়ী ও কাশীপুরের ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। রাণী কাত্যায়নী স্বামীরই ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন। তিনি অতিশয় দয়াবতী ও দানশীলা ছিলেন। এই পুণ্যশীলা রাণী অন্নমেরু ও তুলাদান উপলক্ষে বহু লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত নানা বিষয়েও বহু লক্ষ টাকা দান করিয়া এই পুণ্যবতী রাণী ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে (১১৭৫ সালের শ্রাবণ) পরলোক গমন করেন।

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়—যশস্বিনী বাঙ্গালী মহিলা চিকিৎসক। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ব্রজকিশোর বসু মহাশয় একজন ধর্ম্ম-প্রাণ, উন্নতচরিত্র ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। নারীদিগের উচ্চ শিক্ষা দানে ব্রজকিশোরের ঐকান্তিক উৎসাহ ছিল। তৎফলে শ্রীমতী কাদম্বিনী বাল্যকালেই পিতার নিকট সুশিক্ষা লাভ করেন। ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে তিনি হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই ঐ বিদ্যালয়টি উঠিয়া যাওয়াতে দেশ-প্রসিদ্ধ দুর্গামোহন দাস ও আনন্দ-মোহন বসু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করেন (১৮৭৬)। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে শ্রীমতী কাদম্বিনী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই ঘটনাটি সমগ্র ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভের যোগ্য। তৎপূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোনও নারীকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দানের অনুমতি প্রদান করেন নাই। পূর্ব্ববৎসর শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু এবং শ্রীমতী ডি-অব্রু নামক দুইটি খ্রীষ্টিয় মহিলা উক্তরূপ অনুমতি প্রার্থনায় প্রত্যাখ্যাতা হন

অতঃপর বেথুন কলেজ হইতে তিনি ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে এফ্-এ (বর্ত্তমান আই-এ) পরীক্ষা উত্তীর্ণা হন। শ্রীমতী কাদম্বিনী প্রভৃতি দুই একজন মহিলার উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রথমে সম্মত ছিলেন না। নারী শিক্ষায় উৎসাহশীল কতিপয় মহাপ্রাণ ব্যক্তির নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ঐরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হয়। তিনি এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য আবেদন করেন। শ্রীমতী অবলা দাস (বর্ত্তমানে সার জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্ম্মিনী) ও পূর্ব্বোক্ত শ্রীমতী ডি-অব্রু‌ও সেই সঙ্গে আবেদন করেন কিন্তু তাঁহাদের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়। অতঃপর শ্রীমতী কাদম্বিনী এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহাঁরা দুই জন সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট (Graduate)। তাঁহাদের এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য একদিকে দেশহিতৈষী, উন্নতিশীল ব্যক্তিরা যেরূপ আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন, রক্ষণশীল ব্যক্তিরা সেইরূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে ও এইরূপ ঘটনার দ্বারা দেশের নারী জাতির মহিমা খর্ব্ব হইবে এইরূপ প্রচার করিতে লাগিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'কাদম্বিনী বালা' নামক কবিতা রচনা করিয়া তাঁহাদের অসামান্য সাফল্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ ও বিরুদ্ধ পক্ষীয়গণকে তিরস্কার করেন।

সেই বৎসরই শ্রীমতী কাদম্বিনী প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত পরিণীতা হন। দ্বারিকানাথ ও সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্যে আগ্রহশীল, নির্ভিক, দেশকর্ম্মী ছিলেন। উপযুক্ত পতি লাভ করিয়া শ্রীমতী কাদম্বিনীও জীবনের সার্থকতা লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন। বিবাহান্তে স্বামীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় শ্রীমতী কাদম্বিনী, বিশেষ চেষ্টার পর, কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। মেডিকেল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষেরা সহজে তাঁহার ভর্ত্তি সমর্থন করেন নাই। অবশেষে উপায়ান্তর না পাইয়াই তাঁহারা বাধ্য হইয়া শ্রীমতী কাদম্বিনীকে প্রবেশাধিকার দান করেন (দ্বারিকা নাথ গঙ্গোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য)। মেডিকেল কলেজে তিনি পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করেন। কিন্তু এখান হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় শিক্ষা সমাপন করিয়া ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রত্যাগমন করেন। ইংলণ্ড হইতে তিনি চিকিৎসা বিষয়ক L.R.C.P. (Edin); L.R.C.S. (Glassgow); D. F. P. S. (Dublin) উপাধি লাভ করেন। এদেশে আসিয়া প্রথম কিছুকাল তিনি

কলিকাতা লেডি ডাফরিণ হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ছিলেন। ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি কর্ম্ম কুশলতার পরিচয় দান করেন। অতঃপর তিনি স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহাতেই নিযুক্ত ছিলেন।

দ্বারিকানাথের আগ্রহে, শ্রীমতী কাদম্বিনী দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিতও সংযুক্ত ছিলেন। ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি অন্যতম নারী প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই কংগ্রেসের প্রথম নারী বক্তা।

১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে, তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিতেন। কিন্তু মনে প্রাণে তখনও দেশের মঙ্গলকর কার্য্যের জন্য আগ্রহশীলা ছিলেন। সত্যগ্রহ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী যখন দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত ট্রান্সভালে কারারুদ্ধ হন, তখন তাহার সহকর্ম্মী শ্রীযুত হেনরী পোলক কলিকাতায় আসিয়া ট্রান্সভাল ভারতীয় সমিতি (Transvaal Indian Association) প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীমতী কাদম্বিনী তাহার প্রথম নেত্রী (President) হন এবং স্বভাবসুলভ উৎসাহের সহিত উক্ত সমিতির উন্নতির জন্য বিশেষ পরিশ্রম করেন। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে অনুষ্ঠিত মহিলা সম্মেলনের তিনি একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দে চিকিৎসা সম্মিলনীতে (Medical Conference) যখন, কলিকাতা মেডিকেল কলেজে নারীর প্রবেশাধিকার রহিত করিবার জন্য চেষ্টা হয়, তখন তাহা প্রধানতঃ শ্রীমতী কাদম্বিনীর তীব্র প্রতিবাদেই পরিত্যক্ত হয়। ১৯২২ খ্রীঃ অব্দে শ্রীমতী কামিনী রায় ও শ্রীমতী কাদম্বিনী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের খনিসমূহে নিযুক্ত নারী শ্রমিকদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য প্রেরিত হন। নারীর উন্নতি সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার আন্দোলনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং তিনি তৎসংশ্রবে যথাসাধ্য কাজও করিতেন। তাঁহার পিতা ব্রজকিশোর বসু মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। শ্রীমতী কাদম্বিনীও ব্রাহ্মসমাজের নানা বিভাগীয় কার্য্যের সহিত দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্তা ছিলেন। অতিশয় পরিশ্রমে মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ১৯২৩ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে একদিন সকালে প্রাত্যাহিক কার্য্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অসুস্থ বোধ করেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

কাদির শাহ—সম্রাট হুমায়ুন মালব দেশ অধিকার করিয়া একজন কম্ম-

চারীর হস্তে ইহার শাসনভার অর্পণ করেন। সম্রাট দিল্লীতে ফিরিয়া আসিতে না আসিতেই, পূর্ব্ববর্ত্তী খিলিজি বংশের একজন কর্ম্মচারী মল্লুখাঁ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া মালব দেশ অধিকার করেন এবং কাদির শাহ উপাধী গ্রহণ পূর্ব্বক নিজকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি ১৫৪২ খ্রীঃ অব্দ (হিঃ ৯৪৯) পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। পরে শের শাহশূর মালব অধিকার পূর্ব্বক তাঁহার মন্ত্রী এবং আত্মীয় সুজাখাঁকে এই প্রদেশ প্রদান করেন।

কানাইরাম—(১) তিনি কোটার রাও মধু সিংহের চতুর্থ পুত্র। মধু সিংহ বুন্দির অধিপতি রাও রত্নের দ্বিতীয় পুত্র। ১৫৭৫ খ্রীঃ অব্দে মধু সিংহের জন্ম হয়। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে (১৫৮৯ খ্রীঃ) বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া সম্রাট আকবরের নিকট তিনি কোটা রাজ্য পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৬৩১ খ্রীঃ অব্দে মধুসিংহ পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পঞ্চ পুত্রের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত হয়। তদনুসারে জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ সিং কোটা প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় মোহন সিং পোলৈটা, তৃতীয় জুজার সিংহ কোটরা ও রামগড় রিলাবন, চতুর্থ কানাইরাম কোইলা, দে ও গুড়া নামক স্থানত্রয় এবং পঞ্চম কিশোর সিংহ সঙ্গোদ নামক স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজীব পিতা শাজাহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে, মধুসিংহের পঞ্চ পুত্রই সম্রাট শাজাহানের পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এক কিশোর সিংহ ব্যতীত সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। মুকুন্দের পুত্র অপুত্রক প্রাণত্যাগ করিলে, কানাইরামের পুত্র পরমসিংহ কোটার রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু ছয়মাস পরেই এই অকর্ম্মণ্য পরম সিংহকে বিতাড়িত করিয়া, কিশোর সিংহকে কোটা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। (২) এই কানাইরাম যোধপুর রাজ অভয়সিংহের সময়ে (১৭২৫-১৭৫০ খ্রীঃ) অন্যতম তাঁহার সামন্ত নরপতি ছিলেন। অভয়সিংহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র রামসিংহ রাজা হন। রামসিংহ অতিশয় দুর্ব্বিনীত ছিলেন। তাঁহার অশিষ্ট ব্যবহারে কুম্পাবৎ সর্দ্দার কানাইরাম প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দারেরা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে বিতাড়নপূর্ব্বক অভয় সিংহের ভ্রাতা ভক্তসিংহকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

কানাইলাল আচার্য্য — বাঙ্গালা দেশে যে ডাকের গহনাদ্বারা প্রতিমা সাজান হয়, তাহার উদ্ভাবন নদীয়া জিলার অন্তর্গত উলা বা বীরনগর বাসী কানাই আচার্য্য ও নীলমণি আচার্য্য প্রথম করেন। ১৮৫৬ সালে বীরনগরে

মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইলে, তাঁহারা উক্ত গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী হরিপুরে বাসস্থান স্থাপন করেন। এখনও তথায় তাঁহাদের বংশধরেরা অবস্থান করিতেছেন।

কানাইলাল পাইন — ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে কয়েক বৎসর মাত্র পরলোকগত মতিলাল শীলের প্রতিষ্ঠিত কলেজে যৎসামান্য ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে উনিশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমকালে বিষয় কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজে প্রবিষ্ট হন। সেই সময়ে অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পাইন মহাশয় ধর্ম্মানুরাগ ও কার্য্যোৎসাহ গুণে ত্বরায় সমাজ মধ্যে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি হইলেন। অনেক সভাতেই তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন এবং সমাজ সংক্রান্ত প্রায় সকল প্রশ্নেই তাহার পরামর্শ গ্রহণ করা হইত। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় যখন ব্রাহ্ম ধর্ম্মে প্রবেশ করেন, তখন পাইন মহাশয় সমাজের নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন। এই কারণে তিনি চিরদিন কেশব বাবুকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যের পদে মনোনীত হন। ইহার কিছুদিন পরেই কোন কোন বিষয়ে মতভেদ নিবন্ধন কানাইলাল পাইন মহাশয় তাঁহার পুরাতন বন্ধুগণ সহ কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ হইতে পৃথক হইয়া, বহুবাজারে আর এক সমাজ স্থাপন করেন। তাহার কার্য্য কিছুদিন বেশ চলিয়াছিল। তৎপরে ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে, তিনি তাঁহার সহিত যোগ দিয়া অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের যুবক ব্রাহ্মদের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পুরাতন লোকদিগের সহিত তাঁহার বিশেষ সখ্য ছিল। তিনি তাঁহাদের সকল প্রকার ভাল কার্য্যের বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন, এবং তাঁহাদের মন্দিরে উপাসনাদিতে যোগ দিয়া অনেক সময় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তিনি যখন কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া বাড়ীতে বসিয়াছিলেন তখনও তিনি আপনাকে বিশ্রাম দিতেন না। তিনি অনেক দিন পূর্ব্বে ইংরাজীতে একখানি ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কার্য্য হইতে অবসর লইয়া সেই খানিকে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতেন। তদ্ভিন্ন তিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্ম চিন্তা ও ধর্ম্মালোচনাতে কাল যাপন করিতেন। কিছুদিন তাঁহার মস্তকের

পীড়া অতিশয় বাড়িয়াছিল। তাহাতে অনেক দিন ক্লেশ পাইয়া শেষে ১৮৯১ সালে ১৪ই জুনের গ্রীষ্মাতিশয্যে হঠাৎ তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

কানুদাস বা কানুরাম দাস—একজন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। তাঁহার রচিত ১৪টী পদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। তিনি শ্যামানন্দ ঠাকুরের প্রশিষ্য এবং নীলাচলে (পুরী) বাস করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃতে আছে—

শ্রীসদাশিব কবিরাজ, বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস, তাঁহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃত পূর॥

কান্তবাবু—কাশীমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত নন্দী সাধারণতঃ কান্তবাবু নামেই পরিচিত ছিলেন। কৃষ্ণকান্ত নন্দী দেখ।

কান্ত বিদ্যালঙ্কার—তিনি নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎপুত্র শিবচন্দ্রের সময়ে রাজ সভার অন্যতম প্রধান পণ্ডিত ছিলেন।

কান্তিচন্দ্র মিত্র, ভাই—স্বনাম খ্যাত কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার নববিধান প্রচারার্থ যে মণ্ডলী গঠন করেন, তিনি সেই মণ্ডলীর অন্তর্গত একজন প্রচারক ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান নদীয়া জিলার অন্তর্গত উলা গ্রাম। তাঁহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কীর্ত্তি চন্দ্রমিত্র তাঁহাকে দশ বৎসর বয়সের সময় কলিকাতায় আনয়ন করেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পিতা স্বর্গী হন। এই সময়ে কোনও আত্মীয়ের সাহায্যে পনর টাকা বেতনের কাজ পান। এই কাজে শেষে তাঁহায় ৪৫ টাকা বেতন হইয়াছিল। ইতিমধ্যে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা চৌদ্দ বৎসরের বিধবা স্ত্রী রাখিয়া স্বর্গী হন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার ব্রাহ্ম ভাব দেখিয়া সংসর্গ ত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী ও বিধবা ভ্রাতৃ বধূকে লইয়া পৃথক বাসা করিলেন। এই স্থানেই কলেরা রোগে প্রথমে তাঁহার ভ্রাতৃবধূ পরে তাঁহার স্ত্রী পরলোক গমন করেন। তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের কাজে একবারে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে প্রচারক মণ্ডলীর পরিবারসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেন। তিনি অতিশয় নিষ্ঠার সহিত তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন সেবাপরায়নতার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯১৭ সালের ২১শে আগষ্ট (১লা ভাদ্র ১৩২৪ বাং) তিনি পরলোক গমন করেন।

কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর — জয়পুরের মন্ত্রী ও বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙ্গালী। চব্বিশ পরগণার

অন্তর্গত শ্যামনগরের নিকটবর্ত্তী রাহুতা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। দারিদ্র্য-বশতঃ উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। সামান্য কিছু শিক্ষা লাভ করিয়া, তিনি প্রথমে হুগলী জিলার জনাই গ্রাম্য স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। ঐ কার্য্যে তিনি কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের জন্য সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। অবসরকালে তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া ক্রমে এই দুই বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর ঐ স্থান হইতে তিনি জয়পুর গমন করিয়া, তথাকার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার কার্য্য দক্ষতার বিদ্যালয়টি ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে এবং মহারাজার যত্নেও ইচ্ছায় উহা কলেজে পরিণত হয়। কান্তিচন্দ্রই ঐ কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং সুপরিচালনার জন্য খ্যাতি লাভ করেন। কতিপয় বর্ষ পরে (১৮৭৭) জয়পুরের তদানীন্তন মহারাজা রামসিং তাঁহাকে দরবারের অন্যতম সভ্য নিযুক্ত করেন। ঐ পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত নানা বিষয়ে প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ করেন। মহারাজ রামসিং যখন পরলোক গমন করেন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নাবালক ছিলেন। তজ্জন্য রাজ্যশাসনের নিমিত্ত যে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, কান্তিচন্দ্র তাহার প্রধান সদস্য হন। মহারাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, রাজ্যশাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, এবং কান্তিচন্দ্রকেই তাঁহার প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। বিংশতি বর্ষের অধিক কাল তিনি ঐ সম্মান-জনক পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, নানা বিভাগে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। পরিণত বয়সে ৬৮ বৎসরে ১৩০৭ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার অন্যতম পুত্র ঈশানচন্দ্রও জয়পুরে উচ্চরাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন

কাফুর, মালিক — দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলিজির একজন প্রিয় খোজা। সম্ভবতঃ তিনি হিন্দু ছিলেন। সুলতান তাঁহাকে মন্ত্রীর উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিলেন। সুলতানের মৃত্যুকালে তাঁহার খিজ খাঁ ও সাদি খাঁ নামে দুই পুত্র গোয়ালিয়রে অবস্থান করিতে-ছিলেন; মালিক কাফুর একজন লোক পাঠাইয়া তাঁহাদের উভয়কে অতি নিষ্ঠুররূপে অন্ধ করেন। সুল-তানের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র সাহাব উদ্দিনকে সিংহাসন প্রদান করেন তখন তাঁহার বয়স মাত্র সাত বৎসর। ইহার প্রতি-ফল অচিরেই তাঁহাকে পাইতে হইল। সুলতানের মৃত্যুর ৩৫ দিন পরে ১৩১৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে নিহত করিয়া মৃত

সুলতানের তৃতীয় পুত্র মুবারিক সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই মালিক কাফুরই দাক্ষিণাত্যে প্রথম মুসলমান পতাকা উড্ডীন করেন। যদিও সেই অভিযানের ফল স্থায়ী হয় নাই।

কাবুল শাহ—তিনি আফগানিস্থানের শাহীবংশীয় হিন্দু নরপতি। ইরাণের শাসনকর্ত্তা হেজাজ, ৬৫০ খ্রীঃ অব্দে হিরাট জয় করেন। তৎপরে ৬৬৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি আফগানিস্থান জয় করিবার জন্য আবদুল রহমান নামক সুদক্ষ সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। তিনি উক্ত দেশ জয় করিয়া বহুলোককে বিশেষতঃ যোদ্ধাদিগকে তরবারি মুখে নিক্ষেপ করেন। স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে বন্দী করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। কাবুল শাহ ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন এই প্রতিশ্রুতিতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ইহার কিছুদিন পরেই আফগানিস্থান আবার স্বাধীনতা লাভ করে। ইরাণের শাসনকর্ত্তা হেজাজ এইবারে অবেইদুল্লাকে তৎপ্রদেশ অধিকার করিতে প্রেরণ করেন। সেনাপতি অবেইদুল্লা ভীষণরূপে পরাজিত হইয়া সাতলক্ষ মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক নিস্কৃতি লাভ করেন। তৎপরে আবার হেজাজ আবদুল রহমানকে প্রেরণ করেন। এইবার সেনাপতি আবদুল রহমান হেজাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কাবুল শাহের সাহায্যে রক্ষা পান। ইহার পর আর কোন উৎপাত হয় নাই (অনুমান খ্রীঃ ৭০০ অব্দ।)

কামগার খাঁ — তিনি কোন সালে উড়িষ্যার সুবেদারী পদ লাভ করেন তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু ১৭০৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পদে মুরশিদকুলি খাঁ নিযুক্ত হইয়া আসেন। ১৭০৬ সালে তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন মোহাম্মদ খাঁ উড়িষ্যার নায়েব নাজিম নিযুক্ত হন।

কামদেব — শ্রীহট্টের উত্তর দিকস্থ জয়ন্তিয়া রাজ্যে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কামদেব নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সভাপণ্ডিত কবিরাজ নামক এক কবি 'রাঘব পাণ্ডবীয়' নামক কাব্যের রচয়িতা। কবিরাজ দ্রঃ। (২) কামদেব নামে একজন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা ছিলেন।

কামদেব রায় চৌধুরী — কামদেব ও জয়দেব নামে দুই সহোদর ভাই যশোহর বেভুটিয়ার জমিদার ছিলেন। নবাব খাঞ্জে আলীর উজির স্বধর্ম্ম ত্যাগী মোহাম্মদ তাহিরের পরামর্শে তাঁহারা নবাব কর্ত্তৃক জাতিচ্যুত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। যশোহরের পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী সিংহিকা গ্রাম তাহারা জায়গীর প্রাপ্ত হন। সাতক্ষীরা, হোশেনপুর, মাগুরা, বসুলিয়া প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও বর্ত্তমান আছেন।

কামন্দক — একজন বিখ্যাত নীতি শাস্ত্রকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থ কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্র নামে খ্যাত। খুব সম্ভব তিনি খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

কামন্দকি — একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। প্রসিদ্ধ বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতার টীকায় উৎপল ভট্ট তাঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কামবক্স (যুবরাজ) — সম্রাট আলমগীরের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। আলমগীর তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের অধিকার প্রদান করেন; কিন্তু তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা বাহাদুর শাহের অধীনতা স্বীকার করিতে অসম্মত হইলে, বাহাদুর শাহ একদল প্রবল সৈন্য সমভিব্যাহারে দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন। ১৭০৮ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১১৯) উভয়দলে হায়দ্রাবাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে সাক্ষাৎ হয় এবং সেই যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে সেই দিনই কামবক্স লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার মাতার নাম উদীপুরী মহল। ১৬৬৭ খ্রীঃ অব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী (হিঃ ১০৭৭, ১০ই রমজান) তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।

কাম ভট্ট — তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্তের এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। রঙ্গনাথের টীকা অপেক্ষা কাম ভট্টের টীকা বিশদ।

কামরান, মীরজা — সম্রাট বাবরের অন্যতম পুত্র। তিনি কাবুলের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। হুমায়ুন পাঞ্জাব প্রদেশও তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। শের খাঁ হুমায়ুনকে তাড়াইয়া দিল্লী অধিকার করিলে, কামরান লাহোর প্রদেশ শেরখাঁকে অর্পণ করিয়া সন্ধি করিলেন এবং কাবুল ও কান্দাহার প্রদেশ স্বীয় অধিকারে রাখিয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন। কামরান ইতিপূর্ব্বে দুই একবার দিল্লী অধিকারেও প্রয়াসী হন। কিন্তু হুমায়ুন তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। হুমায়ুন শেরশাহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া পরিশেষে পারস্য রাজের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হন। কামরান ও আস্করি বরাবরই হুমায়ুনের শত্রু ছিলেন। অবশেষে হুমায়ুন পারস্য রাজের সাহায্যে কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করেন। কামরান বার বার লাহোর অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হন। অবশেষে হুমায়ুন তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন এবং অন্ধ করিয়া ১৫৫৩ খ্রীঃ অব্দে মক্কায় প্রেরণ করেন। তথায় ১৫৫৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার তিন কন্যা ও মীরজা আবুল কাশিম নামে এক পুত্র ছিল। আবুল কাশিম সম্রাট আকবরের আদেশে প্রথমে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী হন। পরে ১৫৬৫ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৭৩) নিহত হন।

কামার্ণব, প্রথম — মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত কোলাপুরের নরপতি বীরসিংহের প্রথম কামার্ণব, প্রথম দানার্ণব, প্রথম গুণার্ণব, নরসিংহ ও বজ্রহস্ত নামে পাঁচ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রথম কামার্ণব কলিঙ্গ দেশের রাজা বালাদিত্যকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন এবং রাজধানী দন্তপুরে (জন্তবুরে) দীর্ঘ ষড়ত্রিংশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা দানার্ণব তথায় চত্বারিংশ বর্ষ রাজত্ব করেন। তৎপরে দানার্ণবের পুত্র দ্বিতীয় কামার্ণব কলিঙ্গ দেশে পঞ্চাশ বর্ষ রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র রণার্ণব পাঁচ বৎসর, তৎপর দ্বিতীয় পুত্র বজ্রহস্ত, তৎপরে বজ্রহস্তের ভ্রাতা তৃতীয় কামার্ণব ঊনবিংশ বর্ষ রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় গুণার্ণব সপ্তবিংশতি বর্ষ রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ এই গুণার্ণবেরই পুত্র দেবেন্দ্র বর্ম্মা, ১৮৩—১৮৫ গঙ্গাবংশীয় সালে রাজত্ব করেন। গুণার্ণব দ্বিতীয়ের পরে তাঁহার পুত্র জিতাঙ্কুশ পনর বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কলিগলাঙ্কুশ বার বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে গুণ্ডমান (প্রথম) রাজা হইয়া সাত বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি দ্বিতীয় গুণার্ণবের পুত্র ও জিতাঙ্কুশের ভ্রাতা। তৎপরে গুণ্ডমানের অপর ভ্রাতা ৪র্থ কামার্ণব পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার অপর ভ্রাতা বিনয়াদিত্য তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে দ্বিতীয় গুণার্ণবের পৌত্র ৪র্থ কামার্ণবের পুত্র বজ্রহস্ত (৪র্থ) রাজা হন। তিনি পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে ৪র্থ বজ্রহস্তের পুত্র ৫ম কামার্ণব মাত্র ছয় মাস রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় গুণ্ডমান তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পরে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা (মধু) কামার্ণব (৬ষ্ঠ) রাজা হইয়া উনিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র পঞ্চম বজ্রহস্ত ত্রিকলিঙ্গাধিপতি উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রথম রাজরাজ, ভেঙ্গির রাজা রাজেন্দ্র চোলের (দ্বিতীয়) কন্যা রাজসুন্দরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি ৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ রাজা হইয়াছিলেন। (১০৭৮ খ্রীঃ)

কামার্ণব, দ্বিতীয়— তিনি উড়িষ্যার গঙ্গা বংশীয় নরপতি দানার্ণবের পুত্র। তিনি দন্তপুরে (জন্তবুরে) পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন। কামার্ণব প্রথম দেখ।

কামার্ণব, তৃতীয়— তিনি উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতি রণার্ণবের পুত্র। কামার্ণব, প্রথম দেখ।

কামার্ণব, চতুর্থ— উড়িষ্যার গঙ্গা বংশীয় নরপতি দ্বিতীয় গুণার্ণবের তৃতীয়

পুত্র চতুর্থ কামার্ণব দন্তপুরে ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। কামার্ণব প্রথম দেখ।

কামার্ণব, পঞ্চম — তিনি উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতি চতুর্থ বজ্রহস্তের পুত্র। তিনি মাত্র ছয় মাস রাজত্ব করেন। কামার্ণব প্রথম দেখ।

কামার্ণব, ষষ্ঠ—তিনি উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতি চতুর্থ বজ্রহস্তের পুত্র। তিনি উনিশ বৎসর রাজত্ব করেন। (১০১৯—১০৩৮ খ্রীঃ) তৎপরে তাঁহার তনয় পঞ্চম বজ্রহস্ত ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি অন্ধ্র দেশের বৈদুম্ব বংশীয়া বিনয়া মহাদেবীকে বিবাহ করেন। কামার্ণব প্রথম দেখ।

কামার্ণব, সপ্তম—তিনি উড়িষ্যার বিখ্যাত রাজা অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার মাতার নাম কস্তুরীকা মোহিনী মহাদেবী। তাঁহার পিতা সুদীর্ঘ সত্তর বৎসর রাজত্ব করিয়া ১১৪৮ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তৎপরে তিনি দশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১১৫৮ খ্রীঃ অব্দে অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতা রাঘব রাজা হন। কামার্ণব প্রথম দেখ

কামাল খাঁ গোখার—তিনি গোখার বংশের রাজকুমার। তিনি সুলতান সারংএর পুত্র, দ্বিতীয় মালিক কলানের পৌত্র, প্রথম মালিক কলানের প্রপৌত্র, গোখারবংশের স্থাপয়িতা মালিক খাঁর বৃদ্ধ প্রপৌত্র। সিন্ধু ও ভাটদেশের পর্ব্বত মধ্যে এই রাজ্য অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বে এই প্রদেশ কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। দ্বিতীয় মালিক কলান, শেরশাহের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাজিত ও বন্দী হন। শেরশাহই তাঁহাকে নিহত করেন ও তাঁহার পৌত্র কামাল-খাঁকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। কিছুকাল পরে শেরশাহের পুত্র সলিম শাহ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। কামাল খাঁর বন্দীকালে তাঁহার পিতৃব্য সুলতান আদম সিংহাসন অধিকার করেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে তিনি তাঁহার সহিত পরিচিত হন এবং পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার কিছুকাল পরে সম্রাট আকবর তাঁহাকে পৈত্রিক সিংহাসন প্রদান করেন। কামাল খাঁ তাঁহার পিতৃব্য আলম খাঁকে বন্দী করেন এবং এই বন্দী অবস্থায়ই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। কামাল খাঁ সম্রাট আকবরের সামন্তরাজ শ্রেণীতে পরিগণিত হন। ১৫৬২ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৭০) তাঁহার মৃত্যু হয়।

কামিনীকুমার চন্দ—১৮৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ছাতিয়ান গ্রামে কামিনীকুমার চন্দ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে এম-এ পড়িবার সময় হইতেই

তিনি কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। এম-এ বি-এল্ উপাধি লইয়া কামিনীকুমার কাছাড় জেলার শিলচরে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। উত্তরকালে এই ব্যবসায়ে তিনি বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ বিখ্যাত বালাদন খুনের মোকর্দ্দমায় তাঁহার যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়। শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলা ব্যতীত ত্রিপুরা, ঢাকা প্রভৃতি বহু জিলায় যাইয়া তিনি মোকর্দ্দমা করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। আইন ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতীয় আন্দোলনেও আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে কামিনীকুমার এক সময়ে সুরমা উপত্যকার অবিসম্বাদী নেতা বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি বহু বৎসর শিলচর মিউনিসিপ্যালিটির সর্ব্বাধ্যক্ষ (Chairman) ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আসাম ব্যবস্থাপক সভা এবং ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদেরও সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মতিলালের নেতৃত্বে যখন নিখিল ভারত স্বরাজ্যদল গঠিত হয়, তখন কামিনীকুমার এই দলের অন্যতম সমর্থক ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের পর যে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়, তাহার প্রভাব শ্রীহট্টেও পৌছিয়াছিল। সেই সময় শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলার অধিবাসীদিগের মধ্যে নব-জাগ্রত রাষ্ট্রীয় চেতনাকে সুসংযত করিবার ভার যাঁহারা লইয়াছিলেন, কামিনীকুমার ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। ঐ সময়ে, ১৯০৬ সালের ১১ই আগষ্ট তারিখে শ্রীহট্ট সহরে সুরমা উপত্যকা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে তাঁহাকে আহ্বান করা হয়। কামিনীকুমার চন্দ মহাশয় এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে "সুরমা উপত্যকা সমিতি" নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাঙ্গালার রাজনীতিক্ষেত্রেও তিনি একান্ত অপরিচিত ছিলেন না। ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি অতিশয় নির্ভীকভাবে মতামত প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তিনি এক সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (Fellow) হইয়াছিলেন। শিলচর সহরই তাঁহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র ছিল। তথায় তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯২৩ সালে আসাম পরিভ্রমণ উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী যখন শিলচরে গিয়াছিলেন। তখন তিনি কামিনীকুমার চন্দ মহাশয়ের বাড়ীতেই অতিথি হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল শেষজীবনে ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তিনি বিশেষ ভাবে কোন আন্দোলনে যোগদান

করিতে পারেন নাই। তথাপি কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে শিলচরে যে কমিটি হইয়াছিল, তিনি তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে শিলচরে যে জনসভা হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত চন্দের তাহার সভাপতি হইবার কথা ছিল, কিন্তু চিকিৎসকগণ তাহাতে সম্মতি না দেওয়ায় তিনি ইচ্ছা সত্ত্বেও সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই। তথাপি তিনি একটি উদ্দীপনাপূর্ণ বাণী এই সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই মহাপ্রাণ জননায়ক পঁচাত্তর বৎসর বয়সে ১৩৪২ সালের ১৮ই মাঘ পরলোক গমন করেন।

কামিনী রায়—প্রসিদ্ধ মহিলা কবি। তিনি ঝান্সীর রাণী, অযোধ্যার বেগম, দেওয়ান নন্দকুমার প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, সবজজ্ চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইলে তিনি নিজ পিতামহের নিকট কবিতা আবৃত্তি করিতে শিখেন। ইহাই তাঁহার কবিজীবন পরিস্ফূরণের মূল। আট বৎসর বয়সে তিনি কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়া পিতামহকে শুনাইলে, তিনি পরম পরিতোষ লাভ করিয়া তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান করেন।

পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতা গোপনে তাঁহাকে পাঠ শিক্ষা দেন। তখনকার দিনে মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারে নারীদের বিদ্যাশিক্ষা নিন্দনীয় ছিল। তাঁহার বাল্য শিক্ষা প্রধানতঃ তাঁহার পিতার নিকটেই ঘটে। চণ্ডীচরণ দুহিতাকে ইতিহাস ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই শিক্ষা দিতেন। পিতার শিক্ষার গুণে বাল্যকাল হইতেই কামিনী রায় জ্ঞানপিপাসু হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন চণ্ডীচরণ কন্যার মনে ধর্ম্মভাবের যে প্রেরণা দান করেন, পরবর্ত্তী জীবনে তাহার মধুর অভিব্যক্তি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। বার বৎসর বয়স হইতে তিনি বিদ্যালয়সংলগ্ন ছাত্রীনিবাসে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতে থাকেন এবং ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে সংস্কৃতে 'অনার্স'সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে ষ্ট্যাচুটারী সিবিলিয়ান (Statutory Civilian) কেদারনাথ রায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কেদার নাথ তাঁহার কবিতার রসগ্রাহী ছিলেন এবং তাহারই ফলে তিনি কামিনী দেবীকে জীবনের সহধর্ম্মিনী করিয়া লন। বিবাহের পর তিনি আর বিশেষ কাব্যরচনা করেন নাই। তজ্জন্য কেহ অনুযোগ করিলে, তিনি সপত্নী গর্ভজাত সন্তানগণকে দেখাইয়া বলিতেন, 'ইহারাই আমার জীবন্ত কবিতা।' কামিনী রায় স্বভাবতই লজ্জাশীলা ছিলেন। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, স্বাভাবিক

সঙ্কোচবশতঃ তাহা প্রকাশিত করেন নাই। তাঁহার সুবিখ্যাত কবিতাগুচ্ছ 'আলো ও ছায়া' মাত্র পঞ্চদশবর্ষ বয়সে রচিত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত কারণে দীর্ঘকাল লোক চক্ষুর অগোচরেই ছিল। অবশেষে তাঁহার পিতার একজন বিশিষ্ট বন্ধু কবিবর হেমচন্দ্রের নিকট তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। হেমচন্দ্র ঐ কবিতাগুচ্ছের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিলে ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে, ছদ্ম-নামে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁহার ঐ প্রথম পুস্তকই তাঁহাকে বাঙ্গালার কবিসমাজে উচ্চ আসন প্রদান করে।

তাঁহার পারিবারিক জীবন অল্পকালমধ্যেই বিষাদের আকর হয়। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার প্রথম সন্তান বিয়োগ, ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যু এবং তাহার পরও কয়েক বৎসরের মধ্যে একাধিক সন্তানবিয়োগে তাঁহার জীবনকে শোকসন্তপ্ত করে। নিজ গর্ভজাত পুত্র অশোকের মৃত্যুর (১৯১৩) পর রচিত, 'অশোক সঙ্গীত' নামক কবিতা গ্রন্থে তাঁহার মনের যে তীব্র বেদনা অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বঙ্গসাহিত্যে বিরল। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁহার দুইটি দীর্ঘ কবিতা 'মহাশ্বেতা' এবং 'পুণ্ডরীক' বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন। তাঁহার রচিত পুস্তক সমূহের নাম — (১) আলো ও ছায়া, (২) অম্বা, (৩) ধর্ম্মপুত্র (কাউণ্ট টলষ্টয়ের জীবনী), (৪) গুঞ্জন, (৫) মাল্য ও নির্ম্মাল্য, (৬) পৌরাণিকী, (৭) শ্রাদ্ধিকী, (৮) সিতীমা, (৯) অশোক সঙ্গীত, (১০) দীপ ও ধূপ, (১১) জীবনপথে, এবং (১২) তাঁহার ভগিনী ডাঃ কুমারী যামিনী সেনের জীবনী। তদ্ভিন্ন তাঁহার বহু রচনা অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ১৪ই আশ্বিন, রাম মোহন শতবার্ষিকীর এক অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করিবার সময়ে তিনি অসুস্থা হইয়া পড়েন এবং কয়েক দিন ঘোরতর অসুস্থা থাকিয়া ১৮ই আশ্বিন (২৭ শে সেপ্টেম্বর) পরলোক গমন করেন।

কাসি—তাঁহার প্রকৃত নাম মীরজা আলাউদ্দিন কজভিনী এবং কজবিন নামক স্থানের মীর। তিনি এহিয়াবিন আবদুল লতিফের পুত্র। 'নকাইস-উল-মাসির' নামক কবিদের জীবনীকোষ তাঁহারই রচিত। এই গ্রন্থে প্রায় ৩৫০ জন কবির জীবনী বর্ণমালানুসারে লিখিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ভারতীয় কবি। এই গ্রন্থ সম্রাট আকবরের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। তিনি ১৫৭৩ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৮১) পরলোক গমন করেন।

কায়েম জঙ্গ—১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১৫৬) তাঁহার পিতা নবাব মহম্মদ খাঁ বঙ্গাশের মৃত্যুর পরে তিনি ফরাক্কাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

উজির নবাব সফদরজঙ্গের পরামর্শে তিনি রোহিলাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন কিন্তু পরাজিত হইয়া ১৭৪৯ খ্রীঃ অব্দের ১০ই নবেম্বর (হিঃ ১১৬২, ১০ই জিলহিজ্জা) নিহত হন। উজির তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা বন্দী হইয়া এলাহাবাদে প্রেরিত হন। তাঁহার মাতা ও পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য ফরক্কাবাদ ও তন্নিকট-বর্ত্তী দ্বাদশটি জিলা প্রদত্ত হয়। রাজা নবাব রায় বিজিত প্রদেশ উজিরের প্রতিনিধিস্বরূপ শাসন করিতে নিযুক্ত হন। কায়েম জঙ্গের ভ্রাতা আহাম্মদ খাঁ তাহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পুনর্ব্বার রাজ্য অধিকার করেন।

কারগুজার খাঁ—তিনি আলীবর্দ্দী খাঁর অন্যতম দৌহিত্র পূর্ণিয়ার নবাব সওকত জঙ্গের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। সিরাজ উদ্দৌল্লা আপন পিতৃব্যপুত্র অথবা আপন মাসীপুত্রকে দমন করিবার জন্য সেনাপতি মোহন-লাল, মীর জাফর খাঁ প্রভৃতির অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে সওকত জঙ্গ ও তাঁহার সেনাপতি কার-গুজার খাঁ, আবুতোরাব খাঁ, মুরাদ শের খাঁ প্রভৃতি রণক্ষেত্রে শয়ন করেন।

কারতলব খাঁ—মুরশিদকুলি খাঁ দেখ।

কারমাইকেল, লর্ড—(Lord Carmichael) বাঙ্গালাদেশের একজন শাসনকর্ত্তা। ১৯১২ খ্রীঃ অব্দের দিল্লীর দরবারের ঘোষণাদ্বারা লর্ড কার্জ্জনের দ্বিখণ্ডিত বঙ্গ যখন পুনর্ব্বার মিলিত হইয়া এক প্রদেশে পরিণত হয় এবং তাহার পর হইতে বঙ্গদেশও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের ন্যায় গবর্ণরের দ্বারা শাসিত হইবে বলিয়া স্থির হয়, তখন লর্ড কারমাইকেল প্রথম (১লা এপ্রিল ১৯১৩) বাঙ্গালা দেশের গবর্ণর (Governor) নিযুক্ত হন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশের শাসনকর্ত্তা লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর (Lieutenant Governor) নামে অভিহিত হইতেন। কারমাইকেল নানা জনহিতকর কার্য্য করিয়া দেশ-বাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হন। তিনি এদেশবাসীদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিবার সুযোগ লাভের জন্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার শাসন-কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। তিনি বাঙ্গালী যুবক-দিগকে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করি-বার সুযোগ প্রদান করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হন। দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রবল জলপ্লাবনে দেশের একাংশে বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, তিনি তৎপরতার সহিত তাহাদের সাহায্যের সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করিয়া দেশের লোকের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন

করেন। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ১৯১৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি স্বদেশে গমন করেন।

কার্ত্তিক উপাধ্যায়—তাঁহার জন্মস্থান নবদ্বীপ। তিনি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত অপ্রকাশিত অনেক কবিতা আছে।

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, দেওয়ান (চক্রবর্ত্তী)—১২২৭ সালের কার্ত্তিক সংক্রান্তির রাত্রিতে কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম উমাকান্ত রায়। তাঁহাদের বংশ কৃষ্ণনগর রাজসংসারের দেওয়ান চক্রবর্ত্তী বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কারণ কার্ত্তিকেয় চন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ অনেকেই কৃষ্ণনগর রাজ পরিবারে দেওয়ানী করিয়া আসিয়াছেন। কার্ত্তিকেয় চন্দ্রের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে কুলীনদিগের এক নূতনদল প্রতিষ্ঠা করেন। এই জন্য তাঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে মতকর্ত্তার বংশ বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকেন।

পঞ্চম বৎসর বয়সে কার্ত্তিকেয় চন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। প্রথমে পিতার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া অষ্টম বৎসর বয়সে তিনি এক ওস্তাদের নিকট ফারশী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ত্রয়োদশবর্ষে কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের বিবাহ হয়। বিবাহের কিছুদিন পরে ইনি কৃষ্ণনগর জজ আদালতে রিটার্ণ নবিশের সেরেস্তায় শিক্ষানবিশী করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত আদেশে ফারশী ভাষার পরিবর্ত্তে আদালতে ইংরাজী ভাষার প্রবর্ত্তন হয়। তখন কার্ত্তিকেয়চন্দ্র ফারশী ভাষা ছাড়িয়া দিয়া ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পর ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হন, কিন্তু নানা কারণে তাহা ত্যাগ করেন।

রাজা শ্রীশচন্দ্র কার্ত্তিকেয় চন্দ্রকে প্রথমতঃ প্রধান সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করেন। কুমার সতীশচন্দ্রের শিক্ষার ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয়। পরে ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিংএর শাসনসময়ে কৃষ্ণনগরে কলেজ স্থাপিত হইলে, কুমার সতীশচন্দ্র এই কলেজে প্রবিষ্ট হন। কার্ত্তিকেয় চন্দ্রের উপর তখন হইতে রাজষ্টেট সংক্রান্ত সমস্ত মোকদ্দমা তদ্বিরের ভার পড়ে। শ্রীশচন্দ্র যখন গভর্ণমেণ্টের নিকট মহারাজ উপাধি পাইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। নিজ কার্য্য দক্ষতা গুণে তাঁহার বেতন পঞ্চাশ টাকা হইতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া তিনশত টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। কার্ত্তিকেয় চন্দ্র অতিশয় ধর্ম্মভীরু, পরোপকারী, সদালাপী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ

পুরুষ ছিলেন। তিনি অতি সুগায়ক ছিলেন। এই দেওয়ান চক্রবর্ত্তী-বংশ চিরকাল ধর্ম্মভীরুতা, সাধুতা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা প্রভৃতি মহদ্‌গুণের জন্য সমাজে বিখ্যাত লোক ছিলেন। এই বংশীয় দেওয়ানেরা বিশেষতঃ দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় নিজেদের ক্ষতি করিয়াও প্রভুবংশের সকল প্রকার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। নদীয়া রাজবাটীর অনেক বিষয় এখনও তাঁহাদের নামীতে রহিয়াছে। সেই সকল বিষয় তাহারা নিলামে ডাকিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজ-বংশীয় ব্যক্তি ও জনসাধারণের নিকট কার্ত্তিকেয়চন্দ্র যেরূপ সম্মানের পাত্র ছিলেন, দেশের শাসক সম্প্রদায়ের নিকটও তাঁহার তদ্রূপ প্রতিপত্তি ছিল। একবার নদীয়া জিলার সমস্ত লাখেরাজ ভূমির লাখেরাজ স্বত্ব রহিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট যখন কর ধার্য্য করেন, তখন জমীদারগণ কর দিতে বাধ্য হন। অতঃপর কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের বিশেষ চেষ্টায় জমার স্বত্বাধিকারীগণ অনেক অর্থসঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের "ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত" নামতঃ নদীয়া রাজবংশের ইতিহাস হইলেও উহা বাঙ্গালাদেশের এক অংশের প্রামাণিক ইতিহাস। তাঁহার আত্মজীবনীও তদ্রূপ, তৎ-কালীন সামাজিক জীবনের এক উৎকৃষ্ট চিত্র। কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের সাত পুত্রের মধ্যে খ্যাতনামা কবি ও নাট্য-কার দ্বিজেন্দ্রলাল সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলাল নামক তাঁহার অপর দুই পুত্রও সাহিত্য সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

কার্ভলো — (Carvalius) একজন পর্টুগিজ সেনাপতি। পর্টুগিজেরা এদেশে আসিয়া নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তন্মধ্যে গঙ্গা ও মেঘনা নদীর মোহানাস্থিত সন্দীপ অন্যতম, এই সন্দীপ আরাকান রাজের নামেমাত্র অধীন ছিল। প্রকৃত-পক্ষে ইহা উপনিবিষ্ট পর্টুগিজদিগেরই অধিকারে ছিল। দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম শ্রীপুরের কেদার রায় এক সময়ে এই সন্দীপ স্বীয় অধিকারে আনয়ন করেন। কিন্তু ১৫৭৪ খ্রীঃ অব্দে ইহা মুঘলদের হস্তগত হয়। কেদার রায় নৌযুদ্ধ বিশারদ ছিলেন। তিনি ইহা পুনর্ব্বার অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি নৌসৈন্য বিভাগে কতকগুলি পর্টুগিজ ও ফিরিঙ্গি সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। কার্ভলো তাঁহার সেনাপতি হইলেন। ১৬০২ খ্রীঃ অব্দে তিনি কার্ভলো সেনাপতির সাহায্যে সন্দীপ হইতে মুঘলদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাহা অধিকার করেন। চট্টগ্রাম তখন আরাকানের রাজার অধীন। আরাকান রাজের

পর্টুগিজ সেনাপতি ইমানুয়েল ডি মার্ত্তুজ (Emanuel De Martos) সন্দীপ অধিকার করিতে প্রয়াসী হন। কেদাররায় তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সন্দীপ কার্ভলো ও ডিমার্ত্তুজকে প্রদান করিলেন। তাঁহারা উভয়ে সন্দীপ ভাগ করিলেন। এদিকে আরাকানরাজ মেং রাজাগি বা সেলিম শা দুইবার সন্দীপ আক্রমণ করিয়া অকৃতকার্য্য হন। পর্ত্তুগিজেরা জয়লাভ করিয়াও বহু সৈন্য ও রণতরী নষ্ট হওয়ায়, ভয়ে, বাকলা, শ্রীপুর, যশোহর প্রভৃতি স্থান আশ্রয় লইল। যশোহরপতি প্রতাপাদিত্য ক্রমবর্দ্ধমান পর্টুগিজ শক্তি ধ্বংস করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি ১৬০৩ খ্রীঃ অব্দে কৌশলে কার্ভলোকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়নপূর্ব্বক হত্যা করেন।

কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার — তাঁহার জন্মস্থান ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার ফুরশাইল (ফুলশালী) গ্রামে তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও পাঠক ছিলেন। তিনি ভাগবতের বহু শ্লোকের অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিতেন। তিনিই 'কিশোরী ভজন' নামক একটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। সম্ভবতঃ তিনি উনবিংশ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

কালা নাজির—তিনি ত্রিপুরাধিপতি বিজয়মাণিক্যের (১৫২৮-১৫৭০ খ্রীঃ অব্দ) একজন প্রধান ও প্রিয় সেনাপতি ছিলেন। উত্তরদিকে খাসিয়া, জয়ন্তিয়া ও কাছাড়পতিকে পরাস্ত করিয়া তিনি করদ করিয়াছিলেন। দক্ষিণদিকে মুঘল সেনাপতি মমারক খাঁর সহিত যুদ্ধে তিনি সমরশায়ী হন। সেই যুদ্ধের পরে ত্রিপুরসৈন্য জয়ী হইয়া মুঘলদিগকে দূর করিয়া দেয়।

কালাপাহাড়— এই নামে দুই তিন জন লোক ছিলেন। সকলেই ঘোরতর হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া এই নামে অভিহিত হন। (১) **প্রথম** কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম মিয়া মোহাম্মদ ফরমুলি। তিনি দিল্লীর সম্রাট বহলোল লোদীর ভাগিনেয় ছিলেন। বহলোল লোদী (১৪৫২—১৪৮১ খ্রীঃ অব্দ) স্বীয় ভাগিনেয় মোহাম্মদ ফরমুলিকে অযোধ্যা প্রদেশ জায়গীর প্রদান করেন। বহলোল লোদী জৌনপুরের হোশেন শাহ শাকিকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন এবং স্বীয় পুত্র বারবক শাহকে তাহা প্রদান করেন। মোহাম্মদ ফরমুলি তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। বহলোল লোদীর মৃত্যুর পরে তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নিজাম খাঁ সেকেন্দর লোদী নাম গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। জ্যেষ্ঠ বারবক শাহ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া, সেকেন্দরের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সেই যুদ্ধে

সেনাপতি মোহাম্মদ ফরমুলি বন্দী হইয়া নগ্নপদে সম্রাট সেকেন্দরের সমীপে নীত হন। সেকেন্দর তদবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া স্বীয় অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক সাদরে আলিঙ্গন করেন। মোহাম্মদ ফরমুলি তাঁহার এই সদয় ব্যবহারে তাঁহার একান্ত অনুগত হইয়া পূর্ব্ব স্বামী বারবক শাহের বিরুদ্ধেই যুদ্ধে গমন করেন। বারবক শাহ এই যুদ্ধে পরাস্ত হন। তিনি অতিশয় হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া পশ্চিমাঞ্চলে কালাপাহাড় নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি মৃত্যু কালে প্রচুর বিভব রাখিয়া যান। তাঁহার একমাত্র কন্যা ফাতেমা এই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। (২) দ্বিতীয় কালাপাহাড়ও প্রথম কালাপাহাড়ের ন্যায়ই অতিশয় হিন্দু বিদ্বেষী ও দেববিগ্রহ ধ্বংসকারী ছিলেন। তিনি জাতিতে আফগান ছিলেন। তিনি বাঙ্গলার নবাব সুলেমান করনাণী ও তৎপুত্র দাউদ খাঁর সেনাপতি ছিলেন। পূর্ব্বে আসাম, পশ্চিমে কাশী ও দক্ষিণে উড়িষ্যা এই সমস্ত স্থানের দেবমন্দির ও দেববিগ্রহ কিছুই তাঁহার অত্যাচার হইতে রক্ষা পায় নাই। কালাপাহাড় উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ দেবকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া বহু দেবমন্দির ও বিগ্রহ বিনষ্ট করেন। তৎপরে জগন্নাথের মন্দির আক্রমণ করিলেন কিন্তু তথায় বিগ্রহ পাইলেন না। পাণ্ডারা পূর্ব্বেই পারিকুদ নামক স্থানে বিগ্রহ অপসারিত করিয়াছিল। কালাপাহাড় তথা হইতে বিগ্রহ আনয়ন করিয়া, প্রকাণ্ড কাষ্ঠস্তূপে অগ্নি সংযোগ করিয়া তন্মধ্যে সেই দেববিগ্রহকে নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড গুলি কালী গঙ্গার স্রোতে নিক্ষেপ করিলেন। সেই সময়ে জগন্নাথ দেবের পরম ভক্ত বেসর মহান্তী সেই অর্দ্ধ দগ্ধ দেববিগ্রহ নদীস্রোত হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক এক খণ্ডাইতের গৃহে আনিয়া রক্ষা করেন। পরে রামচন্দ্র দেবের রাজত্ব কালে, সেই বিগ্রহ উড়িষ্যার মন্দিরে পুন প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সম্রাট আকবরের সেনাপতি হোশেন কুলীর হস্তে পাঠান নরপতি দাউদ খাঁ পরাজিত ও নিহত হইলেও কালাপাহাড় মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রু নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে তিনি গতায়ু হন। (৩) তৃতীয় কালাপাহাড় একজন স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হিন্দু। তাঁহার প্রকৃত নাম কালাচাঁদ রায়। বাল্যকালের ডাক নাম ছিল রাজু। তিনি জগন্নাথ রায়ের বংশজাত একটাকিয়ার ভাদুড়ী। বর্ত্তমান রাজসাহী জেলার মান্দ থানার অন্তর্গত বীরজাওন গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। তাঁহার পিতা নয়ানচাঁদ ভাদুড়ী গৌড়ের নবাবের অধীনে ফৌজদার ছিলেন। তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

কালাচাঁদ অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া, মাতামহের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। তাঁহার পিতৃকুল শাক্ত ও মাতৃকুল বৈষ্ণব ছিলেন। কালাচাঁদ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তৎকালীন গৌড়ের নবাব বারবক শাহের (১৪৫৭-১৪৭৪ খ্রীঃ) অধীনে গৌড় নগরের ফৌজদারের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই সময়ে নবাবের কন্যা দুলারি বিবী তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষিণী হইলেন। নবাব বলপূর্ব্বক তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। কালাচাঁদ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে স্থান পাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অতিশয় হিন্দু বিদ্বেষী হন। স্থানে স্থানে হিন্দু দেবালয় চূর্ণ ও বিগ্রহ ভগ্ন করিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ এই কালাপাহাড়ই আসামের দেবমন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন। প্রথম কালাপাহাড় দিল্লীর সম্রাট বহলোল লোদীর সময়ে ও সেকেন্দর লোদীর সময়ে (১৪৫০-১৫১৭ খ্রীঃ) বর্ত্তমান ছিলেন এবং সম্রাট বহলোল লোদীর ভাগিনেয় ছিলেন। দ্বিতীয় কালাপাহাড় ১৫৭৬ খ্রী অব্দে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে যুদ্ধে নিহত হন। তৃতীয় কালাপাহাড় বাঙ্গালার নবাব বারবক শাহের সময়ে (১৪৫৭-১৪৭৪ খ্রীঃ) বর্ত্তমান ছিলেন এবং তাঁহারই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই তিন কালাপাহাড় যে তিন ব্যক্তি ইহা সময় ও পারিপার্শ্বিক ঘটনা হইতেই প্রতিপন্ন হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি জাতিতে পাঠান, তৃতীয় ব্যক্তি স্বধর্ম্ম-ত্যাগী হিন্দু। হিন্দুবিদ্বেষ, দেবমন্দির ও দেববিগ্রহ ধ্বংসের জন্যই তাঁহারা এই বিদ্রূপাত্মক নামে অভিহিত হইয়াছেন।

কালাশোক—প্রাচীন ভারতের এক-জন বৌদ্ধ নরপতি। তাঁহার রাজত্বকালে বৈশালীনগরে (বর্ত্তমান বেসার) খ্রীঃ পূঃ ৩৯০ অব্দে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি হয়। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ও উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। মগধের অনেক স্থানে বিহার স্থাপিত হয় এবং নানা প্রদেশে প্রচারক প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে কয়েকজন প্রচারক পূর্ব্ব নিয়মাবলীর কতক পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করেন। ইহাতে বৌদ্ধগণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। কাকন্দক নামক এক বিখ্যাত বৌদ্ধ গুরুর পুত্র বসকে গুরুপদে বরণ করিয়া, একদল পূর্ব্ববর্ত্তী দল হইতে পৃথক হইয়া পড়েন। পূর্ব্ব-বর্ত্তী দলের নাম ছিল, 'থেরবাদী', এবং পরবর্ত্তী দলের নাম হইল 'মহাসাঙ্ঘিক'। এই দ্বিতীয় দলে প্রায় দশ সহস্র বৌদ্ধ প্রচারক যোগ দিলেন। বুদ্ধের মৃত্যুর পরে দুইশত বৎসরের মধ্যেই তাঁহাদের সম্প্রদায়ের সংখ্যা ষোড়শটী হইয়াছিল। (১) গোকুলিক, (২) একব্যবহারিক,

(৩) পন্নত্তি, (৪) বাহুলিক, (৫) চেতিয়, (৬) সব্বথ, (৭) ধর্ম্মগোত্তিক, (৮) কাশ্যপীয়, (৯) শঙ্কন্তিক, (১০) সত্ত, (১১) হিমবন্ত, (১২) রাজগিরিয়, (১৩) সিদ্ধ-থিকা, (১৪) পূর্ব্বসেলিয়, (১৫) অপর-সেলিয় ও (১৬) বজিরিয়।

কালিকাদাস দত্ত, রায় বাহাদুর, সি আই ই—কুচবিহারের দেশবিখ্যাত মন্ত্রী ও রাজনীতিক। দেশীয় রাজ্য পরিচালনায় যে সকল মনস্বী প্রতিভার পরিচয় দিয়া বাঙ্গালার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, রায় বাহাদুর কালিকাদাস দত্ত তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। বর্দ্ধমান জিলায় তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল। ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে মেড়ালের প্রসিদ্ধ রায়বংশে তিনি জন্ম-গ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি কৃষ্ণ-নগরের মোক্তার তাঁহার মাতুল বধুভূষণ ঘোষের আলয়ে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে তথা হইতে কলিকাতায় গমন করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৮৬০ খ্রীঃ)। তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র, বর্দ্ধমানের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। বি-এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ প্রথমে তিনি সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতা লাভ করেন। অল্প কিছুকাল পরেই আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে হাইকোর্টেই ওকালতী করিবেন মনস্থ করেন। পরে সেই সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া মুন্সেফীপদ গ্রহণ করেন এবং অল্পকাল পরেই বিচার বিভাগ হইতে শাসন বিভাগে স্থানান্তরিত হইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন। আট বৎসর কাল এই পদে কাজ করিয়া সাধুতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যশীলতার জন্য সর্ব্বসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হন। তিনি যখন ঐ পদে কাজ করিতেছিলেন, তখন কুচবিহার রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তদানীন্তন রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ তখন নিতান্ত শিশু। রাজ্যের কার্য্য সাধুতা ও শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একজন সুযোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে-ছিলেন। তাঁহারা কালিকাদাসকেই ঐ পদের সর্ব্বপ্রকার উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করিয়া ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে কুচবিহারে মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। সুদীর্ঘ বিয়াল্লিশ বৎসরকাল অসাধারণ সুখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার সহিত কার্য্য করিয়া ১৯১১ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এই কুচবিহারের মন্ত্রীপদ গ্রহণ করিয়া তিনি যে প্রতিভা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই অতুলনীয়। তাঁহার সুব্যবস্থা ও সুশাসনগুণে কুচ-

বিহারের রাজ্য ক্রমশঃই উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতে থাকে। জমীর প্রকৃত মালিক কৃষকগণকে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার ও অবিচারের হাত হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়ান কালিকাদাস সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হন। তাঁহার সুব্যবস্থায় রাজ্যের আয় প্রভৃত বৃদ্ধি পায় অথচ তৎসঙ্গে প্রজাসাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব বাঙ্গালী বিদ্বেষী তদানীন্তন ছোটলাট সার রিভার্স টমসন (Sir Rivers Thomson) ও অন্যান্য বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী কর্তৃক প্রকাশ্যে স্বীকৃত হইয়াছিল। কুচবিহার রাজ্যের উন্নতি এই মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের কালিকাদাসের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাই মূল কারণ। কালিকাদাস কুচবিহার রাজ্যের আয় বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা হইতে ২৬ লক্ষ টাকায় দাঁড় করাইয়াছিলেন। সেই কারণে যতদিন নৃপেন্দ্রনারায়ণ বর্ত্তমান ছিলেন ততদিন কালিকাদাস অবসর গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কালিকাদাস সুবক্তা ছিলেন। তিনি যখন রাজকর্ম্ম উপলক্ষে ময়মনসিংহে ছিলেন, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহযোগীতায় তখন তথায় এক সাহিত্যসভা স্থাপন করেন। সেই সংশ্রবে তাঁহার প্রাণস্পর্শী চিত্তউন্মাদক বক্তৃতায় ময়মনসিংহে নবজীবনের সঞ্চার হয়। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা লোকের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিত। কালিকাদাস ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে কয়েকটী ব্রহ্মমন্দির তাঁহার চেষ্টাতেই স্থাপিত হয়। তিনি আজীবন কুচবিহারের ব্রাহ্মসমাজের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। কালিকাদাস ও তাঁহার বাল্যবন্ধু রমেশচন্দ্র মিত্র দুজনেই আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। অসাধারণ কর্ম্মকুশলতার জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রায় বাহাদুর ও সি, আই, ই (C. I. E.) উপাধি প্রাপ্ত হন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যুবকের ন্যায় কর্ম্মকুশল ছিলেন। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং সৎকর্ম্মানুরাগী পুরুষ ছিলেন। ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

কালিদাস — (১) ভারতের মহাকবি কালিদাস কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা এখনও পণ্ডিতগণের বিচার্য্য রহিয়াছে। বর্ত্তমানে অধিকাংশ পণ্ডিতেরই মতে কালিদাস খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। মহাকবি কালিদাস, বিক্রমাদিত্য নামক পরাক্রান্ত নরপতির সভাসদ এবং 'নবরত্ন' নামে পরিচিত পণ্ডিত গোষ্ঠীর অন্যতম 'রত্ন' ছিলেন। এই বিক্রমাদিত্য যে প্রকৃতপক্ষে কে ছিলেন তাহাও সুনিশ্চিতরূপে স্থির হয় নাই। ৪১৫ খ্রীঃ

অব্দে মালব দেশে যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব করিতেন, তিনিই নবরত্ন সভার পৃষ্ঠপোষক বিক্রমাদিত্য বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। মতান্তরে কাশ্মীর রাজ হিরণ্যের সমসাময়িক হর্ষ বিক্রমাদিত্যই (৬০৭—৬৫২ খ্রীঃ) কালিদাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আবার কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে গুপ্তবংশীয় কুমারগুপ্তের (৫ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ) রাজত্বকালে মহাকবি কালিদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবার কোনও কোনও পণ্ডিত কালিদাসের কাব্য গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় প্রভৃতি হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, কালিদাস খ্রীঃ পূঃ প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক ছিলেন। এই শেষোক্ত মত বিশেষ প্রচারিত ও পণ্ডিত সমাজে গ্রাহ্য হয় নাই।

কালিদাসের গ্রন্থাবলী হইতে বেশ ধারণা জন্মে যে তিনি নানা শাস্ত্রজ্ঞ ও অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। দার্শনিক মত সমূহের উল্লেখ এবং আলোচনাও তাঁহার কাব্য মধ্যে প্রসঙ্গত প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেশ প্রচলিত কিম্বদন্তি অনুসারে বলিতে হয় যে তিনি প্রথমে ঘোরতর মূর্খ ছিলেন, পরে দেবানুগ্রহে অলৌকীক কবিত্বশক্তি লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যপাঠে, ঐরূপ কিম্বদন্তি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকেনা। তাঁহার কাব্যপাঠে তৎকাল প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি, ভৌগলিক তথ্য, রাজনীতিক বিষয়, প্রাণিবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট নানারূপ তথ্য প্রভৃতি বহু বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ হয়। ঐ সকল বিবিধ তথ্যের অবতারণা কোনও অল্পজ্ঞানী লোকের পক্ষে সম্ভব নহে। ভূয়োদর্শন, রাজনীতিক জ্ঞান, সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বহু বিষয়ের পরিচয় তাঁহার কাব্যপাঠে লাভ করা যায়। রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়ে গমন উপলক্ষে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানের যে বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন তিনি ঐরূপ কোনও দিগ্বিজয়ী সম্রাটের সহচররূপে ঐসকল স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কালিদাসের বর্ণনায় উপমার প্রাচুর্য্য বিদ্যমান এবং ঐ সকল উপমা যেরূপ সুচিন্তিত বাক্যবিন্যাসযুক্ত, সেইরূপ মধুর ও লালিত্যপূর্ণ। সাধারণতঃ কালিদাসের রচিত বলিয়া যে সকল গ্রন্থ জনসমাজে প্রচলিত, পণ্ডিতগণের মতে তাহাদের অনেকগুলিই তাঁহার নহে। অন্য কোনও অখ্যাত নামা কবি, মহাকবি কালিদাসের নামে উহা জনসমাজে প্রচারিত করেন। কোন্ কোন্ পুস্তক প্রকৃতপক্ষে মহাকবি কালিদাসের রচনা, সে বিষয়েও পণ্ডিতগণ একমত নহেন। বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র নামক গ্রন্থ দুইখানি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ

প্রায় এক মত। অর্থাৎ উহা মহাকবি কালিদাসের রচনা নহে।

কালিদাস বিক্রমাদিত্য রাজার নবরত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন। অপর রত্নগুলির নাম — ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, বরাহ ও মিহির। এই সকল 'রত্নে'র ঐতিহাসিকত্ব, অস্তিত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়েই এখনও পণ্ডিতগণের মতভেদ রহিয়াছে। কালিদাস কোন্ স্থানের অধিবাসী ছিলেন তাহাও পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলির ন্যায়, নিশ্চিতরূপে স্থির হয় নাই। সাধারণতঃ তাঁহাকে উজ্জয়িনীর অধিবাসী বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু এ বিষয়েও বহু প্রকার বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কোনও কোনও পণ্ডিত (প্রধানতঃ বঙ্গদেশীয়) কালিদাসকে বাঙ্গালা দেশের অধিবাসী বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

কালিদাস গজদানী — তাঁহার জন্ম স্থান অযোধ্যা প্রদেশ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দির শেষ ভাগে তিনি ভাগ্যান্বেষণে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তৎকালের প্রসিদ্ধ বিদ্বান সৈয়দ ইব্রাহিম মালেক-উল-উলমার নিকট তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহারই পুত্র বঙ্গের বার ভূঞার অন্যতম ঈশা খাঁ।

কালিদাস গণক—(১) খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দিতে কালিদাস নামে এক গণক ছিলেন। তিনি 'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ' নামক মুহূর্ত্তবিচার বিষয়ে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। (২) শত্রু পরাজয় 'যুদ্ধ মুহূর্ত্ত' নামক গ্রন্থ রচয়িতা অপর এক কালিদাস গণকের নাম পাওয়া যায়।

কালিদাস দত্ত:— কলিকাতা বহু-বাজার অঞ্চলের খ্যাতনামা অক্রূরচন্দ্র দত্তের পৌত্র। ১২২৮ বঙ্গাব্দে (১৮২০ অথবা ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে) তাঁহার জন্ম হয়। এই দত্ত পরিবার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও আতিথেয়তার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কালিদাস দত্ত ও তাঁহার ভ্রাতা রাজেন্দ্র দত্ত মেট্রপলিট্যান ইনষ্টিটিউশন (Metropolitan Institution) স্থাপনে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নানারূপে বিশেষ সাহার্য্য করেন। ১২৭৭ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কালিদাস নাথ — তিনি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদ্বারা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য উদ্ধারের বিশেষ সহায়তা হইয়াছিল। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বড়বাজার হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, গৌরাঙ্গ সমাজ প্রভৃতির সাহায্যে প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচারে অধিকাংশ সময় যাপন করিয়াছেন। বঙ্গবাসী পত্রিকা আফিস হইতে তাঁহারই সম্পাদনে কাশীরামদাসের মহাভারত ও কবিকঙ্কন

চণ্ডী প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রাচীন পুঁথি লেখকগণের ভ্রমপ্রমাদের মধ্য হইতে সুসঙ্গত প্রাচীন পাঠ উদ্ধারে তাহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন ব্যতীত কোন কোন বৈষ্ণব পত্রিকার লেখক ও সম্পাদকও তিনি ছিলেন। 'নরোত্তম বিলাস', 'জগদানন্দ পদাবলী', জয়ানন্দের 'চৈতন্য সঙ্গম' প্রভৃতিও তিনিই সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি ১৩১০ সালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

কালিদাস ভট্টাচার্য্য—তাঁহার জন্মস্থান মুরশিদাবাদ জিলার বালুচর নামক স্থান। তাঁহার রচিত অনেকগুলি শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত বিশেষ প্রসিদ্ধ।

কালিদাস মুখোপাধ্যায় — প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্য সাধারণতঃ তিনি 'কালী মীরজা' নামেই খ্যাত ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান হুগলী জিলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া নামক গ্রাম। তিনি প্রথমে গ্রামের পাঠশালায়, পরে টোলে অধ্যয়ন করেন, তৎপরে কাশীতে গমনপূর্ব্বক বেদান্ত দর্শন ও সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি সঙ্গীতে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ গমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি ফার্শী ও উর্দ্দু ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া আনুমানিক ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং এই সময়েই দারপরিগ্রহ করেন। প্রথমে তিনি বর্দ্ধমানের যুবরাজ প্রতাপচাঁদের আশ্রয়ে ছিলেন। তিনিই পরে জাল প্রতাপচাঁদ নামে প্রসিদ্ধ হন। প্রতাপচাঁদ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলে, কালিদাস কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী জমিদার গোপীমোহন ঠাকুর মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সদাশয় গোপীমোহন ঠাকুর মহাশয়ের আশ্রয়েই তাঁহার সর্ব্বপ্রকার অর্থাভাব দূর হয়। সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের কথা তখন দেশময় প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি অতিশয় বিনয়ী ও শিষ্টাচার সম্পন্ন ছিলেন। কথিত আছে রাজা রামমোহন রায়ও তাঁহার নিকট সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ধর্ম্ম ও বিবিধ বিষয়ক সংগীত 'গীত লহরী' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮২০ খ্রীঃ তিনি পরলোক গমন করেন।

কালিদাস সিদ্ধান্ত — তিনি কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারই নিকট রাজা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহারাজা দেখ।

কালিয়ন বা তিরুমঙ্গই—তিনি খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে মান্দ্রাজ প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার চারিজন অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন শিষ্য ছিলেন—প্রথম তোরা বড়কল অর্থাৎ তার্কিক শিরোমণি, দ্বিতীয় তাভু দুয়াল্ অর্থাৎ দ্বার উদ্‌ঘাটক, তিনি ফুৎকার দ্বারা দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে পারিতেন। তৃতীয় নেড়েলাহ মেরিপ্পান অর্থাৎ ছায়া গ্রহ। তিনি কাহারও ছায়া স্পর্শ করিলে, তাহার গতিরোধ হইত। চতুর্থ নীরমেল নড়প্পান অর্থাৎ জলোপরিচর। তিনি জলের উপর দিয়া অবলীলাক্রমে গমন করিতে পারিতেন। কালিয়ন্ শিষ্য চতুষ্টয়সহ শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হন। তথাকার মন্দিরের দুর্দ্দশা দর্শনে অতিমাত্র বিষাদিত হইয়া তিনি শিষ্য চতুষ্টয়ের সাহায্যে দস্যুবৃত্তি দ্বারা অর্থ সঞ্চয় পূর্ব্বক মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করেন। তিনি প্রথমে দেশের লোকের নিকট মন্দির নির্ম্মাণার্থ অর্থ প্রার্থনা করিয়া বিফলকাম হন। পরে তাঁহার শিষ্য চতুষ্টয় ও দেশস্থ অন্যান্য দস্যুদের সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করেন। মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইলে, তিনি শিল্পীদিগকে সমুচিত অর্থ প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। তখন অর্থ সংগ্রহকারী দস্যুদল অর্থ প্রার্থনা করিল। কিন্তু তখন তাঁহার হস্তে আর অর্থ ছিল না। দস্যুরা তখন তাঁহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করে। তিনি কৌশলে তাহাদিগকে জল নিমগ্ন করিয়া হত্যা করেন। সেই দস্যুদল নিহত হইবার স্থানকে লোকে এখনও কোল্লিড়ম্ বা হত্যা স্থল বলে। 'দিব্য প্রবন্ধ' নামে এই সম্প্রদায়ের বেদস্থানীয় একখানা গ্রন্থ আছে। তিনি তাহার ছয়টী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সহস্র শ্লোকাত্মক তিরুমুড়ি বিশেষ বিখ্যাত।

কালীকান্ত চক্রবর্ত্তী — ১২২০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে বিক্রমপুরের (বর্ত্তমানে ফরিদপুরের) অন্তর্গত আকশা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামজয় চক্রবর্ত্তী দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। সামান্য ব্রহ্মোত্তরের আয় দ্বারা সংসার চালাইয়া চতুষ্পাঠীর ছাত্রদেরও আহারব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। কোনও এক সময়ে গৃহদাহে তাঁহার দলিলাদি নষ্ট হয় এবং তৎফলে তিনি সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন। এইরূপ নিরুপায় হইয়া চতুষ্পাঠী বন্ধ করিতে বাধ্য হন। কালীকান্ত গ্রামের পাঠশালায় ও চতুষ্পাঠীতে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া ঢাকা সহরে গমন করেন। ঢাকার তদানীন্তন সদাশয় ডিপুটী কালেক্টার বেতগা নিবাসী হরিশ্চন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহাকে আশ্রয় দেন। এই স্থানে থাকিয়া তিনি ফার্শী ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করেন। বিশেষ জ্ঞান লাভের

আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অর্থোপার্জ্জনের উপায় দেখিতে হইল। ১২৪৪ সালে (১৮৩৭ খ্রীঃ) পাঁচ টাকা বেতনে তিনি সেট্‌লমেণ্ট আফিশে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে সাধুতা ও কার্য্যকুশলতা গুণে তিনি প্রথমে মহাফেজ, তৎপরে নায়েব নাজির, পরে একশত টাকা বেতনের পুলিশ কর্ম্মচারীর পদ প্রাপ্ত হন। সেই সময়ের পুলিশও অত্যন্ত উৎকোচগ্রাহী ও অত্যাচারী ছিল। কিন্তু সাধুপ্রকৃতি কালীকান্ত সেই দিকেই দৃষ্টি দিতেন না। এমন কি মফঃস্বল পরিদর্শনকালে স্বীয় আহার্য্য বস্তু পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তৎপরে তিনি দুইশত টাকা বেতনে গোয়েন্দা বিভাগে বদলি হন। তিনি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন নির্দ্দোষী যাহাতে মুক্তি পায়। কখনও যেন নিরপরাধ ব্যক্তি শাস্তি না পায়। গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করিয়াও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন এবং সময় সময় বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। তিনি যেমন চরিত্রবান তেমনি পরোপকারী ও দানশীল ছিলেন। ৪১ বৎসর চাকুরী করিয়া ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীবাসী হন এবং ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে (১৩০৫ বাং) পঁচাশী বৎসর বয়সে একমাত্র পুত্র তরণী কান্তকে রাখিয়া পরলোক গত হন।

কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার — ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা উপবিভাগের অন্তর্গত মাঘান গ্রামে বিখ্যাত পূর্ণানন্দ গিরির বংশে ১৮১১ খ্রীঃ অব্দে (১২১৮ বাং) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কার্ত্তিকেয়চন্দ্র পঞ্চানন, মাতার নাম কাত্যায়নী দেবী। তাঁহার পিতা ও পিতামহ শ্রীনারায়ণ ন্যায়বাগীশ উভয়েই স্মৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি একবার কুচবিহার রাজবাড়ীতে পণ্ডিতের সভায় বিচারে জয়লাভ করেন। তাহাতে তৎকালীন মন্ত্রী শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার 'তত্ত্বাবশিষ্ঠ' গ্রন্থের মুদ্রন ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হন। তিনি স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মত অনেক স্থলে খণ্ডন করিয়া, স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়—মাত্র প্রথম খণ্ড মুদ্রনের পরই মন্ত্রী মহাশয় পরলোক গমন করেন। এই অসাধারণ পণ্ডিত ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে (১২৭১ বাং) পরলোক গমন করেন। তাঁহার জয়সুন্দরী নামে একমাত্র কন্যা ছিল।

কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী —তিনি একজন বিখ্যাত উপন্যাস লেখক। 'অপূর্ব্ব কারাবাস', 'অপূর্ব্ব সহবাস', 'চিত্রশালা' প্রভৃতি উপন্যাস তাঁহার রচিত। ইংরেজি উপন্যাস লেখক সার ওয়ালটার স্কটের রচিত 'লেডি অব দি লেক'

গ্রন্থের ভাব অবলম্বন করিয়া 'অপূর্ব্ব কারাবাস' গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।

কালীকিঙ্কর তর্কবাগীশ — তিনি খাঁটুরার রূপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশীয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। জ্ঞাতি অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের তিনি একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। একবার শোভাবাজার রাজবাটীতে কোনও ব্যবস্থা পত্র সম্বন্ধে বিচারে জয়লাভ করিয়া স্বীয় অধ্যাপকের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সেই কালের অধ্যাপকদের বেতন গ্রহণে কর্ম্ম করা অতিশয় নিন্দার বিষয় ছিল। একবার কালীকিঙ্কর তর্কবাগীশ মহাশয় কোনও সরকারী কার্য্যে বেতন গ্রহণ করিয়া, ম্লেচ্ছের অর্থ গ্রহণ অপবাদে স্বসমাজে অতিশয় নিন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক গুলি গ্রন্থ আছে। প্রত্যেক গ্রন্থে নিজ পরিচয় ও সন তারিখ দেওয়া হইয়াছে।

কালীকুমার দত্ত— (১) তিনি চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্গত খাঁটুরা গ্রামে ১১৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ফকিরচাঁদ দত্তের কলিকাতা চিনি পট্টিতে খুব বড় কারবার ছিল। তিনি উক্ত কারবারের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করেন। তদ্দ্বারা তিনি কলিকাতায় কয়েকখানা বাড়ী ও জমিদারী ক্রয় করেন। তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং বিশেষ অতিথি সৎকার পরায়ণ লোক ছিলেন। একবার দুই দিন অতিথি না আসায় তিনি সস্ত্রীক উপবাসে ছিলেন। তাঁহার সৎকার্য্যের কথা তৎকালীন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সার এসলি ইডেন (Sir Ashley Eden) অবগত ছিলেন এবং তাঁহাকে, একবার সাক্ষাতে খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১২৬৮ সালের (১৮৬১ খ্রীঃ) অগ্রহায়ণ মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি কেবল খাঁটুরার নহে, বঙ্গের সমস্ত তাম্বুলীবংশের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে চারি পুত্র রাখিয়া যান। তন্মধ্যে হরিশ্চন্দ্রই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

কালীকুমার দত্ত, — (২) তিনি সাধারণতঃ দাতা কালীকুমার নামেই খ্যাত ছিলেন। তাহার জন্মস্থান ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত কুকুটিয়া গ্রাম। তাঁহার পিতামহ রামজয় দত্ত ও পিতা রামলোচন দত্ত। তাঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ। ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি শৈশবে দুঃখ ও দরিদ্রতার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বাঙ্গালা ও ফার্শী ভাষায় বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। প্রথম জীবনে ঢাকা সহরে সামান্য বেতনে আদালতে একটী চাকুরী প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসর ঐ কাজ

করিয়া আদালতের কাজে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। সেই সময়ে জজের অনুমতি পাইলে, সামান্য একটা পরীক্ষা দিয়াই উকীল হওয়া যাইত। তিনিও সেই উপায়ে ওকালতী পরীক্ষা দিয়া উকিল হন। প্রথমে তিনি মুনসেফী আদালতের পরে সদরআমীনা আদালতের আইন ব্যবসায় করেন। এই সময়ে তিনি ময়মনসিংহ সহরে গমন করেন। ঐস্থানেই দাতা বলিয়া চারিদিকে তাঁহার যশ ব্যাপ্ত হয়। তিনি যেমন মাসে সহস্রাধিক টাকা উপার্জ্জন করিতেন তেমান অকাতরে তাহা ব্যয়ও করিতেন। তাঁহার আলয় দরিদ্র বিদ্যার্থী, কর্ম্মপ্রার্থী উমেদার, অতিথি, আত্মীয়, অনাত্মীয়, বহুলোকের আশ্রয়স্থল ছিল। তিনি আদর্শ চরিত্র উকিল ছিলেন। তাঁহার আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান ও ধর্ম্মভীরুতা অতিশয় প্রবল ছিল। তিনি নিজে কখনও অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন না এবং অন্যকেও অসদুপায় অবলম্বন করিতে প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁহার গৃহিণীও তাঁহারই ন্যায় উদার প্রকৃতির ছিলেন। প্রতি বৎসর পূজার ছুটিতে দেশে আসিয়া শতাধিক ব্যক্তিকে বস্ত্রাদি দান করিতেন। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর — কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ জমিদার গোপী-মোহন ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও গোপাল লাল ঠাকুরের পুত্র। ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। শিক্ষালাভ ব্যপদেশে তিনি হিন্দু কলেজ, ওরিয়েণ্টাল সেমি-নারী, ডভ্‌টন কলেজ প্রভৃতি শিক্ষায়তনে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন; পরে গৃহ-শিক্ষকের নিকটও শিক্ষালাভ করেন। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কালীকৃষ্ণ অনাড়ম্বর ধর্ম্মপ্রাণ ও দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। জনহিতকর সকলপ্রকার কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি ছিল এবং তিনি ঐসকল কার্য্যে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের বিবাহ উপলক্ষে স্বনামধন্য মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান শিক্ষালয়ের যন্ত্রাদি ক্রয় করি-বার জন্য বহু অর্থ প্রদান করেন। পরিণত বয়সে, ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে বারাণসীধামে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্রই তাঁহার জীবদ্দশায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র প্রফুল্লনাথ ঠাকুর তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

কালীকৃষ্ণ দেব রাজা বাহাদুর — কলিকাতা শোভাবাজারের প্রসিদ্ধ মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পৌত্র ও রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের মধ্যম পুত্র। ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। গৃহশিক্ষকের নিকট তাঁহার শিক্ষালাভ ঘটে। তিনি জ্ঞানপিপাসু ও স্বধর্ম্ম-

নিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। রাজা সার রাধাকান্ত দেবের দেহাবসানের পর তিনিই প্রধানতঃ দেশের হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন।

এদেশের লোকের পক্ষে তখন উচ্চ শিক্ষা লাভের তদ্রূপ সুযোগ লাভ ঘটিত না। তৎসত্ত্বেও জ্ঞানানুরাগী কালীকৃষ্ণ ইংরেজি, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করেন। তদ্ভিন্ন ফার্শী, আরবী ও উর্দ্দূ ভাষায়ও তাহার বিশেষ অধিকার ছিল।

রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর রাসেলাস্ (Rasselas) গে'জ ফেব্‌ল (Gay's Fable) প্রভৃতি ইংরাজি পুস্তক এবং সংস্কৃত 'মহানাটক' প্রভৃতি পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করেন। শেষোক্ত গ্রন্থ তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে উৎসর্গ করেন এবং মহারাণীও তজ্জন্য তাঁহাকে প্রশংসাসূচক পত্র লেখেন। রাসেলাসের অনুবাদ ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। উহা তিনি লর্ড বেন্টিঙ্কের নামে উৎসর্গ করেন। উহার একদিকে মূল ইংরাজি এবং অপর পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'পুরুষ পরীক্ষা' নামক সংস্কৃত নাটকের এক ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। উহা তৎকালীন পত্রিকাদিতে বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

তদ্ভিন্ন বেতাল পঞ্চবিংশতির ইংরেজি অনুবাদ; গুপ্তিপাড়া নিবাসী চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য বিরচিত 'বিদ্বোন্মাদ তরঙ্গিনী' নামক দার্শনিক গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ; 'নীতি-সঙ্কলন' নামক একটি সংস্কৃত শ্লোক গ্রন্থ (ইংরেজি অনুবাদ সহ); পূর্ব্বোক্ত 'গে'জ ফেবল' এর উর্দ্দু অনুবাদ প্রভৃতি বহু গ্রন্থও তিনি প্রকাশ করেন। তাঁহার ন্যায় বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার তখনকার দিনে অধিক ছিল না। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য ফ্রান্স (France), জার্ম্মনী (Germany) প্রভৃতি ইয়োরোপীয় দেশের নরপতি এবং দিল্লীর বাদশাহ, নেপালের মহারাজা প্রভৃতি বহু দেশীয় নরপতি; ইংলণ্ডাধিপতি চতুর্থ উইলিয়াম (William IV) এবং অনেক রাজবংশীয় ব্যক্তি; স্যার রবার্ট পীল (Sir Robert Peel) প্রভৃতি মনস্বীগণ তাঁহাকে প্রশংসাপত্র ও পুরস্কারাদি প্রেরণ করেন। নেপালের অধিপতি তাঁহাকে বিশেষ সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থাগার বহু মূল্যবান গ্রন্থের ভাণ্ডার ছিল।

সামাজিক মত বিষয়ে কোনও কোনও স্থলে রক্ষণশীল এবং কোনও কোনও স্থলে বিশেষ উদারপন্থী ছিলেন। সতীদাহের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেন, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁহার

অসীম আগ্রহ ছিল। তদানীন্তন জনমতের প্রতিকূলতা করিয়া তিনি স্বীয় পৌত্রীদিগকে বেথুন স্কুলে প্রেরণ করেন। শিক্ষাবিস্তার বিষয়ক সকল প্রকার কার্য্যেই তাঁহার উৎসাহ ও সহানুভূতি ছিল। বিদ্যালয়াদির পুরস্কার বিতরণ সভাতে উপস্থিত থকিয়া উৎসাহ বৰ্দ্ধন করিতেন। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী (Oriental Seminary) প্রভৃতি বিদ্যালয়ের পরিচালনা সভার তিনি একজন সদস্য ছিলেন।

সাহিত্য চর্চ্চায় তাঁহার যেরূপ উৎসাহ ছিল, জনসাধারণের সভা প্রভৃতিতে যোগদান করাও তাঁহার সেইরূপ প্রীতির কার্য্য ছিল। প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ারের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ছিল। কয়েক বৎসর অনুষ্ঠিত ডেভিড স্মৃতিসভায় তিনি সভাপতির কাজ করেন। পুণ্যশ্লোক বেথুন সাহেবের স্মৃতিরক্ষার্থ তৎকালীন দেশীয় ও ইয়োরোপীয় শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ 'বেথুন সোসাইটি' (Bethune Society) নামে এক সাহিত্যসভা স্থাপন করেন। রাজা কালীকৃষ্ণ দেব ঐ সভার একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং উহার অধিবেশনাদিতে উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। বেথুন সোসাইটির অধিবেশন গুলিতে তৎকালীন গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া প্রবন্ধাদি পাঠ, আলোচনা, বিতর্ক প্রভৃতি করিতেন। বহু উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী, প্রথিতযশা শিক্ষাব্রতী প্রভৃতি মনস্বীগণ ঐ অধিবেশন গুলির শোভাবৰ্দ্ধন করিতেন। রাজা কালীকৃষ্ণ বহুবার বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে বক্তৃতা প্রদান, প্রবন্ধ পাঠ অথবা আলোচনায় যোগদান করেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রেও রাজা কালীকৃষ্ণ তৎকালীন অন্যান্য মনস্বীগণের সহিত যথোচিত ভাবে যোগদান করিতেন। স্বভাবতঃ সহৃদয়তাগুণে তিনি প্রজার দুঃখকষ্ট লাঘবেরও চেষ্টা করিতেন। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও দেশহিতৈষী গিরিশচন্দ্র ঘোষ যখন মতভেদ নিবন্ধন হিন্দু-পেট্রিয়টের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া 'বেঙ্গলী' পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, তখন কালীকৃষ্ণ তাঁহার পোষকতা করেন। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তৎকালীন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা রাজা কালীকৃষ্ণকে হিন্দুসমাজের নেতা বলিয়া স্বীকার করিতেন ও তদনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহ, জ্ঞানানুরাগ প্রভৃতি মহদ্গুণের জন্য তিনি সর্ব্বজনমান্য ছিলেন।

১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় যে 'মেসমেরিক' হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত

হয়, তিনি তাহার একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'রাজাবাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দের প্রথম ভাগে বারাণসীধামে কালীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। তাঁহার পরলোক গমনে শিক্ষিত হিন্দু সমাজে বিশেষ শোকের সঞ্চার হয়। তাঁহার স্মৃতিসভায় তৎকালীন বহু সম্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করেন। কলিকাতায় বীডন উদ্যানে (Beadon Square) তাঁহার এক মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা টাউন হলেও তাঁহার প্রতিকৃতি রক্ষিত আছে।

কালীকৃষ্ণ মিত্র—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে সকল বাঙ্গালী ইংরেজি শিক্ষার সাহায্যে দেশের মঙ্গলকর কার্য্যে নিবিষ্ট হন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। ১৮২২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার সাংসারিক অসচ্ছলতার জন্য বাল্যে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পরিশ্রম স্বীকার ও কষ্ট সহ্য করিতে হয়। পরে বৃত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় এ বিষয়ে অনেক আনুকূল্য হয়। কৃষিবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। এদেশের কৃষকদিগকে পাশ্চাত্যের উন্নততর যন্ত্রাদির সাহায্যে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিতে তিনি বিশেষ প্রয়াস পান। এইসকল বিষয়ের সুবিধার জন্য বহু অর্থব্যয়ে কলিকাতার সন্নিকটে বারাসত নামক স্থানে একটি আদর্শ (model) উদ্যান ও কৃষিভাণ্ডার স্থাপন করেন। তিনি উদ্ভিদবিদ্যা, ভৌতিক বিদ্যা, যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতেও অনুরাগী ও পারদর্শী ছিলেন। দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন এবং মাদকসেবন নিবারণ, গার্হস্থ চিকিৎসা প্রভৃতি সামাজিক মঙ্গলজনক কার্য্যেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

কালীকৃষ্ণ রায়—বঙ্গাধিপ আদিশূরের রাজত্বকালে অযোধ্যা প্রদেশান্তর্গত রাজগড় হইতে আগত সনকা আঢ্য নামক জনৈক সুবর্ণ বণিক পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী সুবর্ণ গ্রামে বসবাস করেন। তদীয় বংশধর লক্ষ্মীনারায়ণ ধর (নকুড় ধর) য়ুরোপীয়গণের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া সুবর্ণ গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে বাস করেন। তথায় তিনি ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন ও ইংরাজগণকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করিবার প্রস্তাব করিলে, তিনি নিজে উহা গ্রহণ না করিয়া, তাঁহার একমাত্র দৌহিত্র সুখময় রায়কে উক্ত সম্মান প্রদানের অনুরোধ করেন

রাজা সুখময় রায় পাথুরিয়াঘাটা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

রাজা সুখময়ের বংশধর কুমার কালীকৃষ্ণ রাজা বৈদ্যনাথের পুত্র। কালীকৃষ্ণের দুই পুত্র—দৌলতচন্দ্র ও নাগরনাথ। রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক, প্রধান সেনাপতি লর্ড নেপিয়ার, লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড, লর্ড হার্ডিং, লর্ড এলগিন প্রভৃতি রাজপুরুষগণের নিকট তাঁহার বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। রাজা কালীকৃষ্ণ দানশীল ও উদারচেতা পুরুষ ছিলেন। পাইকপাড়ায় তিনি একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ও চিৎপুরে একটি হাঁসপাতালে এককালীন ২৫০০৲ টাকা ও মাসিক ১০০৲ টাকা দান করেন।

কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী, কবি—রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুণ্ডীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদারবংশীয় মনস্বী। তাঁহাদের যত্নেই মফঃস্বলে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত এবং 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁহারই পুরস্কার ঘোষণায় বাঙ্গালার আদি নাটক 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বে'র জন্ম হয়। তাঁহাদের দ্বারাই রঙ্গপুরে জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। তিনি 'স্বভাব দর্পণ', 'প্রেমারসাষ্টক' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কালীচন্দ্রের মৃত্যুর পর ঐ পত্রিকাখানি কাকিনার বিদ্যোৎসাহী জমিদার শম্ভুচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন উহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' হয়। তাঁহারই ঘোষণা অনুসারে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন 'পতিব্রতোপাখ্যান' নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রথমে প্রতিশ্রুত পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। পুনরায় সেইরূপভাবে 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' নাটক রচনার জন্যও পণ্ডিত তর্করত্ন পুরস্কৃত হন।

কালীচরণ ঘোষ—প্রবাসী বাঙ্গালী বীর। কলিকাতা নিবাসী বাবু কালীচরণ ঘোষ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে সমর বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করিয়া, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করেন। প্রথম ভরতপুর যুদ্ধের সময়ে তিনি সৈন্য দলের রসদসহ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘকাল সমর বিভাগে সেনাধ্যক্ষদিগের সংস্রবে থাকিয়া তিনি যুদ্ধকৌশলাদি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধকালে, ইংরেজ সেনাপতি শত্রুপক্ষীয়দের অস্ত্রাঘাতে নিহত হইলে, অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ সেনাধ্যক্ষদের অনুরোধে তিনি নিহত সেনাপতির পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সৈন্য পরিচালনা করেন এবং সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহার সৈন্য পরিচালনার নৈপুণ্যে ইংরেজপক্ষ জয়লাভ করে। যুদ্ধান্তে, প্রথমে বিনা অনুমতিতে সৈন্যাধ্যক্ষের পরিচ্ছদ পরিধান করায় অপরাধে সাম-

রিক বিধানে তাঁহার অর্থদণ্ড হয়। কিন্তু পরে তাঁহার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বীরত্ব ও রাজভক্তির জন্য তাঁহাকে বহু সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হয়। উপ-রোক্ত ঘটনার পর হইতে তিনি জেনা-রেল (অপভ্রংশ জাঁদরেল) কালু ঘোষ নামে পরিচিত হন।

মৃত সেনাপতির পরিচ্ছদ পরিধান করার অপরাধে তিনি স্বশ্রেণীর মধ্যে অপাংক্তেয় হইয়াছিলেন এবং বহুকাল পর্য্যন্ত ও তাঁহার বংশধরগণকে তজ্জন্য নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়—যে সকল রাজভক্ত বাঙ্গালীর অসীম অধ্যবসায় ও যত্নে ইংরাজ শক্তি ভারতবর্ষে সু-প্রতিষ্ঠিত হয়, সিপাহী বিদ্রোহের সময় যাঁহারা সিপাহীগণের হস্তে অশেষরূপে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইয়াও ইংরাজ-গণকে বিশেষ সহায়তা করেন ইনি তাঁহাদের অন্যতম।

১৮২০ খ্রীঃ অব্দে তিনি এলাহাবাদের কীডগঞ্জ নামক পল্লীতে পিতা হরবল্লভ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা তিন সহোদর—জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ, মধ্যম কালীচরণ ও কনিষ্ঠ তারিণীচরণ। জ্ঞানানন্দ ও সদানন্দ কালীচরণের পুত্র।

লক্ষ্ণৌএর নবাব নাসির উদ্দীন হাইদার প্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরে (লক্ষ্ণৌ এর সুপ্রসিদ্ধ 'তারাওয়ালী কোঠী') কাজ করিবার জন্য ইহার অধ্যক্ষ কর্ণেল উইলকক্স এলাহাবাদ হইতে যে কতিপয় বাঙ্গালী যুবককে লক্ষ্ণৌ আনয়ন করেন ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ইনি উর্দ্দু, ফারসী ও ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার জন্য যখন তিনি এলাহাবাদের ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ, কিন্তু স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে ছয় বৎসরেই বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। তিনি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ লুইস সাহেবের এরূপ স্নেহভাজন হইয়াছিলেন যে, লক্ষ্ণৌ মান মন্দিরের অধ্যক্ষ কর্ণেল উইলকক্সের অনুরোধে মানমন্দিরে কাজ করিবার জন্য অন্য দুইজন বাঙ্গালী যুবকের সহিত যখন তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ প্রেরণ করেন, তখন বিদায়কালে তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কর্ণেল উইল-কক্সের নিকট কালীচরণের পরিচয়পত্রে তিনি লিখিলেন—যদি হাজার লোক এক কথা বলে ও কালীচরণ অন্যরূপ বলেন, তবুও কালীচরণের কথাই সত্য জানিবেন, ইহা বহু পরীক্ষিত। কালী চরণ কার্য্যদক্ষতা ও আচরণগুণে কর্ণেল লুইসের মনে এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া ছিলেন যে সরকারের আদেশে কর্ণেল সাহেব কাবুল যাইবার প্রাক্কালে, যাবতীয় সরকারী কার্য্য ভিন্ন, স্বীয় সাংসারিক কয়েকটী বিষয়ের ভার তাঁহার

উপর ন্যস্ত করেন। এই সকল কার্য্য তিনি এরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন যে, অতঃপর তিনি কর্ণেলের বন্ধুরূপে পরিগণিত হন। কয়েকজন পারিষদের কুপরামর্শে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ একবার লক্ষ্ণৌ মানমন্দির উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব লইয়া কালীচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি নবাবকে মানমন্দির ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করেন, ইহাতে নবাব প্রীত হইয়া তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। কর্ণেল উইলকক্সের মৃত্যুতে মানমন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণে সমর্থ ব্যক্তির অভাবে উহার দপ্তর উঠিয়া যায় এবং কালীচরণ তাঁহার আত্মীয় লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীর ট্রেজারার ভৈরবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের নিম্নতম নায়েব খাজাঞ্চীর পদ প্রাপ্ত হন। ভৈরববাবুর মৃত্যু হইলে, কালীচরণ তাঁহার পদে উন্নীত হন।

তিনি যখন এই পদে আসীন ছিলেন, সেই সময় সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। বিদ্রোহের সূত্রপাতে রাজস্ব রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়াও তিনি যে সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য। তাঁহার এইপ্রকার রাজভক্তির জন্য সিপাহীগণের হস্তে তিনি সপরিবারে অশেষরূপে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হন। অবশেষে অশেষ দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্য দিয়া কালীচরণ সপরিবারে এলাহাবাদে তাঁহার পিতৃভবনে আসিতে সমর্থ হন। অতঃপর তিনি লক্ষ্ণৌ হইতে কাণপুরে প্রেরিত রাজস্বের ভার গ্রহণ করিতে তদীয় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী মার্টিন সাহেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হন। এই কার্য্যভার গ্রহণের কিছুদিন পরেই তিনি তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় সহ অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু মার্টিন সাহেব লক্ষ্ণৌএর কালেক্টররূপে কানপুর হইতে বদলী হইলে, তাঁহারই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে লক্ষ্ণৌএর দপ্তর ও তহশীল পুনর্গঠন ও সুনিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই দুরূহ কার্য্য তিনি অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। ইহাতে উচ্চ রাজকর্ম্মচারীমহলে তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করিল। ইহাতে ট্রেজারি অফিসারকে তাহার প্রতি ঈর্ষান্বিত দেখিয়া কালীবাবু পদত্যাগ করেন। তাঁহার কর্ম্মজীবনে তিনি তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণের যথেষ্ট বিশ্বাস ও প্রীতিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি জেনারেল আউটরাম, স্যার হেনরী লরেন্স প্রভৃতি উচ্চ রাজপুরুষগণ তাঁহার প্রতি গুণমুগ্ধ বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন।

কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া যখন তিনি কাশীতে অবস্থান করিতে-

ছিলেন, সেই সময় তাঁহার পুরাতন বন্ধুদ্বয় হরপ্রসাদ সাহেব সীতারামী ও রায় বলদেব বক্স তাঁহাকে কাশী-নরেশের সহিত পরিচিত করেন। কাশী-নাথ তাঁহার কার্য্য দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কালীবাবুকে তাঁহার ধনাগার ও অস্ত্রাগারের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অতিশয় সত্যনিষ্ঠ, শ্রমশীল, ধর্ম্মপরায়ণ, বদান্য ও আশ্রিত বৎসল ছিলে।

কালীচরণ তর্কালঙ্কার — ১২২৬ বঙ্গাব্দে (খ্রীঃ অঃ ১৮১৯) বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামনিধি তর্কসিদ্ধান্ত। তিনি বিক্রমপুরেই ব্যাকরণ, বাদার্থ ও স্মৃতির অধিকাংশ পাঠ করিয়া নবদ্বীপ গমন করেন ও তৎকালীন শ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের নিকট সাত বৎসর অধ্যয়নান্তে তর্কালঙ্কার উপাধি লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন ও একটি বৃহৎ চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। বিক্রম-পুরের বহু পণ্ডিত তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্রের সকলেই সুপণ্ডিত। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে (খ্রীঃ অঃ ১৮৯২) কালী-চরণ পরলোক গমন করেন। তিনি পরোপকারী, ধার্ম্মিক ও বিনয়ী ছিলেন।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — (রেভারেণ্ড, এম্‌-এ, বি-এল) ভারতীয় খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট নেতা। তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত ছিলেন। কালী-চরণের পিতা হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কার্য্যোপলক্ষে জব্বলপুরে থাকিতেন। সেইস্থানে ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তিনি শিক্ষানুরাগী ও প্রতিভা-বান ছাত্র বলিয়া সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। বিশেষ কৃতিত্বের সহিত এবং অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম্‌-এ পরীক্ষায়, দর্শনশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তৎপরে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাই কোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তদ্ভিন্ন তিনি কিছুকাল জেনারেল এসেম্ব্লী (General Assemely—বর্ত্তমান Scottish Church College) এবং অধুনালুপ্ত ফ্রি চার্চ্চ ইনষ্টি-টিউসনে (Free Church Institution) অধ্যাপকের কাজও করেন। ষোড়শ বর্ষ বয়সে কালীচরণ খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে বহু উচ্চ শিক্ষিত ইয়োরোপীয় ভদ্রলোক এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদিগের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া কালীচরণ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। অনেক ইংলণ্ড প্রত্যাগত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি

অপেক্ষা তিনি উৎকৃষ্টতররূপে ইংরেজিতে বাক্যালাপ করিতে পারিতেন। ধর্ম্মপ্রাণ ও আদর্শ চরিত্র ব্যক্তিরূপে কালীচরণ সর্ব্বসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সাধুতা ও বিনয়াত্মক আচরণের জন্য তিনি ইয়োরোপীয়গণ কর্ত্তৃক 'ধার্ম্মিক খ্রীষ্টান' এই আখ্যা পাইয়াছিলেন। স্বয়ং সুরাপানের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং সুরাপানের বিরুদ্ধে নানারূপ আন্দোলন করেন। 'সুরাপান নিবারণী সভা' স্থাপন করিয়া এবং অন্যান্য অনেক উপায়ে বাঙ্গালীর নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি অশেষ চেষ্টা করেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই বহু ইয়োরোপীয়দের সংশ্রবে আসিয়াও তিনি কখনও জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি কিছুকাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি নির্ভীকভাবে সরকারী দোষ ত্রুটীর তীব্র সমালোচনা করিতেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (Fellow) রূপে শিক্ষার উন্নতি বিষয়ক অনেক বিষয়ে পরিশ্রম করেন। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিতও তাঁহার যোগ ছিল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (Indian Association) স্থাপনকর্ত্তাদের তিনি অন্যতম ছিলেন। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর বাগ্মীও ছিলেন। রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্মবিষয়ক নানা বিষয়ে তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা জনসাধারণকে মুগ্ধ করিত। কিছুকাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার (Registrar) ছিলেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ঐ পদ প্রাপ্ত হন। শেষ জীবনে তিনি পারিবারিক ও শারীরিক ক্লেশ ভোগ করেন। ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) অধিবেশনে যোগদান করিবার সময়ে মূর্চ্ছাক্রান্ত হন এবং তাহার পর কিছুকাল গুরুতর পীড়িত থাকিয়া ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পরলোক গমন করেন।

কালীচরণ লাহিড়ী—নদীয়া কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ লাহিড়ী বংশীয় মহাপ্রাণ রামতনু লাহিড়ীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি কৃষ্ণনগরে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। অমায়িক ব্যবহার ও অসাধারণ পরোপকারিতার জন্য তিনি কৃষ্ণনগরে সর্ব্বজনমান্য ছিলেন। কথিত হয় রোগীর ঔষধ পথ্যাদি ক্রয় করিবার সামর্থ্য না থাকলে, তিনি নিজ ব্যয়ে সমস্তই প্রদান করিতেন। এই লাহিড়ী বংশে আরও অনেক পদস্থ ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছে। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কালীনাথ ঘোষ—চন্দননগর নিবাসী একজন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-প্রচারক ও বহু

ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত ও কবিতা রচয়িতা। 'আত্ম-দান' নামক একখানি নাটক, 'নাম সুধা' ও 'অনুষ্ঠান সঙ্গীত' তাঁহার রচনা।

কালীনাথ চূড়ামণি—প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তৎকালীন বঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রস্থল নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের বিশিষ্ট অধ্যাপনা প্রবর্ত্তন করেন। রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়ের সময় হইতে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকগণ এই অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছেন। ন্যায় শাস্ত্র সম্বন্ধে মৌলিক রচনা ভিন্ন সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ব্যতীত কেহই এই পদের উপযুক্ত বিবেচিত হইতেন না। নবদ্বীপে নব্য ন্যায় অধ্যাপনার প্রবর্ত্তক শিরোমণি মহাশয়ের সময় হইতে ১৮৫৪ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত প্রায় একাদশজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক এই অধ্যাপনা কার্য্য পরিচালনা করেন। কালীনাথ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার আবির্ভাবকাল আনুমাণিক ১৮২০ খ্রীঃ অঃ। বর্ষানুক্রমে এই একাদশজন নৈয়ায়িকের নাম—

(১) হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত (আনুমানিক ১৭৩০ খ্রীঃ অঃ) (২) রাম নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন (আনুমানিক ১৭৬০ খ্রীঃ অঃ) (৩) বুনো রামনাথ (আনুমানিক ১৭৭০ খ্রীঃ অঃ) (৪) কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ (আনুমানিক ১৭৮০ খ্রীঃ অঃ) (৫) শঙ্কর তর্কবাগীশ (আনুমানিক ১৮০০ খ্রীঃ অঃ) (৬) শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি (১৮১০ খ্রীঃ অঃ) (৭) কালীনাথ চূড়ামণি (আনুমাণিক ১৮২০ খ্রীঃ অঃ) (৮) দণ্ডী (আনুমানিক ১৮৩০ খ্রীঃ অঃ) (৯) শ্রীরাম শিরোমণি ('পদার্থতত্ত্ব' লেখক) (১০) মাধব তর্কসিদ্ধান্ত (আনুমানিক ১৮৫০ খ্রীঃ অঃ) (১১) হরমোহন চূড়ামণি (মাধবের সমসাময়িক)

কালীনাথ তর্করত্ন—তিনি শাকদ্বীপি দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি-আই-ই প্রভৃতি তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

কালীনাথ দাস শীল—প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ঢাকা নগরে সীতার বনবাস যাত্রার পালা রচনা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁহার কোন কোন সঙ্গীত পূর্ব্ববঙ্গে অতিশয় প্রচলিত। তিনি সাধারণতঃ কালীবাবু নামেই পরিচিত ছিলেন।

কালীনাথ রায় চৌধুরী — চব্বিশ পরগণায় অন্তর্গত টাকীর বিখ্যাত জমিদার রায় চৌধুরীগণের এক শাখা মুন্সী বংশে ১৮০১ খ্রীঃ অব্দে কালীনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার

নাম শ্রীনাথ রায় চৌধুরী, তাঁহার পিতার সম্পত্তি ভিন্ন পিতৃব্য গোপীনাথ ও তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি উইল করিয়া কালীনাথকে দান করিয়া যান। এই উইল অনুযায়ী সম্পত্তি ঘটিত সকল ব্যাপারে দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহাকে পরামর্শ দানে সহায়তা করিতেন।

কালীনাথ অতিশয় দানশীল ছিলেন। তিনি টাকীতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও লক্ষ টাকা ব্যয়ে টাকী হইতে সৈয়দপুর পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত রাজপথ নিৰ্ম্মাণ করান। গ্রামের মধ্যেও তিনি কয়েকটী রাস্তা, বরাহনগরে একটী পুষ্করিণী ও এক অতিথিশালা প্রস্তুত করান তিনি সুগায়ক ছিলেন ও বিদ্যাসুন্দর পালা গান রচনা করেন। রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কারমূলক কৰ্ম্মসমূহের ও তিনি সহায়ক ছিলেন।

১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে পর কালীনাথ রায় চৌধুরী পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুই কন্যা — ভুবন মোহিনী ও বিন্ধ্যবাসিনী এবং চারি সহোদর — বৈকণ্ঠনাথ, মথুরনাথ, হরিনাথ ও কৃষ্ণ নাথ, স্ত্রী ও কন্যাদ্বয়ের ব্যবস্থা করিয়া, মৃত্যুকালে কালীনাথ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া সহোদরগণকে অর্পণ করেন।

কালীনারায়ণ গুপ্ত—ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী আকানগর গ্রামে ১৮·০ খ্রীঃ অব্দে কালীনারায়ণের জন্ম হয়। তিনি সুধারাম সেন ও যশোদা দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র। মহেশ্বরদি পরগণার ভাটপাড়া গ্রামের প্রসিদ্ধ গুপ্ত বংশের মহীন্দ্রনারায়ণ গুপ্তের বিধবা পত্নী ভাগীরথী দেবী কালীনারায়ণকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই কালীনারায়ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করেন। মাতামহ ব্রজকিশোর দাসের নিকট বাঙ্গলা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কিছুকাল রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্যের টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন ও পরে ফারশী ও উর্দ্দু পাঠ শেষ করিয়া ময়মনসিংহ গমন করেন ও সেখানে খুল্লতাত হরিশ্চন্দ্র রায়ের গৃহে অবস্থান করিয়া ময়মনসিংহ ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হন; কিন্তু অভিভাবকগণের মতের পরিবর্ত্তনে ও বৈষয়িক ব্যাপারে বাধ্য হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষা বন্ধ করিতে হয়। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পাঁচদোনা গ্রামের মাধবরাম সেনের কন্যা অন্নদা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বালক কালীনারায়ণ স্বামীর দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বালিকা পত্নীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন; অন্নদাও পতিশিক্ষাগুণে ধীরে ধীরে সহধৰ্ম্মিণী নামের যোগ্যা হন। বিবাহের কিছুকাল পরে কালীনারায়ণ ময়মনসিংহ জেলার উখরাশাল গ্রামের জগদানন্দ ভট্টাচার্য্যের নিকট শক্তিমন্ত্রে

দীক্ষা গ্রহণ করেন ও নিষ্ঠার সহিত শক্তি সাধনা আরম্ভ করেন, কিন্তু অনতিকাল পরেই ব্রহ্ম-সভা ও ব্রাহ্ম-সাধকগণের সংস্পর্শে আসিয়া, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই সময় ঢাকা নগরে ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের গৃহে ব্রহ্ম-বিদ্যালয় ও সঙ্গত সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কালীনারায়ণের তিন পুত্র—কৃষ্ণগোবিন্দ, প্যারীমোহন ও গঙ্গাগোবিন্দ এই সঙ্গতসভার ছাত্রাবাসে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। সঙ্গত সভার প্রবীণ ব্রাহ্মগণের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তরুণ সদস্যগণ এই সময় জালালউদ্দীন নামক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি গভীর অনুরাগী এক মুসলমান যুবককে সভায় গ্রহণ করেন ও প্রসন্ন কুমার সেন নামক এক সদস্যের বিবাহের প্রীতিভোজ উপলক্ষে উক্ত মুসলমান যুবকের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করেন। এই উদার সৎসাহসী যুবকগণের মধ্যে কালীনারায়ণের পুত্রত্রয়ও ছিলেন। তাঁহাদের এই উদারতা ও সৎসাহসের জন্য কালীনারায়ণ সপরিবারে অশেষরূপে লাঞ্ছিত হন, এমন কি তাঁহার স্বীয় জমিদারীর মধ্যে তাঁহার আত্মীয়গণ, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি তাঁহাকে সামাজিক-ভাবে বর্জ্জন করেন। অতঃপর গুপ্ত মহাশয় প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন ও ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে ঢাকার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম-মন্দিরে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের নিকট দুই পুত্র ও দুই ভৃত্যের সহিত একত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। সেই সময় হইতে কালীনারায়ণ অনন্যচিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন। তিনি স্বীয় জমিদারীর মধ্যে কাওরাইদ গ্রামে এক ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও পল্লীবাসীদের মধ্যে ব্রহ্মসাধন ও ও ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন।

গুপ্ত মহাশয় প্রেমিক সাধক ও একনিষ্ঠ ধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। তাঁহার গভীর ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত সমূহ 'ভাব সঙ্গীত' নামে ও তাঁহার সাধনা লব্ধ তত্ত্ব সমূহ 'ভাব কথায়' প্রকাশ করেন।

১৯০৩ খ্রীঃ অব্দে কালীনারায়ণ ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার ষোড়শ সন্তানের মধ্যে ছয়টী শিশুকালেই প্রাণত্যাগ করে। কৃষ্ণগোবিন্দ, প্যারীমোহন, গঙ্গা-গোবিন্দ, বিনয়চন্দ্র প্রভৃতি পুত্রগণ ও হেমন্তশশী, সৌদামিনী, চপলা, সরলা, বিমল,, সুবালা কন্যাগণ কর্ত্তৃক তাঁহার পরিবার বিস্তৃতি লাভ করে। এই কৃষ্ণগোবিন্দই সুপ্রসিদ্ধ স্যার কে, জি, গুপ্ত আই-সি-এস্। তাঁহার অন্য এক পুত্র প্যারিমোহনও বিলাতে শিক্ষা লাভ করেন।

কালীনারায়ণ রায় (রাজা)—ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল পরগণার

বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী। তাঁহার পিতার নাম গোলোক নারায়ণ রায়। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি জমিদারী পরিচালনা কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী এবং নানা সদ্‌গুণ সম্পন্ন জমিদার ছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

কালীপদ বসু—(১)লব্ধপ্রতিষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও অধ্যাপক। যশোহরজিলার ঝিনাইদহ পরগণায় তাঁহার নিবাস ছিল। তাঁহার পিতার নাম মহিমাপ্রসাদ বসু। মহিমা প্রসাদ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না। তজ্জন্য কালিপদকে বাল্যকাল হইতেই দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিদ্যা-শিক্ষা করিতে হয়। মধ্য-ইংরেজি বিদ্যালয় হইতে এম্‌-এ পর্য্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায়ই তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি প্রথমে কলিকাতাস্থ রিপণ কলে-জিয়েট স্কুলে কর্ম্মগ্রহণ করেন। পরে সরকারী চাকুরী পাইয়া রাভেন্সা কলেজ (কটক), প্রেসিডেন্সী কলেজ (কলি-কাতা), ঢাকা কলেজ প্রভৃতি স্থানে সুখ্যাতির সহিত অধ্যাপনা করেন।

তিনি ছাত্রদের ব্যবহারোপযোগী কয়েকখানি গণিতগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার সমুদয় পুস্তকই বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল।

তিনি চাকুরী উপলক্ষে বিদেশে থাকিলেও স্বগ্রামের উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই উন্মুখ থাকিতেন। তিনি সংস্কারপন্থী ও দেশহিতৈষী ছিলেন। নানাপ্রকার বিরোধ বিদ্রূপের মধ্যেও তিনি, যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহা করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের সহায়তায় তাঁহার তেজস্বিতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সকলের অনুকরণীয় ছিল। ১৩২১ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে (নভেম্বর ১৯১৪) তিনি পরলোক গমন করেন।

কালীপদ বসু — (২) ইনি মীরাট প্রবাসী একজন বাঙ্গালী ব্যবহার-জীবী ও স্থানীয় বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের নেতৃ স্থানায় ছিলেন। কালীপদ বাবু তত্রত্য সকল জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য সম্পাদকতায় মীরাটের সাধারণ গ্রন্থাগার 'লয়াল লাইব্রেরী' যুক্ত প্রদে-শের গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ— খ্যাত-নামা বাঙ্গালী সাংবাদিক। ১২৬৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতা নগরীতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কুলীন ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত ছিলেন। ভবানীপুর চড়ক-ডাঙ্গা বঙ্গবিদ্যালয়ে তাঁহার বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। তৎপরে ঐ অঞ্চলের

মিশন স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাল্যকাল হইতেই প্রতিভাবান ছাত্ররূপে খ্যাতি লাভ করেন। বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন করিবার সময়েই তিনি পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' নামক পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় এবিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দান ও সাহায্য করিতেন। 'সোমপ্রকাশে' কালীপ্রসন্নের সরস বঙ্গ রচনাও প্রকাশিত হইত।

প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া কালীপ্রসন্ন কিছুকাল কলেজে অধ্যয়ন করেন। পরে উহা উহা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন এবং শিক্ষা সমাপনান্তে গুরুকর্তৃক 'কাব্যবিশারদ' উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার কার্য্যশক্তিতে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন বলিয়া, বিদ্যাভূষণ মহাশয় সময়ে সময়ে সোমপ্রকাশের সম্পাদকীয় অনেক কাজ তাঁহাকে করিতে দিতেন। এইভাবে যৌবনকাল হইতেই সংবাদপত্র পরিচালনায় তাঁহার অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটে। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি একাধিক দেশপ্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রের সম্পাদনার ভার প্রাপ্ত হন। কিছুকাল এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত, পণ্ডিত অযোধ্যানাথের প্রসিদ্ধ 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন' (Indian Union) নামক পত্রিকা সম্পাদন করেন। পণ্ডিত অযোধ্যানাথের মৃত্যুর পর তিনি উহার কাজ পরিত্যাগ করেন। তৎপরে কিছুকাল প্রসিদ্ধ 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (Hindu Patriot) নামক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুকাল কাজ করিবার পর, ঐ পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষের পরিচালন-নীতির সহিত মতভেদ হওয়ায় উহা পরিত্যাগ করেন। অতঃপর কিছুকাল 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র সহঃ সম্পাদক এবং তৎপরে কিছুকাল 'বঙ্গনিবাসী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দে তিনি কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় 'হিতবাদী' পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করিয়া, নিজে সম্পাদক হইয়া উহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন (বৈশাখ ১৩০১)। এই হিতবাদীর সম্পাদকরূপেই তিনি পরবর্ত্তী জীবনে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁহার সম্পাদন কৃতিত্বে হিতবাদী জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সকলের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

কলিকাতার একজন খ্যাতনামা অধ্যাপকের পারিবারিক বিষয়ে একটি কবিতা প্রকাশের জন্য সম্পাদকরূপে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের নামে মান হানির মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়।

তিনি লেখকের নাম প্রকাশ করিতে অসম্মত হন এবং ঐ কবিতা প্রকাশের সমুদয় দায়ীত্ব নিজের স্কন্ধে লইয়া কারাদণ্ড বরণ করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরকজয়ন্তী উপলক্ষে দণ্ডভোগের কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি মুক্তি লাভ করেন। কারামুক্ত হইয়া তিনি হিতবাদীতে ধারাবাহিক ভাবে নিজ কারাজীবনের অভিজ্ঞতা ও এদেশের কারাগারের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার যে বর্ণনা প্রকাশ করিতে থাকেন, তৎফলে দেশে আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং কারা-ব্যবস্থার অনেক সংস্কার সাধিত হয়।

হিতবাদীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবার সময়ে তিনি 'হিতবার্ত্তা' নামে একটি হিন্দি পত্রিকা এবং হিতবাদীর একটি দৈনিক সংস্করণও প্রকাশ করেন। তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তির পর ঐ পত্রিকাদ্বয় বন্ধ হইয়া যায়।

বাল্যকালে মিশন স্কুলে পড়িবার সময়ে তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের শিক্ষা প্রভাবে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উদ্যত হন। পরে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয়। পরবর্ত্তী জীবনে উহারই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ যেরূপ স্থানে স্থানে হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইতেন, তিনি উহার প্রতিবাদ স্বরূপ খ্রীষ্টধর্ম্মের দোষ নানাবিধ প্রদর্শনপূর্ব্বক স্থানে স্থানে বক্তৃতা প্রদান এবং পুস্তিকাদি প্রকাশ করিয়া বিতরণ করিতে থাকেন। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে 'এন্টি ক্রিশ্চান (Anti-Christian) নামক এক ইংরেজি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিরোধী ইংরেজ মহলেও ঐ পত্রিকার বিশেষ প্রচার ছিল। দুই বছর পরে উহা বন্ধ হইয়া যায়। কতিপয় বর্ষ পরে তিনি 'কসমোপলিটান' (Cosmopolitan) নামক আর একখানি ইংরাজি মাসিক প্রচার করেন; উহাতেও কিছু কিছু খ্রীষ্টধর্ম্ম বিরোধী বিষয় প্রকাশিত হইত। দুই বৎসর চলিবার পর উহাও বন্ধ হইয়া যায়। এই সকল কাজের সুবিধার জন্য তিনি সিকিউলার প্রেস (Secular Press) নামক একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন।

বাল্যকাল হইতে রসরচনা, কবিতা প্রভৃতিতে কাব্যবিশারদের আগ্রহ ছিল। ছাত্রাবস্থায় ভবানীপুরস্থ ষ্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েসন (Students' Association) নামক সভার মুখপত্রে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেন। মাত্র সতর বৎসর বয়সে তিনি 'লুক্রেশিয়া' নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী এজন্য তাঁহাকে অর্থ সাহায্যও করেন। রস-রচনায় সিদ্ধহস্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'পঞ্চানন্দ' নামক পত্রিকায়, তিনি 'শ্রীফকিরচাঁদ

বাবাজী' এই ছদ্ম নামে 'বঙ্গীয় সমালোচক' নামক একটি ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশ করেন। ঐ কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিকদিগকে অতি তীব্র আক্রমণ করেন। লর্ড লিটনের শাসনকালে (১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে) মুদ্রাযন্ত্র আইনের ফলে সোমপ্রকাশের প্রকাশ বন্ধ হয়। ঐ পত্রিকার শেষ সংখ্যায় 'বিনাদোষে রাজরোষ' নামক একটি কবিতা প্রকাশ হয়। 'সভ্যতা সোপান' নামে এক প্রহসনে তিনি ইয়োরোপীয় হস্তে ভারতীয়দের নিগ্রহের এক চিত্র অঙ্কন করেন। উহা রচনার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করার প্রস্তাব হইয়াছিল। 'নির্দ্দোষের অপরাধ' নামক আর একটি কবিতাও 'সোম প্রকাশে' প্রকাশ করেন। উহাতেও তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। 'সোম প্রকাশ' বন্ধ হইয়া যাইবার কিছুকাল পরে তিনি ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান শিক্ষামন্দিরে (Indian Association for the Cultivation of Science) বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া, মহারাণী স্বর্ণময়ীর অর্থানুকূল্যে কিছুকাল 'প্রকৃতি' নামে একখানি বিজ্ঞান-পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহা পরে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কল্পলতা' নামক পত্রিকার সহিত মিলিত হইয়া যায়। তিনি কিছুকাল 'আর্য্য ঐন্দ্রজালিক সমিতি' নামক এক সভা স্থাপন করিয়া নানাস্থানে পাশ্চাত্য প্রণালীর ইন্দ্রজাল ক্রীড়া প্রদর্শন করেন। ঐ সূত্রে সম্মোহন বিদ্যাতেও (Mesmerism) তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা লাভ ঘটে।

১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে আদালত অবমাননার অভিযোগে সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড হইলে, তিনি বিচারপতি নরিশের প্রতি তীব্র আক্রমণ করিয়া 'ধর্ম্মাবতারের কেচ্ছা' নামে একখানি প্রহসন রচনা করেন। উহা সাধারণে প্রচারিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও কবিতার ব্যঙ্গ সমালোচনা করিয়া 'মিঠেকড়া' নামে তিনি একখানি ক্ষুদ্র কবিতার বই প্রকাশ করেন।

হিতবাদী সম্পাদনাকালে তিনি বিদ্যাপতির পদাবলীর এক সটীক সংস্করণ সঙ্কলন করেন। উহা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। কবিবর হেমচন্দ্রের যখন অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়, তখন হেমচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থ হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশ করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ কবিকে প্রদান করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই আন্দোলনের ফলে রাজসরকার হইতে হেমচন্দ্র মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

হিতবাদীর সম্পাদনে গুরুতর পরিশ্রম নিবন্ধন স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে তিনি

স্বাস্থ্য লাভার্থ জাপান যাত্রা করেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ১৩১৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ — প্রথিতযশাঃ সাহিত্যিক ও সমালোচক। ১২৫০ বঙ্গাব্দে ঢাকা জিলান্তর্গত ভরাকর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম শিবনাথ ঘোষ। তিনি বাল্যকালে মক্তবে ফার্সী ও টোলে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করিয়া বরিশালে ইংরেজি স্কুলে ভর্ত্তি হন। পরে ঢাকায় পড়িবার সময়ে তিনি একজন পণ্ডিতের সঙ্গ লাভ করেন। তৎফলে বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভের পথ পরিত্যাগ করিয়া তিনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং প্রথম কয়েক বৎসর অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে ইংরেজি সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করেন। ঐ সময়ে তিনি ইংরেজিতে বক্তৃতা দিবারও অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করেন। পরে একজন ইংরেজ ধর্ম্মযাজকের উপদেশে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনায় মনোনিবেশ করেন এবং স্বাভাবিক প্রতিভা বশতঃ অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যেও পাণ্ডিত্য লাভ করেন। কিছুকাল পরে তিনি ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আদালতে একটি কর্ম্মগ্রহণ করেন। কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিয়াও তিনি নানা সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিতেন। সেই সকল বক্তৃতা বাঙ্গালা ভাষায়ই হইত। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া সর্ব্বসাধারণ বিস্মিত হইত। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—বাঙ্গালা ভাষার এত শক্তি আছে, তাহা ভাবিতেও পারি নাই। এই অসাধারণ বাগ্মীতা তাঁহার বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্তও অক্ষুণ্ণ ছিল।

দশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া মনস্বী কালীপ্রসন্ন ঢাকার প্রসিদ্ধ ভাওয়াল জমিদারের কর্ম্মসচিবের পদ লাভ করেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা তাঁহাকে ঐ পদে আহ্বান করে। তিনি প্রার্থী হইয়া ঐ পদ লাভ করেন নাই।

কালীপ্রসন্নের সাহিত্যিক জীবনের এক শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি 'বান্ধব' পত্রিকা সম্পাদন। ১২৮১ বঙ্গাব্দে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' তাহার পূর্ব্ববৎসর প্রকাশিত হয়। এই দুই সাহিত্য দিক্‌পালের দুই পত্রিকা বঙ্গসাহিত্যগগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে শোভা পাইতে লাগিল। চুঁচূড়ার অক্ষয় চন্দ্রের 'সাধারণী'ও তখন আপনার স্বাতন্ত্র্য গৌরব লইয়া আসরে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তখনকার সেই প্রতিযোগীতার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে এই তিন দিক্‌পাল অপ্রীতিকে ত্রিসীমায় আসিতে দেন

নাই। বান্ধবের উপাদেয়তা ও লোক সমাজে উহার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া, বঙ্কিম পরম পরিতোষ লাভ করিতেন এবং তাঁহাদের সাহিত্য সেবার নিষ্ঠা ও একাগ্রতার ভিতর দিয়া, তাঁহাদের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল।

বঙ্গদর্শন হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সময়ে বড় আশার সহিত বঙ্কিম বলিয়াছিলেন, 'বঙ্গদর্শন' যাহা করিতে পারে নাই, 'বান্ধব' তাহা করিবে।' কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্কিমের আশা অপূর্ণ রাখিয়া বান্ধবও অল্পকাল পরেই বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে কালীপ্রসন্ন বিশেষ শোকাকুল হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে আবার নূতন বেশে তিনি বান্ধবকে বঙ্গসাহিত্য উদ্যানে উপস্থিত করেন। কিন্তু নবপর্য্যায়ের বান্ধবও বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।

কালীপ্রসন্ন কয়েকখানি গদ্য গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁহার ভাষা অপেক্ষাকৃত সংস্কৃতবহুল বলিয়া, অনেকের নিকট অনাদৃত। কিন্তু বঙ্কিম ও রবীন্দ্র নাথের ন্যায় তাঁহারও একটি নিজস্ব রচনাভঙ্গী ছিল। তাঁহার ভাষা এবং ভাবও সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব। উহা স্বাতন্ত্র্য গৌরবে গরীয়ান্। তাঁহার রচনা উচ্চ শ্রেণীর গদ্য কাব্যের উদাহরণ। কালীপ্রসন্নের 'নারী-জাতি-বিষয়ক-প্রস্তাব', 'প্রভাতচিন্তা', 'নিশীথ চিন্তা', 'নিভৃত চিন্তা', 'প্রমোদলহরী', 'ভক্তির জয়', 'ভ্রান্তিবিনোদ', 'ছায়া দর্শন', 'মা না মহাশক্তি' প্রভৃতি পুস্তকগুলি বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারে উজ্জ্বল রত্ন। ঐ সকল পুস্তকাবলীর অন্তর্গত অভিমান, নীরব কবি, অমৃত, লোকারণ্য, প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি যিনিই পড়িয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ শ্রেণীর রচনা বঙ্গসাহিত্যে একান্তই দুর্লভ। বলাবাহুল্য যে ঐ শ্রেণীর উচ্চ ভাবাত্মক রচনা দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই।

সামাজিক জীবনে কালীপ্রসন্ন বন্ধুবৎসল ও সদালাপী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধুবর্গের মধ্যে অমৃত লাল বসু, দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। ধনীর সহিত তাঁহাকে মিশিতে হইত বলিয়া, দরিদ্রের প্রতি কোনও অবজ্ঞার ভাব তাঁহার কোনও দিন ছিল না।

পরিণত বয়সে ১৩১৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে এই মনস্বী পরলোক গমন করেন।

কালীপ্রসন্ন দত্ত—তিনি ১২৬৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত চাঁওচা গ্রামে সম্ভ্রান্ত দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ চণ্ডীপ্রসাদ দত্তের চারি পুত্র ও পাঁচ কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের ঔরসে ও ইন্দুমতীর গর্ভে কালীপ্রসন্নের জন্ম হয়। কালীপ্রসন্নের তের বৎসর

বয়সের সময় একই দিনে মাতৃ পিতৃ বিয়োগ ঘটে। পনর বৎসর বয়সের সময় তিনি বরিশাল গভর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি কলিকাতায় যাইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ, এ পড়িতে আরম্ভ করেন। যখন তিনি বি, এ পড়িতেছিলেন, তখন আমেরিকায় যাইয়া পাঠাভ্যাস করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। পরিবারের সমস্ত লোকেরই বিশেষ অমত হওয়াতে তাহা সম্ভব হয় নাই। কিছুকাল তিনি 'ভারত সুহৃদ' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। তিনি সাত আট বৎসর ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকেন এবং সেই সময় 'ভারত বণিক' নামক সংবাদ পত্র বাহির করেন। ইহার পর 'দলিত কুসুম' পুস্তক প্রকাশ করেন। ১২৯৩ সনে তিনি বিজনি ষ্টেটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ গ্রহণ করেন এবং পনর বৎসর কাল সেই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে গভর্ণমেণ্ট ও বিজনি ষ্টেটের মধ্যে গারো পর্ব্বতের সীমানা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া তিনি যে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন, উহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ১৩০৮ সনের ৮ই অগ্রহায়ণ তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ প্রবল ছিল। তিনি বুয়র যুদ্ধের ইতিহাস লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় — (১) খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। তিনি কিছুকাল বহরমপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার "বাঙ্গালার নবাবী আমলের ইতিহাস" একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থে কালীপ্রসন্নের অনুসন্ধিৎসা ও সত্যসংগ্রহের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় — (২) প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতে তাঁহার সঙ্গীতশাস্ত্রে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। পরবর্ত্তী জীবনে তাহার যে পরিণতি হয়, তাহা বাস্তবিকই অলৌকিক। লক্ষ্ণৌএর নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ কালীপ্রসন্নের সুরবাহার যন্ত্রের আলাপনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলেন যে হীরক খচিত কণ্ঠহার প্রদান করিলে তবে তাঁহার গুণের পুরস্কার দেওয়া হয়। বহু ইংরেজ সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ এমন কি একাধিক রাজপ্রতিনিধিও তাঁহার বাদ্যালাপ শ্রবণে মুগ্ধ হন। লর্ড রিপন তাহাকে স্বীয় প্রতিকৃতি পুরস্কার দেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে তদানীন্তন যুবরাজ

(পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) যখন এদেশে আগমন করেন তখন কালীপ্রসন্ন তাঁহার নিকটে সঙ্গীত ও যন্ত্রালাপ করিয়া যুবরাজের সন্তুষ্টি বিধান করেন। হঙ্গেরী দেশের জগদ্বিখ্যাত বেহালা বাদক রেমেণ্যি (Remenye) কালীপ্রসন্নের যন্ত্রালাপ শ্রবণে বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া বলেন যে পাশ্চাত্য কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি জগদ্বিখ্যাত হইতে পারিতেন।

তিনি দীর্ঘকাল কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার সঙ্গীতজ্ঞ জমিদার রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষকের কার্য্য করেন তাঁহার গুরু ক্ষেত্রনাথ গোস্বামী বিরচিত 'সঙ্গীত-সার' নামক পুস্তক খানি তিনি পরিবর্দ্ধিত ও উন্নততর ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অসাধারণ সঙ্গীত নৈপুণ্যের জন্য তিনি আমেরিকা, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ হইতেও উচ্চ প্রশংসাপত্র ও সুবর্ণপদকাদি প্রাপ্ত হন। 'শ্বাস তরঙ্গ' বাদ্য যন্ত্রেই তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি যোগাভ্যাস দ্বারা এমন শক্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, ঐ যন্ত্রটি কুক্ষিদেশের মধ্যে চাপিয়া বায়ু নিরোধ করিয়া সমুদয় সঙ্গীত তরঙ্গ উত্থিত করিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। গলার বাহিরে জোড়া শানাই ঠেকাইয়াও অদ্ভুত কৌশলে তিনি বাজাইতে পারিতেন। ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। ঐগুলি সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইয়াছিল। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে এই মনস্বীর পরলোক প্রাপ্তি হয়।

কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী সিউড়ীর নিকটবর্ত্তী মঙ্গলডিহি গ্রামে মাতামহের আলয়ে ১২৬২ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা ক্ষেত্রনাথ পুনরায় স্বীয় শ্যালিকাকে বিবাহ করেন। মাতৃহীন হইয়া আশৈশব মাতামহী কর্ত্তৃক তাঁহার পিত্রালয় সিউড়ীর নিকটস্থ আড্ডা গ্রামে প্রতিপালিত হন। সিউড়ী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, সেখানকার বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি সিউড়ীর জমীদার দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে "শব্দকল্প-দ্রুম" সঙ্কলনে সাহায্য করেন।

কালীপ্রসন্ন শক্তির উপাসক ছিলেন ও শক্তি, তন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে রামপ্রসাদী বাউল ইত্যাদি সুরে বিবিধ সঙ্গীত রচনা করেন। তিনি চিত্রাঙ্কনও করিতে পারিতেন। ১৩০২ বঙ্গাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—বিদ্যোৎসাহী জমীদার এবং মহাভারতের বাঙ্গালা

অনুবাদক। ইহাঁর প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ভাগে মুর্শিদাবাদ, পাটনা প্রভৃতি স্থানে ইংরেজ কোম্পানীর দেওয়ানী করিয়া প্রভূত অর্থসঞ্চয় করেন। কালীপ্রসন্নের পিতার নাম নন্দলাল সিংহ। তাঁহারা কলিকাতা যোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ কায়স্থবংশীয় জমীদার। ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা নগরে কালীপ্রসন্নের জন্ম হয়। অতি অল্প বয়সেই পিতৃহীন হওয়ায় দেশপ্রসিদ্ধ হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার অভিভাবক ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হন. হরচন্দ্রের সুব্যবস্থায় কালীপ্রসন্ন বাল্যকালে সুশিক্ষা লাভ করেন। ইংরেজি, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত, এই তিন ভাষায়ই তিনি পারদর্শী ছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই কালীপ্রসন্ন বিদ্যানুরাগী ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে ১৮৫৩ কি ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে, তিনি বিদ্যোৎসাহিনী নামে এক সভা স্থাপন করেন এবং নিজে কয়েক বৎসর উহার বাগ্মাধ্যক্ষ ছিলেন। ঐ সভার অধিবেশনাদিতে বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাদি পাঠ, নানা বিষয়ের আলোচনা, বক্তৃতা প্রভৃতি হইত। কখনও কখনও বিশিষ্ট ইংরেজ ভদ্রলোকদিগের দ্বারাও বক্তৃতা প্রদান করান হইত। বহু কৃতবিদ্য গণ্যমান্য ব্যক্তি ঐ বিদ্যোৎসাহিনী সভার সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে ঐ সভার অধিবেশনে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সম্বর্দ্ধনা করা হইত। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে ঐ সভার পক্ষ হইতে এক প্রকাশ্য সভায় কবি মধুসূদনকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। সেই সম্বর্দ্ধনা সভায়, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সেই সম্বর্দ্ধনা সভায় কবিকে অভিনন্দনসহ সুদৃশ্য রজতপাত্র প্রদান করা হয়। নীলদর্পণের অনুবাদক খ্যাতনামা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক রেভাঃ জেমস্ লঙ্ (Rev. James Long) সাহেব যখন এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যান, তখনও কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে তাহার সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করেন। পূর্ব্বোক্ত সভার পক্ষ হইতে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' প্রকাশ করেন। (অনুমান ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্য) ঐ পত্রিকাখানি সভার সদস্যগণকে বিনামূল্যে প্রদত্ত হইত। বহু মূল্যবান প্রবন্ধাদির দ্বারা ভূষিত হইয়া পত্রিকাখানি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের প্রশংসা ও আদর লাভ করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন তিনি কিছুকাল দেশপ্রসিদ্ধ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতিষ্ঠিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' পত্রিকারও সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। (১২৬৮ বঙ্গাব্দ)। 'পরিদর্শক' নামক একখানি দৈনিকপত্রও তিনি কিছুকাল পরিচালনা করেন।

পূর্ব্বোক্ত লঙ্ সাহেব যখন আদালতের বিচারে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন, তখন কালীপ্রসন্ন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ অর্থ প্রদান পূর্ব্বক লঙ্ সাহেবের মুক্তি বিধান করেন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন অনেকগুলি পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই কালীপ্রসন্নের স্বরচিত অথবা অনূদিত। কোনও কোনও পুস্তক কেবল সভার পক্ষ হইতে প্রকাশিত করা হইত। তৎ-রচিত প্রধান প্রধান পুস্তকের নাম —'বাবু' (নাটক); 'সাবিত্রী সত্যবান' (নাটক); 'মালতী মাধব' (নাটক-অনুবাদ); 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (ব্যঙ্গরচনা—দুই খণ্ড); 'বিধবোদ্বাহ' (নাটক); বিক্রমোর্ব্বশী (নাটক-অনুবাদ), 'বেণীসংহার' (নাটক-অনুবাদ)।

কালীপ্রসন্নের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ। ঐ অনুবাদকার্য্যের জন্য তৎকালীন বহু পণ্ডিত নিযুক্ত হন। সুদীর্ঘ আট বৎসরকাল ধরিয়া উহার কার্য্য চলিয়াছিল। তিনি অনুবাদের সৌকার্য্যের জন্য নানাস্থান হইতে বহুমূল্য প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেন। তাঁহার শুভানুধ্যায়ী বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করেন। (অষ্টাদশ পর্ব্ব অনুবাদের উপসংহারে তিনি এ বিষয়ে যাঁহাদের নিকট যে সব সাহায্য পাইয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে)। ঐ মহাগ্রন্থ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে উৎসৃষ্ট হয়।

অভিনয়াদি ললিতকলাতেও কালীপ্রসন্নের বিশেষ উৎসাহ ছিল। পূর্ব্বোক্ত বিদ্যোৎসাহিনী সভার সহিত তন্নামীয় একটি রঙ্গমঞ্চও প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৫৬ খ্রীঃ)। রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত বেণীসংহার নাটক তথায় প্রথম অভিনীত হয়। বহু গণ্যমান্য দেশীয় ও ইয়োরোপীয় ব্যক্তি ঐ অভিনয় দর্শন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন। তৎপরে তথায় কালীপ্রসন্নের নিজ অনূদিত বিক্রমোর্ব্বশী নাটক অভিনীত হয় (১৮৫৭)। ঐ অভিনয়েও বহু সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ও ইয়োরোপীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং উহারও বিশেষ প্রশংসা হয়। স্বয়ং অনুবাদক ঐ অভিনয়ে পুরূরবার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করেন। কালীপ্রসন্নের রচিত নাটক 'সাবিত্রী-সত্যবান'ও তথায় অভিনীত হইয়াছিল।

সামাজিক অনেক বিষয়ে কালীপ্রসন্ন সংস্কারপন্থী ছিলেন। দেশে বিধবা-বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে তিনি বিশেষ অর্থসাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন।

হিন্দুপেট্রিয়ট (Hindu Patriot) পত্রের সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর কালীপ্রসন্ন উক্ত পত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া উহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তদ্ভিন্ন হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি-ভাণ্ডারে বহুসহস্র মুদ্রা দান এবং তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের যথাযোগ্য ব্যবস্থাও করেন।

১৭৭০ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে মাত্র ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে এই মনীষী অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

কালীপ্রসাদ কুলভাস্কর, মুন্সী—যে সকল মহাত্মা এতদ্দেশে শিক্ষা-বিস্তারকল্পে দান করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, কালীপ্রসাদ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি যুক্তপ্রদেশবাসী হিন্দুস্থানী কায়স্থ। এলাহাবাদের 'কায়স্থ পাঠশালা' নামক কলেজ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার স্বোপার্জ্জিত পাঁচলক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তির সমস্তই দান করেন।

কালীপ্রসাদ পোদ্দার—এই সুবর্ণ বণিক কুলপ্রদীপ যশোহর নগরবাসী ছিলেন। তিনি অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। লোকে যাহাতে সহজে গঙ্গাস্নান করিতে পারে তদর্থে যশোহর হইতে চাকদহ পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

কালীময় ঘটক — ১২৪৭ বঙ্গাব্দের কোজাগর রাত্রিতে নদীয়া জিলার অন্তর্গত রাণাঘাট গ্রামে কালীময় ঘটক জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্ত। ইঁহারা বন্দ্যবংশীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। কালীময়ের পিতামহ তৎকালীন সম্মানজনক "ঘটক" উপাধি লাভ করেন।

কালীময় বাল্যকালে রাণাঘাটের এক পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। তাঁহাদের অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে জমিদারি সেরেস্তার কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও কার্য্য করিতে লাগিলেন কিন্তু পড়াশুনার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ বরাবরই ছিল। পুত্রের এইরূপ বিদ্যানুরাগ দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে রাণাঘাট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তথাকার পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি হুগলী নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হন। দেড় বৎসর মধ্যেই ১২৬৫ সালে অষ্টাদশ বৎসর বয়সে, তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। সূত্রধর, দরজী, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি শিল্পীদিগের কার্য্যে ইনি অভ্যস্ত ছিলেন।

কালীময় প্রথমে নদীয়া জিলার ভালুকা গ্রামের বাংলা বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। চারি

বৎসর পর বর্দ্ধমান জিলার বেলেড়া গ্রামের বাংলা বিদ্যালয়ের শিক্ষক হন। এই সময় তিনি যশোহর জিলার বারাকপুর গ্রামনিবাসী পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কলঙ্কার মহাশয়ের একমাত্র কন্যা কালীশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। বেলেড়া গ্রামে কিছুদিন কার্য্য করিয়া তিনি নিজ গ্রামের জমিদার পাল চৌধুরীদের সহায়তায় একটী বঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারই অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি ঐ সময় মজুর ও ব্যবসায়ীগণের শিক্ষার জন্য একটী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও বালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা স্কুল পরে রাণাঘাটের ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহিত মিলিত হইয়া যায়। ইনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি তিনি রচনা করেন। ১। চরিতাষ্টক ১ম ও ২য় ভাগ; ২। ছিন্নমস্তা (উপন্যাস); ৩। কৃষিশিক্ষা, ৪। কৃষিপ্রবেশ, ৫। সুরেন্দ্রজীবনী, ৬। পদ্যময়, ৭। মিত্রবিলাপ, ৮। মেলা। ইহাঁর তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ জ্ঞানানন্দ (মূক ও বধির), মধ্যম ধ্যানানন্দ ও কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে ৬০ বৎসর বয়সে কালীময় পরলোক গমন করেন।

কালীমোহন দাস—প্রসিদ্ধ ব্যবহার-জীবী ও দেশহিতৈষী নেতা। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দেশ প্রসিদ্ধ দুর্গামোহন দাস তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর। দেশবন্ধু চিত্ত-রঞ্জন দাস তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহারা বিক্রমপুর পরগণার তেলিরবাগ গ্রামের প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশ জাত। এই বংশে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। কালীমোহন প্রথম জীবনে অগ্রজ দুর্গামোহনের দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে পুনরায় প্রায়শ্চিত্তান্তে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করেন। তিনি পরোপকারী ও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। নিজ অর্জ্জিত সম্পত্তির অধি-কাংশ দেবসেবা ও জনহিতকর কার্য্যের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। (দুর্গা-মোহন দাস দেখ)।

কালীমোহন বসু—বাঙ্গালী সাংবা-দিক। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে তাঁহার জন্ম হয়। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি কিছুকাল 'ফরিদপুর হিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদন কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া, পত্রিকা পরিচালন বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। পরে ১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস হইতে কলিকাতা নগরে 'সম্মিলনী' নামে এক খানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। নিরপেক্ষ মত প্রচার, নানা বিচিত্র সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের জন্য 'সম্মিলনী'

খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। কালীমোহন বসু ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। অমায়িক ব্যবহার এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সহিত সহৃদয় ব্যবহারের জন্য তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। ১২৪১ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে অল্পদিনের ব্যবধানে, কালীমোহনবাবু, তাঁহার স্ত্রী এবং এক কন্যা পরলোক গমন করেন।

কালীশঙ্কর গুহ—তিনি ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল উপবিভাগের দৌলতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই পিতৃহীন হওয়ায় প্রথম জীবনে শিক্ষালাভ করিতে তাঁহাকে খুব কষ্ট করিতে হইয়াছিল। তিনি এক স্বর্ণকারের গৃহে দুইবেলা রন্ধন করিয়া আহারের সংস্থান করিয়াছিলেন। এই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ তিনি যখন উকীল হইয়া উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন, তখন মাসিক ছয়টাকা হিসাবে সেই স্বর্ণকারকে জীবিতকাল পর্য্যন্ত সাহায্য করিয়াছিলেন। কালাগুজ নামে এক সাহেব তাঁহার পড়ার সময়ে কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই উপকারের বিনিময়ে কালানুজের বিধবা পত্নীকে আজীবন মাসিক পঞ্চাশ টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ নগরীর শ্রেষ্ঠ উকীল ছিলেন। তাঁহার উপার্জ্জনও যথেষ্ট ছিল। বাল্যকালে পঠদ্দশায় যে কষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ রাখিয়া বহু দরিদ্র ছাত্রকে তিনি নিজ আলয়ে স্থান দিয়া লেখাপড়া শিক্ষার সহায়তা করিয়াছেন। ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকিল দাতা কালীকুমার দত্তের মৃত্যুর পর, তাঁহার স্থান দাতা কালীশঙ্কর গুহ অধিকার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মত দাতা, অতিথিবৎসল দীনবান্ধব লোক ময়মনসিংহ সহরে অতি অল্পই ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সহরের সকল প্রকার সদনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। বহু দরিদ্র লোক বিনা ব্যয়ে তাঁহার দ্বারা মোকর্দ্দমা পরিচালন করিয়াছে। তাঁহার সদাশয় পত্নী স্বামীরই অনুরূপ ছিলেন। যে সকল ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিল, তাহারা তাঁহার স্নেহের আশ্রয়ে পরম সুখে বাস করিত। এই সদাশয় দম্পতির সস্নেহ ব্যবহার যাহারা পাইয়াছে, তাহার জীবনে কখনও তাহা ভুলিতে পারিবে না। তাঁহার সদয় ও শিষ্টাচার ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করিত। এই মহাত্মা বিংশ শতাব্দার প্রথমভাগে পরলোকগত হইয়াছেন।

কালীশঙ্কর ঘোষাল, রাজা বাহাদুর — ইনি কাশীপ্রবাসী লব্ধ প্রতিষ্ঠ বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও শিক্ষানুরাগী জমিদার রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের পুত্র। সিন্ধু সমরে ইংরাজ সরকারকে প্রভূত সহায়তা করায় লর্ড এলেনবরা (Lord Ellenburough)

তাঁহাকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। তিনি অতিশয় দানশীল ছিলেন। তিনি কাশীতে এক অন্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করেন। রাজা কালীশঙ্কর কাশীতে শিক্ষাবিস্তার সমিতির প্রথম ও প্রধান বাঙ্গালী সদস্য ছিলেন। কাশীর সুপ্রসিদ্ধ কুইন্স কলেজের (Queen's College) সুরম্য অট্টালিকার নক্সা তিনিই রচনা করেন। তিনি পিতার ন্যায় অতি দানশীল ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। রাজা বাহাদুর কালীশঙ্করের সাত পুত্র — কাশীকান্ত, সত্যপ্রসাদ, সত্যকিঙ্কর, সত্যচরণ, সত্যশরণ, সত্যপ্রসন্ন ও সত্যভক্ত।

কালীশঙ্কর দাস — তিনি একজন ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক ও সাধক। ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে ভাদ্রমাসে ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল উপবিভাগের কড়াইল গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম রামনাথ দাস। তাঁহারা বৈদ্য বংশোদ্ভূত ছিলেন। বাল্যে চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন এবং পরে কিঞ্চিৎ চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ব্যবসায়ীরূপে জীবিকার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন। তিনি দীর্ঘকাল রঙ্গপুর জিলার একাধিক জমিদারগৃহের, বিশেষতঃ কাকিনার বিদ্যোৎসাহী জমিদার শম্ভুনাথ চৌধুরীর গৃহচিকিৎসক ছিলেন ঐ সময়ে সাধু ব্যবহার, সচ্চরিত্রতা, ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণের জন্য সর্ব্বত্র সম্মানিত হইতেন। কিছুকাল দেশীয় মতে চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া তিনি রঙ্গপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ডাঃ দয়াল সিংহের অধীনে থাকিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যাও অনেক আয়ত্ত করেন। ঐ সময়ের মধ্যেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের সংশ্রব লাভ করেন এবং ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হইয়া যান। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে দেশপ্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রবন্ধ রচনা দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত। কালীশঙ্কর দাস তাহার প্রতিবাদ করিয়া পুস্তিকা রচনা করেন। পুস্তকখানিতে তাঁহার স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আজীবন কেশবচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য এবং নববিধান ব্রাহ্মসম্প্রদারের অন্তর্ভূক্ত একজন নিষ্ঠাবান গৃহী সাধক ছিলেন। বহুকাল নানাস্থানে উৎসাহের সহিত ধর্ম্মপ্রচারও করিয়াছিলেন। ১৩০২ সালের ২১শে ফাল্গুন তিনি পরলোক গমন করেন।

কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ—ওয়ারেন হেষ্টিংস্ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত যে একাদশজন পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে হিন্দুদিগের সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্রসাগর মন্থন

করিয়া 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক ব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে এক মহাগ্রন্থ রচিত হয়, ইনি তাঁহাদিগের অন্যতম। অপর দশজনের নাম—বাণেশ্বর বিদ্যা-লঙ্কার, কৃষ্ণরাম তর্কসিদ্ধান্ত, রাম-গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, কৃষ্ণজীবন ন্যায়া লঙ্কার, বীরেশ্বর পঞ্চানন, কৃষ্ণচন্দ্র সার্ব্বভৌম, গৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, শ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত, কৃষ্ণকিশোর তর্কালঙ্কার ও সীতারাম ভাট। হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত আচার, ব্যবহার, অনুশাসন, সংস্কার অনুযায়ী উত্তরা-ধিকার প্রভৃতি বিষয়ে আইন প্রণয়ন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থ প্রথমে ফারশী ও পরে হ্যালহেড কর্ত্তৃক Code of Gentoo Laws নামে ইংরেজীতে অনূদিত হয়।

কালীশঙ্কর রায়—বঙ্গাধিপ আদি শূর কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাহাদের কায়স্থ অনুচরদিগের অন্যতম পুরুষোত্তম দত্ত হুগলী জেলার বালিগ্রামে বাস করেন ও সেখানকার দত্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার এক বংশধর বর্গীর অত্যাচারের ভয়ে বালি হইতে মুর্শিদা-বাদের অন্তর্গত চৌরা গ্রামে বসবাস করেন। এই বংশের মদনগোপাল দত্ত বহুকাল নবাব সরকারে কার্য্য ও পরে বাণিজ্য করিয়া বিপুল বিত্তের অধি কারী হন এবং বর্গীর ভয়ে যশোহর জেলার নড়াইলে আসিয়া বসতি করেন। মদন গোপালের দুই পুত্র রামদেব ও রামগোবিন্দ। রাম গোবিন্দের চারি পুত্র—রামানন্দ, রূপ রাম, রুদ্ররাম ও গদারাম দত্ত। মধ্যম রূপরামের তিন পুত্র—নন্দকিশোর, কালীশঙ্কর ও রামনিধি।

কালীশঙ্কর নাটোর রাজসরকারে দেওয়ানের কাজ করিতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় নাটোরাধিপের ভূষণা জমিদারী তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। বাকী খাজনার দায়ে ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে নাটোররাজের পরগণা সকল নীলামে উঠিলে, তিনি তাহার পাঁচটা খরিদ করেন ও পরে আরও ক্ষুদ্র কয়েকটা পরগণা তিনি ক্রয় করেন। ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে রাজস্ব অনাদায়ের অভিযোগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোকর্দ্দমা করিয়া কালী-শঙ্করকে কারারুদ্ধ করেন। চারি বৎসর পরে কালীশঙ্কর কিছু টাকা খাজনা বাবদ দিয়া মুক্তি লাভ করেন ও তদবধি নড়াইলে বাস করেন। ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে মুরশিদাবাদের নবাব বাবরজঙ্গ কালীশঙ্করকে রায় উপাধি দান করিলে, নড়াইলের দত্ত পরিবার রায়বংশ নামে খ্যাত হন। দুই সন্তানের মৃত্যু হইলে, কালীশঙ্কর কাশীতে গমন করেন এবং সেখানেও কয়েকখানি জমিদারী ক্রয় করেন। ১৮৩৪ খ্রীঃ

অব্দে রামনারায়ণ ও জয়নারায়ণ নামে দুই পুত্র রাখিয়া, কালীশঙ্কর ৯০ বৎসর বয়সে কাশীতেই পরলোক গমন করেন। এই রামনারায়ণ ও জয়নারায়ণ হইতেই নড়াইলের জমীদারবংশ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। কালীশঙ্কর বিবিধ গুণ ও অসাধারণ প্রতিভা বলে মৃত্যুকালে স্বোপার্জ্জিত বিপুল ভূসম্পত্তি রাখিয়া যান।

কালুয়া দেব—তিনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের (১৪৯৮-১৫৪২ খ্রীঃ) জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি মাত্র এক বৎসর পাঁচ মাস রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা কথারুদেব রাজা হন। প্রতাপরুদ্র দেখ।

কালু ভুঁঞা—মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী তাম্রলিপ্ত রাজ্যে ক্রমান্বয়ে যে তিনটী রাজবংশ রাজত্ব করেন, ইনি তাহাদের দ্বিতীয় কৈবর্ত্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি উড়িষ্যা হইতে আগমন করিয়া তাম্রলিপ্ত অধিকার করেন এবং উড়িষ্যা হইতে কতিপয় স্বজাতিকে তাম্রলিপ্তে আনাইয়া ভূসম্পত্তি দানে তথায় তাহাদিগকে বসতি স্থাপনে সহায়তা করেন। তাঁহার পর ভাঙ্গর ভুইঞা তাম্রলিপ্তের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৪০৩ খ্রীঃ অব্দে ভাঙ্গর ভুইঞার মৃত্যুর পর কৈবর্ত্তবংশের অবসান হয়। কৈবর্ত্ত রাজারা বঙ্গে এক সময়ে প্রবল ছিলেন।

কালু শাহ—তিনি মুলতানের অধিপতি ছিলেন। জয়শল্মীরের রাজা চাচিকদেব তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরলোকবাসী হন। চাচিকদেবের অন্যতম পুত্র কুম্ভ এই পিতৃহন্তা কালু শাহকে গোপনে হত্যা করিয়া তাঁহার ছিন্ন মস্তক ভ্রাতৃগণকে উপহার দিয়াছিলেন।

কাশিম আলী খাঁ, নবাব, মীর—সাধারণতঃ তিনি মীরকাশিম নামে খ্যাত। তিনি নবাব জাফর আলী খাঁর (মীর জাফরের) জামাতা ছিলেন। ইংরেজ সরকার তাঁহার ক্ষমতায় সন্তুষ্ট হইয়া, ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে বঙ্গদেশের নবাবী পদ প্রদান করেন। তিনি মুঙ্গেরে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার শ্বশুর মীর জাফর খাঁ অতি অকর্ম্মণ্য নবাব ছিলেন। পলাসী যুদ্ধের পর মীরজাফর রাজ্যলোভে ইংরেজ বণিককে বহু অর্থ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল রাজ্যলাভ করিয়া সিরাজের রাজকোষে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু রাজকোষ প্রায় শূন্য ছিল। সুতরাং প্রতিশ্রুত অর্থ তিনি ইংরেজ বণিককে দিতে সমর্থ হন নাই এবং স্বীয় সৈন্যগণের বেতনও বাকী পড়িয়া গেল। ইংরেজ অধ্যক্ষগণ মীর কাশিমের অর্থে বশীভূত হইয়া দেশের দুরবস্থার প্রতিকার ব্যপদেশে মীর কাশিমকে মসনদে বসাইয়া মীর জাফরকে সিংহাসন হইতে

অপসারিত করিলেন। এদিকে মীর কাশিম রাজস্বের সুবন্দোবস্ত করিয়া সৈন্যদের বাকী বেতন বহুল পরিমাণে পরিশোধ করেন। ইংরেজেরা তাঁহার ক্ষমতায় অযথা হস্তক্ষেপ করিলে, তিনি পূর্ব্ব হইতেই ইংরেজদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। ইতিমধ্যে বাদশাহ শাহ আলম পাটনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইরেজ গণ অগ্রসর হইয়া বাদশাহকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক আপনাদের শিবিরে আনয়ন করিয়াছিলেন। মীর কাশিম ইহা পছন্দ করেন নাই। পরে মীর কাশিমও বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বার্ষিক চব্বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে প্রতিশ্রুত হন। সম্রাট তাঁহাকে আলাজাহ নশীর-উল-মুলক এমতাজদ্দৌলা কাশিম আলী খাঁ নশরৎ জঙ্গ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। সম্রাট চলিয়া গেলে, তিনি ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়ের নিকট শুল্ক তলব করিলেন। ইংরেজগণ দিতে অস্বীকৃত হইলেন; সেই জন্য তিনি বাঙ্গলা বিহারের সমস্ত বণিকের বাণিজ্য শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। এই কারণে ও আরও দুই তিনটী কারণে ইংরেজের সহিত নবাবের মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। তিনি ইংরেজদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। অচিরে ইংরেজ ও নবাবের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট উদয়ানালার যুদ্ধে নবাব পরাস্ত হইয়া পাটনায় পলায়ন করিলেন। এদিকে ইংরেজরা পদচ্যুত নবাব মীর জাফর আলী খাঁকে পুনর্ব্বার বাঙ্গলার মসনদে স্থাপন করিলেন। নবাব মীর কাশিম আলী খাঁ ইহাতে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া পাটনাস্থিত দেড় শত ইংরেজ নরনারীকে হত্যা করিবার আদেশ প্রদান করেন। সমরু নামক একজন জার্ম্মাণ কর্ম্মচারীর আদেশে তাহারা সকলেই নিহত হন। ইংরেজেরা মুঙ্গের অধিকার করিয়াই পাটনা আক্রমণ করিলেন। রাজ্যচ্যুত মীর কাশিম অবশিষ্ট সঙ্গীগণসহ অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেইজন্য অযোধ্যার নবাবের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ সংঘটিত হইল। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের বক্সার নগরে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। তাহাতে অযোধ্যার নবাব পরাজিত হন। সেই যুদ্ধে দিল্লীর সম্রাট নবাবের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মীর কাশিম বক্সার যুদ্ধের পর পলায়ন করিয়া প্রথমে রোহিল খণ্ডে যাইয়া রোহিলাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রথমে কিছু সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু ছোট ছোট সর্দ্দারদের নিকট হইতে সামান্য কিছু সাহায্য ছাড়া বিশেষ কিছুই পাইলেন না। তিনি হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং আহমদ শাহ আবদালির নিকটও সাহায্যপ্রার্থী হইয়া বিফল মনোরথ

হন। অবশেষে শেষ চেষ্টা হিসাবে দিল্লীর সম্রাটের শরণাপন্ন হইলেন।

দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া তিনি বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু দরবারের স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদিগের চক্রান্তে তাঁহার মনোরথপূর্ণ হইল না। পরন্তু বাদশাহের অন্যতম মন্ত্রী মাজদ্-উদ্দৌল্লা, মীর কাশিমকে ইংরেজ হস্তে সমর্পণ করিয়া নিজের কিছু স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ইংরেজদের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে থাকেন। মীর কাশিমেরও চর ছিল। তিনি তাহাদের নিকট হইতে এসব বিষয়ে অনেক সংবাদই প্রাপ্ত হইতেন। মাজদ্-উদ্দৌল্লার নিকট হইতে পত্র পাইয়া কলিকাতাস্থ ইংরেজকর্ত্তৃপক্ষগণ মীর কাশিমকে বন্দী করিবার জন্য লেঃ কর্ণেল কামিংস সাহেবকে নির্দ্দেশ দিলেন। কামিংসও কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সকল ষড়যন্ত্র মীরকাশিমের কিছু কিছু গোচরে আসিয়াছিল। তিনি বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতাস্থ ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষদের সহানুভূতি উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তদুদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে কর্ণেল ষ্টিবার্ট নামক এক ইংরেজ সেনানীকে এবং তৎপরে, ১৭৭৬ খ্রীঃ অব্দে জুন মাসের প্রথম

ভাগে ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে এক একখানি পত্র লিখেন। সেই পত্রে তিনি, ইংরেজদের নিকট হইতে সুবিচার পাইবার আশা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত আশাই নিষ্ফল হয়। অযোধ্যার নবাব, দিল্লীর বাদশাহ প্রভৃতি সমধর্ম্মীদিগের নিকট তিনি অনেক কিছু আশা করিয়াছিলেন। কোথাও কিছু না পাইয়া শেষে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া মৃত্যুর পথ চাহিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে প্রায় এক বৎসরকাল, নানাবিধ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল উদরী রোগে কষ্ট পাইয়া ১৭৭৭ খ্রীঃ অব্দের ৭ই জুন দিল্লীর সন্নিকটস্থ পালোয়াল নামক স্থানে তিনি পরলোক গমন করেন।

কাশিম কাহি, মৌলানা—একজন সৈয়দ। তাঁহার প্রকৃত নাম নজম উদ্দিন। আবুল কাশিম নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ সাধক আবুল রহমান জামির শিষ্য ছিলেন। তিনি হিরাট নগর হইতে সম্রাট হুমায়ুনের নির্ব্বাসিত ভ্রাতা মির্জা কামরাণের সঙ্গে মক্কায় গমন করেন। ১৫৫৭ খ্রীঃ অব্দে মীরজা কামরাণের মৃত্যুর পর, তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আলী কুলী খাঁর ভ্রাতা বাহাদুর খাঁর সঙ্গে তিনি বহু কাল বারাণসী নগরীতে অবস্থান করেন। বাহাদুর খাঁর মৃত্যুর

পরে তিনি আগ্রায় গমন করেন এবং ১৫৮০ খ্রীঃ অব্দে ১১০ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

কাশিম খাঁ—নবাব ইসলাম খাঁর মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতা কাশিম খাঁকে সম্রাট জাহাঙ্গীর বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন (১৬১৩ খ্রীঃ)। বঙ্গে উপনীত হইয়াই কাশিম খাঁ মৃত নবাবের ধন সম্পত্তির উত্তরাধিকার লইয়া তাঁহার পুত্র করিমের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হন, এমন কি করিমের অধিকার ভুক্ত কয়েকটী হস্তী সে সম্রাটের বলিয়া দাবী করিলেও, কাশিম তাহা কাড়িয়া লইলেন। মৃত নবাব জাহাঙ্গীরের প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়াই, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহার ভ্রাতা কাশিমকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করেন। কিন্তু মৃত নবাবের পুত্রের প্রতি এই দুর্ব্যবহারে সম্রাট কাশিমের উপর অতিশয় বিরক্ত হন, এবং পাঁচ বৎসর পরে হইলেও, ইহাই বোধ হয় তাঁহার পদচ্যুতির প্রধান কারণ।

এই সময় পর্ত্তুগীজ জলদস্যু সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আরাকান রণতরীসমূহ অধিকার করে ও তাহাদের অধ্যক্ষগণকে হত্যা করে। পরে সে পুনরায় আরাকান উপকূল লুণ্ঠন করে ও লুণ্ঠিত বহু গ্রাম, নগর, জ্বালাইয়া দেয়। অবশেষে রাজধানী আক্রমণ করিতে যাইয়া নিজ আস্তানা সন্দ্বীপে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। আরাকান রাজ তাঁহার সভায় প্রতিভূরূপে ত্যক্ত গঞ্জালের ভ্রাতুষ্পুত্রকে এক উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে আবদ্ধ করেন। তাঁহার এই শোচনীয় দুর্গতিতে ব্যথিত না হইয়া গঞ্জালে গোয়ার পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি ডনহিয়েরোমডিড আজেডো নিকট দূত মারফৎ আরাকান আক্রমণের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন এবং একার্য্যে তাঁহাকে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধিও ডন ফ্রান্সিস ডি মিনিসেন এর অধিনায়কত্বে আরাকান আক্রমণের নিমিত্ত এক পোত বহর প্রেরণ করিলেন। গঞ্জালের সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া কয়েক দিবস অমীমাংসিত ভাবে যুদ্ধ চালাইবার পর, একদিন পর্ত্তুগীজ সরকার ও গঞ্জালের সম্মিলিত নৌবহর তুমুল যুদ্ধের পর পরাস্ত হইল, ডনফ্রান্সিস নিহত হইলেন।

পর বৎসর আকানরাজ গঞ্জালেকে পরাস্ত করিয়া সন্দ্বীপ অধিকার করেন। এই দ্বীপ সমূহের অধিবাসী আরাকানের মগেরা এখন বঙ্গের বহুস্থানে গ্রাম নগর লুণ্ঠন, গৃহে অগ্নি প্রদান, অধিবাসীগণকে ক্রীতদাস করিয়া লইয়া যাওয়া প্রভৃতি যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে থাকে। কাশিম খাঁ ইহাদিগকে দমন করিতে পারেন নাই, বিশেষ চেষ্টাও করেন নাই, ইহাতে সম্রাট জাহাঙ্গীর

তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন (১৬১৮ খ্রীঃ অঃ)।

কাশিম খাঁ জবুনী — সম্রাট শাহ জাহান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ফিদাই খাঁকে পদচ্যুত করিয়া স্বীয় প্রিয়পাত্র কাশিম খাঁকে তাঁহার স্থানে নিয়োগ করেন (১৬২৮ খ্রীঃ)। কাশিম খাঁ প্রথমে শাহজাহানের ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষক ছিলেন। তিনি নূরজাহানের কনিষ্ঠা ভগিনী মনিজা বেগমকে বিবাহ করেন। এই সকল কারণে তিনি সম্রাটের প্রসাদে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ এযাবৎ বঙ্গের নানাস্থানে লুঠতরাজ, গ্রাম নগর জ্বালান, জোর করিয়া অধিবাসীগণকে খৃষ্টান করা, ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় প্রভৃতি অমানুষিক অত্যাচার করিতেছিল। পরে বাদশাহ প্রদত্ত সনদ বলে পর্ত্তুগীজ বণিকেরা দুই এক স্থানে কুঠি নির্ম্মাণ ও বঙ্গে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। তাহাদের নূতন কুঠী নির্ম্মাণ ও তাহা সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা বঙ্গের শাসনকর্ত্তা কাশিম খাঁ সুনজরে দেখেন নাই। তিনি সম্রাটের নিকট তাহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া, তাহাদিগকে বিতাড়নের আদেশ লাভ করেন ও পর্ত্তুগীজদিগের কুঠী ও আড্ডা হুগলী অবরোধ করেন. দীর্ঘকাল অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া পর্ত্তুগীজগণ নগর, দুর্গ ও কুঠিরক্ষায় নিযুক্ত ছিল, পরে মুঘল সৈন্যের হস্তে পরাজিত হইয়া অনেকে নিহত হয়। স্ত্রীলোকগণ বাদশাহের অন্দরমহলে ও আমীর ওমরাহগণের মধ্যে বণ্টিত হয়। বালকগণকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করা হয়। তখন হইতে হুগলীই বঙ্গের রাজবন্দর নির্দ্দিষ্ট হয় ও বঙ্গের শাসনকর্ত্তার অধীনে একজন ফৌজদার ইহা শাসন করিতে থাকেন।

এই যুদ্ধের অনতিকাল পরেই ১৬৩২ খ্রীঃ অব্দে কাশিম খাঁর মৃত্যু হয়। তিনি শৌর্য্য, বীর্য্য ও সাহসগুণে সম্রাটের এরূপ প্রিয়পাত্র হন যে, তাঁহার মৃত্যুতে সম্রাট অতিশয় ব্যথিত হন।

কাশিম বারিদ শাহ (প্রথম)— দাক্ষিণাত্যের বারিদ শাহি বংশের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রথমে একজন তুর্ক জাতীয় ক্রীতদাস ছিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া দাক্ষিণাত্যের অধিপতি দ্বিতীয় মাহমুদ শাহের মন্ত্রীপদ লাভ করেন এবং তিনিই প্রকৃত পক্ষে রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হন। তিনি রাজাকে অতি সামান্য লোকের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। ১৪৯২ খ্রীঃ অব্দে আদিল শাহ, নিজাম শাহ ও ইমাদ শাহের পরামর্শে তিনি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলন করেন।

তিনি সমস্ত রাজ্য অধিকার করিলে, প্রভু মাহমুদ শাহ রাজধানী ও আহম্মদাবাদ বিদর দুর্গ মাত্র নিজ অধিকারে রাখিতে সমর্থ হন। দ্বাদশবর্ষ রাজত্ব করিয়া কাশিম বারিদ শাহ পরলোক গমন করিলে (১৫০৪ খ্রীঃ) তাঁহার পুত্র আহমদ বারিদ শাহ রাজা হইলেন। তাঁহার সময়ে মাহমুদ শাহের অবশিষ্ট ক্ষমতাটুকুও বিনষ্ট হইল। এই বংশের নিম্নলিখিত সাতজন রাজা বিদরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

(১) কাশিম বারিদ শাহ প্রথম (১৪৯২)
(২) আমিদ বারিদ শাহ প্রথম (১৫০৪)
(৩) আলি বারিদ শাহ প্রথম (১৫৪২)
(৪) ইব্রাহিম বারিদ শাহ (১৫৬২)
(৫) কাশিম বারিদ শাহ দ্বিতীয় (১৫৬৯)
(৬) আলি বারিদ শাহ দ্বিতীয় (১৫৭২)
(৭) আমির বারিদ শাহ দ্বিতীয় (১৬০৯)

কাশিম বারিদ শাহ (দ্বিতীয়)—১৫৬৯ খ্রীঃ অব্দে দাক্ষিণাত্যের বিদর নগরের বারিদ শাহী বংশের, ইব্রাহিম বারিদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা কাশিম বারিদ শাহ (দ্বিতীয়), রাজা হইয়াছিলেন। তিনি তিন বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র আলি বারিদ শাহ (দ্বিতীয়) রাজা হইয়াছিলেন।

কাশীদাস মিত্র মুস্তৌফী—কয়েকখানি গভীর ভক্তি ও ধর্ম্মভাব মূলক গ্রন্থ প্রণেতা। হুগলী জেলার অন্তঃপাতী সুখড়িয়া গ্রামের মিত্র মুস্তৌফী পরিবারে কাশীনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহের নাম দেওয়ান গোবিন্দ চন্দ্র মিত্র মুস্তৌফী। বঙ্গের নবাব বাহাদুর দেওয়ান গোবিন্দ চন্দ্রের ঊর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষ রামেশ্বর মিত্রকে মুস্তৌফী উপাধি প্রদান করেন।

কাশীনাথ উত্তমরূপে ফারশী শিক্ষা করেন। তিনি এলাহাবাদে কার্য্য করিতেন এবং বহুকাল সেখানে যাপন করিয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক কাশীবাসী হন। এখানে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন ও বাঙ্গলা ভাষার আলোচনা ও সেবায় শেষ জীবন যাপন করেন। তাহার গ্রন্থগুলি ভক্তিরস ও ধর্ম্মভাবে পূর্ণ। তাঁহার রচিত পুস্তক সমূহের মধ্যে নিম্ন লিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য—'অঞ্জন শলাকা', 'আত্মানুভূতি', 'কাশিকা', গুপ্তলীলা', 'জ্ঞানরসায়ন', 'তত্ত্বপ্রকাশ', 'প্রয়াগমাহাত্ম্য', 'প্রেমানন্দ লহরী', 'বিচার তরঙ্গিণী,' 'বিচার দীপিকা', 'শক্তিতত্ত্বসার', 'জ্ঞান রসায়ন', 'সজ্জন রঞ্জন' ও 'শঙ্কর বিজয়।'

কাশীনাথ—(১) একজন স্মৃতিশাস্ত্রকার। তাঁহার পিতার নাম অনন্ত। তিনি ১৭৯১ শকে (১৮৬৯ খ্রীঃ) ধর্ম্মসিন্ধু নামে একখানি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। (২) প্রশ্নদীপিকা বা প্রদীপ নামক জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। তিনি ১৬৩৯ শকের (১৭১৭ খ্রীঃ) পূর্ব্বে ইহা রচনা করিয়া-

ছিলেন। (৩) লগ্ন চন্দ্রিকা গ্রন্থ কাশীনাথ বিরচিত। (৪) একজন বাঙ্গালী কবি তাঁহার জন্মস্থান লক্ষ্মীপুর। তিনি রামায়ণের কোনও কোনও অংশ কবিতায় রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে "কালনেমীর রায়বার" পাওয়া গিয়াছে। (৫) একজন প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা ও গ্রন্থকার। তিনি 'অজীর্ণ মঞ্জরী'; 'চিকিৎসা পদ্ধতি', 'লঙ্ঘন পথ্য নির্ণয়', 'কাশীনাথ পদ্ধতি', 'চিকিৎসা ক্রম', 'কল্প বল্লী', 'বালবোধ' 'পাকাবলী', 'রসকল্পলতা' প্রভৃতি বহু আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ রচনা করেন।

কাশীনাথ ঘোষ— কলিকাতা সিমুলিয়ার ঘোষবংশের প্রতিষ্ঠাতা কাশীনাথ রামলোচন ঘোষের পুত্র ও কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান নদীয়ার অন্তঃপাতী মনসাপোতা গ্রাম নিবাসী রামদেব ঘোষের পৌত্র। সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ কাশীনাথের পৌত্র। ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দে কাশীনাথের জন্ম হয়। পিতার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া পরে স্বীয় চেষ্টায় তিনি ইংরেজী শিক্ষা করেন। লক্ষপতি রামদুলাল সরকারের অংশীদাররূপে ব্যবসায় করিয়া তিনি বিপুল বিত্তের অধিকারী হন। তিনি অতিশয় সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল ছিলেন। তিনি অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন ও হিন্দুর আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, উৎসব-পর্ব্বাদি নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। এজন্য তিনি তদানীন্তন হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। বন্ধু রামদুলালের মৃত্যুতে কাশীনাথ গভীর শোক প্রাপ্ত হন এবং ইহার অনতিকাল পরেই ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন।

কাশীনাথ চূড়ামণি—নবদ্বীপের এক জন বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। শিব নাথ বিদ্যাবাচস্পতির পরে তিনিই নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত হইয়াছিলেন।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন — একজন বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত। দক্ষিণাচার, তন্ত্ররাজ, শ্যামাসন্তোষ প্রভৃতি তান্ত্রিক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—(১) তাঁহার জন্ম স্থান ২৪পরগণার অন্তর্গত আড়িয়াদহ গ্রাম। ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে 'ভাষা পরিচ্ছেদ' নামক গ্রন্থের তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে স্কুল বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক ইহা প্রকাশিত হয়।

কাশীনাথ দাশগুপ্ত, মুন্সী—ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার বিদগ্রামে ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি নোয়াখালী জেলায় মহাফেজ ছিলেন। সাধুতা ও কর্ম্মনৈপুণ্যে তিনি সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বীয় গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই তাঁহার

সাহিত্য জীবন ও কর্ম্ম জীবনের আরম্ভ হয়। 'শব্দদীপিকা', 'পঞ্চবটীতত্ত্ব' 'অবলা জ্ঞানদীপিকা', 'কন্যাপণ-বিনাশিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত। সেই সময়ে গ্রামে ডাকঘর ছিল না। বলিতে গেলে তাঁহারই আন্দোলনে প্রথমে ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট সাধারণ ডাক পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন। বিক্রমপুরের রাস্তার বন্দোবস্তের জন্যও তিনি যথেষ্ট কাজ করিয়াছিলেন। তিনি সমাজসংস্কারে ব্রতী হইয়া 'কন্যাপণ বিনাশক' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কন্যাপণ দ্বারা যে সমাজের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-সমাজের ঘোর অকল্যাণ হইতেছে তাহা প্রদর্শন করাই উক্ত গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল। উহা পাঠ করিলে তাঁহার শাস্ত্র জ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে তিনি ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

কাশীনাথ বিদ্যানিবাস—তিনি নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র। পিতামহের নাম নরহরি বিশারদ। তাঁহাদের বংশে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যেমন পণ্ডিত তেমনি অর্থশালীও ছিলেন। কাশীনাথ অতিশয় জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। বহু গ্রন্থ তিনি লোক নিযুক্ত করিয়া নকল করাইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ফলে তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি মুগ্ধবোধের এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। বড়ই দুঃখের বিষয় তাঁহার টীকা এখন দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু মুগ্ধবোধের অন্যতম টীকাকার আড়িয়াদহ নিবাসী ঘোষাল-বংশীয় রাম তর্কবাগীশ মহাশয় সেই টীকার খুব প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি পুরীর জগন্নাথ দেবের বার মাসের বার যাত্রা ও পূজা পদ্ধতি সম্বন্ধে একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি কাশীতে পণ্ডিত মণ্ডলীর সভায় কয়েকবার বিচারে জয়লাভ করেন। তাঁহারই পুত্র বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন 'ভাষা পরিপরিচ্ছেদ' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া দেশবিখ্যাত হইয়াছেন।

কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য—(১)'শীঘ্রবোধ' নামক মুহূর্ত্ত বিবরণ বিষয়ের একটী গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন। লক্ষ্মীপতি নামক জ্যোতিষী পণ্ডিত ইহার টীকা রচনা করিয়াছেন।

কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য—(২) তাঁহার জন্ম স্থান ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত বিদ্যাকুট গ্রাম। তিনি বশিষ্ঠ বংশজ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ইন্দ্রনারায়ণ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় ত্রিপুরার মহারাজের সভা পণ্ডিত ছিলেন। ত্রিপুরা রাজবংশের-উপনয়ন সংস্কারে তিনি একজন প্রধান

উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বিচারে সমাগত কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, উৎকল, মিথিলা, নবদ্বীপ, বাকলাচন্দ্রদ্বীপ, বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলের পণ্ডিতমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ী সম্মতি প্রদানপূর্ব্বক উপনয়ন সংস্কারে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র কাশীনাথও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত 'কাশীনাথী পাত্রা' নামক কলাপ ব্যাকরণের টীকা অতি বিখ্যাত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত চণ্ডীর টীকাও পণ্ডিত মণ্ডলীতে বিশেষ সমাদৃত। তাঁহার পুত্র উমানাথ ভট্টাচার্য্যও একজন প্রতিভাশালী পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু সম্যক প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাইবার পূর্ব্বেই মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি অকালে পরলোক গমন করেন। বর্ত্তমান গ্রন্থ লেখক উমানাথ ভট্টাচার্য্যেরই পুত্র।

কাশীনাথ রামচন্দ্র ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ —প্রসিদ্ধ মারাঠি পণ্ডিত ও ব্যবহার-জীবী। তিনি জাতিতে গণ্ডসারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন, পিতার নাম বাপু রাম-চন্দ্র তেলাঙ্গ। ১৭৭২ শকের ১০ই ভাদ্র (১৮৫০ খ্রীঃ অব্দের ৩০শে আগষ্ট) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ত্র্যম্বক রামচন্দ্র তেলাঙ্গ তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাশীনাথ ১৮৬৪ খ্রীঃঅব্দে প্রবেশিকা, ১৮৬৬ সালে, বি-এ, ১৮৬৮ সালে এম-এ এবং ১৮৭১ সালে এল্-এল্-বি, ১৮৮২ সালে এডভোকেট-শিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। অল্পকাল মধ্যেই ওকালতিতে তিনি বিশেষ যশঃলাভ করেন। তিনি একজন বিখ্যাত বাগ্মী ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি সংস্কৃত মুদ্রা-রাক্ষস নাটকের টীকা ও গীতার ইংরেজী অনু-বাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। লাইসেন্স্ ট্যাক্স ও তুলা সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া বিশেষ যশঃলাভ করেন। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে গুণগ্রাহী বড়লাট লর্ড রিপণ তাঁহাকে শিক্ষা কমিশনের সভ্য নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন এবং সেই সময়েই তিনি সি,আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি বোম্বাই টাউনহলে ইলবার্টবিল সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার বন্ধু, দেশহিতৈষী ফিরোজ শা মেহতা, মিঃ আলান হিউম প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া, বোম্বে প্রেসিডেন্সী আসোসিয়েসন (Bombay Presiden-cy Association) নামে একটী রাজ-নৈতিক সভা স্থাপন করেন। এই সময়ে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি (Indian National Congress) স্থাপিত হয়। ১৮৮৯ সালে তিনি বোম্বাই হাই-কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। তিনি

সুযোগ্য বিচারপতি ছিলেন। ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে তিনি বোম্বাই রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর (Royal Asiatic Society) সভাপতি নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরই তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মাধ্যক্ষ (Vice-Chancellor) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৯৩ সালে মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে, এই কর্ম্মঠ মহাত্মা পরলোক গমন করেন। তিনি যে কেবল আইনজ্ঞ, বিচক্ষণ, রাজনৈতিক পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, তিনি সমাজ-সংস্কারক এবং দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির কার্য্যে যত্নশীল ছিলেন। তিনি বাল্য বিবাহের বিরোধী ও বিধবা বিবাহের সমর্থক ছিলেন এবং স্বীয় বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।

[illegible]থ রায়—তিনি কৃষ্ণনগরের রাজবংশের স্থাপয়িতা ভবানন্দ মজুমদারের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে নদীয়ার অন্তর্গত জলেশ্বরে দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য শাসন করিতেন। দুঃখের বিষয় এই প্রবল প্রতাপান্বিত ভূস্বামীর আর কোন প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় নাই।

কাশীনাথ সামুদ্রাচার্য্য—খ্রীঃ ১৬০০ অব্দে সম্ভবতঃ তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি হাত দেখিয়া এমন কি চেহারা দেখিয়াও লোকের স্বভাব প্রকৃতি বলিতে পারি-[illegible] তাঁহার রাজেন্দ্র, রাঘবেন্দ্র ও মহেন্দ্র নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারাও সকলেই পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তন্মধ্যে রাঘবেন্দ্র নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। সেইজন্য তিনি শতাবধান নামে খ্যাত ছিলেন।

কাশীনাথ সার্ব্বভৌম—তিনি কুশদহের অন্তর্গত মাটিকোমড়া গ্রামের রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের বংশধর ও রামশরণ ন্যায়বাচস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি স্বীয় পিতার ন্যায় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার দেখ।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ— বাঙ্গালী মনস্বী ও সাহিত্যিক। কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ কায়স্থ জমীদার বংশে তাঁহার জন্ম হয়। আদি নিবাস হাবড়া জিলার সন্নিকটবর্ত্তী পৈতাল গ্রাম।

বাঙ্গালা ১২৬৭ সালে শ্রাবণ মাসে, (১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে আগষ্ট মাসে) স্বীয় মাতামহ রামনারায়ণ বসু-সর্ব্বাধিকারীর খিদিরপুর বাসভবনে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে মাতুলালয়ে অবস্থান করিয়া দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পাঠ শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হইয়া, অল্পকালমধ্যে তথাকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন। সেই সময় হইতে তিনি কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হন।

হিন্দু কলেজের প্রথমযুগে, তথাকার প্রসিদ্ধ অধ্যাপকত্রয়—মিঃ উইলসন, মিঃ ডিরোজিও ও ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন

যে সকল যুবকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কাশীপ্রসাদ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহাদের কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া, কাশীপ্রসাদও ইংরেজিতে কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ আচার্য্যগণও তাঁহাকে এই বিষয়ে উৎসাহিত ও সাহায্য প্রদান করেন। কাশীপ্রসাদের The Shair and other Poems, ইংরেজ সুধীগণের নিকটও আদৃত হইয়াছিল। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে কাশীপ্রসাদ মিঃ জেমস্‌মিল রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের অংশ বিশেষের সমালোচনাসূচক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ঐ প্রবন্ধটি এক পুরস্কার বিতরণ সভায় পঠিত হয়। তৎকালীন বড়লাট ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সুধীজন কর্ত্তৃক প্রবন্ধটি বিশেষ প্রশংসিত হয় এবং কোনও কোনও উচ্চশ্রেণীর পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। তিনি আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন। তাহাদের প্রায় সমস্তগুলিই ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে এবং বিশিষ্ট ইংরেজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত কবিতা-সঙ্কলন গুলিতে তাহাদের অনেক কবিতা স্থান লাভ করিয়াছিল। বস্তুতঃ তৎকালে শিক্ষিত দেশীয় ইংরেজ নরনারীর নিকট কাশী-প্রসাদের ইংরেজি কাব্য রচনানৈপুণ্য পরম বিস্ময়ের ও উচ্চ প্রশংসার বিষয় হইয়াছিল। তৎকালে ইংলণ্ডে "Fisher's Drawing Room Scrap Book" নামক একখানি সচিত্র পুস্তক প্রকাশিত হইত। তাহাতে সুন্দর সুন্দর চিত্র ও সুপাঠ্য কবিতা থাকিত। ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত ঐরূপ Scrap Bookএ কাশীপ্রসাদের একটি প্রতিকৃতি, সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ইহা হইতেই ইংরেজ সুধীসমাজে কাশীপ্রসাদের মর্য্যাদার মূল্য নিরূপিত হইতে পারে।

তৎকালীন উচ্চশ্রেণীর সাময়িক পত্রিকাগুলিতে কাশীপ্রসাদের রচনা বহুল পরিমাণে প্রকাশিত হইত। নিধুবাবু, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদের অনেক কবিতা তিনি মূলের ভাব প্রায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সুললিত ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। সাধারণ সাহিত্য রচনা ভিন্ন ইতিহাসেও তাঁহার আগ্রহ ছিল। Memoirs of Indian Dynastics (ভারতীয় রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত) নামে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে গোয়ালিয়র, ইন্দোর, বরোদা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যাধিপতিদের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা ভাষাতেও কাশীপ্রসাদের ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তিনি বাঙ্গালাতে তিনশতেরও অধিক সঙ্গীত রচনা করেন। তাহাদের অধিকাংশই অবশ্

কালধর্ম্মের প্রভাব বশতঃ আদিরসাত্মক ছিল। তাঁহার ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীতগুলি অতিশয় গভীর ভাবব্যঞ্জক। তিনি পৌরাণিক দেবদেবীগণ সম্বন্ধেও বাঙ্গালা এবং ইংরেজি ভাষায় সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেন।

তিনি সদালাপী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বাস ভবনে তৎকালীন সম্ভ্রান্ত ও মনস্বী ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া নানারূপ সদালোচনায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার ভবনে অনুষ্ঠিত হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত পূজাদিতে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণও নিমন্ত্রিত হইতেন। স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াও বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা তাঁহার অনুমোদিত ছিল না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহারই নিকটে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে (Supreme Court) যাহারা প্রথম জুরীর কাজ করেন, কাশীপ্রসাদ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি একজন অবৈতনিক বিচারকও (Honorary Magistrate) ছিলেন। "The Hindu Intelligencer" নাম দিয়া ইনি একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর তাহা বন্ধ হইয়া যায়। ১২৮০ বঙ্গাব্দের, কার্ত্তিক মাসে এই মনস্বী পরলোক গমন করেন।

কাশীপ্রসাদ জয়শোয়াল— খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মির্জ্জাপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি উচ্চশিক্ষার্থ ইংলণ্ডে যান এবং কেম্‌ব্রিজ হইতে এম্ এ উপাধি লাভ করেন। অতঃপর আইন পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ (ব্যারিষ্টার) হইয়া তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং পাটনা হাই-কোর্টে যোগ দেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য বিভিন্নমুখী ছিল। তিনি একাধারে আইন ব্যবসায়ী, ঐতিহাসিক, আয়কর আইন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, এবং ভারতীয় দর্শন এবং হিন্দুদের ইতিহাস সম্বন্ধে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। গবেষণা করিয়া তিনি এমন অনেক নূতন তথ্য বাহির করিয়াছিলেন, যাহা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণকে পথ প্রদর্শন করিবে।

তিনি অক্সফোর্ডের ডেভিস চাইনিজ স্কলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের এমিরিটাস (Emeritus) অধ্যাপক এবং ঠাকুর আইন অধ্যাপক (Tagore Law Lecturer) ছিলেন। কাশীপ্রসাদ 'মনু ও যাজ্ঞবল্ক, এবং হিন্দু রাজনীতি বিষয়ে ইংরাজিতে দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই দুইখানি ভারতবর্ষ ও বিদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া

হিন্দুদের শেষ রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সমগ্র ইতিহাস তিনি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ব করিয়াছিলেন। ১৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দুই শত বৎসরের ভারতবর্ষের ইতিহাস তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার ভিনসেণ্ট স্মিথ (Sir Vincent Smith) হইতে আরম্ভ করিয়া কোন ঐতিহাসিকই ভারতের ঐ দুইশত বর্ষের ইতিহাস বাহির করিতে পারেন নাই এবং সেই জন্য তাঁহারা ইহাকে অন্ধকার যুগ ('Dark Period') বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। কাশীপ্রসাদ দক্ষিণ ভারতের এবং প্রাচীন হিন্দুদিগের উপনিবেশ স্থাপনের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বুদ্ধের সময় হইতে পালবংশ পর্য্যন্ত হিন্দু জাতির ইতিহাসও লিখিয়াছেন। ইহার মধ্যে গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সম্পর্কে অনেক অনাবিষ্কৃত তথ্য পাওয়া যায়। ১৯২৬ সালে তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-লিট (D. Litt) উপাধি পান। তিনি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় নিখিল-ভারত প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনের (All Indian Oriental Conference) ষষ্ঠ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বরোদায় উক্ত সম্মেলনের মূল সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৩৪৪ সালের ১৯শে শ্রাবণ বুধবার তিনি পরলোক গমন করেন (৪ঠা আগষ্ট ১৯৩৭)।

মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র এবং তিনটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একটী কন্যা শ্রীমতী ধর্ম্মশীলা লাল এম-এ, ব্যারিষ্টার, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিঙ্গাপুরের ব্যারিষ্টার।

ডাঃ কালীপ্রসাদ জয়শোয়াল চরম পত্র দ্বারা তাঁহার বিরাট পুস্তকসংগ্রহ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক সংগ্রহে বহু আইন পুস্তক ও প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা প্রভৃতি সম্পর্কে বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক আছে।

কাশীরাও হোলকার — তুকাজী হোলকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৯৭ খ্রী অব্দে তুকাজীর মৃত্যুর পর কাশীরাও ও তাঁহার ভ্রাতা মলহর রাওএর মধ্যে ইন্দোরের কর্ত্তৃত্ব লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে, উভয়েই পুনায় পেশওয়ার দরবারে বিচারপ্রার্থী হন। দৌলত রাও সিন্ধিয়া হোলকার বংশের রাজ্য আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে কাশীরাও এর পক্ষ অবলম্বন করিয়া একদিন মলহর রাওকে অতর্কিতে আক্রমণ ও অনুচরবর্গ সহ তাঁহাকে নিহত করিলেন। ইহার পর কাশীরাওকে বশে রাখিয়া দৌলতরাও তাঁহার নামে ইন্দোর শাসনের ছলে রাজ্য আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। তুকাজী

অপর এক পুত্র যশোবন্ত রাও দীর্ঘকাল যুদ্ধবিগ্রহের পর দৌলত রাওএর হস্ত হইতে ইন্দোর উদ্ধার করেন।

কাশীরাম দাস — প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি। বাঙ্গালা ৯৬৫ সালে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধীন সিঙ্গিগ্রামে কাশীরাম দাস জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম কমলাকান্ত দাস, পিতামহের নাম সুধাকর দাস ও প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর দাস। তিনি বাল্যকালে পিতার নিকট হইতে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন। বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি মেদিনীপুর আতাবাগড়স্থ রাজার আশ্রয়ে কিছুকাল অতিবাহিত করেন; রাজ-আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে যখন তাঁহার কবিতা রচনার খ্যাতি প্রচারিত হইল, তখন "নলোপাখ্যান" নামক একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। ইহার কিছুদিন পরে "জলপর্ব্ব" ও "স্বপ্নপর্ব্ব" নামীয় অপর দুইখানি কাব্য রচনা করেন। অবশেষে বাঙ্গালা ১০০০ সালে অর্থাৎ ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মূল সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। উক্ত বিরাট গ্রন্থ অনুবাদ করিতে তাঁহার জীবনের বাকী সমুদয় সময় নিয়োজিত হয়। মহাভারত নামক বিরাট গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ রচনা করিয়া ইনি বাঙ্গালী জাতীকে অমূল্য সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার জন্ম ৯৬৫ বাংলা সালে নির্দ্ধারণের মূলে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে এবং ১০১১ সালে যে তিনি বিরাট পর্ব্ব রচনা সমাধা করেন, তাহাও যুক্তি সিদ্ধ; তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর গদাধর দাসের 'জগন্নাথ মঙ্গলে' উল্লেখ হইতে ১০৫৫ সালেও যে কাশীরাম জীবিত ছিলেন তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে।

কেহ কেহ কাশীরামের সংস্কৃত জ্ঞানে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যদিও কাশীরাম মূল সংস্কৃত মহাভারত সর্ব্বত্র অনুসরণ না করিয়া, বহুস্থানেই স্বীয় কল্পনা ও কবিত্বের আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন এবং কোন কোন নূতন মনোহর উপাখ্যান সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার বিরাট গ্রন্থের পর্ব্ব বিভাগে মূলের সহিত বহুলাংশে সাদৃশ্য ও বহু স্থলে মূলের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া যথাযথ আক্ষরিক অনুবাদ দর্শনে কোন ক্রমেও মনে হয় না, তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ছিলেন।

মূলের পর্ব্ববিভাগ নিম্নলিখিতরূপ— (১) আদি, (২) সভা, (৩) বন, (৪) বিরাট, (৫) উদ্যোগ, (৬) ভীষ্ম, (৭) দ্রোণ, (৮) কর্ণ, (৯) শল্য, (১০)

সৌপ্তিক, (১১) স্ত্রী, (১২) শান্তি, (১৩) অনুশাসন, (১৪) অশ্বমেধ, (১৫) আশ্রমবাসিক, (১৬) মৌষল, (১৭) মহাপ্রস্থান ও (১৮) স্বর্গারোহণ।

কাশীরামের মহাভারতের পর্ব্ব বিভাগ কর্ণ পর্ব্ব পর্য্যন্ত মূলের অবিকল অনুরূপ; এতদ্ভিন্ন ক্রমিক পর্য্যায় ব্যতীত কাশীরামের (১১) স্ত্রী বা নারী, এবং (১৫) অশ্বমেধ পর্ব্বও মূল মহাভারতের সদৃশ। (১০) গদা ও (১২) ঐষিক নামক দুইটি পর্ব্ব নূতন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, মূলে ইহারা যথাক্রমে (৯) শল্য ও সৌপ্তিক পর্ব্বান্তর্গত। মূল মহাভারতের (১৭) মহাপ্রস্থান পর্ব্ব দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া কাশীরামের মহাভারতের (১৭) মৌষল ও (১৮) স্বর্গারোহণ পর্ব্বের অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। মোট পর্ব্ব সংখ্যা দুই মহাভারতেই এক। 'বঙ্গ ভাষার লেখক' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত 'যান-পর্ব্ব', 'দাস পর্ব্ব', 'পাশা পর্ব্ব' ও 'কুসুম পর্ব্ব' এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালে প্রাপ্ত 'দান পর্ব্ব' ও 'দণ্ডী পর্ব্ব নামক পুঁথি পর্ব্বাধ্যায় রূপে গৃহীত হইতে পারে।

অনেক মনে করেন প্রথম তিন পর্ব্ব ও বিরাটের কিয়দংশ রচনাকরিয়া কাশীরাম পরলোক গমন করেন, কিন্তু এই মত যুক্তিসহ নহে। পরন্ত কাশীরা সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন এরূপ বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ আছে, তবে ইহাও সত্য যে পূর্ব্ববর্ত্তী বহু অনুবাদক ও কবির রচনার অংশ বিশেষ কাশীরামের মহাভারতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কাশীরামের মহাভারতের দায়িত্ব পরবর্ত্তী সঙ্কলয়িতা ও সম্পাদকগণের। আর বটতলার সংস্করণ নামে প্রচলিত কাশীরামের যে মহাভারতের সহিত আমরা পরিচিত, তাহা শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান পাদরী কেরী ও মার্শম্যান সাহেবের সংস্কৃত ও বাঙ্গলা শিক্ষক পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সংস্করণ। ইহা কাশীরামের মহাভারতের পাঠ হইতে বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত।

কাশীরামের বিষয়ে এত মতানৈক্য ও বিতর্ক সত্ত্বেও, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, যে কাশীরাম বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। মহাভারতকে আংশিক অনুবাদ বা উপাখ্যান অবলম্বনে কাব্য রচনা ইতিপূর্ব্বেও অনেকে করিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র মহাভারতের অমৃত, তিনি বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে পরিবেশন করিয়াছেন।

কাশীরামের মৃত্যুর সময়ও সর্ব্ববাদী সম্মতরূপে গৃহীত হয় নাই।

কাশুলি — একজন সিদ্ধাচার্য্য। গোরক্ষনাথ দেখ।

কাশ্যপ — (১) বৌদ্ধশাস্ত্র মতে গৌতম বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বে আরও পঞ্চান্ন জন বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন। কাশ্যপ তাঁহাদের

মধ্যে সর্ব্বশেষ বুদ্ধ ছিলেন। তিনি বারাণসীর নিকটবর্ত্তী মৃগদাব বনে জন্মগ্রহণ করেন। (২) মহাত্মা গৌতম বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য। উরুবিল্ব গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। বুদ্ধদেব দ্বিতীয়বার উরুবিল্ব গ্রামে পদার্পণ করিলে, প্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত কাশ্যপ তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব স্বীয় গাত্রবস্ত্র তাঁহাকে উপহার দিয়া বলিয়াছিলেন—তুমি আর আমি এক। খ্রীঃ পূঃ ৪৭৭ অব্দে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের পর তাঁহার শিষ্যেরা মহামতি কাশ্যপের উপদেশ অনুসারেই চলিতেন। কাশ্যপের অধিনায়কত্বে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহাভ্যন্তরে বৌদ্ধদিগের প্রথম মহা সঙ্গীতি খ্রীঃ পূঃ ৪৯০ অব্দে সম্পন্ন হয়। পাঁচশত বৌদ্ধ ভিক্ষু এই সঙ্গীতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। গৌতম বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য উপালী কর্তৃক এই সঙ্গীতিতে "বিনয়" (ভিক্ষুদের প্রতিপাল্য নিয়মাবলী) বিবৃত ও ভিক্ষুগণ কর্তৃক গৃহিত হয়। বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য আনন্দ 'ধর্ম্ম' বিষয়ে আলোচনা করেন

কাশ্যপমাতঙ্গ — চীন দেশের হান্ বংশীয় সম্রাট মিংতির রাজত্বকালে (৫৮-৭৫ খ্রীঃ অঃ) যে দুইজন হিন্দু প্রচারক গৌতম বুদ্ধের বাণী বহন করিয়া চীনে সর্ব্বপ্রথমে উপনীত হন বলিয়া কথিত হয়, ইনি তাঁহাদের অন্যতর। অপর প্রচারকের নাম ধর্ম্মরত্ন। তাঁহাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'দ্বিচত্বারিংশৎসূত্র' নামক কখানি মাত্র পাওয়া যায়। কথিত আছে চীন সম্রাট ভারতীয় ভিক্ষুদ্বয়ের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব জানিতে চাহিলে, কাশ্যপমাতঙ্গ বুদ্ধের জীবন ও বাণী সহ বিভিন্ন বৌদ্ধমত, ভিক্ষু জীবনের নীতি ও উপদেশ সকল এই গ্রন্থে সংক্ষেপে বিবৃত করেন।

কাহ্নজী— একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। তিনি গুর্জ্জরাধিপতির সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সূর্য্যদাস, গোপাল ও রামকৃষ্ণ নামে তিন পুত্র ছিলেন। তাঁহারাও বিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত ছিলেন। তন্মধ্যে গোপালের পুত্র ও শিবদাসের শিষ্য গণেশ ব্রহ্মপুরে ১৫৩৭ শকে (১৬১৪ খ্রীঃ) জাতকালঙ্কার নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

কিচনার, হোরেসিও হার্ব্বট — (Kitchener of Khartoum, Horatio Herbert) ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে আয়ারল্যাণ্ড দেশের কেরীর অন্তঃপাতী লিষ্টওয়েলের নিকটস্থ গানসবারো হাউসে কিচনারের জন্ম হয়। লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল এইচ, এইচ, কিচনার তাঁহার পিতা। ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি উলউইচের সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে রয়েল ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে

যোগদান করেন। প্যালেষ্টাইন, মিশর দক্ষিণ আফ্রিকা সুদান প্রভৃতি স্থানে স্বীয় সমরদক্ষতা বলে জয়লাভ করেন এবং বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন ও বহু সম্মানকর উপাধি-ভূষিত হন। পরে ভারতের প্রধান সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ও অতি দক্ষতার সহিত সামরিক বিভাগের সংস্কার সাধন করেন। এই ব্যাপারে তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জনের সহিত মতদ্বৈধ হইলে বিলাতের সমরসচিব তাঁহার মত সমর্থন করেন। ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহারই দক্ষতাগুণে অতি অল্প সময়েই ইংলণ্ড মহাসমরের জন্য দ্রুত প্রস্তুত হইতে সমর্থ হয়। ঐ সময় ব্যপদেশে ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে রুশ দেশে গমনকালে শত্রুর মাইনে আহত হইয়া তাঁহার জাহাজ নিমজ্জিত হয় ও তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

কিরণচাঁদ দরবেশ — ফরিদপুর জিলার অন্তঃপাতী খালিয়া গ্রামে ১২৮৫ বঙ্গাব্দে কিরণচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও সংসার ত্যাগ করিয়া ভারতের যাবতীয় তীর্থে ভ্রমণ করেন। ইনি ধর্ম্মপরায়ণ ও ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইনি বহু সঙ্গীত ও কবিতা রচনাকরেন, তন্মধ্যে কতকগুলি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে 'কাবেরী', 'গানের খাতা' 'জপজী' 'প্রথম শতক', 'দ্বিতীয় শতক', 'মন্দির' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কিশোরীচাঁদ মিত্র — স্বনাম খ্যাত সাহিত্য ব্রতী ও মনস্বী। তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের সুপরিচিত প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রাম-নারায়ণ মিত্র। তাঁহার মাতা আনন্দ-ময়ী বাঙ্গালা ভাষায় সুশিক্ষিতা ছিলেন। অতি শৈশবকাল হইতেই প্যারীচাঁদের প্রভাব কিশোরীচাঁদের জীবনে পতিত হয় এবং তৎফলে উভয় ভ্রাতার প্রকৃতি প্রায় একই ধরণে গঠিত হয়।

শৈশবে স্থানীয় পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। বাঙ্গালা শিক্ষা কিছুদূর অগ্রসর হইলে তিনি কিছুকাল ফারশী শিক্ষা করেন। তাহার কিছু-কাল পূর্ব্ব হইতে এদেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করিয়া ছিল; প্যারীচাঁদের উৎসাহে তাঁহাদের বাটীতেই একটী ক্ষুদ্রাকার ইংরাজি শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। রাধানাথ শিকদার, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি তাহাতে শিক্ষকতা করিতেন। ঐ বিদ্যালয়েই বালক কিশোরীচাঁদের ইংরেজি শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হয়। ক্রমে বয়ঃবৃদ্ধির সহিত তিনি প্রথমে হেয়ার (David Hare) সাহেবের বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তৎপরে তথা

হইতে হিন্দু স্কুলে (কলেজ) গমন করেন। সর্ব্বত্রই প্রতিভাবান ছাত্ররূপে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার সতীর্থ দিগের ও সমসাময়িক ছাত্রগণের মধ্যে প্যারিচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু, কবি মধুসূদন, ভোলানাথ চন্দ্র প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছাত্র-জীবনে প্রথমে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার এবং পরে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ রিচার্ডসনের (Captain David Leicester Richardson) বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছাত্র হইয়াছিলেন। রিচার্ডসনের তত্ত্বাবধানে কিশোরীচাঁদ ইংরেজি সাহিত্যের সহিত পরিচিত হন। তৎফলে তিনি যে সাহিত্য-রসের আস্বাদন লাভ করেন, চিরদিন তাহা তাঁহার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইংরেজি প্রবন্ধ রচনাতে তিনি এতদূর পারদর্শীতা লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার এক বার্ষিক পরীক্ষাতে লিখিত রচনা, কলেজের পারিতোষিক বিতরণ সভায় পঠিত হয় এবং অপর একটি উৎকৃষ্ট রচনার জন্য তিনি তদানীন্তন বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড (Auckland) এর নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহার ছাত্রাবস্থায় (১৮৩৮ খ্রীঃ) রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ মনস্বীগণ দেশীয় যুবকদিগের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা" (Society for the Acquisition of General Knowledge) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। যুবক কিশোরীচাঁদ উৎসাহের সহিত তাহাতে যোগদান করেন এবং কয়েকবার ঐ সভার অধিবেশন গুলিতে ইংরেজি প্রবন্ধ পাঠ করেন। রচনাগুলি সকলেরই প্রশংসা লাভ করে।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াও তাঁহার জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত অথবা জনহিতকর কাজ করিবার ইচ্ছা লুপ্ত হয় নাই। প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাজক ডাফ্ সাহেবের (Alexander Duff) গুণে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে কিছুকাল অবৈতনিক শিক্ষকের কাজ করেন। ডাফ্ সাহেবের সহিত তাঁহার বন্ধুতা চিরদিন অক্ষুন্ন ছিল। ঐ সময় হইতেই তিনি বিস্তৃত ভাবে সাহিত্য সেবা আরম্ভ করেন। "বেঙ্গল হরকরা" (Bengal Hurkuru) ; "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" (Bengal Spectator), প্রভৃতি কাগজে প্রথমে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। পরে তদানীন্তন প্রসিদ্ধ মাসিক "ক্যালকাটা রিভিউ" (Calcutta Review—ইহা এখনও চলিতেছে) পত্রে তাঁহার বহু চিন্তাশীল ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত

হইয়াছিল। উক্ত পত্রিকাতে কিশোরী-চাঁদ রাজা রামমোহন রায়ের যে জীবনী প্রকাশ করেন তাহা সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। ঐ প্রবন্ধ রচনা পরোক্ষ-ভাবে তাঁহার বৈষয়িক উন্নতির কারণও হইয়াছিল। ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর পর, কিশোরীচাঁদ হেয়ার সাহেবের স্মৃতিরক্ষার জন্য বার্ষিক-সভা আহ্বান করিয়া পুণ্যশ্লোক হেয়ারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি রাজকার্য্য উপলক্ষে কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ সভার সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। পর-বর্ত্তীকালে পুনরায় যখন কলিকাতায় আসিয়া অবস্থান করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন (১৮৫৪ খ্রীঃ), তখনও হেয়ারের স্মৃতি সভায় একাধিক বার মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অথবা সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া, তিনি হেয়ার সাহেবের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি নিজ ভবনে Hindu Theo-philanthropic Society নামে এক সভা স্থাপন করেন। পরবর্ত্তী কালে প্রকাশিত, ঐ সভায় পঠিত প্রবন্ধাবলীর ভূমিকা হইতে, ঐ সভার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের বিষয় জানা যায়। "হিন্দু পৌত্তলিকতা বিনষ্ট করা এবং ঈশ্বর, পরলোক, সত্য ও সুখ সম্বন্ধে যুক্তি সম্মত ও উন্নত অভিমত প্রচার করাই সভার উদ্দেশ্য। হিন্দুগণকে পরমাত্মা এবং সত্যরূপে ঈশ্বরকে পূজা করিতে শিক্ষা দেওয়া, এবং তাঁহাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা, স্বজাতীয়গণ এবং আপনা-দিগের প্রতি যে সকল নৈতিক ও পবিত্রতন কর্ত্তব্য আছে তাহা পালন করান ইহার অভিলষিত উদ্দেশ্য।" ডাঃ অ্যালেক্‌জাণ্ডার ডাফ্, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাম-গোপাল ঘোষ প্রমুখ মনস্বীগণ ঐ সভার অধিবেশনাদিতে যোগ দিতেন। তথায় ইংরেজি অথবা বাঙ্গালা ভাষায় ধর্ম্ম, নীতি ও সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি পঠিত হইত। পূর্ব্বোক্ত মনস্বীগণ ব্যতীত তৎকালীন আরও অনেক শিক্ষিত ও উদারচেতা ব্যক্তি উহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দুঃখের বিষয় রাজকর্ম্মানু-রোধে কলিকাতা ত্যাগ করার অল্প-কাল পরেই ঐ সভার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়।

অনুমান ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে কিশোরী-চাঁদ রাজকার্য্য গ্রহণ করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন। তিনি প্রথমে রামপুর বোয়ালিয়ার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজি-ষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন। তৎপরে পাঁচ বৎসরের অধিককাল নাটোর মহ-কুমার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সর্ব্ব-মোট তিনি প্রায় ছয় বৎসর ঐ রাজ-কার্য্য উপলক্ষে ঐ সকল স্থানে বাস

করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে বালক ও বালিকাদিগের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, যাতায়াতের জন্য পথ নির্ম্মাণ, জলাশয় খনন, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি সকল প্রকার জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়া তৎস্থানীয় সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। বস্তুতঃ ঐ সময়ের মধ্যে কিশোরীচাঁদ তাঁহার অসাধারণ জনসেবার ইচ্ছা ও কর্ম্মনৈপুণ্য প্রকাশ করেন। তৎপরে কিছুকাল অন্যত্র বদলী হইয়া ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার আগমন করেন এবং উত্তর বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ঐ পদে তিনি সর্ব্বমোট প্রায় চার বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ শেষভাগে তিনি এক ষড়যন্ত্রের ফলে কর্ম্মচ্যুত হন।

সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে ভারত প্রবাসী ইংরেজদিগের মনে এক প্রবল প্রতিহিংসার ভাব জাগ্রত হয়। তাহার ফলে অনেক স্থলে নির্দ্দোষ ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করে অথবা লঘু অপরাধে লোকে গুরুদণ্ড ভোগ করে। সেই সময়েই আবার শ্বেতাঙ্গ অপরাধিরা যাহাতে মফস্বলস্থ আদালতেও অভিযুক্ত হন এবং তথায় তাঁহাদের বিচার হইতে পারে, এই বিষয় লইয়া দেশে এক ঘোরতর আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। কিশোরীচাঁদ এই আন্দোলনে বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করেন। তৎফলে কতিপয় স্বার্থান্বেষী ইংরেজ বিদ্বেষ বশতঃ তাঁহার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে। কলিকাতার তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার মিঃ ওয়াকোপ (Mr. Wauchope), রাজকার্য্যে শিথিলতা প্রদর্শন, নিয়ম বহির্ভূত কাজ করা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে কিশোরীচাঁদের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট অভিযোগ করেন। প্রথম প্রথম উহাতে বিশেষ ফল দর্শে নাই। কিন্তু বারংবার ঐ বিষয়ে অভিযোগ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া এ বিষয় মীমাংসার জন্য একটি তদন্ত-সভা (কমিশন) নিযুক্ত করেন। ছোট আদালতের তদানীন্তন বাঙ্গালী বিচারপতি হরচন্দ্র ঘোষ ঐ কমিশনের একজন সদস্য ছিলেন। বিচারে অবশ্য কিশোরীচাঁদই দোষী সাব্যস্ত হইয়া কর্ম্মচ্যুত হন। কারণ কবির ভাষায় বলিতে হয় "পাশী-ইমামে বিবাদ বাঁধিলে, পাশীই অপরাধী"। কিশোরীচাঁদের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদের ঐ ঘৃণিত ষড়যন্ত্র এবং তাহার পূর্ব্বোক্ত পরিণামে, দেশের শিক্ষিত সমাজে ঘোরতর বিক্ষোভ সৃষ্টি এবং আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগে কিশোরীচাঁদ কলিকাতার উত্তর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি হইয়া

কলিকাতায় আগমন করেন এবং ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে তাঁহার কর্ম্মচ্যুতি ঘটে। এই সময়ের মধ্যে তিনি কলিকাতার প্রায় সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর ও শিক্ষাবিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়া প্রভূত পরিশ্রম করেন। তৎকালীন উচ্চশিক্ষিত দেশীয় ব্যক্তিগণ বিস্তৃতভাবে রাজনীতির আলোচনা করিতেন, কিশোরীচাঁদও সেই আলোচনা ও আন্দোলনে বিশেষ ভাবে যুক্ত থাকিতেন। "হিন্দু পেট্রিয়ট" (Hindu Patriot) এর তদানীন্তন সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার অতি প্রিয় সুহৃদ ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে, কিশোরীচাঁদ বেনামীতে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, ঐ বিদ্রোহ সৈনিক সংক্রান্ত বিপ্লব মাত্র, দেশের জনসাধারণের উহার সহিত কোনও যোগ ছিল না, অথবা তাহারা উহার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্নও ছিল না।

সামাজিক রীতিনীতির উন্নতি ও সংস্কার সাধনের জন্যও কিশোরচাঁদ সচেষ্ট ছিলেন। তদুপলক্ষে ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায়, দেশের সামাজিক উন্নতির চেষ্টা করিবার জন্য, এক সভা স্থাপিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ দেশের গৌরবস্থল মনস্বীগণ তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। (মহর্ষি) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার প্রথম সভাপতি হন। ঐ সভা হইতে ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে বহুবিবাহ নিবারণের জন্য, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায়, এক আবেদন প্রেরিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচেষ্টায়ও ঐ সভা হইতে প্রভূত উৎসাহ দান ও সাহায্য করা হয়। তদ্ভিন্ন আরও অনেক আপত্তিকর সামাজিক রীতিনীতি সংস্কারের জন্যও ঐ সভাহইতে বিশেষ চেষ্টা করা হয়।

"ইণ্ডিয়ান ফীল্ড" (Indian Field) নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা কিশোরীচাঁদ কয়েক বৎসর অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করেন। ঐ পত্রিকাখানি পূর্ব্বে মিঃ জেম্‌স্ হিউম (James Hume) নামক একজন ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইত। কিশোরীচাঁদ উহার প্রতিষ্ঠাতাদিগের অন্যতম ছিলেন। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, পাথুরিয়াঘাটার বাবু রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও কতিপয় ইংরেজ মনস্বীর অর্থ সাহায্যে ও অন্যান্য রূপ সহযোগীতায় উহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় সকল সম্প্রদায়ের লোকের উপযোগী করিবার জন্য উহাতে ক্রীড়া কৌতুক, শিকার

কৃষি, শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক নিবন্ধাদিও প্রকাশিত হইত। বহু উচ্চপদস্থ ইংরেজও উহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। দেশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে কিশোরীচাঁদ স্বয়ং, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ মনস্বী-গণ উহাতে নিয়মিত লিখিতেন। ঐ পত্রিকায় কিশোরীচাঁদের নানা বিষয়ে বহু মূল্যবান, গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দের নীল বিদ্রোহ সংস্রবে, কিশোরীচাঁদের লিখিত প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে উহা হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সহিত মিলিত হইয়া যায়। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন," (British Indian Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। কিশোরীচাঁদ প্রথম অবস্থা হইতে উহার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। তিনি ঐ সভার বহু অধিবেশনে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বাস্তবিক তৎকালে কলিকাতায় এমন কোনও জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান ছিল না, যাহার সহিত কিশোরীচাঁদ ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন না। জনহিত-সাধক কার্য্যের জন্য পরিশ্রম করা তাঁহার অতীব আনন্দের বিষয় ছিল। সভাস্থাপন ও পরিচালনা করা, পত্রিকাতে প্রবন্ধাদি লেখা, পত্রিকা সম্পাদন করা, প্রভৃতি লোক সেবার সমুদয় উপায়ই তিনি আনন্দের সহিত অবলম্বন করিয়া অকৃত্রিম অনুরাগের সহিত পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার ও সর্ব্বজন-মঙ্গলকর কার্য্যের অতি সামান্য পরিচয় মাত্র উপরে দেওয়া হইল। বহু প্রতিষ্ঠাপন্ন জমিদার এবং এমন কি কুচবিহারের তদানীন্তন মহারাজাও তাঁহার নিকট প্রভূত সাহায্য ও উপদেশ লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তখনকার দিনে কিশোরীচাঁদ বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে সকল সম্প্রদায়ের নিকট সম্মান লাভ করিতেন। লেখক, বাগ্মী, পরামর্শ দাতা, লোক সেবক ও দেশের প্রকৃত হিতৈষীরূপে কিশোরীচাঁদ চিরকাল ভারতবাসীর শ্রদ্ধা পাইবেন। ১২৮০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে এই মনস্বী পরলোক গমন করেন

কিশোরী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়— ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী জনাই গ্রামে কিশোরীমোহন জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রামের ট্রেণিং স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল তিনি স্বীয় গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। অতঃপর Comptrollor of Accounts অফিসে চাকুরী প্রাপ্ত হন এবং অনতিকাল মধ্যেই স্বীয় কার্য্যকুশলতা বলে উর্দ্ধতন

কর্ম্মচারীদিগের প্রীতিলাভে সমর্থ হন। পরে আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত ঐ পদত্যাগ করেন এবং আইন অধ্যয়ন ও তৎসহ 'হালিসহর পত্রিকা'র ইংরাজী অংশ সম্পাদন করিতে থাকেন। তাঁহার বিচক্ষণ সম্পাদনা গুণে ইংরাজীতে সুলেখক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি প্রচারিত হয় এবং প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হন। অতঃপর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, হুগলী জজ আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু আইন ব্যবসায় তাঁহার পছন্দ না হওয়ায়, নরেশচন্দ্র দত্ত দ্বারা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত এবং শম্ভুচন্দ্র সম্পাদিত 'রেইস এণ্ড রায়ৎ' (Rais and Ryots) পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। শম্ভুচন্দ্রের পরলোক গমনের পর যোগেশ চন্দ্র দত্ত 'রেইস এণ্ড রায়ৎ' পত্রিকা সম্পাদন করিতে থাকিলে, কিশোরীমোহন বহুদিন উক্ত পত্রিকার লেখক ছিলেন। কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন 'চরক সংহিতা'র ইংরাজী অনুবাদ করিবার ভার কিশোরীমোহনের উপর অর্পণ করেন। ইহা ভিন্ন প্রতাপচন্দ্র রায় মহাভারতের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন, তিনি তাহারও সম্পাদক ছিলেন। কিশোরীমোহন এই অনুবাদ কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য শেষভাগে সরকার বাহাদুর তাঁহাকে ২৫৲ টাকা মাসোহারা দান করেন।

শিক্ষকতা, সরকারী কর্ম্ম এবং আইন ব্যবসায় প্রভৃতি সর্ব্বত্রই কিশোরীমোহন স্বীয় প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। ইংরাজীতে মৌলিক প্রবন্ধ রচনায় ও অনুবাদ কার্য্যে তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কিশোরীমোহন পরলোক গমন করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায় আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

কিশোরী মোহন বাগচী—সুপ্রসিদ্ধ পি, এম, বাগচী কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পিতার নাম প্যারী মোহন বাগচী। কিশোরী মোহন দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন, তথাপি বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া সামান্য কেরাণীগিরির জন্য লালায়িত না হইয়া, নূতন কোন ব্যবসায়ের উপায় উদ্ভাবনে আত্মনিয়োগ করেন। অবশেষে দেখিলেন, ঘরে ঘরে প্রস্তুত লিখিবার কালির পরিবর্ত্তে বিলাতী কালিতে দেশ ছাইয়া যাইতেছে ও দেশের প্রভূত অর্থ এই বাবদে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে; দরিদ্র দেশের এই প্রকার শোষণ নিবারণ মানসে স্বদেশী লিখিবার কালি আবিষ্কারের জন্য কিশোরীমোহন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। অবশেষে বিদেশী কালির

তুলা কিন্তু দামে সস্তা লিখিবার কালি আবিষ্কারে সমর্থ হন, কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী কালির ব্যবসায়ীগণের সহিত প্রতিযোগীতায় প্রথমে তাঁহাকে বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রথমে স্বদেশবাসীর যথেষ্ট সহানুভূতি তিনি প্রাপ্ত হন নাই। ক্রমশঃ স্বীয় অধ্যবসায় বলে এবং তাঁহার আবিষ্কৃত দ্রব্যের উৎকর্ষের বলে কিশোরীমোহন গভর্ণমেণ্ট, রেলওয়ে এবং স্বায়ত্ব শাসনাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহে কালি সরবরাহ করিতে সমর্থ হন। এই ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত অর্থ লাভ করিয়া কিশোরী মোহন স্বীয় ব্যবসায় অধিকতর প্রসারিত করেন ও শীল মোহর, রবারষ্ট্যাম্প, পঞ্জিকা প্রকাশ ও পুষ্পসার প্রভৃতির ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং এই সকল ব্যবসায়েও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই কিশোরী মোহন অধ্যবসায়ী কষ্টসহিষ্ণু, কঠোর পরিশ্রমী উচ্চাকাঙ্খী ছিলেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাঁহার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালী যুবকগণের অনুকরণ যোগ্য। কিশোরী মোহন অতিশয় পিতৃভক্ত ছিলেন এবং পিতার স্মরণার্থে পিতার নাম অনুসারে তাঁহার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের নাম পি, এম, বাগচী কোম্পানী রাখেন। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে কিশোরীমোহন ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

কিশোরীলাল ঘোষ—অমৃত বাজার পত্রিকার অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি বঙ্গের অন্যতম শ্রমিক নেতা ছিলেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাঁহার নাম ছিল। তিনি বেকসুর খালাস পাইয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মুক্তি তাঁহার স্বদেশবাসীদের কাজে লাগিল না। দীর্ঘকালব্যাপী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার সময়ে তাঁহার যে কঠিন পীড়ার সূত্রপাত হয়। পরিণামে তাহাই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। ইহাতে সাংবাদিক জগতের ক্ষতি হইয়াছে এবং শ্রমিকদেরও ক্ষতি হইয়াছে। (মৃত্যু ফাল্গুন—১৩৩৯)

কিশোরীলাল রায়—ঢাকা জেলার বিদ্যানুরাগী ও দানশীল জমিদার। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বালিয়াটী গ্রামে কিশোরীলাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ রায়। নিজে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ না করিলেও, শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। পিতার নাম অনুসারে তিনি ঢাকায় জগন্নাথ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর জগন্নাথ স্কুল নিজ নামানুসারে "কিশোরীলাল জুবিলী" নামে অভিহিত করেন। একবার ঘূর্ণিবাত্যায় ও আর একবার অগ্নিদাহে কলেজগৃহ বিনষ্ট হইলে, তিনি সত্বর উহা পুনর্নিম্মাণ করাইয়া দেন। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দেন। তিনি

"জগন্নাথ কলেজ" ও "কিশোরীলাল জুবিলী স্কুল" সাধারণের সম্পত্তিরূপে এক-ন্যাস-রক্ষক সমিতি (Trustees) গঠন করিয়া তাহার হস্তে অর্পণ করেন।

১৩১৬ বঙ্গাব্দে কিশোরীলাল পরলোক গমন করেন।

কিষণ ভাট—তিনি মানভাউ নামক একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি পৈঠান নামক স্থানের রাজার গুরু ছিলেন। তিনি বেদাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি বহুদেববাদ ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। স্বয়ং একটী নীচ জাতীয়া রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য ব্রাহ্মণেরা তজ্জন্য তাঁহার ঘোরতর বিরোধী হইয়াছিলেন। বহুদেববাদ বেদবিরুদ্ধ ইহা প্রমাণ করিলেও সামাজিক নির্য্যাতন হইতে তিনি নিষ্কৃতি পান নাই। তিনি নির্ভয়ে স্বীয় মত প্রচারে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার উপাস্য দেবতার নাম কৃষ্ণ। তিনি গোলোকবিহারী কৃষ্ণ নহেন। তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম। তাঁহার শিষ্যেরা অন্যের পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন না। মৃতদেহ তাঁহারা অগ্নি সংকার করেন। মধ্যপ্রদেশের অমরাবতী জিলায়ই তাহাদের সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকের বাস।

কিষণ সিংহ—একজন হিন্দু পর্য্যটক। তিনি তিব্বতের অভ্যন্তরে গমন করিয়া লাসা নগরীর মানচিত্র প্রস্তুত করেন এবং উহা ভারত সরকারকে প্রদান করেন।

কিষণ সিংহ—তিনি উদয়পুরের রাণা উদয় সিংহের সপ্তদশ পুত্রের অন্যতম। তিনি ১৬১৩ খ্রীঃ অব্দে কিষণগড় স্থাপন করেন। সহস্রমল, জয়মল ও ভরমল নামে তাঁহার তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে ভরমলের পুত্র হরি সিংহ, হরি সিংহের পুত্র রূপ সিংহ। এই রূপসিংহ কর্ত্তৃক রূপ নগর স্থাপিত হয়। উদয় সিংহের সপ্তদশ পুত্রের বংশ এক শতাব্দী মধ্যে রাজপুতানায় বহু বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

কিসা গোতমী (কৃশা গোতমী)—যে তেরজন নারী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুদ্ধের শিষ্য ছিলেন এবং সাধনার দ্বারা অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচারে তাঁহারা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পালি সাহিত্য তাঁহাদের প্রশংসায় পরিপূর্ণ।

কীর্ত্তি — যে সকল পণ্ডিত তিব্বতে সংস্কৃত অনুবাদের কার্য্য করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি নেপালের অধিবাসী ছিলেন।

কীর্ত্তিচন্দ্র গেন্দেলা — আসাম প্রদেশের আহমবংশীয় নরপতি রাজে

সিংহের সময়ে তিনি বড় বড়ুয়া বা প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে রাজেশ্বর সিংহ রাজপদ লাভ করেন। এইজন্য তিনি অতিশয় গর্ব্বিত ছিলেন। অন্য একজন সেনাপতি রাজার গ্লানিসূচক একখানা পুস্তক রচনা করেন। কীর্ত্তিচন্দ্র রাজগোচরে ইহা আনয়ন করিলে, রাজার আদেশে উক্ত গ্রন্থ ও আরও অনেক গ্রন্থ বিনষ্ট হয়। ইহাতে বহু সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার বিরোধী হন। মোয়ামারী বিদ্রোহে তিনি সেনাপতি রাঘা কর্ত্তৃক নিহত হন।

কীর্ত্তিচন্দ্র দত্ত, দেওয়ান—মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত জঙ্গীপুর নামক গ্রামে ১৭৩৯ খ্রীঃ অব্দে বৈশ্য সুবর্ণবণিক বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক ছিলেন। কীর্ত্তিচন্দ্র ফার্শী ভাষা শিক্ষা করিয়া জঙ্গীপুরের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশম কুঠীতে হাজিরানবিশের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে সেই রেশমকুঠীতে ইলিয়ট নামে এক সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি কীর্ত্তিচন্দ্রের অসাধারণ কার্য্য-নৈপুণ্য, সরল অমায়িক ব্যবহার ও সাধুতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে কুঠীর দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার উপর কুঠীর সমস্ত ভার ন্যস্ত করিলেন এই কার্য্যে কীর্ত্তিচন্দ্র প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি অচির-কালমধ্যে বার্ষিক প্রায় তিন হাজার টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি ক্রয় করিলেন এবং অতি রমণীয় প্রাসাদ তুল্য ত্রিচত্বর দ্বিতল বাটী নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই বাটী উৎসর্গ করিয়া গৃহ প্রবেশকালে স্বীয় গুরুদেব খোষালচন্দ্র অধিকারী মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বাটী দেখিয়া খুব প্রশংসা করাতে কীর্ত্তিচন্দ্র সেই বাটী, সমস্ত তৈজস-পত্রাদি সহ, গুরুদেবকে দান করিলেন। গুরুদেব সেই প্রাসাদবাটী রক্ষায় নিতান্ত অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলে, কীর্ত্তিচন্দ্র সেইসঙ্গে ক্রীত ভূমিসম্পত্তিও তাঁহাকে দান করিয়া, স্বামীস্ত্রী একবস্ত্রে সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই সংবাদ মুহূর্ত্তের মধ্যে চারিদিকে প্রচারিত হইলে, দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার মনিব রেশম কুঠীর ইলিয়ট সাহেবও আসিয়াছিলেন। তিনি নানা প্রকারে তাঁহাকে এই দান যে অন্যায় হইয়াছে, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কীর্ত্তিচন্দ্রের স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও সরল ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা দৃষ্টে নিরস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার পর হইতে কীর্ত্তিচন্দ্রের প্রতি ইলিয়ট সাহেবের শ্রদ্ধা আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া গেল।

এদিকে কীর্ত্তিচন্দ্রের জন্য ইলিয়ট সাহেব অবিলম্বে একটী সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার বসবাসের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সাহেব তাঁহার অর্থাগমেরও যথেষ্ট উপায় করিয়া দিলেন। অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার সুরম্য সৌধমালা পরিবেষ্টিত প্রকাণ্ড বাসভবন, উদ্যানবাটী, রঙ্গমহল প্রভৃতি নির্ম্মিত হইল এবং মালদহের অন্তর্গত দাস্যা নামক মহালের জমিদারী সত্ব তিনি ক্রয় করিলেন। এই সময়ে তিনি নাটোরের রাজার গণকর মহাল জমিদারী নিলাম হইতে ক্রয় করেন। এই সময়ে তাঁহার চরম উন্নতি হইয়াছিল। কথিত আছে তিনি এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে লক্ষ্মীনারায়ণ নামে এক বিগ্রহ পাইয়াছিলেন। সেই বিগ্রহ বৃন্দাবনবিহারী নামে প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ পরগণে গণকর মহাল নামক জমিদারী উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে সমুদয় সদনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া তিনি তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। তাঁহার স্ত্রী রাধামণি পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র মহানন্দ দত্তের হস্তে সমুদয় সংসারের ভার অর্পণ করিয়া বৃন্দাবনে ১২২৪ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে, নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন।

কীর্ত্তিচন্দ্র ধ্বজ সিংহ (রাজা)—মণিপুরের রাজা। ইনি চন্দ্রকীর্ত্তি নামেও পরিচিত। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া কথিত মণিপুর-রাজ বংশে কীর্ত্তিচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কাছাড়-রাজবংশের উচ্ছেদ কারী গম্ভীরসিংহ কীর্ত্তিচন্দ্রের পিতা। তিনি ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে অল্প বয়সে মণিপুরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে, সেনাপতি নরসিংহ দশবৎসর রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। অতঃপর কীর্ত্তিচন্দ্রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে রাজপদ লাভ করেন। ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে নরসিংহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র চৌবাসিংহের সহায়তায় কীর্ত্তিচন্দ্র পুনরায় সিংহাসন লাভ করেন ও চৌবাকে যুবরাজ মনোনীত করেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে কোহিমা অধিকার কালে ইংরাজ সরকারকে সহায়তা করিয়া তিনি সম্মানজনক কে, সি, এস্ আই, উপাধিভূষিত হন। তাঁহার সুযোগ্য শাসনে মণিপুর রাজ্য ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ১৮৮৬খ্রীঃ অব্দে কীর্ত্তিচন্দ্র পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শূরচন্দ্র সিংহাসন লাভ করিলে, কীর্ত্তিচন্দ্র কর্তৃক মনোনীত যুবরাজ চৌবাসিংহ রাজপদ প্রাপ্তির জন্য ষড়যন্ত্র করায় ইংরাজ সরকারকর্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। অতঃপর ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে শূরচন্দ্রের

বিরোধ ঘটিলে, তিনি নির্ব্বাসিত হন ও টিকেন্দ্রজিৎকে নির্ব্বাসিত করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া কুলচন্দ্র মণিপুরের সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু অঙ্গীকার অনুযায়ী কার্য্য না করায়, ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে সেই বিষয়ের মীমাংসার জন্য মণিপুর গমন করিয়া, আসামের তৎকালীন চীফ কমিশনার কুইণ্টন (Chief Commissioner Queenton) সদলে নিহত হন। ইহার ফলে মণিপুর যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ বন্দী হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। অতঃপর রাজা নরসিংহের পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক পৌত্র চুড়া চাঁদ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মণিপুরের সিংহাসনে স্থাপিত হন।

কীর্ত্তিচন্দ্র রায়—লাহোরের কাপুর ক্ষত্রিয় জাতীয় বৰ্দ্ধমান রাজবংশে কীর্ত্তিচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক রাজা উপাধি ভূষিত জগৎরাম রায় তাঁহার পিতা এবং রাণী বিষ্ণুকুমারী তাঁহার মাতা। ১৭০২ খ্রীঃ অব্দে জগৎরাম গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইলে, কীর্ত্তিচন্দ্র পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করেন এবং পর বৎসর বাদশাহ আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে সনদ ও পৈতৃকপদ লাভ করেন। তিনি তাঁহার পিতামহ কৃষ্ণরাম রায়ের হত্যাকারী ও তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চেতুয়ার রাজা শোভা সিংহের ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ ও বৰ্দ্ধমান বিদ্রোহের অপর দুই নেতা মেদিনীপুর চন্দ্রকোণার জমিদার রঘুনাথ সিংহ ও বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহকে পরাস্ত করিয়া প্রথমোক্ত দুইজনের রাজ্য ও গোপাল সিংহের প্রসিদ্ধ তরবারি কাড়িয়া লন। এতদ্ভিন্ন তিনি হুগলী জেলার বেলঘরিয়া ও ভুরশুট প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণের জমিদারী এবং হুগলী ও তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী রামনগর গ্রামের রাজা রঘুনাথ সিংহের বালিগড় পরগণার রাজপুত রাজা জয় করেন। এইরূপে স্বীয় বাহুবলে কীর্ত্তিচন্দ্র বৰ্দ্ধমান রাজ্য প্রভূত পরিমাণে বিস্তৃত করেন। ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দে রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

কীর্ত্তিচন্দ্র সিংহ—মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত নশীপুরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজবংশে রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পিতা। ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে কৃষ্ণচন্দ্র পরলোকগমন করিলে কীর্ত্তিচন্দ্র রাজপদ প্রাপ্ত হন ও নশীপুরের বিবিধ শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিযুক্ত হন। নশীপুরের বর্ত্তমান প্রাসাদ তিনিই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি শিক্ষিত, তেজস্বী ও ধর্ম্মপরায়ণ জমিদার ছিলেন। পদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহার উপর প্রীত ছিলেন এবং তাঁহাকে সম্মান করিতেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

কীর্ত্তিচাঁদ (রাজা)—ইনি বাঙ্গালার নবাব দরবারের উচ্চ পদস্থ রাজ কর্ম্মচারী রায় রায়ান আলমচাঁদের পুত্র। বিহারে মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠানকালে তিনি প্রভুভক্তি, বিশ্বস্ততা ও অন্যান্য বিবিধ গুণের জন্য নবাব আলিবর্দ্দির জামাতা ও সিরাজউদ্দৌলার পিতা জৈনউদ্দীনের প্রীতি লাভ করেন। আফগান সর্দ্দারগণের বিদ্রোহে তাঁহার প্রভুভক্তির জন্য এবং রাজস্ব সম্পর্কিত কতকগুলি অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য বিষয় নবাবের দৃষ্টিগোচর করাইয়া নবাবের অনুগ্রহে তিনি বঙ্গের দেওয়ানী পদ লাভ করেন। অতঃপর পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি দলিলপত্র দ্বারা জগৎশেঠ, বৰ্দ্ধমানের মহারাজা প্রমুখ কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হইতে নবাব সরকারের প্রাপ্য ক্রোড়াধিক টাকা আদায় করিয়া তিনি রাজকোষ পূর্ণ করেন। কয়েক বৎসর মাত্র দেওয়ানী করিয়াই তাঁহার মৃত্যু হয়।

কীর্ত্তিধর — বিখ্যাত ত্রিপুরাধিপতি ধর্ম্মধরের পুত্র কীর্ত্তিধর একজন প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। তাঁহার অন্যনাম সিংহতুঙ্গ বা ছেংথুমফা। তিনি সত্যনিষ্ঠ, ঈশ্বর-ভক্তি-পরায়ণ ও রণ নিপুণ ছিলেন। তাঁহার মহিষীও বীরাঙ্গনা ছিলেন। তিনি মিহিরকুল রাজ জয় করিয়া ত্রিপুর রাজ্য সীমা মেঘন নদীর-তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। কসময়ে হীরাবন্ত নামে একজন সামন্ত নৃপতি বিদ্রোহী হন। কিন্তু ত্রিপুরাপতির ভয়ে তৎকালীন গৌড়ের মুসলমান নৃপতির সাহায্যার্থী হন। গৌড়াধিপ গিয়াসউদ্দিন হীরাবন্তের সাহায্যার্থ একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু ত্রিপুর রাজ মহিষী সেই সৈন্য দলকে বিতাড়িত করিয়া হীরাবন্তকে বন্দী করেন। মহারাজ কীর্ত্তিধরের পুত্র রাজসূর্য্য (আচঙ্গফা)।

কীর্ত্তিনাথ উপাধ্যায় — নেপালে রাজ্য স্থাপয়িতা মিথিলার রাজা হরিসিংহ দেবের বংশের রাজকুমারী রাজল্ল দেবীর স্বামী, নেপালের প্রাচীন মল্লবংশীয় জয়স্থিতি মল্লের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে নেপালে বৃহত্তর মিথিলা গঠন-প্রয়াসী হরি সিংহ দেবের আরব্ধ কার্য্যের সমাপনের জন্য ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি সম্পাদন মানসে যে পঞ্চ মৈথিলী ব্রাহ্মণ নেপালে আনয়ন করেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। অপর চারিজনের নাম—রঘুনাথ ঝা, শ্রীনাথ ভট্ট, মহীনাথ ভট্ট ও রমা নাথ ঝা।

কীর্ত্তিনারায়ণ শাস্ত্রী—তিনি নান্নার নিবাসী একজন কবি। সংস্কৃত ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই বহু কবিতা রচনা করেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল।

কীর্ত্তিবর্ম্মা—(১) তিনি ১০৪৯—১১০০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত চন্দেল্লের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণমিশ্র তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। কীর্ত্তিবর্ম্মার সেনাপতি ব্রাহ্মণ জাতীয় গোপাল, চেদীবংশীয় কর্ণদেবকে পরাস্ত করিয়া কীর্ত্তিবর্ম্মাকে পুনঃ সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

কীর্ত্তিবর্ম্মা— (২) মহারাষ্ট্রের চালুক্য-বংশীয় নরপতি পুলকেশীর প্রথম পুত্র। তাঁহার মাতার নাম দুল্লভাদেবী। তিনি উত্তর কানাড়ার কদম্ব নরপতি ও উত্তর কঙ্কনের মৌর্য্য নরপতিদিগকে পরাজিত করেন। তিনি ৫৬৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মঙ্গলীশ রাজ্য লাভ করেন। পুলকেশী প্রথম দেখ। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী একজন রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট ছিলেন।

কীর্ত্তিবর্ম্মা— (৩) মহারাষ্ট্রের চালুক্য-বংশীয় নরপতি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের পুত্র কীর্ত্তিবর্ম্মা (২য়) ৭৪৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনিই এই বংশের শেষ নরপতি। তাঁহাদেরই সামন্ত নরপতি রাষ্ট্রকুটের রাজা দন্তীদুর্গ কর্ত্তৃক তিনি পরাজিত হন। সম্ভবতঃ তাঁহারাই আবার রাষ্ট্রকুট নরপতিদের সামন্ত শ্রেণীতে পরিণত হইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। (পুলকেশী প্রথম ও দ্বিতীয় দেখ)। ঐ বংশীয় নরপতি প্রথম পুলকেশীর মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিবর্ম্মা রাজা হন। তিনি ৫৯০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি তাঁহার পিতারই ন্যায় অতিশয় পরাক্রমশালী ছিলেন। উত্তর কঙ্কন ও উত্তর কানাড়া প্রদেশ জয় করিয়া তিনি নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা মঙ্গলীশ সিংহাসন অধিকার করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী মঙ্গলীশকে ও তাহার পুত্রকে পরাস্ত ও বধ করেন। এই গৃহ বিবাদের সময়ে রাষ্ট্রকূটবংশীয় গোবিন্দ বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। পরে পুলকেশীর সদয় ব্যবহারে শত্রুতা মিত্রতায় পরিণত হয়।

কীর্ত্তি বিজয়—তিনি হীর বিজয় সূরীর শিষ্য ছিলেন। স্বীয় গুরুর ন্যায় তিনিও একজন অসাধারণ দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। শ্বেতাম্বর জৈন পণ্ডিত হীর বিজয় ১৫২৬-১৫৯৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

কীর্ত্তিরাজ — নীলপুরাধিপতি কীর্ত্তি রাজ, কাশ্মীরপতি কলস রাজের সামন্ত নরপতি ছিলেন। এই কীর্ত্তি রাজের কন্যা ভুবনমতীকে কলস রাজ বিবাহ করিয়াছিলেন (১০৮১-১০৮৯ খ্রীঃ অব্দ) এই বিবাহের ফলে কলস রাজের

শত্রুরা অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। তিনিও শ্বশুরের সাহায্য লাভ করিয়া অতিশয় বলশালী হইয়াছিলেন।

কীর্ত্তিসিংহ, মহারাজা — তিনি মিথিলার রাজা ছিলেন। তাঁহারই আদেশে কবি বিদ্যাপতি 'কীর্ত্তি নাগ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

কীলহ—একজন বৈষ্ণব গুরু। প্রসিদ্ধ ভক্তমাল গ্রন্থ প্রণেতা নাভাজীকে তিনি ও তদীয় সহচর অগ্রদাস অরণ্যে অসহায় অবস্থায় পাইয়া স্বীয় আলয়ে আনয়ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করেন। তিনি খাকি নামে একটী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। রামানন্দের শিষ্য আশানন্দ, আশানন্দের শিষ্য কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাসের শিষ্য কীলহ। খাকিদের আচার ব্যবহার শাক্ত ও বৈষ্ণব অনুষ্ঠান মিশ্রিত। জয়পুর নগরে তাঁহার মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। নাভাজী দেখ।

কুক্কুট নাথ—তিনি নাথ পন্থীদের ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষের একজন। অপান নাথ দেখ।

কুক্কুরী—সিদ্ধাচার্য্য গণের মধ্যে যাঁহারা চর্য্যাপদ বা কীর্ত্তনের গান রচনা করিয়া ছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। ইনি মহামায়ার আরাধনা করিতেন এবং বজ্রযানের সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

কুক্কুরী পাদ—তিনি একজন উড়িষ্যা দেশবাসী সিদ্ধাচার্য্য। তিব্বতের বৌদ্ধ মন্দিরে রক্ষিত তাঁহার প্রতিকৃতির সহিত একটী কুক্কুরেরও প্রতিকৃতি রহিয়াছে। তাঁহার রচিত বৌদ্ধ চর্য্যাপদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি বিক্রমপুর বিহারে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

কুচুমার — যে ছয়জন পণ্ডিত বাৎসায়নের কামসূত্র অবলম্বনে সংক্ষিপ্ত কামশাস্ত্র রচনা করেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম।

কুচনাচার্য্য— দাক্ষিণাত্যের তৈলঙ্গ কুচনাচার্য্য সারণি বা পদক নির্ম্মাণের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। তাঁহার সারণির নাম গ্রহচক্র। ১২৯৮ খ্রীঃ অব্দে (১২২০ শকে) পঞ্চাঙ্গ বা সপ্তাঙ্গ গণনার নিমিত্ত এই সারণির সৃষ্টি হয়। বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ এই পাঁচটী বিষয় থাকে বলিয়া ইহার নাম পঞ্চাঙ্গ। এতদ্ভিন্ন রবি ও চন্দ্রের স্থানও প্রাচীন পঞ্জিকায় প্রদত্ত হইত; এইজন্য ইহার নাম সপ্তাঙ্গও হইয়াছিল। গ্রহ চক্রের একখানি টীকা মাকণ্ডেয় পুত্র মাগুলি পাঠী উড়িয়া ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন।

কুজগণ দেব—হর্ষ রাজের মৃত্যুর পরে কুজগণ দেব অজয় মেরুর (বর্ত্তমান আজমীর) রাজা হইয়া ছিলেন। তিনি গজনীর অধিপতি সবক্তিগিনকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দ্বাদশ সহস্র অশ্ব লাভ করিয়াছিলেন। স্বীয় জয় লাভের চিহ্ন স্বরূপ 'সুলতানগ্রহ' উপাধি গ্রহণ

করিয়াছিলেন। এই সবকৃতিগিন নাজির উদ্দিন নামে ভট্ট গ্রন্থে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধর বিশাল দেবও প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনিও মুসলমানদিগকে বিশেষরূপে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়া ছিলেন। বিশাল দেব দেখ।

কুট্টাকার শিরোমণি—তিনি ভূলজরাজকৃত "বাক্যামৃত" গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন।

কুনাল (কুণাল)—মগধরাজ সম্রাট অশোকের পুত্র। কেহ কেহ উক্ত চরিত্রের ঐতিহাসিকতায় সন্দেহ করিয়াছেন। যাহা হউক বুদ্ধ চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে কুনাল সম্বন্ধে যে সুন্দর উপাখ্যানটী বর্ণিত আছে তাহা এইরূপ—রাজমহিষী পদ্মাবতী (মতান্তরে অসন্ধিমিত্রা) কুনালের জননী এবং কাঞ্চনমালা তাঁহার পত্নী। কুনাল অতিশয় রূপবান ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ রূপে, বিশেষতঃ তাঁহার আঁখিদ্বয়ের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার বিমাতা তাঁহার প্রণয়াসক্ত হন এবং স্বীয় অসদভিপ্রায় কুনালের নিকট ব্যক্ত করেন। ধর্ম্মপরায়ণ কুনাল পাপীয়সী তিষ্যরক্ষার এই পাপ প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করেন।

মহারাজ অশোক একদা গুরুতর পীড়ায় তিষ্যরক্ষার পরিচর্য্যায় আরোগ্য লাভে তাহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহার প্রার্থনা অনুসারে সপ্তাহের জন্য তাঁহাকে শাসনভার অর্পণ করেন। কুনাল এই সময় পিতার আদেশে বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত তক্ষশিলা গমন করেন। পাপিষ্ঠা তিষ্যরক্ষা রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াই তাঁহার প্রণয় প্রত্যাখ্যানকারী কুনালের চক্ষু উৎপাটন করিবার জন্য তক্ষশিলার শাসনকর্ত্তাকে আদেশ প্রেরণ করিলেন। এই আদেশ পত্র কুনালের হস্তে পতিত হইলেও, তিনি উহা গোপন করিবার কিছু মাত্র চেষ্টা না করিয়া, রাজাজ্ঞা মনে করিয়া এই নিষ্ঠুর আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত হইলে, ভিক্ষুক বেশে তক্ষশিলা ত্যাগ করেন। তাঁহার পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী কাঞ্চনমালাও তাঁহার অনুগমন করেন। অবশেষে তাঁহারা বহু কষ্টে রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে উপস্থিত হন। প্রাসাদদ্বারে সুমধুর বীণাধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহারাজ অশোক এই অন্ধ বীণাবাদককে তাঁহার পুত্র বলিয়া চিনিতে পারেন এবং যুগপৎ হর্ষ বিষাদে অভিভূত হন। অতঃপর কুনালের মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, মহারাজ অশোক পাপীয়সী মহিষী তিষ্যরক্ষার প্রাণ সংহারের আদেশ প্রদান করেন; কিন্তু কুনালের বিনীত প্রার্থনায় উক্ত আদেশ প্রত্যাহার করেন।

অশোকের মৃত্যুর পর কুনাল মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং

কুনালের পরলোক গমনে তৎপুত্র সম্প্রাতি রাজপদ লাভ করেন।

কুণ্ডবৈয়ার—তিনি চোল রাজ্যের অধিপতি প্রথম রাজরাজের কন্যা। পূর্ব্বদেশীয় বেঙ্গীর চালুক্যবংশীয় নরপতি বিমলাদিত্যের মহিষী ছিলেন।

কুণ্ডরায়—তিনি মুলতানের অধিপতি ছিলেন। মোহাম্মদ বিন্ কাশিম (৭১২ খ্রীঃ) মুলতান আক্রমণ করিলে তিনি ও দাহিরের পিতৃব্য পুত্র বৎসরাজ তাঁহার সঙ্গে দুই মাসের অধিককাল যুদ্ধ করিয়া নগর রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে এক স্বদেশদ্রোহীর জন্য নগরের পতন হয়। মোহাম্মদ বিন্-কাশিম দেখ।

কুণ্ডল কেশরী—তিনি উড়িষ্যার কেশরী বংশীয় একজন স্বাধীন নরপতি ছিলেন। তিনি পরম শিবভক্ত ছিলেন এবং ৮১১-৮২৯ খ্রীঃ অব্দে পুরীর বিখ্যাত মার্কণ্ডেশ্বর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় নবম শতকের প্রথম পাদ ও দ্বিতীয় পাদের কয়েক বৎসর।

কুণ্ডাদিত্য—চালুক্য বংশের একজন সামন্ত নরপতি। তাঁহাদের উপাধি পট্টবর্দ্ধন ছিল।

কুতব আলম—তাঁহার প্রকৃত নাম শেখ (সৈয়দ) বুরহান উদ্দীন, কিন্তু তিনি কুতব আলম্ নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি মকদুম জাহানিয়ান সৈয়দ জালাল বৌখারীর পৌত্র এবং একজন দরবেশ। গুজরাতেই তিনি অবস্থান করিতেন এবং আহম্মদাবাদের ছয় মাইল দূরে বাতুহ নামক স্থানে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে, সেইখানেই সমাহিত হন। তাঁহার পুত্র শাহ আলমও একজন ধার্ম্মিক লোক ছিলেন এবং গুজরাতেই তনুত্যাগ করেন।

কুতব আলম—তিনি একজন বিখ্যাত দরবেশ। তাঁহাক প্রকৃত নাম শেখ নুর উদ্দীন আহাম্মদ। লাহোর নগরে তাঁহার জন্ম হয়। কিন্তু বিহারের অন্তর্গত পিড়ুয়া নামক স্থানে তিনি পরলোক গমন করেন ও তথায়ই তিনি সমাহিত হন। প্রসিদ্ধ দরবেশ হিসাম উদ্দীন দরবেশ তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

কুতব উদ্দিন আইবাক—তাঁহার একটা অঙ্গুলী কাটা ছিল বলিয়া তিনি আইবাক নামে কথিত হইতেন। তিনি তুর্কি স্থানের একজন ক্রীতদাস ছিলেন। একজন বণিক বাল্যকালে তাঁহাকে নিশাপুরের শাসনকর্ত্তা ফকির উদ্দিনের নিকট বিক্রয় করেন। সদাশয় ফকির উদ্দিন স্বীয় সন্তানগণের সহিত তাঁহারও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কুতব কুরাণ পাঠ, অশ্বারোহণ, ধনুর্বিদ্যা, প্রভৃতি নানা বিদ্যায় অচিরকাল মধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যৌবন প্রাপ্ত হইলে ফকির উদ্দিন তাঁহাকে এক বণিকের

নিকট বিক্রয় করেন। বণিক গজনী নগরে আগমনপূর্ব্বক তথাকার ভূপতি মোহাম্মদ ঘোরীর নিকট তাঁহাকে বিক্রয় করেন। একদিন মোহাম্মদ ঘোরী তাঁহার ভৃত্যদের মধ্যে কিছু অর্থ বিতরণ করেন। কুতব উদ্দিন তাহার অংশে যাহা পাইয়াছিলেন, সেই সমস্ত অধীনস্থ ভৃত্যদের মধ্যে বিতরণ করিয়া বলিলেন — 'স্বয়ং ভূপতি যাহার সহায় তাঁহার অভাব কিছুই নাই।' এই কথা ক্রমে মোহাম্মদ ঘোরীর কর্ণগোচর হইল। ইহাতে তিনি এত দূর সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহাকে বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কেবল তাহাই নহে অল্পকাল মধ্যেই তিনি অশ্বশালার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। মোহাম্মদ ঘোরীর খোরাসান আক্রমণ সময়ে, তিনি তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। ইহার কিছুদিন পরে একদিন তিনি অশ্বারোহণে অসতর্কভাবে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় খোরাসানিরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু মোহাম্মদ ঘোরী খোরাসানপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। তৎপরে তাঁহাকে একটী প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করেন। ১১৯৩ খ্রীঃ অব্দে কুতব উদ্দিন মোহাম্মদ ঘোরীর সঙ্গে প্রথম ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১১৯১ খ্রীঃ অব্দে মোহাম্মদ ঘোরী একবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন। পরে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্যই মোহাম্মদ ঘোরী পরে এক বিপুল সৈন্য বাহিনীসহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। যুদ্ধ জয় অনেক সময় বুদ্ধি কৌশলেও হয়। পৃথ্বীরাজ, মোহাম্মদ ঘোরীর অপেক্ষা অনেক বেশী সৈন্য লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। দৃষদ্বতীর উভয় তীরে সৈন্যদল সমবেত হইলে পৃথ্বীরাজ, ঘোরীকে প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিতে বলিলেন। ঘোরী বলিলেন—'তিনি তাঁহার ভ্রাতার কর্ম্মচারী মাত্র। তাঁহাকে পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলাম। প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ না আসা পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত থাকুক।' পৃথ্বীরাজ এই বাক্যে আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক অসতর্ক হইলেন। সৈন্যেরা আমোদ প্রমোদে মত্ত হইল। মোহাম্মদ ঘোরী অতি মনোযোগের সহিত শত্রুর এই অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে হিন্দু সেনাপতি গোবিন্দ রায় নিহত হইলেন। পৃথ্বীরাজ বন্দী হইয়া নৃশংসভাবে নিহত হইলেন। নব বিজিত রাজ্যের শাসন ও সংরক্ষণের ভার কুতব উদ্দিনের হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি বহু ধন রত্ন ও বহু হিন্দু বন্দীসহ স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

কুতব উদ্দিন দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া, মোহাম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি-রূপে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন ইহার কিছুকাল পরেই তিনি আলীগড় স্বীয় অধিকারভুক্ত করিলেন। তাহার পর বৎসর (১১৯৪ খ্রীঃ অব্দে) মোহাম্মদ ঘোরী কনৌজ ও বারাণসী আক্রমণ করিতে অভিলাষী হইয়া ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করেন। কুতব উদ্দিন লুণ্ঠিত দ্রব্য সামগ্রীসহ প্রভুর প্রত্যুদ্গমন করিলেন। মোহাম্মদ ঘোরী কুতব উদ্দিনের বীরত্বে ও বিশ্বস্ততায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই কনৌজ ও বারাণসী আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। কুতব সসৈন্যে কনৌজে উপস্থিত হইয়া মহারাজা জয়চন্দ্রকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। মোহাম্মদ ঘোরীকে আহ্বান করিয়া পৃথ্বীরাজকে নিহত করিবার ফল তিনি ভোগ করিয়া পরলোকগত হইলেন। তাঁহার বংশধরেরা রাজপুতানার মরুভূমিতে আশ্রয় লইলেন। তৎপরে কুতব উদ্দিন বারাণসী ও বিহারের কোনও কোনও স্থান লুণ্ঠনপূর্ব্বক, প্রায় সহস্রাধিক দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া বিপুল ধনরাশি মোহাম্মদ ঘোরীকে উপহার প্রদান করেন। অতঃপর মোহাম্মদ ঘোরী কুতব হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক গজনীতে প্রত্যাগত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে ১২০৬ খ্রীঃ অব্দে ঘোরী গোক্ষুর দিগকর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মাহমুদ ঘোরী ঘোর রাজ্যের অধিপতি হইয়া কুতব উদ্দিনকে ভারতবর্ষের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করেন। মোহাম্মদ ঘোরীর অন্যতম সেনাপতি এলাদাজ খাঁ গজনীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মোহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পরে এলাদাজ খাঁ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তিনি শুধু গজনীর অধিকার লইয়াই তৃপ্ত রহিলেন না। তিনি রাজ্য বিস্তারে অভিলাষী হইয়া লাহোর নগরে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। কুতব উদ্দিন তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া গজনী পর্য্যন্ত অধিকার করিলেন। এদিকে অত্যল্প কাল মধ্যেই এলাদাজ খাঁ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কুতব উদ্দিনকে ভারতবর্ষে বিতাড়িত করিলেন। মোহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পরে কুতব উদ্দিন মাত্র চারি বৎসর জীবিত ছিলেন। ১২১০ খ্রীঃ অব্দে লাহোর-নগরে ঘোড়দৌড়ের সময় ঘোড়া হইতে পড়িয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ন্যায়পরায়ণ, দানশীল ও শৌর্য্যবীর্য্যশালী নরপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অর্থ বিতরণে মুক্তহস্ত ছিলেন। এজন্য লোকে তাঁহাকে 'লক্ষ মুদ্রা প্রদাতা' এই উপাধি প্রদান করিয়াছিল। উত্তরকালে কেহ অর্থ বিতরণে কার্পণ্য না করিলে, তাঁহাকে দ্বিতীয় কুতব উদ্দিন আখ্যা প্রদান করা হইত

বস্তুতঃ তিনি নানাগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়াই ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলমান রাজত্ব স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার স্থাপিত বংশ ইতিহাসে 'দাস বংশ' নামে খ্যাত। কারণ কুতব উদ্দিন হইতে আরম্ভ করিয়া এই বংশের প্রসিদ্ধ কয়েকজন রাজাই প্রথমে ক্রীত দাস ছিলেন। এই বংশের নিম্ন লিখিত কয়েকজন রাজা হইয়াছিলেন—

নাম খ্রীঃ অব্দ।

১। কুতব উদ্দিন—১২০৬—১২১০

২। আরাম (কুতব উদ্দিনের পুত্র) ১২১১

৩। শামস উদ্দিন আল্‌তমাস (কুতব উদ্দিনের জামাতা) ১২১১—১২৩৫

৪। রুকণ উদ্দিন (আলতমাসের পুত্র) ১২৩৫

৫। রেজিয়া, সুলতানা (আলতমাসের কন্যা) ১২৩৬—১২৩৯

৬। বহরম শাহ (আলতমাসের পুত্র) ১২৩৯—১২৪১

৭। আলাউদ্দিন মসায়ুদ (রুকন উদ্দিনের পুত্র)—১২৪১—১২৪৬

৮। নাসির উদ্দিন মাহমুদ (আলত-মাসের পুত্র)—১২৪৬—১২৬৫

৯। গিয়াসউদ্দিন বুল্‌বন্ (আলতমাসের ক্রীতদাস ও জামাতা) ১২৬৫—১২৮৭

১০। কৈকুবাদ (আলতমাসের পৌত্র) ১২৮৭—১২৯০

কুতব উদ্দিন তাঁহার ভারত বিজয় চিরস্মরণীয় করিবার জন্য দিল্লীর কুতব মিনার নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার জীবিত কালে উহা শেষ হয় নাই। তাঁহার ক্রীতদাস ও জামাতা সম্রাট আলতমাসের সময়ে উহার নির্ম্মাণ শেষ হয়। দিল্লীর বিখ্যাত কুতব মসজিদও কুতব উদ্দিন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

কুতব উদ্দীন খাঁ কুকলতাস—তাঁহার পূর্ব্ব নাম খুবন অথবা খুবু। তিনি শেখ সলিম চিস্তির ভাগিনেয় এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের ধাত্রী ভাই। সম্রাট তাঁহাকে পাঁচ হাজারী মনসবদারী প্রদান করিয়াছিলেন ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন। বর্দ্ধমানে শের আফগানের (নূর-জাহানের পূর্ব্বস্বামী) হস্তে তিনি নিহত হন এবং ফতেপুর সিক্রিতে তাঁহার মৃত-দেহ প্রেরিত ও সমাহিত হয়।

কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী, খোজা—দিল্লীর একজন বিখ্যাত মুসলমান সাধক। তিনি সাধারণতঃ কুতব শাহ নামেই পরিচিত। পারস্যের উশি স্থানে তাঁহার জন্ম বলিয়া কখনও কখনও উশি নামেও পরিচিত ছিলেন। ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাচীন দিল্লী নগরে পর-লোক গমন করেন এবং তথায় সমাহিত হন। তিনি একজন কবিও ছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি ফকির উদ্দীন শকরগঞ্জ তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

কুতব উদ্দীন মনোয়ার শেখ—হানসির একজন মুসলমান সাধক এবং শেখ জামাল উদ্দীন আহম্মদের পৌত্র। তিনি সুলতান ফিরোজ শাহ বারবক ও বিখ্যাত দরবেশ শেখ নাসির উদ্দীন চিরাগ-ই দিল্লীর সমসাময়িক। তিনি এবং শেখ নাসির উভয়েই শেখ নিজাম উদ্দীন আওলিয়ার শিষ্য ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় উভয়েই ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। নাসির উদ্দীন দিল্লীতে এবং কুতব উদ্দীন হানসীতে সমাহিত হন।

কুতব উদ্দীন মামুদ লঙ্গা—মূলতানের লঙ্গা বংশীয় দ্বিতীয় ভূপতি। দিল্লীর সম্রাট বহলোল লোদীর সময়ে তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা এবং জামাতা শেখ ইউসুফকে বন্দী করিয়া দিল্লী প্রেরণ করেন। পরে স্বয়ং মূলতানের অধিপতি হন। ষোল বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হুসেন লঙ্গা মূলতানের সিংহাসন লাভ করেন।

কুবের—কলিঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত দেবরাষ্ট্র নামক স্থানের তিনি রাজা ছিলেন। তিনি গুপ্ত বংশীয় নরপতি সমুদ্রগুপ্তকে দাক্ষিণাপথ আক্রমণ করিতে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন।

কুবের পণ্ডিত—তিনি প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যের পিতা। ১৪৩৪ খ্রীঃ অব্দে অদ্বৈতাচার্য্যের জন্ম হয়। অদ্বৈতাচার্য্য দেখ। কুবেরের পত্নী নাভাদেবী ১৪৩৪ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গের প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যকে প্রসব করেন।

কুবের মিশ্র—তিনি 'ভাস্বতি ব্যাখ্যা' নামে জ্যোতিষের এক করণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা ১৬০৭ শকে (১৬৮৫ খ্রীঃ অব্দে) রচিত হইয়াছিল।

কুবেরাচার্য্য—তিনি কুবের তর্ক-পঞ্চানন নামেও খ্যাত ছিলেন। বঙ্গের স্বাধীন নরপতি রাজা গণেশের প্রধান মন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়ালের পুত্র কুবেরাচার্য্য শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়ের স্বাধীন ব্রাহ্মণ নরপতি দিব্য সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'দত্তক চন্দ্রিকা' অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

কুব্জ বিষ্ণু বৰ্দ্ধন—তিনি চালুক্য বংশীয় রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশীর ভ্রাতা এবং উক্তবংশীয় প্রথম কীর্ত্তি বর্ম্মার পুত্র। দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহাকে পূর্ব্ব উপকূলে বেঙ্গী রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পূর্ব্ব দেশীয় চালুক্য শাখা দীর্ঘকাল তথায় রাজত্ব করেন। পুলকেশী প্রথম (দ্বিতীয়) দেখ। কুব্জ বিষ্ণু বর্দ্ধন ৬১৫—৬৩৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

কুমরদেবী—তিনি অঙ্গদেশের অধিপতি মদন দেবের কন্যার কন্যা ছিলেন। রাজা মদন দেবের ভগিনীকে পালবংশীয় বঙ্গাধিপ তৃতীয় বিগ্রহ পাল বিবাহ

করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহ পালের পুত্র প্রসিদ্ধ রামপাল। মদন দেবের কন্যা শঙ্করদেবীর গর্ভে কুমরদেবী জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। গাড়োয়াল দেশের অধিপতি চন্দ্রদেবের পৌত্র, এবং মদন দেবের পুত্র, গোবিন্দ চন্দ্রের সহিত কুমরদেবীর বিবাহ হইয়াছিল। এই কুমরদেবী একটী বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন।

কুমার—স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি বিমারের পুত্র মহারাজ কুমারচন্দ্র হইতে অধস্তন ১০১ম, ও ত্রিপুর হইতে অধস্তন ৫৬তম নরপতি ছিলেন। বরবক্র নদী তীরে পূর্ব্বে তাহার রাজধানী ছিল। তিনি তথা হইতে ছাম্বুল নগরে (বর্ত্তমান টকলা সহরে) সুবড়াই খুঙ্গ নামক শিবের আরাধনা করিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর তাহার পুত্র সুকুমার রাজা হইয়াছিলেন। ত্রিপুর দেখ।

কুমার কলস—তীব্বতীয় টেঙ্গুর হইতে যেসকল বৌদ্ধ সহজিয়া আচার্য্যের নাম পাওয়া গিয়াছে, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। অপর আচার্য্যগণের নাম—আচার্য্য কালপাদ, কঙ্কালিন বা কুম্ভকার, কুশলী পাদ, তেলিপ বা তৈলিক পাদ ও উপাধ্যায় জয়দেব।

কুমারকৃষ্ণ দত্ত—কলিকাতার অন্তর্গত হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তপরিবারে কুমার কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত এটর্ণী ছিলেন। ১৯২১ খ্রীঃ অব্দে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁহার পরমবন্ধু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় গ্রেপ্তার হইলে, তিনি চিরতরে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। সাধুতা ও ন্যায় পরায়ণতার জন্য তিনি সর্ব্বজন সমাদৃত ছিলেন।

তিনি সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর আন্দোলনে যোগদান করিতেন। দরিদ্র নারায়ণের সেবায়, দেশে শিক্ষা বিস্তারে ও কৃষির উন্নতি বিধানে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি প্রভূত পরিশ্রম করেন। তিনি শিক্ষা ও কৃষি সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করেন এবং কুসুমা নামক স্থানে একটি আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া কৃষি শিক্ষা দানের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১৯৩১ খ্রীঃ অব্দের ১লা নবেম্বর রবিবার তিনি ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

কুমারচন্দ্র—তিব্বতীয় টেঙ্গুর হইতে নানা বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণেতা যে সকল বজ্রাচার্য্যের নাম পাওয়া গিয়াছে, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। অন্যান্য বজ্রাচার্য্যগণ—বরেন্দ্রবাসী মহাচার্য্য চন্দ্র গোমিন্, কায়স্থাচার্য্য টঙ্কদাস, জগদ্দলবাসী বিভূতিচন্দ্র, জ্ঞানশ্রী বা জ্ঞানবজ্র, কায়স্থ মহোপাধ্যায় গয়াধর, মহাচার্য্য কায়স্থ তথাগত রক্ষিত, সরহ বা রাহুল ভদ্র,

বৈরোচন বজ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, দুর্জ্জয় চন্দ্র, নারো বা নাড়পাদ, প্রজ্ঞা-বর্ম্মা, রাহুলশ্রী, লুইপাদ, বিদ্যাকর সিংহ, সিদ্ধাচার্য্য জালন্ধরী পাদ, ভুসুকু, কানুপা বা কৃষ্ণাচার্য্য, ধর্ম্মপাদ বা ধমপা, কম্বল বা কামলী, কম্বল বংশে কঙ্কণ, বিরূপ শান্তিপাদ, শবরীপাদ, চাটিল, কুক্কুরীপাদ, অদ্বয়বজ্র, লীলাপাদ, থগণ, মৈত্রীপাদ, গুরু ভট্টারক বুদ্ধি জ্ঞান, মাতৃচেট, মহা-সুগতা বজ্র, মগধ-রাজ ডোম্বী হেরুক ও আচার্য্য তারিণী সেন।

কুমার চন্দ্র অবধূত—তিনি একজন সিদ্ধাচার্য্য। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম —'কৃষ্ণযমারি তন্ত্রস্য পঞ্জিকা রত্নাবলী'।

কুমারগুপ্ত—(১) মালবের গুপ্তবংশীয় সম্রাট প্রথম জীবিত গুপ্তের পুত্র। মালবের গুপ্তবংশের সহিত কনৌজের মৌথারী বংশের চির শত্রুতা ছিল। কুমারগুপ্ত তাঁহার পিতার মতই, তাঁহার সমসাময়িক কনৌজপতি শোনবর্ম্মার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

কুমারগুপ্ত—(২) মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ গুপ্ত বংশীয় সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের প্রপৌত্র এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র। (৪১৩—৪৫৫ খ্রীঃ) তিনি নির্ব্বিবাদে সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার অধিকারকালে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছু ঘটে নাই। কুমার গুপ্তের পুত্র স্কন্দ গুপ্ত। এই গুপ্তবংশীয় রাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মা বলম্বী ছিলেন। মহাকবি কালিদাস এই কুমারগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া একটি মত প্রচলিত আছে।

কুমার গুরু পর স্বামী—তিনি খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। এই বৈষ্ণবাচার্য্য অনেক গুলি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছেন। তিনি দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন।

কুমার চন্দ্র ভট্টাচার্য্য—অযোধ্যার অন্তর্গত খেরী জিলা আদালতের এক-জন প্রসিদ্ধ প্রবাসী বাঙ্গালী ব্যবহার-জীবী। তাহার পিতা গোপী নাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় এলাহাবাদ লাট দপ্তরে (Secretariat) সরকারী চাকুরী করিতেন। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্ব হইতেই তিনি সপরিবারে প্রয়াগ প্রবাসী হন। তাঁহার পূর্ব্বনিবাস ত্রিপুরা জেলার অন্তঃপাতী ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার জাঠাগ্রামে। এলাহাবাদ ও আগ্রায় শিক্ষা লাভ করিয়া কুমারচন্দ্র কিছুদিন সংযুক্ত প্রদেশেই একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। অতঃপর প্রতাপগড়ের রাজা চিৎপাল সিংহ মহাশয়ের খাস মুন্সির (Private Secretary) কার্য্য করিতে করিতে এলাহাবাদ হাই কোর্টের ওকালতী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে কিছুদিন প্রতাপগড় জেলা আদালতে ও পরে খেরী জেলার প্রধান

সহর লখীমপুরে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কুমারচন্দ্রই খেরী জেলার প্রথম প্রবাসী বাঙ্গালী। আইন ব্যবসায়ে তাঁহার যথেষ্ট সুনাম হয়। স্থানীয় জনসাধারণ ও জমীদারগণের মধ্যেও তাঁহার বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। প্রসাদী নারায়ণ নামক জনৈক স্থানীয় জমিদারের নিকট কুমারচন্দ্র তাঁহার জমিদারী রঞ্জিৎ মহল ক্রয় করেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দে কুমারচন্দ্রের মৃত্যু হইলে, তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র জমীদারী বিক্রয় করিয়া লখীমপুর ত্যাগ করেন এবং তাঁহাদের পৈতৃক নিবাস জাঠাগ্রামে উঠিয়া আসেন।

কুমারজীব—যে সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু বৌদ্ধদর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি সংস্কৃত হইতে চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়া ভারতীয় চিন্তার রত্নরাজি চীন দেশে প্রচার ও রক্ষণে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার পিতা কুমারায়ণ ও পিতামহ কুমারদত্ত উভয়েই ভারতীয় হিন্দু ছিলেন ও বংশানুক্রমে রাজ-সচিবের কার্য্য করিতেন। কুমারায়ণ এই সম্মানকর পদত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন ও ভ্রমণ করিতে করিতে দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় অতিক্রম করিয়া চীন সীমান্তের অনতি দূরে মধ্য এসিয়ার অন্তর্গত এক মরূস্থানে অবস্থিত কুচা রাজ্যে উপনীত হন। আর্য্যজাতি হইতে উৎপন্ন ও আর্য্য ভাষাভাষী অধিবাসিগণের আবাস স্থল কুচা রাজ্যের রাজা কর্ত্তৃক সম্মানজনক উচ্চ পদ গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া, তিনি রাজপুরোহিতের পদ গ্রহণ করেন এবং রাজভগ্নী জীবার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এই মিলনের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, পিতার নামের প্রথমাংশ ও মাতার নাম অনুসারে তাহার কুমারজীব নামকরণ করা হয়। কুমারজীবের জন্মের অনতিকাল পরে জীবা স্বামীর সম্মতিক্রমে ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করিয়া, পুত্রের শিক্ষার জন্য সপুত্র দেশ পর্য্যটনে বাহির হন। এই ভ্রমণ কালে তাঁহারা কাশ্মীর, স-লে (বর্ত্তমান কাশগড়) ও য়ারখণ্ড পরিদর্শন করেন। কাশ্মীরে কুমারজীব রাজ ভ্রাতা বন্ধুদত্তের নিকট হীনযান সর্ব্বাস্তিবাদ, বিশেষ করিয়া ইহার সূত্র বা আগম, স-লে বা কাশগড়ে সর্ব্বাস্তি দর্শন এবং বেদ, কলা, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র এবং অবশেষে য়ারখণ্ডের রাজভ্রাতা সূর্য্যসোমের নিকট নাগার্জ্জুন ও তাহার শিষ্য আর্য্যদেবের মহাযানদর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও মহাযানমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর মহাযানমত ও বৌদ্ধ সাহিত্য প্রচার তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। কুচায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ত্রিংশবর্ষকাল তাহার সাহিত্য ও ধর্ম্মের উন্নতি বিধানে যত্নবান হইলেন।

ক্রমে কুমারজীবের যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইলে, তদানীন্তন চীন সম্রাট তাঁহাকে স্বীয় রাজধানী চাও-ঙানে আনয়ণ করিবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু কুচা রাজ তাঁহাকে ছাড়িতে অসম্মত হন। কথিত আছে এইজন্য চীন সেনাপতির সহিত কুচা-রাজের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যাহা হউক অবশেষে কুমারজীব চাওঙানে গমন করেন এবং চীন সম্রাটের গুরুপদে বৃত হন। এখানেই ৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

কুমারজীব অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান আহরণের জন্য আগ্রহ ছিল যেমন অসীম, সদ্ধর্ম্ম ও জ্ঞানপ্রচারে উৎসাহও ছিল তেমনি অপার। কথিত আছে বালক কালে কাশ্মীরে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তিনি তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। চীন ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। চাওঙানে অবস্থান কালে রাজা ইয়াও হিংএর অনুরোধে অষ্ট সহস্র শ্রমণের সহায়তায় হিন্দু শাস্ত্র সমূহের প্রচলিত অনুবাদ মূলের সহিত মিলাইয়া, ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, সংশোধন করেন ; ফলে আট বৎসরে ৪২১ খণ্ডে ৯৮ খানি হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থ অনূদিত হয়।

মহাযান দর্শন শাস্ত্র সমূহের অনু-বাদ, কুচা ও চীনে কুমারজীবের অক্ষয় কীর্ত্তি। তৎপূর্ব্বে ধর্ম্ম বা দর্শন হিসাবে কেহই মহাযান মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করেন নাই।

কুমারজীব অনূদিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে নিম্ন লিখিতগুলি উল্লেখ যোগ্য—মহাপ্রজ্ঞা পারমিতা সূত্র, দশসহস্রিকা, বজ্রছেদিকা-প্রজ্ঞা পারমিতা সূত্র, প্রজ্ঞা পারমিতা হৃদয় সূত্র। বিমল কীর্ত্তি নির্দ্দেশ, ব্রহ্মজাল সূত্র, সুমঙ্গম সূত্র, সুত্রালঙ্কার প্রভৃতি।

কুমার দত্ত—সংস্কৃত হইতে বৌদ্ধ দর্শন সাহিত্য প্রভৃতি চীন ভাষায় অনুবাদক ভিক্ষু কুমারজীবের পিতামহ। তিনি ভারতীয় কোন রাজার মন্ত্রীত্ব করিতেন। কুমারজীব দেখ।

কুমারদাস—মহাকবি কালিদাসের পরবর্ত্তী একজন কবি। তাঁহার "জানকী-হরণ" কাব্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত বা অন্য কোন পরি-চয় দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার কাব্যখানি সিংহলী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। সিংহল দেশীয় জনশ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তিনি সিংহলেরই একজন রাজা ছিলেন। (৫১৭—৫২৬ খ্রীঃ)। এই মত অবশ্য সর্ব্বত্র গৃহীত হয় নাই। কুমারদাসের কাব্যে কালিদাসের প্রভাব বিশেষ লক্ষিত হয়।

কুমারনন্দী ভট্টারক—ইনি একজন জৈন দার্শনিক পণ্ডিত। ধর্ম্মভূষণ স্বীয় গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

কুমার পাল—(১) তিনি বঙ্গের স্বাধীন পরাক্রান্ত নরপতি রামপালের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ রাজ্যপাল পিতার জীবদ্দশায় পরলোক গমন করেন। রামপালের মৃত্যুর পর রাজ্যে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হয়। কিন্তু তিনি বিচক্ষণ সেনাপতি সামন্ত নৃপতি বৈদ্য দেবের সহায়তায় এই অরাজকতা দমন করেন। তিনি ১১০৩-১১১০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গোপাল (তৃতীয়) অতি অল্প বয়সেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। গোপাল (প্রথম) দেখ।

কুমারপাল—(২) গুজরাতের চালুক্য বংশীয় জয়সিংহ সিদ্ধরাজের পরে কুমারপাল রাজা হয়েন। (১১৪৩ খ্রীঃ) তিনি প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থকার হেমচন্দ্রের নিকট জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। (আনুমাণিক ১১৫৯ খ্রীঃ) নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কুমারপাল উহার বিস্তারের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন। হেমচন্দ্র কুমার পালের নিকট বহু বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছিলেন। (হেমচন্দ্র দেখ)।

কুমার বাল্মীকি—তিনি একজন মাধ্ব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কবি। ১৫৯০ খ্রীঃ অব্দের সমকালে তিনি বাল্মীকির মূল রামায়ণ কানাড়ি ভাষায় পদ্যে অনুবাদ করেন। বঙ্গদেশের কৃত্তিবাস রামায়ণের ন্যায় ইহাও মহীশূর অঞ্চলে খুব সমাদৃত

কুমার বিষ্ণু—তিনি কাঞ্চীনগরের পল্লববংশীয় নরপতি বীর কুর্চ্চের পৌত্র ও স্কন্দ শিষ্যের পুত্র। তিনি বীরকুর্চ্চনা বংশীয় নরপতি সাতবাহনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন (১৭৮ খ্রীঃ)। কুমারবিষ্ণু ২০০ খ্রীঃ অব্দে কাঞ্চীনগরের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সেই নগর অধিকার করেন।

কুমাররাজ—তিনি কামরূপের অধিপতি ছিলেন। স্থাণেশ্বরের অধিবাসী হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে, তিনি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে এক শ্বেত ছত্র উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্য নাম ভাস্করবর্ম্মা।

কুমারলাত--প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কৃত কবি। তিনি কণিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া, অনুমিত হয়। তদ্‌রচিত "কল্পনা মণ্ডিটিকা" একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। উক্ত পুস্তকখানি চীন ভাষায় "সূত্রালঙ্কার" নামে অনূদিত হইয়াছিল। মধ্য এসিয়ার অন্তর্গত তুরফান নামক স্থানে ঐ পুস্তকের কোনও কোনও অংশ পাওয়া গিয়াছে। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর মতে কুমারলাত মহাযান বৌদ্ধ মতের 'সৌত্রান্তিক' শাখার প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি অশ্বঘোষ নাগার্জ্জুন, আর্য্যদেব প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন। কোনও কোনও স্থানে তাঁহার নাম কুমারলব্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

কুমার শ্রী—কাশ্মীর দেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত। প্রজ্ঞাকর গুপ্ত বিরচিত ধর্ম্ম কীর্ত্তির 'প্রমাণ বার্ত্তিক' গ্রন্থের টীকা 'প্রমাণ বার্ত্তিকালঙ্কার' কাশ্মীর দেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত ভাগ্যরাজ ও তিব্বতীয় অনুবাদক কর্ত্তৃক তিব্বতাধিপ লামার আনুকূল্যে তদ্দেশীয় ভাষায় অনূদিত হইলে, পরে সুমতি ও উক্ত অনুবাদক বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু আচার্য্যের সহায়তায় এবং মহাপণ্ডিত সুনশ্রী মিত্র ও কাশ্মীরি মহাপণ্ডিত কুমার শ্রীর তত্ত্বাবধানে উক্ত অনুবাদ সংশোধন করেন।

কুমার শ্রী ভদ্র—একজন ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য্য। তিনি তিব্বতে গমন করিয়া তথাকার সাম্-য়ে বিহারে দো জেলার দুইজন লামার সাহায্যে ধর্ম্ম-কীর্ত্তির 'বাদ ন্যায়বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ' নামক বাদন্যায় গ্রন্থের শান্ত রক্ষিত বিরচিত টীকা তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

কুমার সিংহ— তিনি শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত জগদীশপুরের জমিদার ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়া তিনি বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কুমার সিংহ আরা সহরের খাজানা লুট করিয়া জেলের কয়েদীদিগকে মুক্তি দিয়া ছিলেন। অবশেষে এক যুদ্ধে তাঁহার দক্ষিণ হস্তটী ছিন্ন হইয়া যায়। এবং সেই যুদ্ধেই ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

কুমার স্বামী—তিনি প্রসিদ্ধ টীকাকার মাল্লনাথের পুত্র। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত দেবীপুর তাঁহাদের জন্মস্থান। বিদ্যানাথ প্রণীত 'প্রতাপ যশোভূষণ' নামক গ্রন্থের 'রত্নাপণ' নামক টীকা রচনা করিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। খুব সম্ভব তিনি পঞ্চদশ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। মল্লিনাথ দেখ।

কুমারায়ণ—যে সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু বৌদ্ধ দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি সংস্কৃত হইতে চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম কুমারজীবের পিতা। কুমারজীব দেখ।

কুমারিলভট্ট—প্রসিদ্ধ দার্শনিক আচার্য্য নামান্তর ভট্টপাদ উপবর্ষ মতানুযায়ী পূর্ব্ব মীমাংসার বার্ত্তিক রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ই-২সিংএর ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত তারানাথের ভারতীয় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইতিহাস হইতে সংগৃহীত ঐতিহাসিক উপাদান বলে কুমারিলের আবির্ভাব কাল খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দী বলিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ণীত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার অধিবাস স্থান সম্বন্ধে মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ তাঁহার নিবাস আর্য্যাবর্ত্তে, কেহ বা দাক্ষিণাত্যে আবার কেহ কেহ কামরূপে নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। তত্রত্য পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী এবং অবস্থা বিবেচনা করিলে, শেষোক্ত মত অগ্রাহ্য করা যায় না। এই মতাবলম্বীগণ বলেন—

সপ্তম শতাব্দীতে কামরূপ রাজকুমার ভাস্কর বর্ম্মনের রাজত্বকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে (বর্ত্তমান গৌহাটী) কুমারিল ভট্ট আবির্ভূত হন। এই সময় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্য ভাগে নালন্দার মহাবিদ্যালয়ে বৌদ্ধ দর্শন অধ্যয়নে রত হিউ-এন-চাঙ্গের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া, ভট্টপাদ কুমারিল তাঁহাকে কামরূপে আসিতে আমন্ত্রণ করেন, কিন্তু চীন পরিব্রাজক তাহাতে অস্বীকার করেন। পরে তাঁহার গুরু জ্ঞানবৃদ্ধ প্রজ্ঞাভদ্রের অনুরোধে কামরূপ রাজের আমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ পূর্ব্ববঙ্গ ও কামরূপ গমন করেন। এইরূপে কামরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইলে, কুমারিল তাহা নির্ম্মূল করিতে বদ্ধপরিকর হন। কিছুকাল পরে পার্ব্বত্য দেশের শালস্তম্ভ নামক মহাপরাক্রমশালী এক রাজা কামরূপরাজ কুমার ভাস্করকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কামরূপের রাজা হন। তিনি তান্ত্রিক মতের প্রতিষ্ঠা ও বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হন। এইরূপে স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে দেখিয়া, কুমারিল মগধে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিকূল মত প্রচার দ্বারা উহার বিলোপ সাধনে কৃতযত্ন হন। কিন্তু মগধে গমন করিয়া কুমারিল তত্রত্য বৌদ্ধ ও জৈন আচার্য্যগণকে হিন্দুদর্শনে পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া শাস্ত্রীয় বিচারে উহার যুক্তিখণ্ডনে নিযুক্ত দেখেন, তখন তিনিও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আচার্য্য শীলভদ্রের নিকট জৈন ও বৌদ্ধদর্শন অধ্যয়নে নিরত হন। এইরূপে উক্ত শাস্ত্রসমূহে পারদর্শিতা লাভ করিয়া, বৌদ্ধাচার্য্যগণকে শাস্ত্রীয় বিচারে পরাস্ত করিয়া তিনি কর্ম্মকাণ্ডে ব্যাখ্যাত বৈদিকধর্ম্মের প্রচারে তৎপর হন। কুমারিল প্রয়াগে অবস্থানকালে আচার্য্য শঙ্কর তাঁহাকে শারীরক ভাষ্যের বার্ত্তিক প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু স্বীয় আয়ুষ্কাল নিঃশেষিত প্রায় জানিয়া কুমারিল শঙ্করাচার্য্যকে তাঁহার (কুমারিলের) ভগিনীপতি বিশ্বরূপ দ্বারা উক্ত বার্ত্তিক রচনা করাইতে বলেন।

আচার্য্য শীলভদ্রের নিকট বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনাদিতে লব্ধ জ্ঞান অধীত বিদ্যার প্রতিকূলে প্রয়োগনিমিত্ত গুরুদ্রোহ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কুমারিল প্রয়াগে তুষানলে তনুত্যাগ করেন।

মীমাংসকগণের মধ্যে যথাক্রমে গুরু ও উম্বেক বলিয়া পরিচিত প্রভাকর ও ভবভূতি ভট্টপাদ কুমারিলের প্রধান শিষ্য ছিলেন। কুমারিলের

ভগিনীর নাম উভয়ভারতী। পরবর্ত্তী কালে সুরেশ্বরাচার্য্য নামে খ্যাত বিশ্বরূপ মণ্ডন মিশ্র তাঁহার স্বামী হইয়া ছিলেন।

কুমারিলের গ্রন্থ সমূহের মধ্যে তন্ত্র বার্ত্তিক, শ্লোক বার্ত্তিক ও লঘু বার্ত্তিক সমধিক উল্লেখযোগ্য। কাহারও কাহারও মতে কুমারিল নিরীশ্বরবাদী ছিলেন; কিন্তু তৎপ্রণীত গ্রন্থ সমূহ পাঠে এই মত সম্পূর্ণরূপ ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়।

কুমুদচন্দ্র—তাঁহার পূর্ব্ব নাম সিদ্ধ সেন দিবাকর। তিনি জৈন আচার্য্য বৃদ্ধবাদ সুরীর নিকট জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কুমুদচন্দ্র নাম গ্রহণ করেন। কথিত আছে তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যকে খ্রীঃ পূঃ ৫৭ অব্দে জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ঐতিহাসিক সত্য নহে। এই কুমুদচন্দ্রই দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রথম জৈন ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তিনি ৪৮০-৫৫০ খ্রী অব্দ কালের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।

কুমুদচন্দ্র সিংহ (মহারাজা)—গারো পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত সুসঙ্গ দুর্গাপুর রাজ্যের অধিপতি।

১২৭৩ বঙ্গাব্দে সুসঙ্গ দুর্গাপুরে উক্ত স্থানের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজবংশে মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সুসঙ্গ রাজকুলের প্রতিষ্ঠাতা সোমেশ্বর ঠাকুরের অধস্তন ষোড়শ পুরুষ এবং মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের পুত্র। প্রথমে স্বগ্রামস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ে এবং পরে কলিকাতায় তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বিজ্ঞানে বি, এ, উপাধি লাভ করিয়া এম্ এ, ও আইন অধ্যয়ন করেন। অকালে পিতৃবিয়োগ বশতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই; কিন্তু জ্ঞান পিপাসা চিরদিনই তাঁহার মধ্যে প্রবল ছিল। ছাত্রাবস্থায় মহাকবি কালিদাসের কাব্য তাঁহাকে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি এই প্রবল অনুরাগের ফলে তিনি কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার দর্শন, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি সমুদয় সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রকাশিত এবং অনেক বহুমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থের তাঁহার এক বিরাট সংগ্রহ ছিল। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অনর্গল বক্তৃতা শ্রবণে তৎকালীন প্রথিতযশা পণ্ডিতগণও একান্ত বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কলিকাতার সংস্কৃত বোর্ডের অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া ছিলেন। মহারাজ কুমুদচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্যের সহিতও ঘনিষ্ঠ পরিচিত

ছিলেন এবং বঙ্গসাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তৎকালীন বঙ্গসাহিত্য সম্পর্কিত বহু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 'আরতি,' 'বান্ধব,' 'সৌরভ,' 'সাহিত্য-সংহিতা' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় তিনি যেসকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'ব্রাহ্মণ,' 'প্রাচীন ভারতে চতুঃষষ্টি কলা,' 'আমাদের কোন পথ অবলম্বনীয়,' 'ভারতীয় কবি ও চিত্রকর,' 'সংস্কৃত ভাষা চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা' প্রভৃতি একাধারে তাঁহার সংস্কৃত এবং বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র তাঁহার কতকগুলি প্রবন্ধ ও অভিভাষণ সংকলন করিয়া 'কৌমুদী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন।

তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন এবং হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের কল্যাণকর বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁহারই সমাজ হিতৈষণামূলক ঐকান্তিক চেষ্টায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের আটটি পটির সমন্বয় সাধন হয়। কলিকাতা নগরে অনুষ্ঠিত প্রথম ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি ১৩১৮ বঙ্গাব্দে ময়মনসিংহ নগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক, শিক্ষা সংস্কারাদিমূলক অনেক প্রতিষ্ঠানের সদস্য মনোনীত হন। ১৯১১ সনে দিল্লীর দরবারে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের জমীদারদের প্রতিনিধি স্বরূপ সম্রাট দর্শনের অনুমতি প্রাপ্ত হন।

লক্ষ্মীর বরপুত্র হইলেও বাণীর আরাধনা তাঁহার জীবনের পরম পরিতোষের বিষয় ছিল। তিনি পবিত্র চরিত্র, মধুরস্বভাব, পাণ্ডিত্যের জন্য সর্ব্বজনমান্য ছিলেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে দুর্গাপুরে তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

কুমুদনাথ চৌধুরী—প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ব্যবহারজীবী ও শিকারী। তিনি দেশ বিখ্যাত জননায়ক সার আশুতোষ চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। কুমুদ নাথ তাঁহার অন্যান্য অনেক ভ্রাতাদের ন্যায় সাহিত্যচর্চ্চাও করিতেন। কিন্তু শিকারেই তাঁহার বহু উৎসাহ ছিল। নানাস্থানে তিনি বহু আরণ্য জন্তু শিকার করিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত 'ঝিলে জঙ্গলে শিকার' একখানি মনোজ্ঞ পুস্তক। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত এক করদ রাজ্যে শিকার করিতে যাইয়া, আহত ব্যাঘ্রের আক্রমণে নিহত হন।

কুম্ভ, মহারাণা—চিতোরের প্রসিদ্ধ রাজপুত নৃপতি। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম

কুম্ভকর্ণ। চিতোরপতি লাখার, রাঠোর বংশীয়া মহিষী হংসবাই-এর গর্ভে রাণা মুকুলজী জন্মগ্রহণ করেন। মুকুলজীর পুত্র রাণা কুম্ভ। তাঁহার দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নাম চুঁড়া ও রাঘব দেব। ১৪৩৩ খ্রীঃ অব্দে মহারাণা মুকুলজী কয়েকজন সর্দ্দারের চক্রান্তে নিহত হন। তখন কুম্ভ অতি শিশু। তাঁহার পিতার মাতুল রণমল তখন চিতোরের সর্ব্বপ্রধান ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শিশু কুম্ভকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজ মতে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কুম্ভ, রণমলের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্য গোপনে তাঁহার বধ সাধন করান (অনুমানিক ১৮৪৮ খ্রীঃ)।

রাণা কুম্ভ প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে বহুবার তাঁহাকে, কখনও আত্মরক্ষার জন্য, কখনও বা রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্খার বশীভূত হওয়ায়, রাজপুত ও মুসলমান রাজাদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। তিনি প্রথমে নিজ রাজ্য সন্নিকটস্থ শিরোহী রাজ্য অধিকার করেন। তৎপরে ১৪৩৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি মাহমুদ খিলজীর মালব রাজ্য আক্রমণ করেন। সুলতান মামুদ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। রাণা কুম্ভ মালব রাজ্যান্তর্গত সারঙ্গপুর নগর বিধ্বস্ত করিয়া নিজের বিজয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপর আনুমানিক ১৪৫০ খ্রীঃ অব্দে তিনি হারাবতী নামক রাজপুত রাজ্য আক্রমণ করেন এবং অশেষ চেষ্টার পর তাহা অধিকার করিতে সমর্থ হন। তাহার কয়েক বৎসর পর মালবপতি পূর্ব্বোক্ত মাহমুদ শাহ্ পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য একাধিকবার চিতোর অভিযান করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঐতিহাসিক ফিরিশতা ঐ অভিযান সকলের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, মালবপতি প্রতি অভিযানেই অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালের ঐতিহাসিকগণ এই বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। বস্তুতঃ ঐ সকল অভিযানের প্রকৃত ফলাফল যথোচিত বিচারসহ গৃহিত হয় নাই।

তাহার কতিপয় বর্ষ পরে নাগোর নামক স্থানের অধিকার লইয়া গুজরাতের সুলতানের সহিত রাণা কুম্ভের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। রাজ্যচ্যুত শিরোহীপতি এই সংগ্রামে গুজরাতপতির সহিত যোগদান করেন। তৎসত্ত্বেও গুজরাত সৈন্য রাজপুত সৈন্যের হস্তে বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু পর বৎসর মালব ও গুজরাতের মিলিত শক্তির নিকট রাজপুত শক্তি পরাজিত হয়। রাণা কুম্ভ দুইবার পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। পরে সন্ধি স্থাপিত হইলে বিজয়ী

মুসলমান নৃপতিদ্বয় উপযুক্ত ক্ষতি পূরণ গ্রহণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

রাণা কুম্ভ অসাধারণ রণনীতি বিশারদ নৃপতি ছিলেন। তিনি তাঁহার রাজ্য মধ্যে বহু দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করান। তন্মধ্যে কুম্ভলগড় দুর্গ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। জনসাধারণের উপকারের জন্য তিনি পুষ্করিণী ও কূপ খনন প্রভৃতি লোক হিতকর কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করেন।

মহারাণা কুম্ভ বিদ্বান, শাস্ত্রবিদ্, সঙ্গীত প্রভৃতি ললিতকলা-নিপুণ এবং বিদ্যানুরাগী নরপতি ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে এবং আনুকূল্যে বহু বিদ্বান ব্যক্তি নানা বিভাগে জ্ঞান চর্চ্চা করিয়া সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করেন। রাণা স্বয়ংও কয়েকখানি নাটক "গীতগোবিন্দ" এর টীকা, "চণ্ডীশতকম্" এর ব্যাখ্যা, "সঙ্গীত রত্নাকর" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। প্রধানতঃ শিবোপাসক হইলেও, তিনি বিষ্ণুভক্তও ছিলেন। তাঁহার অধিকার কালে বিভিন্ন রীতি অনুসারে নির্ম্মিত বহু বিষ্ণু মূর্ত্তির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। জৈন ধর্ম্মের প্রতিও তাহার শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি জৈনদিগকে নানাভাবে সাহায্য করেন।

বৃদ্ধাবস্থায় মহারাণা কুম্ভ উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হন। দীর্ঘকাল ঐ রোগে আক্রান্ত থাকিয়া ১৪৬৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার রাজ্যলোভী জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয় সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হন।

কুম্ভকর্ণ—চিতোরের মহারাজা সমর সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্র কর্ণের প্রতি সমর সিংহ অতিরিক্ত স্নেহ প্রদর্শন করিয়া তাহাকেই রাজপদ অর্পণ করেন, সেইজন্য জ্যেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ কতিপয় সহচর সহ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। তথায় বিদের নামক একজন হাবশী পাদশার অধীনে একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

কুয়াজী—দশনামী শৈব সন্ন্যাসীদের ন্যায় বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদেরও বায়ান্নটী সম্প্রদায় আছে, তাহাদিগকে দোয়ারা বলে। এক একজন তেজস্বান্ ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া এক একটি দোয়ারা স্থাপন করেন। প্রত্যেক দোয়ারা স্থাপন-কর্ত্তার নামেই অভিহিত হয়। মহাত্মা কুয়াজী এইরূপ একটী দোয়া-রার প্রবর্ত্তক। সুতরাং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দোয়ারা কুয়াজী দোয়ারা নামে খ্যাত। তদ্রূপ মহাত্মা কমল, অগ্র-দাস, শ্রমনজী, টিলাজী, দেবমুরারিজী, চন্দ্রামজী, রামকবীরজী, নাভাগ স্বামী, পিপাজী, খোজিজী, রামপ্রসাদ প্রভৃতি এক একটি দোয়ারার প্রবর্ত্তক।

কুরেশ, কুরনাথ, আলবান্ বা শ্রীবৎসাঙ্ক—তিনি আচার্য্যরামানুজের

অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। রামানুজের প্রথম শিষ্য দাশরথি, দ্বিতীয় কুরেশ। তিনি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং অসামান্য স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন ধনবান্ ভূম্যধিকারী এবং অতিশয় দানশীল ব্যক্তি ছিলেন।

কুরেশের সহায়তায় আচার্য্য রামানুজ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য রচনা করেন। তিনি অসাধারণ গুরুভক্ত ছিলেন। একবার চোলাধিপতি শৈব রাজেন্দ্র চোল রামানুজের প্রাণবধ করিবার সঙ্কল্প করিয়া, তাহাকে স্বীয় রাজসভায় ধরিয়া আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলে, কুরেশ গুরুর বেশ ধারণ পূর্ব্বক রাজসভায় উপস্থিত হন এবং রাজার পণ্ডিতগণকে শাস্ত্রীয় বিচারে পরাস্ত করেন। তথাপি রাজা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ শৈব মত গ্রহণ করিতে আদেশ করিলে, কুরেশ অসম্মত হন। তখন চোলপতি তাহার চক্ষু নষ্ট করিয়া দেন। যাহা হওক, কথিত আছে, গুরু কৃপায় কাঞ্চীনাথ ভগবান্ বরদ রাজের বরে তাঁহার পুনরায় চক্ষু লাভ ঘটে।

তিরোধানের পূর্ব্বে আচার্য্য রামানুজ যখন শ্রীরঙ্গমে অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন কুরেশ কাবেরী তীর্থে পত্নী ও শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।

আচার্য্য কুরেশের দুই পুত্র—পরাশর ভট্টাচার্য্য ও বেদব্যাস ভট্টাচার্য্য রামানুজাচার্য্য পরাশর আচার্য্যকে ধর্ম্ম পুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং মঠেই তাঁহাকে পালন করেন। তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা এবং বিবাহ আচার্য্যের নির্দ্দেশ অনুসারেই অনুষ্ঠিত হয়। ইনি আচার্য্যের অতিশয় প্রীতিভাজন হইয়া বেদান্তাচার্য্য নাম প্রাপ্ত হন এবং উত্তরকালে বৈষ্ণব সমাজের নেতা হন

কুরেশাচার্য্যের স্থিতিকাল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে।

কুলচন্দ্র—(১) গজনীর অধিপতি সুলতান মাহমুদ ১০১৮ খ্রীঃ অব্দে কনৌজ, মথুরা বিধ্বস্ত করেন। এই সময়েই তিনি মহাওয়ান নামক দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গপতি কুলচন্দ্র এই প্রবল শত্রুর সহিত প্রাণপনে যুদ্ধ করিয়াও দুর্গ রক্ষায় অসমর্থ হইলেন তখন তিনি পলায়ন করিতে অভিলাষী হইয়া হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্ব নদী পার হইবার উপক্রম করিলেন। এমন সময়ে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। শত্রুহস্তে পতিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় মনে করিয়া তিনি প্রথমে স্ত্রীকে হত্যা করিয়া পরে স্বয়ং আত্মহত্যা করিলেন।

কুলচন্দ্র, মহারাজা (২)—তিনি মণিপুরপতি কীর্ত্তিচন্দ্র ধ্বজ সিংহের অন্যতম পুত্র। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে কীর্ত্তিচন্দ্রের

মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠপুত্র শূরচন্দ্র রাজা হন। কিন্তু শূরচন্দ্র সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতকর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলে কুলচন্দ্র ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে রাজা হন। ইংরেজ সরকার টিকেন্দ্রজিতের নির্ব্বাসনের অঙ্গীকারে কুলচন্দ্রকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু কুলচন্দ্র প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়াতে মণিপুর যুদ্ধ সংঘটিত হয় (১৮৯২)। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে আসামের চীপকমিশনার কুইনটন প্রভৃতি নিহত হন, তৎপরে প্রবল একদল সৈন্য যাইয়া মণিপুরিদগকে পরাস্ত করে এবং টিকেন্দ্রজিৎ ও মন্ত্রী থঙ্গাল জেনেরেলকে বন্দী করে। বিচারে কুলচন্দ্র নির্ব্বাসিত, টিকেন্দ্রজিত ও মন্ত্রী থঙ্গাল জেনেরেল ফাঁস কাষ্টে বিলম্বিত হন। মণিপুরের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা নরসিংহের প্রপৌত্র চূড়াচাঁদকে বড়লাট সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু নিরপরাধ শূরচন্দ্র কেন ইংরেজ সরকারের আশ্রয় লইয়াও রাজা হইতে পারিলেন না, ইহা বড়ই রহস্য জনক।

কুলতুঙ্গ—বেঙ্গীর পূর্ব্ব চালুক্য নরপতি বিমলাদিত্যের তিনি পুত্র এবং চোলপতি রাজরাজের দৌহিত্র। তিনি স্বীয় মাতুল প্রথম রাজেন্দ্রের কন্যা অম্মাঙ্গা দেবীকে বিবাহ করেন। কুলতুঙ্গের পিতৃব্য বিজয়াদিত্য কুলতুঙ্গকে অপসারিত করিয়া রাজ্য অধিকার করিতে প্রয়াসী হন। এই বিষয়ে তাঁহার মামা বিজয়াদিত্যের সহায় হইলেন। কুলতুঙ্গ উপায়ন্তর না দেখিয়া চালুক্যপতি আহবমল্লের সাহায্য প্রার্থী হইলেন। চোল-চালুক্যগণের মধ্যে কয়েকটী অমীমাংসিত যুদ্ধ হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ১০৬৯ খ্রীঃ অব্দে আহবমল্লের মৃত্যুতে অবস্থা অন্যরূপ ধারণ করিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সোমেশ্বর (দ্বিতীয়) রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য অধিকতর ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তিনি সিংহাসনের অভিলাষী হইয়া, চোলপতি বীর রাজেন্দ্রের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। বীর রাজেন্দ্র স্বীয় জামাতা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। কুলতুঙ্গ চালুক্যদের গৃহ বিবাদের সুযোগ পাইয়া চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় সোমেশ্বরকে অপসারিত করিয়া বিক্রমাদিত্য রাজা হইয়াছিলেন। কুলতুঙ্গ ও বিক্রমাদিত্যের মধ্যে কয়েকটী যুদ্ধ হইয়া ১০৮০ খ্রীঃ অব্দে সন্ধি স্থাপিত হইল। অবশেষে ১১১৮ খ্রীঃ অব্দে চালুক্যদের সামন্ত নরপতি বিত্তিদেব হয়শালের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কুলতুঙ্গ বিষাদে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কুল দত্ত—'ক্রিয়া সংগ্রহ' নামক গ্রন্থের লেখক। তাঁহার এই গ্রন্থ নেপালের রাজধানীস্থিত ধ্বখারাম নামক বিহারে

অবস্থান করিয়া আচার্য্য কীর্ত্তিচন্দ্র তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী — বাঙ্গালী তান্ত্রিক সাধক। ১২৭৪ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বিক্রমপুর পরগণার পশ্চিম পাড়া গ্রামের এক কুলীন বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতাও একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে প্রসিদ্ধ সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তদবধি তিনি অসাম্প্রদায়িক ভাবের সাধকরূপে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। শাস্ত্র ও সদাচারের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না করিয়া তিনি উদারভাবাপন্ন নৈতিক জীবন যাপন করেন। পরিণত বয়সে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

কুল পাল—বঙ্গাধিপ মহীপালের রাজত্বকালে (৯৭৫-১০২৫ খ্রীঃ অঃ) বঙ্গে যেসকল সামন্ত নৃপতি রাজত্ব করিতেন, ইনি তাহাদের অন্যতম। ভাগীরথীর পশ্চিম তটে তাঁহার রাজ্য অবস্থিত ছিল। তাঁহার দুই পুত্র—হরিপাল ও অহিপাল। হরিপাল স্বীয় নাম অনুসারে সিঙ্গুরের পশ্চিমে হট্ট ও জলাশয় পূর্ণ একখানি সমৃদ্ধিশালী মহাগ্রাম প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় রাজত্ব করিতেন। এই গ্রাম প্রধানতঃ তন্তুবায় ও শাকল ব্রাহ্মণগণের আবাস স্থল ছিল। অহিপাল মাহেশ হইতে ত্রিবেণীর নিকট চক্রদ্বীপ অঞ্চলে কিছুকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার তিন পুত্র—কৃতধ্বজ, বিভাণ্ড ও কেশিধ্বজ। বৈশ্য জাতীয়া জননীগণের গর্ভজাত এই তিন পুত্রের মধ্যে কৃতধ্বজ সপ্তগ্রামে বৈদ্যগণের রাজা হন। তাঁহার পুত্র বিরল সুগন্ধা গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। বিভাণ্ড ভাগীরথীর পশ্চিম তটস্থ সামন্তরাজ বাণের মন্ত্রীত্ব করিতেন তাঁহার বংশধরগণ জগদ্দল অঞ্চলে বাস করিতেন। কেশিধ্বজ চান্দোলের রাজা হন। তিনি বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কায়স্থ আনাইয়া এখানে উপনিবিষ্ট করান।

কুল শেখর আলোয়ার—তিনি মালাবারের অন্তর্গত চোলপত্তন নগরে খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দিতে ফাল্গুন মাসে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় দীপ্তিশালী ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে কৌস্তভ মণির অবতার বলিয়া জ্ঞান করিতেন। "মুকুন্দমালা" নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

কুলস্তম্ভ—তিনি উড়িষ্যার শুল্ক বংশীয়-নরপতি রণস্তম্ভের জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা রাজা হন। কাঞ্চনস্তম্ভ দেখ।

কুলি কুতুব শাহ, সুলতান (প্রথম) —গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী রাজবংশের স্থাপয়িতা। তাঁহার পিতা কুতব-উল-মুল্ক ভাগ্য পরীক্ষার জন্য তাতার দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং দাক্ষিণাত্যের মহম্মদ শাহ বাহমনীর অধানে কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া মামুদ শাহের রাজত্বকালে কুতব-উল-মুল্ক উপাধি ও তেলিঙ্গানার শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জামকুণ্ড আক্রমণ কালে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুলতান কুলি পিতার পদ ও উপাধি প্রাপ্ত হন, অধিকন্তু গোলকুণ্ডা ও তেলিঙ্গানা জায়গীর স্বরূপ লাভ করেন। বাহমনী বংশের শক্তি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজেকে তেলিঙ্গানার স্বাধীন ভূপতি বলিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক 'কুলি কুতব শাহ' উপাধি গ্রহণ করিলেন। তিনি পঞ্চাশ বৎসর অতি নিপুণতার সহিত রাজ্যশাসন করেন ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্রের প্ররোচনায় তিনি একজন ক্রীতদাস কর্ত্তৃক নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র জামশেদ কুতব শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। নিম্নে কুতব শাহ বংশের তালিকা দেওয়া গেল—

১। কুলি কুতব শাহ।
২। জামসেদ কুতব শাহ।
৩। ইব্রাহিম কুতব শাহ।
৪। মোহাম্মদ কুলি কুতব শাহ।
৫। মোহাম্মদ কুতব শাহ।
৬। আব্দুল্লা কুতব শাহ।
৭। আব্দুল হাসন।

কুলিকুতব শাহ, সুলতান (দ্বিতীয়) —অপর নাম মহম্মদ কুলি কুতব শাহ। ১৫৮১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতা ইব্রাহিম কুতব শাহের মৃত্যুর পর বার বৎসর বয়সে তিনি গোলকুণ্ডার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজ্য লাভ করিয়াই বিজাপুরের আদিল শাহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং পরে স্বীয় ভগিনীকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। গোলকুণ্ডার জলবায়ু তাঁহার স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না বলিয়া, বাগমতি নামক তাঁহার এক উপপত্নীর নামানুসারে তিনি ভাগনগর স্থাপন করেন। পরে ইহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া হায়দরাবাদ রাখেন। পারস্যের সম্রাট শাহ আব্বাসের এক পুত্রের সহিত তাঁহার এক কন্যার বিবাহ হয়। তিনি একজন গুণগ্রাহী রাজা ছিলেন। বিদ্বান্ লোকদের বিশেষ সমাদর করিতেন এবং নিজেও একজন কবি ছিলেন। একত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ কুতব শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কুলিচ খাঁ তুরাণী—তিনি তুরাণ দেশের অধিবাসী ছিলেন। ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গিরের শুভ দৃষ্টি পথে পতিত হন। অচিরেই একটী পাঁচ হাজারী মনসবদারীর পদ পান। কিছুদিন তিনি কাবুল ও কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘজীবী হইতে পারেন নাই। ১৬৫৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

কুলির খাঁ—নামান্তর আবিদ খাঁ। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং পাঁচ হাজারী মনসবদারী প্রাপ্ত হন। ১৬৮৬ খ্রীঃ গোলকুণ্ডা অবরোধ কালে একটী কামানের গোলার আঘাতে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হয়। তাঁহারই পুত্র প্রসিদ্ধ গাজিউদ্দীন খাঁ ফিরোজ জঙ্গ (প্রথম) এবং পৌত্র প্রসিদ্ধ হায়দরাবাদের নিজাম-উল-মুল্ক আসফ জা।

কুলী খাঁ—সম্রাট আকবরের একজন সেনাপতি। তিনিই হিন্দু সেনাপতি হিমুকে বন্দী করিয়াছিলেন। হিমুর পরাজয়েই লোদী বংশের আশা সমূলে বিনষ্ট হইল।

কুলোতুঙ্গদেব—অন্যনাম রাজেন্দ্র চোল, তিনি বেঙ্গির চালুক্য বংশীয় নরপতি প্রথম রাজরাজের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম অম্মাঙ্গা, অম্মাঙ্গা কাঞ্চীর রাজেন্দ্র চোলনরপতির কন্যা ছিলেন। তাঁহার পুত্র মাতামহে[র] রাজ্য লাভ করিয়া তাঁহার নাম গ্র[হণ] করিয়াছিলেন। কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধ[ন] দেখ।

কুলোত্তুঙ্গ চোল প্রথম—বেঙ্গি[র] দ্বিতীয় রাজেন্দ্র চোল, তাঞ্জোরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কুলোত্তুঙ্গ প্রথম চোল নামে খ্যাত হন। কলিঙ্গের রাজরাজ (প্রথম) কলোত্তুঙ্গকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্য[া] রাজসুন্দরীকে বিবাহ করেন। তাঁহা[দে]রই পুত্র প্রসিদ্ধ অনন্ত বর্ম্মা চোল গঙ্গ

কুল্লুক ভট্ট—সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী স্মার্ত্ত পণ্ডিত ও মনুসংহিতার ভাষ্যকার। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলে ভট্টনারায়ণ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিত[া] পণ্ডিত-কুল-ভূষণ দিবাকর ভট্ট। কথিত আছে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বারাণসী ধামে কুল্লুক ভট্ট কর্ত্তৃক তাঁহার সুবিখ্যাত মনুসংহিতার টীকা প্রণীত হয় এ[বং] তাঁহার সমসাময়িক উদয়নাচার্য্যের অনুরোধে ময়ূর ভট্ট ও মঙ্গল ওঝার সহযোগীতায় কুলশাস্ত্র সংগৃহীত হয়।

কুশধ্বজ—ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রা[ম] নিবাসী কুলধ্বজ নামক জনৈক ব্রাহ্ম[ণ] ভাওয়াল গাজীর বংশধর দৌলত গাজী[র] দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার পুত্র বলরাম[ও] এই বংশের দেওয়ান ছিলেন। নবাব মুরশিদকুলি খাঁর সময়ে বাকী রাজস্বে[র]

জন্য জমিদারী নিলাম হইলে, বলরাম নয় আনার অংশ খরিদ করিয়া ভাওয়ালের জমিদার হন। তৎপর তিনি নবাব হইতে রায় চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন।

কুশল সিংহ—তিনি যোধপুরের অধিপতি অভয় সিংহের একজন প্রধান সামন্ত নরপতি। মারবারপতি রণমল্লের চতুর্ব্বিংশতি পুত্রের মধ্যে চম্প চতুর্থ পুত্র ছিলেন। তাহা হইতেই চম্পাবৎ গোত্রীয় রাজপুত্রদের উদ্ভব। রাজকুমার চম্প, আহবা, কেটো, পালরি প্রভৃতি স্থান ভূমিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই চম্পাবৎ গোত্রেই কুশল সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরনট। তিনি দিল্লীর মুঘল সম্রাট মোহাম্মদ শাহের সময়ে (১৭১৯—১৭৪৮ খ্রীঃ) বর্ত্তমান ছিলেন। মুঘল বংশের গৃহ বিবাদের সুযোগে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের শাসনকর্ত্তারা প্রায় সকলেই স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। গুজরাটের শাসনকর্ত্তা শের বুলন্দ খাঁও বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কিন্তু অভয় সিংহের সেনাপতি কুশল সিংহ প্রভৃতির বীরত্বেই শের বুলন্দ পরাস্ত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। অভয় সিংহের মৃত্যুর পরে রামসিংহ যোধপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অতিশয় দুর্ব্বিনীত ছিলেন। তাঁহার অশিষ্ট ব্যবহারে কুশল সিংহ প্রভৃতি চম্পাবৎ সর্দ্দারেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পিতৃব্য ভক্ত সিংহের শরণাপন্ন হন। ভক্ত সিংহ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রামসিংহকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। উভয়পক্ষে তখন ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই যুদ্ধেই কুশল সিংহ সমর ক্ষেত্রে শয়ন করেন।

কুশারণ্য—আসামের নরপতি হরবিন্দের পুত্র। রত্নপুর নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। ব্রহ্মপুত্রের স্রোতবেগে রত্নপুর বিলুপ্ত হইয়াছে।

কুসুম দেব—তিনি উজ্জয়িনীর রাজা ভর্তৃহরির অন্যতম সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি একজন কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—দৃষ্টান্তশতক।

কুসুমভার—তিনি উড়িষ্যার করবংশীয় রাজা লোণভারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার অনুজ ললিতভার রাজা হইয়াছিলেন। উন্মত্ত সিংহ দেখ।

কুসুম্বর—তিনি আসামের বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংস্কারক শঙ্করদেবের পিতা। যখন আসামের রাজা বিশ্বসিংহ স্বীয় ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভুঁইয়া নামক সামন্ত নৃপতিগণকে সমূলে উচ্ছেদ করিতেছিলেন, তখন কুসুম্বর ভুঁইয়া আহম রাজ্যের অন্তর্গত বরদোয়া নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি শৈব ছিলেন, পুত্রলাভার্থ শিবের আরা-

ধনা করিয়া ১৪৪৯ খ্রীঃ অব্দে এক পুত্র লাভ করেন শঙ্করের বরে পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার নাম শঙ্কর-দেব রাখিলেন। শঙ্কর দেব দেখ।

কূন—তিনি দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যরাজ বংশের অন্যতম রাজা। তিনি প্রথমে জৈন ছিলেন। পরে তিরুজ্ঞান সম্বন্দর নামক সন্ন্যাসীর নিকটে শৈব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং জৈনদিগের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে ৮০০০ জৈন তাঁহার অত্যাচারে নিহত হয়।

কুশর—যে সকল ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে গমন করিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন. ইনি তাঁহাদের অন্যতম।

কৃত্তিবাস—বাঙ্গালী কবি। বাল্মীকি রামায়ণ সুমধুর বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়া কবি কৃত্তিবাস চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। কৃত্তিবাসের জন্মকাল এখনও যদিও পণ্ডিত মণ্ডলীর বিচার বিবেচনার বস্তু রহিয়াছে, তথাপি, আপততঃ ১৩২০ শক (১৩৯৯ খ্রীঃ ; ৮০৫ বঙ্গাব্দ) তাঁহার জন্ম বৎসর বলিয়া অনেকেই মনে করেন। কৃত্তিবাসের নিজের বর্ণনামতে ঐ বৎসর রবিবার, শ্রীপঞ্চমী তিথিতে মাঘ মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার পিতার নাম বনমালী। তাঁহারা সর্ব্বমোট সাত ভাই ও এক ভগিনী ছিলেন। কৃত্তিবাসের পূর্ব্ব পুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ব্ববঙ্গের দনুজ নাম ধারী কোনও রাজার অমাত্য ছিলেন। 'প্রমাদ' হওয়াতে (পণ্ডিতগণের বিবেচনায় পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান আক্রমণ হওয়াতে) দনুজ রাজা রাজ্য ভ্রষ্ট হন এবং নরসিংহ ওঝা দেশত্যাগ করিয়া আসিয়া নদীয়া জিলার অন্তর্গত শান্তি-পুরের অনতিদূরে ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন কৃত্তিবাস এই নরসিংহ ওঝার অধস্তন চতুর্থ পুরুষ।

কৃত্তিবাস গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপন করিয়া রাজা গণেশের সভায় উপস্থিত হন এবং তাঁহারই আদেশে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে প্রবৃত্ত

কৃত্তিবাসের রামায়ণ এক অপূর্ব্ব পুস্তক। ভাষার লালিত্যে, বর্ণনার মনোহারিত্বে, অলঙ্কার ও উদাহরণ প্রয়োগের মাধুর্য্যে উহা বাঙ্গালা ভাষার একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। উহার উপাখ্যান ভাগ প্রধানতঃ বাল্মিকী রামায়ণ হইতে গৃহীত হইলেও, কবিজন সুলভ প্রতিভা বলে কৃত্তিবাস তাহাতে বহু নূতন ঘটনার বিন্যাস করিয়াছেন। বাঙ্গালার তদানীন্তন সামাজিক জীবনের এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয় ঐ পুস্তক হইতে পাওয়া যায়। তৎকালে আর কোনও পুস্তক এত লোকপ্রিয় হয় নাই। সেই কারণে পরবর্ত্তীকালে বহু কবি ঐ

গ্রন্থের অনুকরণে আরও অনেকে রামায়ণ রচনা করেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোনটিই কৃত্তিবাসের রামায়ণ অপেক্ষা অধিক জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণ আনুমানিক ১৩৪০ শকে রচিত হয়। পরবর্ত্তীকালে যাঁহারা কৃত্তিবাসের অনুকরণে অপর রামায়ণ রচনা করেন, তন্মধ্যে পাবনা জিলার অমৃতকুণ্ডা গ্রাম নিবাসী অদ্ভুতাচার্য্য উপাধিধারী কবি নিত্যানন্দই প্রধান। তাঁহার গ্রন্থও বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং তৎফলে অনেক সময়ে গাহিবার সময়ে গায়কগণ একের রচিত পদ অন্যের রচনার সহিত সংযোগ করিতেন। এইভাবে মূল কৃত্তিবাসের রামায়ণে অনেক জিনিস প্রক্ষিপ্ত হয়।

১৮০৩ খ্রীঃ শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টধর্ম্মযাজকগণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রথম মুদ্রিত করেন। তাঁহারা অবশ্য বিভিন্ন পুঁথি মিলাইয়া প্রকৃত কৃত্তিবাস রামায়ণের পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন নাই। তাহা হইলেও ঐ মুদ্রিত পুস্তক অতিশয় আগ্রহের সহিত শিক্ষানুরাগী বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে স্থান পাইয়াছিল। এযাবৎকাল প্রধানতঃ ঐ শ্রীরামপুরী কৃত্তিবাসী রামায়ণই দেশে প্রচলিত। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে আধুনিক বটতলার রামায়ণের আদর্শ স্থানীয় শ্রীরামপুরী রামায়ণ বিশ্বাসযোগ্য পুঁথি হইতে সংগৃহিত নহে। এখন কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া যাহা বিক্রয় হয়, মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কৃত্তিবাসী খাঁটি রামায়ণ বহুল পরিমাণে আধুনিকতার আবরণ, সংস্কৃতের প্রলেপ, প্রক্ষিপ্তের উৎপাত, পাঠান্তরের সমাবেশ, অপপাঠের বাহুল্য অঙ্গবৈকুল্য এবং অবয়বহানির সংস্পর্শ ঘটিয়াছে।' (এক্ষণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিদ্বজ্জনসংঘ হইতে মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের সংস্করণ প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে)।

কৃপানন্দ বাহুবলীন্দ্র—তিনি মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী ময়নাগড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র হইতে অধস্তন পঞ্চম ময়নাগড় রাজ। ময়নাগড়ের অধিপতি গোকুলানন্দ বাহুবলীন্দ্র পরলোক গমন করিলে, তিনি এই রাজ্য লাভ করেন। ১৭৪৪ খ্রীঃ অব্দে কাশীযোড়ার রাজা নরনারায়ণ রায় কৃপানন্দকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কৃপানন্দের পর জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্র ময়নাগড়ের রাজা হন।

কৃপানারায়ণ রায় — তমলুকের রাজা। উক্ত রাজ্যের গঙ্গা বংশীয় রাজাদিগের আদি পুরুষ বিদ্যাধর রায় হইতে

অধস্তন পঞ্চত্রিংশ পুরুষ। রাজা নরনারায়ণ রায় তাঁহার পিতা। তিনি স্বীয় রাজ্য মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে রাজা কৃপানারায়ণ রায় নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা কমলনারায়ণ তমলুকের রাজপদ লাভ করেন।

কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত—ওয়ারেণ হেষ্টিংস কর্ত্তৃক আহুত হইয়া, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত একাদশজন পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে হিন্দুদিগের সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক ব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে এক মহাগ্রন্থ রচিত হয়। ইনি সেই একাদশ পণ্ডিতের অন্যতম। কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ দেখ।

কৃপারাম মিশ্র—এই জ্যোতিষী পণ্ডিত ১৭১৪ শকে (১৭৯২ খ্রীঃ অঃ) 'শিবোক্ত পঞ্চ পক্ষী' নামক শাকুন গ্রন্থের 'পঞ্চপক্ষী প্রকাশ' নামে এক টীকা রচনা করেন। তিনি কেশব কৃত 'মুহূর্ত্ত তত্ত্ব' গ্রন্থেরও এক টীকা প্রণয়ন করেন। 'যন্ত্রচিন্তামণি উদাহরণ' তাঁহার রচিত। তিনি ভাস্কর কৃত লীলাবতীর উপরে 'লীলাবতী কৌতুক' নামে এক টীকা রচনা করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন তিনি বেঙ্কট শর্ম্মা বিরচিত 'সর্ব্বার্থ চিন্তামণি' নামক জাতকের এক টীকা প্রণয়ন করেন।

কৃপারাম সোম—চুচুঁড়ার সোম পদবীধারী বিখ্যাত জমিদারগণের পূর্ব্ব পুরুষ। তদানীন্তন গৌড়াধিপের প্রধান মন্ত্রী বলভদ্র সোমের পৌত্র ও নৃসিংহ সোমের পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম গঙ্গানারায়ণ সোম। তিনি দক্ষতার সহিত চুচুঁড়ার ওলন্দাজ কুঠিতে কর্ম্ম করিয়া, ওলন্দাজ কোম্পানী হইতে সরকার উপাধি লাভ করেন। কৃপারামের পুত্র রামচরণ চন্দননগর হইতে উঠিয়া আসিয়া কলিকাতায় বাগবাজার পল্লীতে বসতি স্থাপন করেন।

কৃপাশঙ্কর—এই জ্যোতিষী পণ্ডিত, গণিত ও ফলিত সম্বন্ধে 'জ্যোতিষকেদার' নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

কৃমি কণ্ঠ—খ্রীষ্টীয় দশম শতকে কাঞ্চীনগরে কৃমিকণ্ঠ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শৈব ছিলেন এবং বৈষ্ণবগণের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতেন। বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজের উপর তাঁহার অতিশয় বিদ্বেষ ছিল। তিনি রামানুজকে হত্যা করিয়া দেশ হইতে বৈষ্ণবদিগকে বিতাড়িত করিতে মনস্থ করেন; এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তিনি রামানুজকে ডাকিয়া পাঠান। রামানুজের শিষ্যগণ কৃমিকণ্ঠের এই দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা রামানুজকে কিছুতেই যাইতে

দিলেন না। তৎপরিবর্ত্তে রামানুজের প্রিয় শিষ্য কুরেশ, কৃমিকণ্ঠের রাজ সভায় উপস্থিত হইলেন। কৃমিকণ্ঠের আদেশে ঘাতক যখন তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করেন, তখনও তিনি ঘাতকগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণংভট্ট বা কৃষ্ণভট্ট আর্ডে কাশী-বাসী—একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত 'মঞ্জুষা' বা 'জাগদীশী' টীকা এবং 'নির্ণয়সিন্ধু'র উপর দীপিকা নামে টীকা রচনা করিয়া ইনি প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার পিতার নাম রঘুনাথ ভট্ট। কাশী তাঁহার জন্মস্থান। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

কৃষ্ণ (১)—এই জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ১৫৯৪ শকের (১৬৭২ খ্রীঃ অঃ) পূর্ব্বে তাজক তিলক গ্রন্থ রচনা করেন। (২) কৃষ্ণ নামে এক জ্যোতিষী পক্ষীজাতক নামে একখানা জাতক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। (৩) এক কৃষ্ণ শিবোক্ত পঞ্চপক্ষী 'নামক শাকুল' গ্রন্থের, পঞ্চ-পক্ষী প্রকাশ নামক এক টীকা (১৫৪৬ খ্রীঃ অঃ) পূর্ব্বে রচনা করেন।

কৃষ্ণ—(২) তিনি একজন বড় দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক ন্যায়ের মতানুবর্ত্তী ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'মধ্যম প্রতীত্য সমুৎপাদ'।

কৃষ্ণ—(৩) 'ভাবপ্রকাশ' নামক প্রসিদ্ধ বৈদ্য শাস্ত্র প্রণেতা।

কৃষ্ণ—(৪) শালুম্ব্রাপতি রাবৎকৃষ্ণ মিবারের একজন প্রধান সামন্ত নরপতি ছিলেন। তিনিই রাণা যোগমলকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া রাণা প্রতাপকে রাজবংশ ও দেবদত্ত খড়্গে সজ্জিত করিয়া রাজাসনে স্থাপন করেন এবং তিনবার ভূমি স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে মিবারের অধীশ্বর বলিয়া সম্বোধন করেন। ক্রমে সকল সর্দ্দার ও সামন্ত রাবৎকৃষ্ণের কার্য্যের অনুসরণ করেন।

কৃষ্ণ—(৫) বল্লভরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ চেদিবংশীয় প্রথম কোকল্লদেবের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। এই কৃষ্ণ অকালবর্ষ নামেও খ্যাত ছিলেন।

কৃষ্ণ—(৬) দেবগিরির যাদব বংশীয় নরপতি সিজ্ঞনের পৌত্র। ১২৪৭ খ্রীঃ অব্দে পিতামহের মৃত্যুর পর তিনি রাজা হন। তিনি হয়শাল, গুর্জ্জর ও মালব নরপতিগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ১২৬০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মহাদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কৃষ্ণ—(৭) রাষ্ট্রকূট বংশীয় তৃতীয় কৃষ্ণ একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে চালুক্য বংশীয় পেরুমানদি গঙ্গারাজ্য আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। এই পেরুমান-দিকে গঙ্গারাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য চোলরাজ রাজাদিত্য

তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। পেরুমানদিকে সাহায্য করিবার জন্য তৃতীয় কৃষ্ণ অগ্রসর হইলেন। তক্কুলম্ নামক স্থানে ৯৪৭ খ্রীঃ অব্দে এক ঘোরতর যুদ্ধে কৃষ্ণ রাজাদিত্যকে ভীষণরূপে পরাস্ত করেন। রাষ্ট্রকূটপতি তৃতীয় কৃষ্ণ চোলরাজধানী কাঞ্চীনগরী অধিকার করিলেন এবং তাঞ্জোর অবরোধ করিলেন। এই বিপদ হইতে রাজাদিত্যের ভ্রাতা গন্দরাদিত্য কোনও রূপে চোলরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী (কবিরাজ)—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পার্শ্বচর সদাশিব কবিরাজ ও তৎপুত্র, নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গা দেবীর স্বামী মাধবাচার্য্যের গুরু পুরুষোত্তম কবিরাজের বংশে ১৮১০ খ্রীঃ অব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাজনঘাট গ্রামে কৃষ্ণকমলের জন্মহয়। তাঁহার পিতার নাম মুরলীধর ও মাতারনাম যমুনা দেবী।

সপ্তম বর্ষ বয়সে কৃষ্ণকমল পিতাকর্ত্তৃক বৃন্দাবনে নীত হন ও তথায় ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। কিছুকাল পর বৃন্দাবনের জনৈক সন্তানহীন ধনবান বণিক কৃষ্ণকমলকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিতে চাহিলে, মুরলীধর সপুত্র স্বগ্রামে প্রত্যাবৃত হন। অতঃপর নবদ্বীপের এক চতুষ্পাঠীতে তিনি কাব্য অধ্যয়ন করেন। নবদ্বীপে অবস্থান কালে তিনি নিমাই সন্ন্যাস নামক তাঁহার বিখ্যাত পালা গান রচনা করেন ও স্বয়ং উহার অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। এই রচনা ও অভিনয় নবদ্বীপ বাসীগণকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী সোমড়া বাঁকীপুর গ্রামে কৃষ্ণকমলের বিবাহ হয়। তাঁহার পত্নীর নাম স্বর্ণময়ী দেবী।

অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত কৃষ্ণকমল বহুকাল ঢাকা নগরীতে অবস্থান করেন এবং এই স্থানেই তাঁহার বিখ্যাত পালা গান গুলি রচিত হয়। ঢাকায় তৎকালে কৃষ্ণকমল ভিন্ন আরও অনেক পালা গান রচয়িতা ছিলেন, কিন্তু প্রবল প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও কৃষ্ণকমল রচিত পালা গান সকল তাহাদের অন্তর্নিহিত ভাব, ভক্তিরস ও কবিত্বগুণে পূর্ব্ববঙ্গবাসীগণের হৃদয় হরণ করিয়াছিল। তাঁহার রচিত পালা সকলের মধ্যে 'নিমাই সন্ন্যাস,' 'স্বপ্ন-বিলাস', 'রাই উন্মাদিনী' বা 'দিব্যোন্মাদ' 'বিচিত্র বিলাস', 'সুবল সংবাদ,' 'নন্দ হরণ', 'ভরত মিলন' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঢাকায় তিনি বিপুল প্রতিষ্ঠা ও যশ লাভ করেন এবং ঢাকাবাসীগণের দ্বারা সসম্মানে 'বড় গোঁসাই' নামে অভিহিত হন। পুস্তক সমূহের বিক্রয়লব্ধ আয়ও তাঁহার সামান্য ছিল না। জ্যেষ্ঠ পুত্রের শোকে কাতর ও ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া সাতাত্তর বৎসর বয়সে ১৮৮৮

খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় তিনি দেহত্যাগ করেন।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য— দেশপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী। আনু-মানিক ১২৪৭ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহারা মালদহের বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন। মাত্র ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তিনি কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্ত্তী পরী-ক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময়ে তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুকাল পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া হাবড়ায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ঐ সময়েই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। তাঁহার পর কিছুকাল কলিকাতা হাইকোর্টেও আইন ব্যবসায় করেন।

পরবর্ত্তীকালে তিনি কিছুকাল রিপণ কলেজের আইন বিভাগের অধ্যক্ষতা করেন। ঐ সময়ে একাধারে সংস্কৃত, দর্শনশাস্ত্র এবং ব্যবহার শাস্ত্র এই তিন বিষয়েই তিনি অধ্যাপনা করিতেন। সংস্কৃত ও দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কথা সর্ব্বজন বিদিত ছিল। বহুকাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন।

প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা সাময়িক পত্র হিত-বাদীর তিনিই প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য বহু সাময়িক পত্রিকাতে তাঁহার চিন্তাপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হইত। কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত 'অবোধ বন্ধু' নামক মাসিক পত্রিকাতে নূতন রীতিতে বহু বাঙ্গালা প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তীকালে বঙ্কিম-চন্দ্রের রচনা রীতি কৃষ্ণকমলের রচনা রীতিরই উন্নততর অবস্থা ছিল।

সংস্কৃত কাব্য সমূহের ছাত্রপাঠ্য সংস্করণ প্রকাশ করিয়া তিনি বহু ছাত্রের সংস্কৃত শিক্ষালাভের পথ সুগম করিয়া দেন।

রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি সামাজিক বিষয়ে উদার মতাবলম্বী ছিলেন।

তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী, নানা ভাষাবিদ্ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অধিক জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি আধুনিক কালের সাধা-রণ বাঙ্গালীর তুলনায় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে (১৯২২ খ্রীঃ আগষ্ট) বিরানব্বই বৎসর বয়সে এই মনীষী পরলোক গমন করেন।

কৃষ্ণকান্ত চামার (কেষ্টা মুচী)— চর্ম্মকার কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জাতি-ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলেও, কবির গান এবং বৈষ্ণব সঙ্গীত রচনা করিয়া কৃষ্ণকান্ত বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। অবসর সময়ে স্বয়ং কবি গান গাহিয়া কৃষ্ণকান্ত অর্থোপার্জ্জন করিতেন। তৎকালীন অন্যান্য কবিগান রচয়িতাদের সঙ্গীতের মত তাঁহার গান সকলও যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছিল।

কৃষ্ণকান্ত দাস— একজন বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। তাঁহার রচিত ২৯টী পদ পাওয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণকান্ত নন্দী — কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বাঙ্গলা, ফারসী ও কিছু কিছু কিছু ইংরেজি জানিতেন এবং হিসাব পত্রে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল. কাশিমবাজারে তাঁহার একটি সামান্য মুদির দোকান ছিল। সেজন্য লোকে তাঁহাকে 'কান্ত মুদি' বলিয়া ডাকিত। পরে তিনি ইংরেজদের কুঠিতে সামান্য মুহুরির কাজে নিযুক্ত হন। সেই সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন। কান্তবাবুর সহিত তখনই তাঁহার পরিচয় হয়। ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাশিম বাজারের রেশম কুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা নিজনামে কোন ব্যবসায় পরিচালনা করিতে পারিতেন না। এই সময়েই তাঁহারা নিজ নামে অথবা বেনামিতে ব্যবসায় পরিচালনা করিবার অনুমতি পান। হেষ্টিংস সাহেব কান্ত বাবুর বেনামিতে ব্যবসায় চালাইতেন এবং জমিদারী ও ফারম প্রভৃতি ইজারা লইতেন। ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় অন্ধকূপ হত্যা সংঘটিত হয়। সেই সময়ে নবাব ইংরেজ জাতির উপরই অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং কাশিম বাজারের ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ হেষ্টিংস সাহেব ও অন্যান্য সাহেবদিগকে বন্দী করেন। এই সময়ে হেষ্টিংস কোনও প্রকারে পলাইয়া কান্ত বাবুর শরণাপন্ন হন। কান্তবাবু অতি সতর্কতার সহিত তাঁহাকে গোপন করিয়া রাখেন। তৎপরে ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস ভারতবর্ষের প্রধান শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন। এইসময়ে পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়া তিনি কান্তবাবুকে নিজের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। এই পদে চতুর্দ্দশ বৎসর কাল প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কান্ত বাবু প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন ও মান সম্মান লাভ করেন। এই এই সময়ে গাজীপুর ও রঙ্গপুরে কয়েকটী জমিদারী এবং লবণের গোলার ইজারা প্রাপ্ত হন। হেষ্টিংসের অনুগ্রহে কিছু পরে গাজীপুর ও আজমগড় জিলার

কয়েকটী পরগণা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হন। কথিত আছে নাটোরাধিপতির রঙ্গপুরস্থ বাহিরবন্দ নামক উৎকৃষ্ট পরগণা হেষ্টিংস সাহেব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, তাঁহার উপকারী কান্তবাবুকে প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কান্ত বাবুর পুত্র লোকনাথ নন্দী মহাশয়ের নামেও অনেক জমিদারী বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বলিতে কি কান্তবাবু হেষ্টিংস সাহেবের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তিনি যখন যেস্থানে গমন করিতেন, কান্তবাবুও তাঁহার সঙ্গী হইতেন। ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দে হেষ্টিংস সাহেব কাশীরাজ চৈৎসিংহকে আক্রমণ করেন। এই সময়ে কান্তবাবু অত্যাচার নিবারণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হন। রাজমাতার নিকট হইতে অনেকগুলি বহু মূল্যবান্ অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক জিনিষ লুণ্ঠনের সময় প্রাপ্ত হন। বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তাঁহার বহু জমিদারী লাভ হয়। দেওয়ান নন্দকুমারের ফাঁসির তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পুত্র লোকনাথ নন্দী রাজা হন। ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দের ২৯ শে ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র রাজা লোকনাথ নন্দী বিষয়ের অধিকারী হন। তিনি আরও কয়েকটী জমিদারি ক্রয় করিয়া সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। ১৮০৪ খ্রীঃঅব্দে এক বৎসর বয়স্ক পুত্র হরিনাথ নন্দীকে রাখিয়া তিনি পরলোকবাসী হন। রাজা হরিনাথ ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় হস্তে জমিদারীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তিনি দাতা, উন্নতমনা ও পরোপকারী রাজা ছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দের ১৮ই অগ্রহায়ণ তিনি পত্নী রাণী হরসুন্দরী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র রাজা কৃষ্ণনাথ ও কন্যা গোবিন্দ সুন্দরীকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

কৃষ্ণকান্ত পাঠক—ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ বিক্রমপুরের কাসাভোগ গ্রামে অনুমান ১২২৮ বঙ্গাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম চিন্তামণি ঠাকুর। কথকতা করা তাঁহার ব্যবসায় ছিল। তাঁহার রচিত সংগীত ও নূতন সুর অতি মনোহর ছিল। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গীত করিবার শক্তি অটুট ছিল। সত্তর বৎসর বয়সে ১২৯৮ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। নিম্নে তাঁহার একটী বহুজন আদৃত সংগীত প্রদত্ত হইল। তাঁহার এই কবিত্বময় সঙ্গীতটী তাঁহার কণ্ঠে অতি মধুর শুনাইত।

রাগীনী মনোহর সাই—তাললোফা।

জানি কার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে,
ও গোর হয়েছে। তারে ধরবে বলে;

থই পেলেনা, ন'দে উঠেছে।
কারে জানি বাসতো ভাল,
সে মনের মত ছিল,
সদা ওর মনছিল,
সেই রূপের কাছে
ও পেলে না সে বলে, তাইতে বিকল
অন্তরে ওর দাগ লেগেছে।
বুঝি ওর মনপুড়ে যায়,
নাইকো স্থির ভ্রমি বেড়ায়,
তাপিত প্রাণ শীতল হয়,
স্থান কোথায় আছে ?
তার প্রেমানলে দগ্ধ হৃদয়,
নয়নে নিশানা আছে।
নাইকো ওর দুঃখের অন্ত,
হয়েছে পথ শ্রান্ত
সদা মন ভ্রান্ত নয়ন জল পড়েছে।
কৃষ্ণকান্ত বলে, শান্তি নাই তার
যাবজ্জীবন তাবৎ আছে ॥

কৃষ্ণকান্ত পাল চৌধুরী বা কান্ত পান্তী—তিনি রাণাঘাট পালচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পিতার নাম সহস্ররাম পাল। তাঁহারা জাতিতে তিলি। সহস্ররামের কৃষ্ণকান্ত, শম্ভুচন্দ্র ও নিধিরাম নামে তিন পুত্র ছিল। কৃষ্ণকান্ত ১৭৪৯ খ্রীঃ অব্দের (১১৫৬ বঙ্গাব্দের) অগ্রহায়ণ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। সুতরাং কৃষ্ণকান্ত লেখাপড়া শিক্ষার সুযোগ পান নাই। তিনি পান বিক্রয় করিতেন বলিয়া, পান্তী নামে খ্যাত হন। গাংনাপুরের ও আন্দুলের হাট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতেন। এই প্রকারে তিনি কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন। ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় ছোলা দুষ্প্রাপ্য হয়। এই সময়ে রাণাঘাটে একজন মহাজন ছোলা ক্রয় করিতে আসেন। কৃষ্ণকান্ত তাঁহাকে ছোলা সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন এবং তাঁহার সহিত এক চুক্তি পত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সময়ে আড়ংঘাটার মহান্ত গঙ্গারামের গোলায় অনেক সঞ্চিত ছোলা ছিল। সেই ছোলা কীটদষ্ট হইতে আরম্ভ করিলে, তিনি অতি অল্প মূল্যে তাঁহার নিকট বিক্রয় করেন। চুক্তি পত্রানুযায়ী তিনি সেই ছোলা পূর্ব্বোক্ত কলিকাতাগত মহাজনের নিকট বিক্রয় করিয়া ছয় সহস্র মুদ্রা লাভ করেন। ঐ টাকায় তিনি কলিকাতায় লবণের ব্যবসায় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের পরামর্শে তিনি কয়েকটি জমিদারী ক্রয় করেন। কৃষ্ণনগরের রাজারা মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতেন। সেই সময়ের কৃষ্ণনগরের রাজা শিবচন্দ্র তাঁহাকে চৌধুরী উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। কৃষ্ণকান্ত রাণাঘাট ক্রয় করিয়া ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে বাস

ভবন, উদ্যান বাটী অশ্বশালা, গোলা-বাটী প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও প্রশস্ত জলাশয় খনন করিয়া সহরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহারা রাণা-ঘাটের পালচৌধুরী নামে খ্যাত হন। ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে মার্কুইস অব হেষ্টিংস রাণাঘাট পরিদর্শনকালে, তাঁহাকে রাজা উপাধি দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত সম্মত না হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত 'পালচৌধুরী উপাধি' মঞ্জুর করিয়া আসাশোঁটা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন। তদবধি তাঁহারা আসাশোঁটা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণকান্ত যেমন ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তেমনই সদ্ব্যয়ও তাঁহার যথেষ্ট ছিল।

কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ—নদীয়াধি-পতি মহারাজ গিরিশচন্দ্রের (১৮০২-১৮৪১ খ্রীঃ) রাজসভার একজন প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত। তিনি ন্যায় ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন। 'শব্দশক্তি প্রকাশিকা', নামক ন্যায়শাস্ত্র গ্রন্থ তাহারই রচিত। তদ্ভিন্ন তিনি জীমূত বাহন কৃত দায়ভাগের একটী টীকা এবং 'গোপাল লীলামৃত' নামক একটি গ্রন্থও রচনাকরেন।

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী, রসসাগর—তিনি নদীয়া কৃষ্ণনগরের রাজা গিরিশ চন্দ্রের (১৮০২-১৮৪১ খৃঃ) রাজ-সভায় একজন বিখ্যাত হাস্যরসিক কবি ছিলেন। তাঁহার উপস্থিত কবিতা রচনায় অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। উপস্থিত পাদপূরণেও তাঁহার অসা-ধারণ ক্ষমতা ছিল। ১১৯৮ বঙ্গাব্দে (১৭৯১ খৃঃ) তিনি নদীয়া জিলার বাগোয়ানের নিকটস্থ বাড়েবাকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৫১ বঙ্গাব্দে কন্যার আলয়ে শান্তিপুরে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গলা, হিন্দী, ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সমস্যা পূরণের অসাধারণ ক্ষমতার একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া গেল। সমস্যা—

শমন ভবনে কেন তুমি অগ্রগামী ?
শক্তিশেলে লক্ষ্মণ পড়িলে রণভূমি,
কান্দেন ব্যাকুল হয়ে জগতের স্বামী।
শিক্ষা দীক্ষা বিবাহ সভায় আগে আমি,
শমন ভবনে কেন, তুমি অগ্রগামী ?

কৃষ্ণকিশোর তর্কালঙ্কার—ওয়ারেন হেষ্টিংসের আজ্ঞাক্রমে যে এগারজন পণ্ডিত 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, কৃষ্ণকিশোর তাঁহাদের অন্যতম। কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ দেখ।

কৃষ্ণকিশোর বিদ্যাসাগর—ত্রিপুরা জেলার জনৈক দার্শনিক পণ্ডিত। বুড়ীশ্বর গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। ত্রিপুরার বিখ্যাত পণ্ডিত শিবকিঙ্কর বিদ্যাভূষণ তাঁহার পিতামহ। তিনি শেষ জীবনে কাশীতেই ছিলেন এবং একজন পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতিও ছিল। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য, মহারাজ—তিনি ত্রিপুরার মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যের পুত্র। ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজা হন। শস্ত্রবিদ্যা ও মল্লযুদ্ধে তিনি নিপুণ ছিলেন। কিন্তু বড়ই অপব্যয়ী ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দের বৈশাখ মাসে তিনি বজ্রাঘাতে পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র ঈশানচন্দ্র রাজা হন।

কৃষ্ণকিশোর রায়—তিনি একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি। 'দুর্গা লীলা তরঙ্গিনী' নামক প্রসিদ্ধ কাব্য তাঁহার রচিত।

কৃষ্ণকুমার মিত্র—দেশ প্রসিদ্ধ সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতা, সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম্ম প্রচারক। ১২৫৯ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে (১৮৫২ খ্রীঃ ডিসেম্বর) ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার বাঘিল গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। কৃষ্ণকুমারের পিতা গুরুচরণ মিত্র লোকপ্রসিদ্ধ, ধর্ম্মপ্রাণ, তেজস্বী, অতিথিবৎসল সৎকর্ম্মানুরাগী সম্ভ্রান্ত তালুকদার ছিলেন। তাঁহার সমস্ত সদ্‌গুণ কৃষ্ণকুমার লাভ করেন।

অতি শৈশবে কৃষ্ণকুমার ময়মনসিংহ নগরে হার্ডিং বঙ্গ বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশটাকা বৃত্তি লাভ করেন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া কলেজে ভর্ত্তি হন এবং যথা-সময়ে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কর্ম্ম জীবনের প্রথম হইতে, জন-হিতকর কাজে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল স্বর্গীয় কালীশঙ্কর সুকুল, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি মনস্বীগণের সহিত বন্ধুত্বের ফলে, তিনি এবিষয়ে কাজ করিবার বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন (Indian Association) স্থাপিত হইলে আনন্দমোহন বসু তাহার প্রথমসম্পাদক এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তৎপূর্ব্বে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত কালীশঙ্কর সুকুল ও কৃষ্ণকুমার মিত্র উভয়ে উত্তর বঙ্গের নানাস্থানে বক্তৃতা প্রদান করিবার জন্য গমন করেন। তৎপরে ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় তাঁহারা দুইজন এবং সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর ভারতের নানাস্থানে রাজনীতিক বক্তৃতা প্রদান করিবার জন্য পর্য্যটন করেন।

১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় সিটি স্কুল স্থপিত হয়। পুনার প্রসিদ্ধ ভারত সেবক সমিতির (Servants of India Society) অনুকরণে

আজীবন মাত্র ৭০৲ টাকা বেতনে কাজ করিবার অঙ্গীকারে কৃষ্ণকুমার ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। পরে ঐ স্কুল কলেজে পরিণত হইলে তিনি উহার ইতিহাসের অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ঐ পদ পরিত্যাগ করিতে হয়। শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে তিনি সর্ব্বদাই ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও মানসিক উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতেন।

১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গ বিভাগ উপলক্ষে দেশব্যাপী যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়, কৃষ্ণকুমার প্রথম হইতে উৎসাহের সহিত তাহাতে যোগদান করেন। বস্তুতঃ ঐ আন্দোলনের তিনি একজন প্রধান নেতা ছিলেন। তৎসম্পাদিত সঞ্জীবনী পত্রিকায় তিনি তীব্র ভাষায় বঙ্গ বিভাগের প্রতিবাদ করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা প্রদান, বিদেশী পণ্য বর্জ্জনে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে ১৯০৫ হইতে ১৯১১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত কয় বৎসরের স্বদেশী আন্দোলনে কৃষ্ণকুমার একজন প্রধান নেতা ছিলেন। ঐ যুগের বাঙ্গালা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে কৃষ্ণকুমারের নাম জলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। ঐ সময়েই তিনি সিটি কলেজের কাজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সঞ্জীবনী পত্রিকাতেই প্রথম বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। এই ব্যাপারেতিনি সুরেন্দ্রনাথের প্রধান সহযোগী ছিলেন। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে ৺কৃষ্ণকুমার মিত্র, ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত, ৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, ৺রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী দাস, ৺শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, ৺ভূপেশচন্দ্র নাগ ও শচীন্দ্র প্রসাদ বসু, এই নয়জন ব্যক্তি নির্ব্বাসিত হন। কৃষ্ণকুমারকে আগ্রা দুর্গে বন্দী করিয়া রাখা হয়। এই নির্ব্বাসন উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বত্র বিপুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাঁহার মুক্তি সাধনের জন্য বিলাতেও আন্দোলন ও অর্থ সংগ্রহ হয়। প্রায় পনের মাস বন্দী থাকিয়া ১৯১০ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

দীর্ঘকাল বন্দী অবস্থায় থাকিয়াও কৃষ্ণকুমারের তেজস্বিতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। তিনি নূতন উৎসাহে এবং নূতন ভাবে স্বদেশী মন্ত্র প্রচারে ব্রতী হন। তাঁহারই উৎসাহে এবং আরও কতিপয় উৎসাহশীল ব্যক্তির পরিশ্রমে প্রথম স্বদেশী মেলার প্রতিষ্ঠা হয়। কয়েক বৎসর বিশেষ সাফল্যের সহিত ঐরূপ মেলা হইয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশে যে অসহযোগ আন্দোলন উপস্থিত হয়, কৃষ্ণকুমার তাঁহার যৌক্তিকতায় সন্দীহান হইয়া, সেই আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। জনসাধারণের অপ্রিয় হইবার আশঙ্কায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তিনি সঞ্জীবনী পত্রিকায় ঐ আন্দোলনে বিরুদ্ধে লেখনী পরিচালনা করেন। কোনও প্রকার কটূক্তি, ভীতি প্রদর্শন, অনুরোধ অথবা উপহাস তাঁহাকে নিজ মতের বিরুদ্ধ কার্য্য করাইতে পারে নাই। এই অসাধারণ স্বমত দৃঢ়তা তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত একভাবেই ছিল।

প্রধানতঃ কলিকাতায় থাকিয়া ব্যাপক ভাবে রাজনীতি আন্দোলনে নিযুক্ত থাকিলেও গ্রামের উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। নিজ গ্রামে কর্ম্মপটু ব্যক্তিদের অন্ন সংস্থানের জন্য নানাভাবে সহজ শিল্পের আয়োজন করেন। ঐসকল ব্যক্তিদের প্রস্তুত দ্রব্য নানাস্থানে বিক্রয় করাইবার ব্যবস্থা করিয়া তিনি বহু দরিদ্র পরিবারের অন্ন সংস্থানের উপায় করেন।

রাজনীতিক জীবনের কার্য্যাবলীর এক প্রধান অংশ সঞ্জীবনী সম্পাদন। তিনি চিরদিন এক আদর্শ লইয়া সঞ্জীবনী সম্পাদন করিয়াছেন। ঐ পত্রিকা সাহায্যে তিনি আসামের চা বাগানের কুলিদের প্রতি অত্যাচার নিবারণের জন্য যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন তাহা বাস্তবিকই অভূতপূর্ব্ব। তাঁহার আন্দোলনে বিব্রত হইয়া, চা-করগণ প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার মস্তকের জন্য পাঁচশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। পূর্ব্বোক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এবিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। 'আসামে লেগ্রীর বংশধর' নামে, জ্বালাময়ী ভাষায় ধারাবাহিক ভাবে সঞ্জীবনীতে যে সকল বিবরণ প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহারই ফলে জনসাধারণের মধ্যে তাহার আন্দোলন আরম্ভ হয়, এবং তৎফলে কুলিদের প্রতি অত্যাচার অনেকাংশে প্রশমিত হয়।

কৃষ্ণকুমার কংগ্রেসের প্রথম হইতেই উহার একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। তৎকালীন বাঙ্গালা সাময়িক পত্রসকলের মধ্যে সঞ্জীবনীই কেবল জনসাধারণকে কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করেন। শেষ জীবনে, কংগ্রেসের কার্য্য প্রণালী তাঁহার বিশ্বাস বিরুদ্ধ হইলেও, তিনি কখনও প্রকাশ্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মত প্রচার করেন নাই।

সঞ্জীবনী পত্রিকার সাহায্যে তিনি দেশের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর কার্য্যে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতেন। আবশ্যক মত সরকারের কার্য্যে তীব্র প্রতিবাদ করিতেও তিনি কখনও

পশ্চাৎপদ হন নাই। ঐ পত্রিকার দ্বারা চিরদিন সাম্প্রদায়িক মিলন প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণকুমারের জীবনের একটি প্রধান গুণ ছিল তেজস্বিতা। কোনও রূপ ভীতি প্রদর্শন তাঁহাকে কর্ত্তব্য-চ্যুত করিতে পারে নাই। পূর্ব্বোক্ত স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বরিশালে একবার (১৯০৬) রাজনীতিক সম্মেলন হয়। স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ ঐ সম্মেলন হইতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এমন কি তাঁহারা, বল প্রয়োগে উহা ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্যত হন। সেই সময়ে সভার অধিবেশন কালে স্থানীয় পুলিশের প্রধান কর্ম্মচারী সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া বলেন যে অধিবেশন আইন বিগর্হিত। সুতরাং স্বেচ্ছায় অধিবেশনের কাজ বন্ধ না করিলে বল প্রকাশে উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। তখন উপস্থিত সমুদয় ব্যক্তি সভাগৃহ ত্যাগ করেন। কেবল কৃষ্ণকুমার একাকী দৃঢ়ভাবে মঞ্চের উপর বসিয়া রহিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে পুলিশের লোক ধরিয়া বাহিরে আনয়ন করে।

তাঁহার নির্ভিকতাও সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনি একবার ত্রিপুরার মহারাজের নিকট হইতে সিটি কলেজের সাহায্যের জন্য প্রদত্ত তিন হাজার টাকা সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে গোয়ালন্দে আসিতে ছিলেন। তখন ষ্টীমার ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে হয় নাই। পথে ঝড়ে মেঘনায় নৌকাডুবি হয়। কৃষ্ণকুমার পূর্ব্বেই সমুদয় টাকা দৃঢ়ভাবে কোমরে বাঁধিয়া নদী সাঁতরাইয়া ফরিদপুরে উপস্থিত হন। তথা হইতে একবস্ত্রে পদব্রজে গোয়ালন্দ গমন করেন এবং গোয়ালন্দে হইতে রেলযোগে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অতি অল্প বয়সেই ময়মনসিংহ নগরে ছাত্রাবস্থায় থাকিবার সময়ে তিনি ময়মনসিংহ নগরে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। ময়মনসিংহে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে, তিনি তাহার সভ্য হন। তৎফলে তাঁহার অভিভাবকগণের উপর উৎপীড়ন হইবার তিনি দীর্ঘকাল বাড়ীর বাহিরে কলাপাতায় আহার করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার যোগ ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তিনি অকৃত্রিম ধর্ম্মভাব, ধর্ম্মপ্রচারে অদম্য উৎসাহ, উদার প্রকৃতি, পরোপকারিতা, অন্যায়ের ও দুর্নীতির প্রতি প্রবল ঘৃণা প্রভৃতি মহৎগুণের জন্য ক্রমশঃ ব্রাহ্মসমাজে নেতৃপদ লাভ করেন। আজীবন তিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ব্রাহ্মসমাজকে সর্ব্বপ্রকারে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অসাধারণ ছিল বলিলেও

অত্যুক্তি হয় না। মনে প্রাণে তিনি খাঁটি ব্রাহ্ম ছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য অশেষ ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহ্য করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার পরোপকার স্পৃহায় ধনী দরিদ্র ভেদ ছিল না। যে কোনও সম্প্রদায়ের লোক, কোনও রূপ সাহায্য প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তিনি নিজের সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা তুচ্ছ করিয়া তাহার উপকার করিয়াছেন। একাধারে ধনীর বন্ধু এবং দরিদ্রের সকল প্রকার বিপদের সহায়, এরূপ লোক বাস্তবিকই দুর্লভ।

নারীজাতীর প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ও করুণা ছিল। বাঙ্গলা দেশে নারীর প্রতি অত্যাচার বিস্তৃতি লাভ করিলে তিনি আরও কয়েকটি মহানুভব ব্যক্তির সহায়তায় নারীরক্ষা সমিতি স্থাপন করেন এবং নিজের সুখ স্বাস্থ্য উপেক্ষা করিয়া ঐ সমিতির সাহায্যে নারীর প্রতি অত্যাচারের বিপুল আন্দোলন্ উপস্থিত করেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে ঐ সমিতির প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিনেও, একটি বিপন্না নারীর সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি যদি আর কিছুও না করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে কেবল এই কার্য্যদ্বারাই দেশের লোকের শ্রদ্ধারপাত্র হইতে পারিতেন। বস্তুতঃ গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে একাধারে এইরূপ বহুগুণ সম্পন্ন মনীষী বাঙ্গালাদেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলেও সত্যের অপলাপ করা হয় না। তিনি লোক সমাজে নিজের প্রতিষ্ঠালাভের জন্য আদৌ ব্যগ্র ছিলেন না। সর্ব্বদাই সকলের পশ্চাতে থাকিয়া কাজ করিতে ভাল বাসিতেন। অথচ তিনি নিজে সুদীর্ঘ জীবনে যত মহৎ কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সামান্য অংশ সম্পন্ন করিতে পারিলে অনেকে জীবন ধন্য মনে করিতে পারে। তাঁহার জীবিত কালের মধ্যে এমন কোনও সংকাজ দেশে ঘটিতে পারে নাই, যাহার সহিত তাঁহার আন্তরিক যোগ না ছিল।

১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে (১৩৪৩ বঙ্গাব্দের পৌষ) মাত্র কয়েক ঘণ্টা গুরুতর পীড়ার আক্রমণে এই মহা-প্রাণ ব্যক্তি অমরলোকে গমন করেন।

কৃষ্ণগুপ্ত—মালব রাজ্যের গুপ্তবংশীয় নরপতি। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতি-গণের কোন বিবরণ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ তিনিই এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মালবের গুপ্তরাজ বংশের তালিকা— কৃষ্ণগুপ্ত— হর্ষ-গুপ্ত— জীবিতগুপ্ত— কুমারগুপ্ত — দামোদরগুপ্ত — মহাসেনগুপ্ত — দেবগুপ্ত (ভ্রাতা)—আদিত্য সেন—দেবগুপ্ত—বিশ্বগুপ্ত ও জীবিতগুপ্ত।

কৃষ্ণগুপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুমার গুপ্তের (১ম) বংশ লোপ পাইলে কৃষ্ণ-গুপ্তের (অন্য নাম গোবিন্দগুপ্ত) বংশ-ধরেরা পাটলীপুত্র নগরে রাজত্ব করিয়া ছিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, সার—ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী ভাটপাড়া গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ গুপ্তপরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা ও কাওরাইদের জমীদার ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুরাগী প্রচারক কালী নারায়ণ গুপ্ত তাঁহার পিতা এবং অন্নদা দেবী তাঁহার জননী। বাল্যে ঢাকায় কৃষ্ণগোবিন্দ বিদ্যাশিক্ষা করেন এই সময় ঢাকা নগরীতে ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের গৃহে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও সঙ্গতসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কালী-নারায়ণের তিন পুত্র—কৃষ্ণগোবিন্দ, প্যারীমোহন ও গঙ্গাগোবিন্দ এই সঙ্গত সভার ছাত্রাবাসে অবস্থান করিতেন। সঙ্গত সভার সদস্য প্রবীণ ব্রাহ্মগণের প্রবল আপত্তিসত্ত্বেও কৃষ্ণগোবিন্দ প্রমুখ সভার তরুণ সদস্যগণ এইসময়ে জালালউদ্দীন নামক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি গভীর অনুরাগী এক মুসলমান যুবককে সভার সভ্য শ্রেণী ভুক্ত করেন ও প্রসন্ন কুমার সেন নামক এক সদস্যের বিবাহের প্রীতিভোজ উপলক্ষে উক্ত মুসলমান যুবকের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করেন। পুত্রগণের এই উদারতা ও সৎসাহসের জন্য কালী নারায়ণ স্বীয় জমিদারীর মধ্যেও আত্মীয়, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি দ্বারা সামাজিক বর্জ্জন প্রভৃতি অশেষরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করেন। তিনি অবশেষে ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে ঢাকার ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নিকট দুই পুত্র এবং দুই ভৃত্যের সহিত একত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কৃষ্ণগোবিন্দ ময়মনসিংহ ও ঢাকা নগরীতে শিক্ষা লাভ করেন। তৎপরে ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে গমনপূর্ব্বক সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগীতায় সফলকাম হইয়া ১৯৭১ খ্রীঃ অব্দ হইতে বাঙ্গলা সরকারের অধীনে দায়ীত্বপূর্ণ নানা পদে কর্ম্ম করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গলা সরকারের রাজস্ব সংক্রান্তমন্ত্রণা সভার (Revenue Board) প্রথম ভারতীয় সদস্য এবং ১৯০৭খ্রীঃ অব্দে বিলাতের ভারতসচিবের মন্ত্রণা সভার (India Council) অন্যতর প্রথম ভারতীয় সভ্য মনোনীত হন। এতদ্ভিন্ন ভারতীয় ফিশারী কমিশনের সভ্যপদেও মনোনীত হন। ১৯২৬ খ্রীঃ অব্দে (১৩৩৩ বঙ্গাব্দে) কলিকাতা নগরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র—তিনি কাছাড়ের রাজা হরিচন্দ্র নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৭৩খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যুর পরে তিনি রাজা হন। ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে জনৈক মুঘল

কতকগুলি লোক সংগ্রহ করিয়া কাছাড় অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন। তিনি প্রথমে রাজধানী কশপুর অবরোধ করিলে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গোয়াবাড়ী নামক স্থানে পলায়ন করেন। ইহাতেই বিজয়োন্মত্ত মুঘল সৈন্য বদরপুরস্থিত ইংরেজ ঘাটি আক্রমণ করেন। ইংরেজ সুবাদার কল্যাণ সিংহ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন। কাছাড়পতি কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে মণিপুরাধিপতি মধুচন্দ্র স্বীয় ভ্রাতা চৌরজিং ও মারজিৎ কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া, কাছাড়পতি কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ-চন্দ্র নিজ সৈন্য দ্বারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুচন্দ্র সমর-ক্ষেত্রে শয়ন করেন। ইহার কিছুকাল পরে মারজিংও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দে অনপত্য কৃষ্ণচন্দ্র চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র রাজা হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—তিনি বীরভূমের রাজা বিপ্রচরণের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যুর পরে বিষয়ের অধিকারী হন। তিনি অতি সদাশয় ও পরোপকারী ছিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারী নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ষাট হাজার ও তাঁরা চাঁদ মুখোপাধ্যায় সাতাশ হাজারটাকা তাঁহার নিকট ঋণী ছিলেন। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সেইসমস্ত টাকা তাঁহাদিগকে মাপ করিয়া দেন। তিনি স্বীয় রাজ্যে দেবালয় প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খননাদি দ্বারা দেশের লোকের যথেষ্ট উপকারকরিয়া-ছিলেন। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী রাজা হন।

কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার—ত্রিপুরাজিলার চাপিতলা গ্রামের ভট্টাচার্য্য বংশে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ-চন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার পিতার নাম রুক্মিণীকান্ত বিদ্যালঙ্কার। তাঁহার পুত্র কালিদাস সিদ্ধান্তপঞ্চানন। তাঁহারা সকলেই প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — তিনি ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে নদীয়া জিলার অন্তর্গত শিবনিবাস গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কিছুদিন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন পাঠ পরিত্যাগ করেন। তিনি প্রথমে অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত সাধারণী পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। তাহার পরে তিনি বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক

হন। অতি নিপুণতার সহিত কার্য্য করিয়া তিনি যশোলাভ করেন। তাঁহার সম্পাদন নৈপুণ্যে বঙ্গবাসীর প্রসার ও প্রতিপত্তিবিশেষ বৃদ্ধি পায়। তৎপরে তিনি বঙ্গবাসীর দৈনিক সংস্করণ 'দৈনিক চন্দ্রিকা'র সম্পাদক হন। এই কার্য্য ছাড়িয়া তিনি কিছুদিনের জন্য নাড়াজোলের রাজার ম্যানেজার নিযুক্ত হন। এই স্থানেই দুরারোগ্য বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কাশী গমন করেন। এই সময় তিনি যোগ সাধনে নিযুক্ত হন। ১৯১১ খ্রীঃ অব্দে মাঘী পূর্ণিমার দিন তিনি পরলোক গমন করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ, মহারাজ—(১) দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিযুক্ত সুবাদার খান দৌরান ১৬৬১ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে উড়িষ্যার অন্তর্গত জলেশ্বরে আগমন করেন। তৎফলে যাঁহারা অরাজকতার সময়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা একটু শঙ্কিত হইলেন। কেহ কেহ আনুগত্য স্বীকার করিয়া পত্র লিখিলেন। ময়ুর ভঞ্জের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জও খান দৌরাণকে পত্র লিখিয়াছিলেন। খান দৌরাণ সকলকে আশ্বাস দিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করেন। কেহ কেহ দেখা করিতে গেলেন, কেহ বা যান নাই। কৃষ্ণ চন্দ্র খান দৌরানের সহিত দেখা করিতে যাইয়া সভা-মধ্যে অপমানিত হন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সভাস্থলেই খান দৌরানকে আক্রমণ করেন। ফলে তিনি স্বয়ং নিহত হন। খান দৌরান দেখ।

কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ ২য় রাজা— ময়ুর-ভঞ্জের রাজা শ্রীনাথ ভঞ্জ ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ রাজা হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র ভঞ্জ চৌদ্দ বৎসর বয়সে রাজপদ লাভ করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—'সদ্ভাব শতক' নাম কবিতা পুস্তক প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি। বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তঃপাতী সেনহাটী গ্রামের এক বিখ্যাত বৈদ্যবংশে অনুমান ১২৪৫ বঙ্গাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃতে, বিশেষতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণে এবং ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ প্রসিদ্ধ পারস্য কবি হাফেজের ভাব অবলম্বনে তিনি 'সদ্ভাবশতক' নামক তাঁহার বিখ্যাত কবিতা গ্রন্থ রচনা করেন। দীর্ঘকাল তিনি যশোহরের সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই শিক্ষকতা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, কৃষ্ণচন্দ্র ক্রমান্বয়ে যোগ্যতার সহিত ঢাকা-প্রকাশ, বিজ্ঞাপনী ও

দ্বৈভাষিকী নামক তিনখানি পত্রিকা সম্পাদন করেন, তন্মধ্যে ঢাকাপ্রকাশ তাঁহার সম্পাদকতায় সমধিক খ্যাতি লাভ করে এবং এখনও প্রকাশিত হইতেছে। কৃষ্ণচন্দ্র কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সংবাদ প্রভাকরেরও লেখক ছিলেন। তিনি 'সদ্ভাব শতক' 'কৈবল্যতত্ত্ব' 'মোহনভোগ' ও 'রাসের ইতিবৃত্ত' এই চারিখানি পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার সকল রচনাই ভক্তি ও উচ্চভাবে পূর্ণ।

কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ, সন্তুষ্টচিত্ত এবং শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে স্বগ্রাম সেনহাটীতে তিনি পরলোক গমন করেন। উমেশচন্দ্র মজুমদার কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র।

চন্দ্র রাও মোরে—তিনি জেউলের রাজা যশোবন্ত রাও মোরের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। তিনি অসভ্য কোলদিগকে পরাস্ত করিয়া বিজয়ের স্মারক রূপে অর্দ্ধমণ রৌপ্যে মহাবালেশ্বর মন্দিরের শিবলিঙ্গ ও একটী মনোহর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—বালাজী রাও, দৌলৎ রাও, হনুমন্তরাও, গোবিন্দ রাও ও যশোবন্ত রাও। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বালাজী রাও রাজা হন এবং অপর চারিজন বৃত্তি লাভ করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র রায়—কলিকাতার বাদুড়বাগানের রায়বংশ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের সন্তান। এই বংশের ত্রয়োদশ পুরুষ সঙ্কেত বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্ব বঙ্গের অন্তর্গত বৃহৎ বাঙ্গালপাশ গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তৎপরে তাঁহার বংশধরেরা ক্রমে মুরশিদাবাদের অন্তর্গত বেণীপুরে আসিয়া বাস করেন। এই স্থানেই কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম শ্রীবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীবের সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র নবাব সরকারে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এইসময়ে তিনি রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি বর্দ্ধমানের রাজা জগৎরাম রায়ের একজন কর্ম্মচারী হন। এই সময়ে তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত শাঁকাসা গ্রাম হইতে মুসলমানদের অত্যাচারে হুগলী জিলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরে চলিয়া আসেন। কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র—অমরচন্দ্র, হরিপ্রসাদ ও ব্রজবিনোদ। কনিষ্ঠ ব্রজবিনোদ রায় বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার অধীনে কর্ম্ম করিতেন। কিন্তু নবাবের অন্যায় ব্যবহারে কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বগৃহে আসিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি সম্পত্তিশালী, দেবভক্ত ও পরোপকারী ছিলেন। ১৭৬৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র রায় (মহারাজা)—নদীয়ার স্বনামখ্যাত রাজা। তিনি কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুম-

দার হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। তাঁহার পিতার নাম রঘুরাম রায়। ১৭১০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় তাঁহার সবিশেষ অধিকার ছিল। তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রেও বিশেষ নিপুণ ছিলেন।

১৭২৮ খ্রীঃ অব্দে রঘুরাম রায়ের মৃত্যু হয়। তদনুজ রামগোপালকেই, রঘুরাম স্বীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া যান। কৌশলী কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ব্বেই নবাব আলীবর্দ্দি খাঁর দরবারে উপস্থিত হইয়া নিজনামে জমিদারীর ফারমান লাভ করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং বিদ্বান এবং জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অধিকার কালে নবদ্বীপ জ্ঞানচর্চ্চার এক প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল। তাঁহার রাজসভাও নানাদিগ্‌দেশাগত পণ্ডিত ও সুধীগণের সমাগমে মুখরিত থাকিত। বহু কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে নানাবিধ সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার ন্যায় জ্ঞানানুরাগী ও জ্ঞানীব্যক্তিদের পরম সহায় ভূম্যধিকারী তখনকার সময়ে বাঙ্গালাদেশে আর ছিল না। ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, গুপ্তিপাড়ার বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, সাধক কবি রামপ্রসাদ প্রভৃতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন এবং সকলেই তাঁহার নিকট হইতে নানাপ্রকারে সাহায্য পাইয়াছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকার কালে নদীয়ার সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হয়। তাঁহার অধিকারের সীমানাও বহুদূর বিস্তৃতি লাভ করে। উত্তরে পলাশী হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পূর্ব্বে ধুলিয়াপুর হইতে পশ্চিমে ভাগীরথী পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃতি লাভ করে। এই সমগ্র অধিকার চৌরাশী পরগণায় বিভক্ত ছিল। পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করিয়া রাজস্ব সংক্রান্ত বহু নূতন ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হন। সেই সুযোগে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নিজ পুত্র শিবচন্দ্রের নামে নূতন বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন এবং ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দে এক 'অভিলষিত ব্যবস্থাপত্র' (Will) দ্বারা শিবচন্দ্রকেই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের জীবদ্দশায় বঙ্গের রাজনৈতিক বহু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে, ক্লাইভ নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে মনস্থ করিয়া, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ মতই কাজ করেন। যুদ্ধের পর ক্লাইভ কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ কয়েকটি কামান কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার প্রদান করেন এবং

বিশেষ চেষ্টার পর দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে তাঁহার জন্ম 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধির সনদ আনয়ন করাইয়া দেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণে উত্যক্ত হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রাজধানীর অনতিদূরে শিবনিবাস নামে এক নগর স্থাপনপূর্ব্বক তথায় কিছুকাল বাস করেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রজাহিতৈষী বিচক্ষণ ভূপতি ছিলেন। রাস্তা নির্ম্মাণ, জলাশয় ও কূপ খনন, পান্থনিবাস স্থাপন প্রভৃতি বহু জনহিতকর কার্য্য করিয়া তিনি লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন। কথিত আছে রাজা রাজবল্লভ যখন নিজের বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে উৎসুক হইয়া নদীয়ার পণ্ডিতগণের সম্মতি লাভের চেষ্টা করেন, তখন কৃষ্ণচন্দ্রেরই কৌশলে তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত শিবনিবাস নগরীর প্রতিষ্ঠা হইলে তথায় তিনি মহা-সমারোহে অগ্নিহোত্র বাজপেয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তদুপলক্ষে কাশী, কাঞ্চী প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মণগণ সমাগত হন। যজ্ঞান্তে তাঁহারা কৃষ্ণচন্দ্রকে 'অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী' উপাধি প্রদান করেন। বাঙ্গালাদেশে জগদ্ধাত্রী পূজা ও কালী পূজা তাঁহার চেষ্টায়ই প্রচলিত হয় বলিয়া কথিত হয়।

নদীয়ার রাজবংশের অলঙ্কার স্বরূপ এই মনস্বী ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে (১১৮৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে) তিয়াত্তর বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র সাধু—ইনি চন্দন নগরের একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ১২৭৬ বঙ্গাব্দে 'স্পর্শানন্দা' নামক একখানি নাটক ও ১২৯১ বঙ্গাব্দে 'কল্পনা প্রসূন' নামে একখানি কাব্য প্রকাশ করেন।

কৃষ্ণধর দেবশর্ম্মা -- তিনি একজন গর্গ গোত্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন শাখা অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন। তিনি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন শাসনের গ্রহীতা ছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র সার্ব্বভৌম — ওয়ারেন হেষ্টিংসের আদেশে যে এগারজন পণ্ডিত 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক ব্যবহারগ্রন্থ সঙ্কলন করেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ দেখ।

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালা বাবু)—মুর্শিদা-বাদ জেলার অন্তর্গত কান্দির জমিদার ও পাইকপাড়ার রাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয় দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দের পৌত্র ছিলেন। তিনি বর্দ্ধমান ও কটক কালেক্টরীতে কিছু-কাল দেওয়ানী করিয়া, পদত্যাগ করেন এবং স্বীয় পৈতৃক জমিদারীর তত্ত্বাবধানে আত্মনিয়োগ করেন। একদা সায়াহ্নে কর্ম্মান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে লালা বাবু শুনিলেন কোনও রজক কন্যা

তাহার পিতাকে বলিতেছে — "উঠ, বাবা, বেলা যায়, বাস্‌নায় (ভাটি দিবার জন্য রজকের চুল্লী) আগুন দাও।' মুহূর্ত্তে রজক কন্যার এই বাক্য লালা বাবুকে ত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমেই স্মরণ করাইয়া দিল, তাঁহার জীবন বেলাও অবসান প্রায়, তাঁহারও বাসনা রাশিতে অগ্নিপ্রদানের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ লালাবাবুর অন্তরের সকল বাসনা কামনা বৈরাগ্যের অনলে বিদগ্ধ হইয়া, ত্রিশ বৎসরের নবীন যুবককে সংসার বিরাগী সন্ন্যাসীতে পরিণত করিল। সংসার ত্যাগ করিয়া এই নবীন সন্ন্যাসী ব্রজধামে গমন করিলেন এবং পঞ্চবিংশতি লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে রাজস্থানের মর্ম্মর প্রস্তরে এক সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র নামে বিগ্রহ ও মন্দির সংলগ্ন এক অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। অতঃপর মথুরার রাধাকুণ্ড শ্বেত প্রস্তরে সোপান বদ্ধ হইল। এই সময় ইংরাজ সরকারের সহিত রাজপুতানার কয়েকটি রাজ্যের প্রস্তাবিত এক সন্ধিতে লালাবাবু কোন রাজাকে অস্বীকৃত হইতে পরামর্শ দিয়াছেন, এই সন্দেহে ইংরাজ রেসিডেণ্ট সার চাল স মেট্‌কাফ (Sir Charles Metcalfe) কর্ত্তৃক তিনি দিল্লীতে নীত হন। কিন্তু পরে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়া, তিনি রেসিডেণ্ট মহোদয়কর্ত্তৃক দিল্লীর বাদশাহের সহিত পরিচিত হন। তিনি তাঁহাকে সম্মানকর মহারাজা উপাধিতে ভূষিত করিতে চাহিলে, তিনি সবিনয়ে এই রাজ সম্মান গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। সম্রাটের সহিত পরিচিত হওয়াতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও অন্নসত্রের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য লক্ষাধিক টাকা আয়ের ১৫ খানি গ্রাম (মথুরা জেলার অন্তর্গত) ক্রয় করিবার সুবিধা হয়। এই জমিদারী সম্পর্কে মথুরার শেঠদিগের সহিত লালাবাবুর ঘোর বিবাদ বিসম্বাদ এবং মামলা মোকর্দ্দমা সংঘটিত হয়। তৎফলে বিদ্বেষবশতঃ তাঁহারা পরস্পরের মুখদর্শন করিতেন না।

তৎকালে ভক্তমাল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক বৈষ্ণব চূড়ামণি কৃষ্ণদাস বাবাজী ব্রজধামে অবস্থান করিতেছিলেন। লালাবাবু তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য উপর্য্যুপরি দুইবার ব্যাকুলভাবে অভিলাষ নিবেদন করিলেও, কৃষ্ণদাস দুইবারই তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ করিবার সময় সমুপস্থিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে বলিয়া, তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। লালাবাবু ক্রমে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সুমধুর হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে কুঞ্জে কুঞ্জে ভিক্ষা করিয়া দিনান্তে ভিক্ষালব্ধ অন্নে একাহারে দিন যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় বারেও কৃষ্ণদাস তাঁহাকে দীক্ষাদানে প্রত্যাখ্যান করিলে, তিনি

আত্মবিশ্লেষণপূর্ব্বক চিন্তা করিলেন যে, সংসারের সর্ব্বপ্রকার ভোগবিলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনের তরুতল আশ্রয় করিয়া মাধুকরী ব্রতধারণে দিনাতিপাত করিলেও, তাঁহার মনের মলিনতা তখনও দূরীভূত হয় নাই, শত্রু-মিত্রে ভেদাভেদ জ্ঞান তখনও তাঁহার মনে প্রবল, তখনও শত্রুর প্রতি তাঁহার মনে প্রেমের সঞ্চার হয় নাই, নতুবা তিনি শেঠ বাবুদের দ্বারে ভিক্ষার্থে যাইতে কুণ্ঠিত হইবেন কেন? এইরূপ চিন্তা করিয়া লালা বাবু শেঠ বাবুদের ঠাকুর বাড়ীর দ্বারে ভিক্ষার্থে উপস্থিত হইলে, বিস্মিত ভৃত্যের আহ্বানে শেঠ বাবুদের কর্ত্তা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বৈরাগ্য বিমণ্ডিত লালাবাবুর শান্ত মুখশ্রী সন্দর্শনে অভিভূত হইয়া চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন। লালাবাবু শেঠজীকে বক্ষে ধারণ করিলেন। অতঃপর দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ উভয়ের দরবিগলিত প্রেমাশ্রুতে পূর্ব্বের সমস্ত বিরোধ বিদ্বেষ ধুইয়া গেল। তারপর ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া, শেঠ বাবুদের ঠাকুর বাড়ীর বাহিরে আসিলে লালা বাবু কৃষ্ণদাস বাবাজীকে দেখিবা মাত্র, তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইল। তিনি চেতনা লাভ করিলে, কৃষ্ণদাস তাঁহাকে দীক্ষা দান করিলেন। ইহার পর লালা বাবু মৌনব্রত ধারণ করেন। একদা মৌনী লালাবাবুর দর্শন লাভ করিয়া গোয়ালিয়রের মহারাণী তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইলে, তিনি মহারাণীর নিকট হইতে অপসৃত হইবার সময় মহারাণীর এক অশ্বারোহী রক্ষীর অশ্বপদ তলে পতিত হইয়া ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে ব্রজমণ্ডলে নশ্বরদেহ রক্ষা করেন। এখানেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

উত্তরপশ্চিম ভারতে পুণ্যশ্লোক লালা বাবুর প্রাতঃস্মরণীয় নাম, তাঁহার প্রেম-ভক্তি, বৈরাগ্য তিতিক্ষা, কি বাঙ্গালী কি অবাঙ্গালী, গৃহী সংসারী নির্ব্বিশেষে সকলের নিত্যকার প্রসঙ্গ। তাঁহার কুঞ্জ ও সমাধি ব্রজধামের বহুতীর্থের মধ্যে বৈষ্ণবদিগের এক মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। সংযুক্ত প্রদেশের মথুরা ব্যতীত বহু স্থানে লালা বাবুর বিশাল জমিদারী আছে। স্বনামধন্যা রাণী কাত্যায়নী লালাবাবুর সহধর্ম্মিণী ছিলেন।

কৃষ্ণচরণ দাস—একজন বৈষ্ণব কবি। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—'শ্যামানন্দ প্রকাশ' এই গ্রন্থে তাঁহার গুরু শ্যামানন্দ প্রভুর বংশীয়দের নুপুরাকৃতি তিলক ধারণের বিবরণ এবং প্রসঙ্গত শ্যামানন্দ প্রভুরও জীবন চরিত আংশিক রূপে বর্ণিত আছে।

কৃষ্ণজীবন—বাঙ্গালী কবি। উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর জিলার বাহিরবন্দর পরগণার অন্তর্গত বজরাগ্রামে তিনি জন্ম-

গ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে মোদক ছিলেন। 'অভয়ামঙ্গল' নামক কাব্য তাঁহার রচনা। রাণী ভবানীর দত্তক-পুত্র সাধক প্রবর মহারাজ রামকৃষ্ণের সভায় এই কাব্য রচিত হয়।

কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার— ওয়ারেন হেষ্টিংসের আজ্ঞাক্রমে যে এগারজন পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন; কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ দেখ।

কৃষ্ণজীবন বিদ্যাভূষণ—খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরাজিলার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামের মৌদ্‌গল্য বংশে দয়ারাম ন্যায়ালঙ্কার, হরিহর তর্কবাগীশ, কৃষ্ণজীবন বিদ্যাভূষণ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রে তৎপ্রদেশে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

কৃষ্ণজীবন মুখোপাধ্যায়—উদয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র কৃষ্ণজীবন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভগিনীকে বিবাহ করিয়া মহারাজার দেওয়ানী পদ লাভ করেন। তদবধি তাঁহার বংশ দেওয়ান মুখোপাধ্যায়ের বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। তাঁহারা নদীয়ার জেলার অন্তর্গত উলা বা বীরনগরের অধিবাসী ছিলেন। কৃষ্ণজীবন বলবান, বিদ্বান ও সুপুরুষ ছিলেন। কথিত আছে তিনি পাঁচ হাত দীর্ঘ ছিলেন। কৃষ্ণজীবনের ছয় পুত্রের মধ্যে গোবিন্দজীবন, বৈকুণ্ঠজীবন ও বিষ্ণুজীবনের বংশধরগণ বিভিন্ন স্থানে বাস করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণজী বিশ্বনাথ— ছত্রপতি শিবাজীর সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, তিনি কতিপয় বিশ্বস্ত অনুগত লোক পাইয়াছিলেন। এই কৃষ্ণজী বিশ্বনাথ তন্মধ্যে একজন। এই ব্রাহ্মণ যুবক স্বীয় জননী ও অন্যান্য আত্মীয় সহ মথুরায় অবস্থান করিতে ছিলেন। এমন সময় শিবাজী স্বীয় পুত্র সহ দিল্লী হইতে সন্ন্যাসীবেশে মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণজী বিশ্বনাথের সহিত এখানেই তাঁহার পরিচয় হয়। শিবাজী স্বীয় পুত্র শম্ভুজীকে কৃষ্ণজী বিশ্বনাথের জননীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া এবং কৃষ্ণজীকে সঙ্গে করিয়া সন্ন্যাসী বেশে স্বদেশের দিকে রওনা হইলেন। সুজা পথে আসিলে ধরা পড়িবার আশঙ্কা ছিল। সেজন্য তাঁহারা প্রথমে কাশী তৎপরে প্রয়াগ ও তাহার পরে গয়া হইয়া বঙ্গদেশে, অবশেষে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইন্দোরের পথে স্বদেশে আগমন করিলেন। বলা বাহুল্য শিবাজীকে প্রত্যাবৃত দেখিয়া তাঁহার স্বদেশ বাসী অতিশয় আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণজী বিশ্বনাথ কয়েক দিন বিশ্রাম করিয়াই, শম্ভুজীকে আনয়ন করিবার জন্য, মথুরা

অভিমুখে রওনা হইলেন। শম্ভুজীকে সঙ্গে করিয়া মালবের পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে মালবের মুসলমান শাসনকর্ত্তার সন্দেহ দৃষ্টি তাঁহাদের উপর পতিত হইল। এই সময়ে কৃষ্ণজী বিশ্বনাথ শম্ভুজীকে স্বীয় পুত্র বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক এক পাত্রে তাঁহার সহিত আহার করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় শম্ভুজীর সহিত এক পাত্রে আহার করিতে ইতস্ততঃ করিলেই, শম্ভুজীর জীবন শেষ হইত। ধন্য প্রভু ভক্তি! ধন্য স্বজাতীপ্রেম!

কৃষ্ণতাতার্য্য— এই দাক্ষিণাত্যবাসী পণ্ডিত 'ণত্বচন্দ্রিকা' নামে এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, নারায়ণ শব্দে ণ থাকায় এই শব্দদ্বারা মহাদেবকে বুঝাইতে পারে না।

কৃষ্ণতীর্থ ভারতী—তিনি দাক্ষিণাত্যের শৃঙ্গেরী মঠে ১৩৩৩ হইতে ১৩৮০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম সোমনাথ। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা মাধব উক্ত মঠের অধ্যক্ষ বিদ্যাশঙ্কর তীর্থের (১২২৮-১৩৩৩ খ্রীঃ) নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, ভারতী কৃষ্ণতীর্থ ও বিদ্যারণ্য নাম প্রাপ্ত হন স্বীয় গুরুর মৃত্যুর পরে ভারতী কৃষ্ণতীর্থ উক্ত মঠের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম —'বৈয়াসিক ন্যায়-মালা।' ইহা শঙ্কর মত সমর্থক এক খানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

কৃষ্ণদাস— (১) কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আউল চাঁদ ফকিরের ২২ জন শিষ্যের অন্যতম। আউল চাঁদ দেখ।

কৃষ্ণদাস — (২) মহাভারতকার কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠ সহোদর। তিনি খুব ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তাঁহার গুরু গোপাল দাস দীক্ষার সময়ে তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর প্রদান করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ বিলাস'। যদিও শ্রীভাগবতকে তাঁহার গ্রন্থের উপাদান স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তবু স্থান বিশেষে সংযোজন, বর্জ্জন প্রভৃতি নিজ অভিপ্রায়ানুযায়ী করিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস— (৩) এই কৃষ্ণদাস 'দূতী সংবাদ' রচয়িতা। তাঁহার গ্রন্থের উপাখ্যান ভাগ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে গৃহীত।

কৃষ্ণদাস— (৪) এই কৃষ্ণদাস বৃন্দাবন রাধাকুণ্ড নিবাসী একজন ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি ভাগবতের টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রচিত চমৎকার চন্দ্রিকার পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস—(৫) খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে মাধ্ব সম্প্রদায়ের ভক্ত কৃষ্ণদাস বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি কাণেড়ী ভাষায় কৃষ্ণ স্তোত্র লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

কৃষ্ণদাস—(৬) বল্লভী সম্প্রদায়ের এই ভক্ত ১৫৫০ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি 'প্রেমরস-রস' নামে একখানা কাব্য লিখিয়াছেন। সম্ভবত তিনি গুজরাটের অধিবাসী ছিলেন।

কৃষ্ণদাস— (৭) একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। 'অশ্বরুড়ি' নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

কৃষ্ণদাস—(৮) সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তিনি একজন গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'প্রাপ্তি বর্ণ দীপিকা'।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ (গোস্বামী) — চৈতন্যচরিতামৃতকার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। অনুমান ১৫৩০খ্রীঃ অব্দে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্য বংশে কৃষ্ণদাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ভগীরথ কবিরাজ ও মাতার নাম সুনন্দা দেবী। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হইয়া কৃষ্ণদাস ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাদাস সন্তানহীনা পিতৃস্বসার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া, পরে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কিঞ্চিৎ ফারশী শিক্ষা করেন।

বাল্যাবধি কৃষ্ণদাসের সাধু সংসর্গ ও ধর্ম্মালোচনার প্রবৃত্তি প্রবল ছিল। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে পিতৃস্বসার মৃত্যুর পর, বিষয় সম্পত্তি প্রভৃতির তত্ত্বাবধানের ভার কনিষ্ঠের উপর ন্যস্ত করিয়া কৃষ্ণদাস একাগ্রচিত্তে ধর্ম্মচিন্তা, শাস্ত্রালোচনা ও সাধন ভজনে নিবিষ্ট হইলেন। এই সময় তিনি শ্রীচৈতন্য প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। অনন্তর সংসার ত্যাগ করিয়া, তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া, ব্রজমণ্ডলে উপনীত হন। কেহ বলেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া, তিনি সংসার ত্যাগ করেন। অপরের মতে পাঠান ও মুঘল বিজেতাগণের আক্রমণে বিধ্বস্ত ও লুপ্ত তীর্থ সমূহের উদ্ধারের সঙ্কল্পে শ্রীচৈতন্যকে সহায়তা করিবার জন্য নিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক তিনি ব্রজধামে প্রেরিত হন। যাহা হউক তথায় উপস্থিত হইয়া, তিনি তৎকালীন বিখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সাহচর্য্য লাভ করেন এবং রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট ভক্তিগ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন ও তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করেন। অতঃপর রূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, কবি কর্ণপুর, গোপালভট্ট, জীবগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আদেশ ও উৎসাহে 'কৃষ্ণামৃত' গ্রন্থের টীকা ও 'গোবিন্দ লীলামৃত' এবং 'ভাগবত-শাস্ত্র গূঢ়-রহস্য' নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। অবশেষে বৃদ্ধবয়সে বৈষ্ণব ভক্তগণের অনুরোধে শ্রীচৈতন্যের অন্তলীলা বিষয়ে তাঁহাদের অতৃপ্ত বাসনা পরিতৃপ্ত করিতে মহাপ্রভুর শেষ জীবন সুবিস্তৃত রূপে বর্ণনা করিয়া 'চৈতন্য

চরিতামৃত' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ তিনি অসীম অধ্যবসায় সহকারে পূর্ব্বাচার্য্য বৈষ্ণবগণের বহুগ্রন্থ আলোচনা করিয়া এবং জীবিত গোস্বামীগণের মুখে শ্রবণ করিয়া নয় বৎসরে সমাপ্ত করেন। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের সকল গ্রন্থই অসাধারণ কবিত্ব এবং পাণ্ডিত্য পূর্ণ, কিন্তু ভক্তি ও জ্ঞানের এরূপ অপূর্ব্ব সমন্বয় 'চৈতন্য চরিতামৃত' ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। গ্রন্থের অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদ ব্যতীতও এই গ্রন্থ গোস্বামী মহাশয়ের সংস্কৃত ও ব্রজভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচায়ক।

উল্লিখিত গ্রন্থ সমূহ ব্যতীত কৃষ্ণদাস আরও বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার জন্মস্থান ঝামটপুরে আজিও তাঁহার কাষ্ঠ পাদুকা ও তদীয় শিষ্য মুকুন্দ দত্ত লিখিত 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থের প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। কবিরাজ গোস্বামীর স্বহস্ত লিখিত মূল পুঁথিখানি বৃন্দাবনের রাধামাধবের দেব-মন্দিরে রহিয়াছে।

এই গ্রন্থ রচনার পর উহা প্রচারের জন্য কৃষ্ণদাস ব্রজমণ্ডলের তদানীন্তন বৈষ্ণবগণের নেতৃস্থানীয় জীব গোস্বামীর অনুমতি প্রার্থনা করিলে, রূপ, সনাতন প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর সমাদর হ্রাসের সম্ভাবনায় তিনি উহা প্রকাশের অনুমতি দেওয়া দূরে থাকুক, উহা নষ্ট করিতে প্রয়াস পান। দীর্ঘকাল পরিশ্রমের ফল এইরূপে নিরর্থক হইবে আশঙ্কা করিয়া কৃষ্ণদাস ব্যাকুল হইয়া পড়েন। যাহা হউক পরে যখন জানিতে পারিলেন, তাঁহার শিষ্য মুকুন্দের নিকট গ্রন্থের এক প্রতিলিপি রক্ষিত আছে, তখন তিনি কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন। ইহার পর গৌড় হইতে আগত কবিকর্ণপুর এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, জীব গোস্বামীর নিকট পুনরায় ঐ গ্রন্থ ও উহার স্বরচিত এক টীকা প্রচারের প্রার্থনা করিলে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও গোস্বামী মহাশয় অনুমতি প্রদান করেন।

জীবগোস্বামী মহাশয়ের অনুমতি লাভ করিয়া কৃষ্ণদাস তাঁহার প্রিয় শিষ্য মুকুন্দ দত্ত সমভিব্যাহারে গ্রন্থের এক প্রতিলিপি বঙ্গে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর ইহা লুণ্ঠন করেন। এই দুঃসহ সংবাদ শ্রবণ মাত্র শোকে আকুল হইয়া কৃষ্ণদাস ১৬১৫ খ্রীঃ অব্দে রাধাকুণ্ডে তনুত্যাগ করেন এবং সেইস্থানেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

কৃষ্ণদাসজী—রামানন্দ পন্থী সাধক। অনন্তানন্দ তাঁহার গুরু ছিলেন। হিমালয়ের অন্তঃপাতি কুলু দেশে তাঁহার জন্ম হয়। আমেরের রাজা পৃথীরাজ কৃষ্ণদাসের শিষ্য হইয়াছিলেন। অগ্রদাস ও কীলহ নামে কৃষ্ণদাসের দুই জন প্রধান শিষ্য ছিলেন।

কৃষ্ণদাস, দীন—ইনি একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা। মুখটী বংশের বরুণ বাচস্পতি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার পিতার নাম কংসারি মিশ্র ও ও মাতার নাম কমলা দেবী। মিশ্র মহাশয়ের ছয় পুত্র—দামোদর পণ্ডিত জগন্নাথ, সূর্য্য সরখেল, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহ চৈতন্য। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস পঞ্চম।

তাঁহারা পূর্ব্বে শালিগ্রামে বাস করিতেন। পরে নদীয়ার অন্তর্গত অম্বিকা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

বৈষ্ণবপদাবলী ভিন্ন তিনি 'ভক্তি-রসাত্মিক' নামক একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

কৃষ্ণদাস (দুঃখী বা দুঃখিনী) — ইনি শ্যামাদাস বা শ্যামানন্দ পুরী নামেও পরিচিত। তিনি একজন পদাবলী রচয়িতা। পদাবলী ভিন্ন তিনি 'অদ্বৈত-তত্ত্ব,' 'উপাসনা-সার-সংগ্রহ' ও 'বৃন্দাবন-পরিক্রম' নামক কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন।

কৃষ্ণদাস পণ্ডিত—ইনি রামকৃষ্ণ নামেও পরিচিত ছিলেন। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত হাঁসপুকুরের উত্তরে অম্বিকা-নগরের সুবর্ণ বণিকবংশে কৃষ্ণদাসের জন্ম হয়। পরে ইহারা কলিকাতার বহুবাজার অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। কৃষ্ণদাসের পিতার নাম তারাচাঁদ। নারায়ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দশাবতারে শ্রীকৃষ্ণের লীলা অবলম্বন করিয়া সরল বাঙ্গালা কবিতায় ইনি 'নারদ পুরাণ' বা 'নারদ সংবাদ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহাতে শ্রীকৃষ্ণকে বক্তা ও নারদকে শ্রোতা কল্পনা করা হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস পাল — প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক পণ্ডিত। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা নগরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঈশ্বর চন্দ্র সামান্য বেতনে এক সূতার দোকানে কার্য্য করিতেন। কৃষ্ণদাস প্রথমে গৌরমোহন আঢ্য মহাশয়ের ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর (Oriental seminary) সহিত সংযুক্ত এক পাঠশালায়, পরে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর ইংরেজী বিভাগে, তৎপরে পাদ্রী মিলনের নিকট ইংরেজী সাহিত্য এবং অবশেষে কতিপয় বন্ধুর সহযোগীতায় স্থাপিত 'লিটারেরী ফ্রী ডিবেটিং ক্লাবে' পেরেণ্ট্যাল একাডেমীর অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড মর্গ্যানের নিকট ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। উক্ত তর্ক সভার অবৈতনিক সদস্য ও সম্পাদক হিসাবে কৃষ্ণদাস বহু প্রবন্ধ পাঠ ও তর্কবিতর্কে যোগদান করিয়া বক্তৃতাদি প্রদান করিতেন। তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের অনেকেই এই সভায় বক্তৃতা করিতেন। একবার বিখ্যাত বাগ্মী ডাফের বক্তৃতার

অংশ বিশেষের ওজস্বিনী ভাষায় প্রতিবাদ করিয়া বালক কৃষ্ণদাস শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন।

এই সময় মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপিত হইলে, কৃষ্ণদাস তাঁহার সহপাঠি শম্ভু চন্দ্রের সহিত পুনরায় কলেজে প্রবেশ করেন। এই চন্দ্রই পরে 'রেইস এণ্ড রায়ত' নামক পত্রিকার সম্পাদক রূপে দেশবিখ্যাত হইয়াছিলেন।

কলেজে অধ্যয়ন কালেই কৃষ্ণদাস সংবাদ পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। এমনকি সতীর্থ শম্ভুচন্দ্রের সহযোগীতায় একখানা ইংরেজী মাসিক প্রকাশ করেন। এইসময় ডেভিড হেয়ারের স্মরণার্থ মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে আহূত সভায় কৃষ্ণদাস এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে ইহা ছোট আদালতের জজ হরচন্দ্র ঘোষের ব্যয়ে মুদ্রিত হয়। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস পাল ইংলিস 'হরকরা' 'ফিনিক্স' 'সিটিজেন' কানপুর হইতে প্রকাশিত 'সেন্ট্রাল ষ্টার' 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রভৃতি পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন।

অতঃপর হরচন্দ্র ঘোষের সুপারিশে কৃষ্ণদাস চব্বিশপরগণার জজ আদালতে অনুবাদক নিযুক্ত হন, কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইংরাজী জজ সাহেবের পছন্দ না হওয়াতে, তিনি পদচ্যুত হন। অতঃপর পুনরায় হরচন্দ্রের সুপারিশে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক বিখ্যাত রাজনৈতিক সভার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও স্বদেশ প্রেমিক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনের পর, ক্রমান্বয়ে হস্তান্তরিত হইতে 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সম্পাদন ভার যোগ্য হিসাবে কৃষ্ণদাসের উপর অর্পিত হয়। তখন উহার সত্ত্বাধিকারী ছিলেন, কালী প্রসন্ন সিংহ। কৃষ্ণদাসের অনুরোধে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশানের কতিপয় সভ্যের প্রস্তাবে তাঁহাদের কয়েকজনকে লইয়া একটি ন্যাসরক্ষক সমিতি। গঠন করিয়া উহার উপর হিন্দু পেট্রিয়টের পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। কৃষ্ণদাস নামে ঐ সমিতির অধীন হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তিনি হিন্দু পেট্রিয়টের স্বাধীন সম্পাদক এবং তাঁহার বিচক্ষণ সম্পাদনাগুণে উহাকে জমিদার সভার শক্তিশালী মুখপাত্ররূপে পরিণত করেন। যেখানে জমিদারগণের সহিত প্রজাগণের স্বার্থে সংঘাত হইত না, সেখানে তিনি প্রজাসাধারণের পক্ষই সমর্থন করিতেন। ১৮২৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতা পুরতন্ত্রের সদস্য (Commisioner) নির্ব্বাচিত হন এবং বিশেষ যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। সাংবাদিক

হিসাবে কয়েক স্থানে জনসাধারণের বিরুদ্ধে, সরকার পক্ষ, বিশেষতঃ জমিদারগণের পক্ষ অবলম্বন করেন। তৎফলে তিনি বঙ্গীয় ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ, রাজসম্মান লাভ এবং প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। স্যার জর্জ্জ টেম্পল (Sir George Temple) পুরতন্ত্র সমূহে আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিলে, কৃষ্ণদাস উহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বেঙ্গলী পত্রিকায় একদা বিচারপতি নরিশের কোন সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করিয়া কারারুদ্ধ হন। ইহা লইয়া দেশব্যাপী প্রচণ্ড বিক্ষোভের সঞ্চার হয় কিন্তু কৃষ্ণদাস সহযোগী পত্রিকার এই বিপদে কিছুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া, মিঃ নরিশের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সরকারের কার্য্যের সমর্থন করেন। এই সকল কারণে কৃষ্ণদাস জনসাধারণের কিছুকাল বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

১৮৮৪ খ্রীং অব্দে কৃষ্ণদাস পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় গুণমুগ্ধ বন্ধুগণ তাঁহার এক মর্ম্মর মূর্ত্তি কলিকাতার হ্যারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে স্থাপন করেন।

কৃষ্ণদাস প্রামাণিক—খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ধনী ব্যবসায়ী বর্ত্তমান ছিলেন। ময়মনসিংহ জিলার পূর্ব্ব দক্ষিণ ভাগে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরস্থ নরগুন্দা গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ছিল। প্রথম জীবনে তিনি খুব দরিদ্র ছিলেন। দারিদ্রের তাড়নায় তাঁহার জন্ম স্থান বারপাড়া নামক স্থান হইতে নরগুন্দায় চলিয়া আসেন। এখানে স্থানীয় ইংরেজ কুঠীর এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়া প্রচুর অর্থশালী হন। তিনি নাটোরের তদানীন্তন রাজা রামকৃষ্ণকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া তুইটী নিষ্কর তালুক লাভ করেন। এইধার্ম্মিক কৃষ্ণদাস দেবমন্দির প্রতিষ্টা, জলাশয় খনন ও অন্যান্য সদনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র নন্দকিশোর বিষয়ের অধিকারী হন। তিনিও পিতার ন্যায় মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সৎকার্য্যে অনুরক্ত ছিলেন।

কৃষ্ণদাস বাবাজী (লালদাস বাবাজী) — নাভাজী বিরচিত হিন্দী গ্রন্থ 'ভক্তমাল' এর বঙ্গানুবাদক। কৃষ্ণদাস সাধারণ্যে লালদাস নামেও পরিচিত। তিনি বহুকাল বৃন্দাবনে বাস করেন। কান্দীর রাজাদের ও পাইকপাড়ার জমীদারদের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের পৌত্র দানশীল বৈষ্ণচূড়ামণি কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালা বাবু) মহাশয়ের তিনি দীক্ষা গুরু ছিলেন। (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ দেখ)। নাভাজী বিরচিত হিন্দি গ্রন্থ 'ভক্ত-মাল' এর পদ্যে বঙ্গানুবাদ তাঁহার জীবনের

শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। মূল গ্রন্থের অনুবাদ ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থে আরও কতকগুলি বিষয় সংযোজিত করিয়া, তিনি তাঁহার গ্রন্থকে অধিকতর মূল্যবান করিয়াছেন। বহু বৈষ্ণব ভক্তের জীবনী তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নাভাজী শিষ্য প্রিয়দাসকৃত টীকার মর্ম্ম, এবং ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবৎ, শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের বহু গ্রন্থের তত্ত্বসমূহ লাল দাসের অনুবাদ গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

কৃষ্ণদাস মল্লিক—কলিকাতা বড়-বাজারের সুবর্ণ বণিক মল্লিক বংশ দানশীলতা ও অন্যান্য সৎকাজের জন্য বিখ্যাত। এই বৈশ্য জাতির উপাধি দে ছিল। পরে মুঘল সম্রাট হইতে মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণদাস মল্লিকের ১৬০১ খ্রীঃ অব্দে জন্ম হয়। ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতামহ বনমালী মল্লিকের মৃত্যুর পরে, তিনি বিষয়ের উত্তরাধীকারী হন। তাঁহার পিতা পূর্ব্বেই পরলোক গত হইয়া ছিলেন। তিনি হুগলী নদীর তীরবর্ত্তী বল্লভ পুরে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ত্রিবেণীতে একটী অতিথিশালা স্থাপন করেন। তিনি একজন উন্নতমনাপুরুষ। ১৬৮০ খ্রীঃ অব্দে রাজারাম, প্রাণবল্লভ ও কালীচরণ নামক তিন পুত্র রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন।

কৃষ্ণদাস, মহারাজা — স্বাধীন ত্রিপুরার অধিপতি কমল রায়ের পুত্র কৃষ্ণদাস পিতার মৃত্যুর পরে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি ত্রিপুর হইতে অধস্তন ৮২ তম রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই রাণীর গর্ভে পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় রাণীর গর্ভজাত যশোরাজ বা যশো ফা পিতার মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ত্রিপুর দেখ।

কৃষ্ণদাস রাজা—দিল্লীর মুঘল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ে হস্তী ও অশ্বশালার তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন। সম্রাট আকবর শাহ তাঁহাকে তিন শত সৈন্যের সেনাপতি পদ প্রদানপূর্ব্বক সম্মানিত করিয়াছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহ তাঁহাকে হাজার সৈন্যের সেনাপতি পদ ও রাজা উপাধি প্রদান করেন।

কৃষ্ণদাস রায় চৌধুরী—তিনি টাকীর জমিদার ভবানী দাসের চার পুত্রের মধ্যে তৃতীয় এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত ছিলেন। তাঁহারা বিরাট গুহের বংশধর। পিতার মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চণ্ডীচরণ তাঁহাকে পৈত্রিক বিষয় হইতে বঞ্চিত করিলে, তিনি টাকীর পশ্চিম প্রান্তস্থ কটুর গ্রামে ঘোষ বংশজ স্বীয় মাতামহ আলয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। মাতামহ অপুত্রক পরলোক গমন করিলেন। তিনি তাঁহার আগড় পাড়া জমিদারী

প্রাপ্ত হইলেন ; পরে সপ্ত গ্রাম সরকারের নিকট অভিযোগ করিয়া পৈত্রিক জমিদারীরও চতুর্থাংশ উদ্ধার করিলেন। এইরূপে তিনি প্রচুর সম্পত্তি লাভ করেন। পরে স্বয়ং আরও জমিদারী অর্জ্জন করেন। তিনি টাকীতে স্থায়ী বাসস্থান করেন। রঘুনাথ, রত্নেশ্বর, কাশীশ্বর, রাধাকান্ত ও কেশব দাস নামে পাঁচ পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। এই পাঁচ পুত্র পৃথক পাঁচটী বাসস্থান টাকীতেই নির্ম্মাণ করেন। তাঁহারাই টাকীর পঞ্চ গুহ বংশীয় কুলীন কায়স্থের আদি পুরুষ।

কৃষ্ণদাস (লাউড়িয়া)—ইহার গৃহস্থাশ্রমের নাম দিব্যসিংহ। অদ্বৈত মহাপ্রভুর নিকট ভক্তিতত্ত্ব ও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের পর লাউর পরগণার অধিবাসী দিব্যসিংহ কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলার লাউড় পরগণায় রাজত্ব করিতেন। কাত্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে লাউড় পরগণার নবগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। অদ্বৈত মহাপ্রভুর পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন তাঁহার মন্ত্রীত্ব করিতেন। অদ্বৈত প্রভু তখন বিদ্যাশিক্ষার্থ শান্তিপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। কুবের পণ্ডিত রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্য শান্তিপুরে বসতি স্থাপন করেন। অনন্তর ক্রমে অদ্বৈতাচার্য্যের বংশ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইলে, তাঁহার নিকট ভক্তিতত্ত্ব ও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ মানসে শান্তিপুরে আগমন করেন। অদ্বৈত প্রভুর নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি ভক্তি ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল শান্তিপুরেই যাপন করেন। তাঁহার বাসের জন্য নির্ম্মিত পুষ্পোদ্যান অদ্যাপি ফুল্লবাটী নামে পরিচিত।

কৃষ্ণদাস অদ্বৈত মহাপ্রভুর বাল্যজীবনের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় 'বাল্যলীলা সূত্রম্' নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা ভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় বিষ্ণুপুরী ঠাকুর কর্ত্তৃক রচিত 'বিষ্ণু ভক্তি রত্নাবলী' নামক গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালায় পাঁচালী ছন্দে অনূদিত করেন।

কৃষ্ণদাস লাহা, রাজা—কলিকাতার বিখ্যাত রাজা দুর্গাচরণ লাহা মহাশয়, কৃষ্ণচন্দ্র লাহা ও হৃষিকেশ লাহা নামক দুই পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া বিরাশী বৎসর বয়সে ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার ন্যায় বাণিজ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তিনিও পিতৃ পিতামহের ন্যায় সৎকর্ম্মানুরাগী, পরোপকারী ও দানশীল ছিলেন। তিনি ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতর

সেরিফের পদ লাভ করেন। ১৯১০ খ্রীঃ অব্দে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের জন্মদিনে তিনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। সেই বৎসরই পরলোকগত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি ভাণ্ডারে তিনি পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। ১৯১১ খ্রীঃ অব্দে চুচুঁড়া জলের কল নির্ম্মাণে ৮০ হাজার টাকা দান করেন। ১৯১২ সালে ৪ঠা জানুয়ারী নবীন সম্রাট ও মহিষী কলিকাতায় এক দরবার করেন। সেই সভায় মুরশিদাবাদের নবাব বাহাদুর তাঁহাকে সম্রাট দম্পতির সহিত পরিচিত করিয়া দেন। ১৯১২ সালে কৃষ্ণদাস লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা, চণ্ডীচরণ লাহা ও অম্বিকাচরণ লাহা মহাশয়গণ মিলিতভাবে রিপন কলেজ ফণ্ডে পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা দান করেন। ১৯১৩ সালের বর্দ্ধমানের বন্যায় পীড়িত লোকদের সাহায্যার্থ চারি ভ্রাতায় পাঁচ হাজার এবং হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পঁচাত্তর হাজার টাকা দান করেন। এইসকল প্রধান দান ব্যতীতও তিনি অনেক দান করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস শূর—'বিদ্যুন্মালিনী' নামক একখানি আখ্যায়িকার লেখক। চন্দননগরের নাড়ুয়া নামক পল্লীতে তাঁহার নিবাস ছিল এবং তেলিনী পাড়ার জমিদার রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীনে তিনি কার্য্য করিতেন। তাঁহারই অনুমতিক্রমে, কৃষ্ণদাস দুই খণ্ডে সমাপ্ত বিদ্যুন্মালিনী নামক তাঁহারই আখ্যায়িকা খানি ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশ করেন।

কৃষ্ণদাস সিদ্ধান্ত—তিনি রাজনগরের মহারাজা রাজ বল্লভের অন্যতম সভা-পণ্ডিত ছিলেন। রাজ বল্লভ, মহারাজা দেখ।

কৃষ্ণদাস সেনগুপ্ত—নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার প্রধান কর্ম্মচারী রাজা রাজবল্লভের রামদাস, কৃষ্ণদাস, গঙ্গা-দাস, রতনকৃষ্ণ ও গোপালকৃষ্ণ নামে পাঁচ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কৃষ্ণদাস সুযোগ্য ছিলেন বলিয়া, সর্ব্ববিষয়ে পিতার সহকারী হইতে পারিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার নবাব হইয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ জামাতা নিবাইস মোহাম্মদকে ঢাকার নায়েব নবাব পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু নিবাইস মোহাম্মদ মুরশিদাবাদে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হোসেন কুলি খাঁ দ্বারাই রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। এই হোসেন কুলি খাঁ রাজা রাজবল্লভকে তাঁহার সহকারী রূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার উন্নতির পথ সুগম করিয়া দেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যুর পরে সিরাজউদ্দৌলা নবাব হন। তিনি তাঁহার বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বনকারী হোসেন কুলি খাঁকে গোপনে হত্যা করেন। তাঁহার পদে রাজা রাজবল্লভকে ঢাকায় নায়েব নবাব

পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় রাজবল্লভের প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাঁহার মধ্যম পুত্র কৃষ্ণদাসকে লোকে নবাব বলিয়া সম্বোধন করিত। নিবাইস মোহাম্মদের মৃত্যুর পরে, তাঁহার পত্নী ঘেসেটী বেগমের তিনি সর্ব্ব বিষয়ে পরামর্শদাতা হইয়াছিলেন। বেগমের ইচ্ছা ছিল যে আলীবর্দ্দী খাঁর মৃত্যুর পরে তাঁহার পোষ্যপুত্র এক্রাম-উদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হন। এইজন্য রাজা রাজবল্লভ দশ সহস্র সৈন্য সহ মুর্শিদাবাদের এক ক্রোশ দক্ষিণে মতিঝিল নামক উদ্যান মধ্যে ছাউনী করিলেন। যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত মনে করিয়া, তিনি সমস্ত ধন সম্পত্তি সহ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদাসকে কলিকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণদাস উমিচাঁদের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সিরাজ ইহাতে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া রাজবল্লভকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন এবং কৃষ্ণদাসকে তাহার হস্তে অর্পণ করিতে ইংরেজদিগকে চিঠি লিখিলেন। ইংরেজেরা অসম্মত হইলে, নবাব কলিকাতা আক্রমণ করিয়া, তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। কৃষ্ণদাস ও উমিচাঁদ বন্দী অবস্থায় নবাব সমীপে নীত হইলে, নবাব তাঁহাদের প্রতি অতিশয় সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক, খিলাত প্রদান করিলেন বড়ই পরিতাপের বিষয় নবাবেরএই সৌজন্যেও তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে বিরত হইলেন না। অচিরকাল মধ্যেই তাঁহাদের চক্রান্তে সিরাজ-উদ্দৌল্লা পরাজিত ও নিহত হইলেন। অন্যতম বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর খাঁ নবাবী পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে রাজবল্লভ প্রধান মন্ত্রী এবং তৎপুত্র কৃষ্ণদাস ঢাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম রাজবল্লভকে 'মহারাজা রাজবল্লভ রায় রাইয়া সলার জঙ্গ বাহাদুর' উপাধি প্রদানপূর্ব্বক মুঙ্গেরের সুবেদার পদ প্রদান করেন। তখন কৃষ্ণদাস রাজাবাহাদুর উপাধি পাইয়া মীরজাফরের প্রধান মন্ত্রী হইলেন। বলা বাহুল্য এই সময়ই পিতা পুত্রের চরম উন্নতির সময়। ইহার কিছুকাল পরেই মীরজাফর খাঁ ইংরেজ কর্ত্তৃক পদচ্যুত ও তাঁহার জামাতা তৎপরিবর্ত্তে নবাব হইলেন। মীরকাশিম তাঁহাদিগকে ইংরেজদের পক্ষাবলম্বী মনে করিয়া সন্দেহ করিতেন। সেজন্য পিতা ও পুত্র উভয়কে মুঙ্গের দুর্গে অবরুদ্ধ করেন। ইতিমধ্যে ইংরেজদের সহিত মীরকাশিমের মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইয়া যুদ্ধ সংঘটিত হইল। মীরকাশিম গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উদয়নালায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, পিতা পুত্র উভয়কে গলায় বালুকাপূর্ণ

থলী বন্ধনপূর্ব্বক গঙ্গায় নিমজ্জন করিয়া বধ করিবার আদেশ দিলেন। ১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দে নবাবের নিষ্ঠুর আদেশে মহারাজা রাজবল্লভ সেন ও কৃষ্ণদাস সেনের জীবন লীলার অবসান হইল। কৃষ্ণদাস পৈত্রিক ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারীর এক পঞ্চমাংস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে, রাজকৃষ্ণ, হৃদয়কৃষ্ণ ও রমণকৃষ্ণ নামক তাঁহার তিন পুত্র উক্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন।

কৃষ্ণদেব—তিনি জয়পুরের মহারাজা প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ জয়সিংহের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত পরকীয়া সাধন প্রণালীর দোষারোপ করিয়া স্বকীয় মতের প্রাধান্য স্থাপন করেন। বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার নিকট বিচারে পরাজিত হন। অবশেষে স্বীয় মত প্রচার উদ্দেশ্যে তিনি বঙ্গদেশে আগমন করেন। বঙ্গের নবাব মীরজাফর আলী খাঁর তত্ত্বাবধানে এক বিরাট সভা আহূত হয়। সেই সভায় তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের বংশধর আচার্য্য রাধা-মোহন ঠাকুরের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

কৃষ্ণদেব রায়, মহারাজা—তিনি তুলুব বংশীয় দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিজয় নগরের রাজা ছিলেন। ১৫১০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার ভ্রাতা বীর নরসিংহের মৃত্যুর পরে তিনি রাজা হন এবং ১৫৩০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ১৫১৩ সালে তিনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রকে এক যুদ্ধে পরাস্ত করেন। ১৫১৫ সালে তিনি কুণ্ডবিড়ু দুর্গ অধিকার করেন। এই দুর্গ তখন রাজা প্রতাপরুদ্রের অন্যতম পুত্র বীরভদ্রের অধিকারে ছিল। দুই মাস অবরোধের পর দুর্গ শত্রু হস্তে পতিত হয় এবং বীরভদ্র বন্দী হন। কৃষ্ণদেব স্বীয় সেনাপতি শাল্বতিম্মকে দুর্গের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। এই যুদ্ধে প্রতাপরুদ্র মুসলমান সৈন্যও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে প্রতাপরুদ্রের হিন্দু সেনাপতি কুমার হম্মির মহাপাত্র ও কেশব পাত্র, এবং মুসলমান সেনাপতি মল্লু খাঁ ও উদ্দণ্ড খাঁ শত্রু হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। তৎপরে কৃষ্ণদেব কোণ্ডপল্লী নামক দুর্গ আক্রমণ করিয়া বিজলী খাঁ প্রভৃতি আরও দশজন সেনাপতিকে বন্দী করেন। ক্রমাগত কয়েকটী আক্রমণে প্রতাপ রুদ্র পরাজিত হইয়া, গোদাবরীর দক্ষিণ দিকস্থ সমস্ত প্রদেশ প্রদান পূর্ব্বক এবং স্বীয় কন্যা জগন্মোহিনীকে কৃষ্ণদেবের সহিত বিবাহ দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। বিবাহের পর বীর-ভদ্র মুক্ত হইয়া বিজয়নগরপতির সামন্তরূপে মলেগ বেল্লুর সীমে নামক

প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। একজন সমসাময়িক পর্ত্তুগিজ লেখকের মতে তাঁহার সাত লক্ষ পদাতিক ও বত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং পাঁচ শত পঞ্চাশটী রণহস্তী ছিল।

কৃষ্ণদেব, দেবরায় — যশোহরের অন্তর্গত নলডাঙ্গার জমিদার বংশ রাঢ়ীয় শ্রেণীর শাণ্ডিল্য গোত্রীয় আখণ্ডলের সন্তান। বিষ্ণুদাস ভট্টাচার্য্য হাজরা এই জমিদার বংশের স্থাপন কর্ত্তা। এই বংশের রাজা রঘুদেব দেবরায়ের পুত্র কৃষ্ণদেব দেবরায়। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি রাজপদ গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে রাজ্য মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তিনি একজন বলবীর্য্যশালী রাজা ছিলেন। ১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি মহেন্দ্র শঙ্কর ও রাম শঙ্কর নামে দুই ঔরস পুত্র এবং গোবিন্দ চন্দ্র নামে এক পোষ্য পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। মহেন্দ্রশঙ্কর ও রামশঙ্কর প্রত্যেকে ছয় আনা এবং গোবিন্দচন্দ্র চারি আনা অংশ গ্রহণ করিয়া জমিদারী ভাগ করিয়া লয়েন। মহেন্দ্র শঙ্কর ও গোবিন্দচন্দ্রের জমিদারী নড়াইলের জমিদারেরা ক্রয় করিয়াছেন। রাম শঙ্করের জমিদারী এখনও তাঁহাদের বংশধরেরা ভোগ করিতেছেন।

কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ—তিনি রাজনগরের মহারাজা রাজবল্লভের অন্যতম সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজবল্লভ, মহারাজা দেখ।

কৃষ্ণদেব বিদ্যালঙ্কার—উত্তর বিক্রমপুরের ধলছত্রবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশীয় কৃষ্ণদেব বিদ্যালঙ্কার মহাশয় খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে ঢাকা শ্রীনগরের দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম কেদার রায়ের পুরোহিত ছিলেন। তিনি একজন অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন।

কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য—তাঁহার জন্ম স্থান শ্রীহট্টের অন্তর্গত মান্দারকান্দি গ্রাম। তাঁহার পিতামহের নাম কাশীশ্বর ভট্টাচার্য্য ও পিতার নাম দেববাচস্পতি। তাঁহার রচিত একখানা পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে। এই পাঁচালীর নাম 'নিয়ত মঙ্গল চণ্ডী'।

কৃষ্ণদৈবজ্ঞ—(১) বল্লাল দৈবজ্ঞের অন্যতম পুত্র কৃষ্ণদৈবজ্ঞ একজন অসাধারণ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় প্রধান জ্যোতিষীর পদে নিযুক্ত করেন। তিনি গোলগ্রামবাসী দিবাকর জ্যোতিষীর অন্যতম পুত্র বিষ্ণু জ্যোতিষীর শিষ্য ছিলেন। কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ ভাস্করের বীজগণিতের উপর নবাঙ্কুর নামক টীকা এবং লীলাবতীর উপর কল্পলতাবতার নামে

টীকা লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীপতি কৃত জাতক পদ্ধতির টীকা ও 'ছাদক নির্ণয়' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থ খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল। ছাদক নির্ণয়ে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণের কারণ, দম্পতী যুগলের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ— (২) কাশ্যপ গোত্রীয় মহাদেবের পুত্র কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ ১৬৫৩ খ্রীঃ অব্দে (১৫৭৫ শকে) করণ 'কৌস্তুভ' নামে এক করণ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা কেশবকৃত গ্রহকৌতুক ও গণেশ-কৃত গ্রহলাঘব নামক গ্রন্থদ্বয় অবলম্বনে লিখিত। তন্ত্ররত্ন নামে তাঁহার আরও একখানা গ্রন্থ আছে। তাঁহার জন্মস্থান বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কোঙ্কন প্রদেশ। তিনি দেশস্থ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। সূর্য্য সিদ্ধান্তের উপর কৃষ্ণ দৈবজ্ঞের এক টীকাও আছে।

কৃষ্ণধন বিদ্যাপ ত—তাঁহার জন্মস্থান বর্দ্ধমান জিলায়। দেশাচার সম্বন্ধে তাঁহার রচিত সামাজিক সংগীতগুলি অতি উৎকৃষ্ট। এক সময়ে সংগীত-গুলির খুব আদর ছিল।

কৃষ্ণধর দেবশর্ম্মা — তিনি একজন গর্গ গোত্রীর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তিনি ঋগ্বে-দের আশ্বলায়ন শাখা অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন। তিনি মহারাজ লক্ষণসেনের সুন্দরবন শাসনের গ্রহীতা ছিলেন।

কৃষ্ণধূর্জ্জটি দীক্ষিত—তিনি 'সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার পিতার নাম বেঙ্কটেশ দীক্ষিত এবং মাতার নাম শেষী। দাক্ষিণাত্যের কোয়ংপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

কৃষ্ণনাথ — (১) একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত তিনি মুদ্গল কৃত 'ভাবকল্পলতা' গ্রন্থের এক বিশদ টীকা রচনা করেন।

কৃষ্ণনাথ — (২) দ্বিশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে তিনি শীতলা দেবীর একটি পাঁচালী রচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, মহামহো-পাধ্যায়—বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রস্থল পূর্ব্বস্থলী গ্রামে ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস নবদ্বীপে ছিল। তাঁহার পিতামহ অভয়াচরণ তর্কবাচস্পতি পূর্ব্বস্থলীতে আসিয়া বাস করেন। কৃষ্ণনাথ, খ্যাতনামা মৈথিল পণ্ডিত অর্জ্জুন মিশ্রের অধস্তন নব পুরুষ ছিলেন। তিনি শৈশবে পিতৃহীন হয়েন। তাঁহার সমকালে তাঁহার তুল্য অসাধারণ পণ্ডিত অতি অল্প ছিলেন। তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্য ও নিরপেক্ষতা গুণে শ্রীভারত ধর্ম্মমহা-মণ্ডলের ব্যবস্থাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। উক্ত মহামণ্ডলের সভাপতি প্রসিদ্ধ জমিদার দ্বারবঙ্গাধিপতি

তাঁহাকে 'পণ্ডিতকুল চক্রবর্ত্তী' উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। নবদ্বীপাধিপতি কর্ত্তৃক তিনি নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্তের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দীর্ঘকাল উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি কাশীতে গমন করিলে তৎপদে হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তিনি বহু গ্রন্থের টীকা, ভাষ্যাদি ও মূল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহার গ্রন্থাদির নাম সন্নিবিষ্ট হইল। কর্পূরাদি স্তোত্রের টীকা, অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের টীকা, মলমাসতত্ত্ব টীকা, দায়ভাগ টিপ্পনী, বেদান্ত পরিভাষা টীকা, অর্থ সংগ্রহের টীকা, মীমাংসা ন্যায়প্রকাশ, তত্ত্ব কৌমুদী, স্মৃতি সিদ্ধান্ত, বাতদূত, শ্যামা সন্তোষ, বৃহৎ মুগ্ধবোধ, প্রভৃতি। এই অমূল্য গ্রন্থরাজি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি ১৯১১ খ্রীঃ অব্দের ১২ই ডিসেম্বর (২৬শে অগ্রহায়ণ) কাশীতেই পরলোক গত হন।

কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরী—২৪ পরগণার অন্তর্গত টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীনাথ রায় মহাশয়ের তিনি কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৈকুণ্ঠ নাথের ন্যায় তিনি সঙ্গীত রচনায় নিপুণ ছিলেন। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে তিনি এক মাত্র পুত্র যোগেন্দ্রনাথকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। প্রসিদ্ধ যতীন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহাশয় তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

কৃষ্ণনারায়ণ—(১) তাঁহার পিতা হংসনারায়ণ আসাম প্রদেশের আহম বংশীয় নরপতিদের সামন্ত নরপতিরূপে দরং প্রদেশের রাজা ছিলেন। আহম-রাজ গৌরীনাথ (১৭৮০-৯৪) সন্দেহ-বশে হংসনারায়ণকে নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিয়া তাঁহারই আত্মীয় বিষ্ণুনারায়ণকে দরং রাজ্য অর্পণ করেন। পিতার এই প্রকার হত্যায় কৃষ্ণনারায়ণ তাঁহার প্রতিশোধ লইবার জন্য কোচবিহারস্থিত ইংরেজ কমিশনার ডগলাস সাহেবের (Mr Douglas) শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু সাহায্য পাইলেন না। কৃষ্ণ-নারায়ণ ইহাতে নিরস্ত না হইয়া, কতকগুলি বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক বিষ্ণুনারায়ণকে বিতাড়িত করিয়া, স্বয়ং দরংরাজ্য অধিকার করিলেন। তিনি কামরূপ রাজ্যেরও কতক অংশ অধিকার করিয়া স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। আহমরাজ গৌরী-নাথ উপায়ান্তর অভাবে ইংরেজদের শরণাপন্ন হইলেন। ইংরেজ সেনাপতি কাপ্তান ওয়েলস (Capt. Welsh) তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বশে আনয়ন করেন। ইতিমধ্যে কৃষ্ণনারায়ণের সেনাপতি (বড় গোহাই) কোন কারণে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহারই আত্মীয়

সমুদ্র নারায়ণকে দরং রাজ্যের সিংহাসন প্রদান করেন।

কৃষ্ণনারায়ণ— (২) শ্রীহট্টের অন্তর্গত ইটার স্বাধীন ব্রাহ্মণ রাজা সুবিদ নারায়ণের চতুর্থ পুত্র কৃষ্ণনারায়ণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ঈশাখাঁ নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহারই বংশধর আবদুল হামিদ চৌধুরী মহাশয় শ্রীহট্টের অন্যতম জমিদার। সুবিদ নারায়ণ দেখ।

কৃষ্ণপণ্ডিত—তিনি খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একখানা প্রাকৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণপাদ—তিনি মুসলমান আগমনের পূর্ব্বের একজন বাঙ্গালা ভাষার লেখক। তাঁহার রচিত সাতাইশ খানা বই পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার জন্মস্থান এখনও নির্ণয় হয় নাই।

কৃষ্ণপান্তী — কৃষ্ণকান্ত পালচৌধুরী দেখ।

কৃষ্ণপাল— হুগলী জিলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর নিবাসী তন্তুবায় বংশীয় কৃষ্ণপাল বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে তাঁহার দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীরামপুরের তদানীন্তন ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তা, এবং বহু ইংরেজ পর্ত্তুগীজ ও দেশীয় লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম-প্রচারক উইলিয়াম কেরী (William Carey) দীক্ষাকার্য্য বাঙ্গালা ভাষায় সম্পন্ন করেন। এই কৃষ্ণপালের কন্যার সহিত ব্রাহ্মণ বংশীয় কৃষ্ণপ্রসাদ নামক এক খ্রীষ্টিয় যুবকের বিবাহ, পূর্ব্বোক্ত কেরী সাহেব ও মার্শমান প্রভৃতি আরও কতিপয় পাদ্রীর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রেও সমুদয় অনুষ্ঠান বাঙ্গালা ভাষায় সম্পন্ন হয় (১৮০৩ খ্রীঃ)।

কৃষ্ণপ্রসাদ— জনৈক বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা। তিনি আচার্য্য শ্রীনিবাস ঠাকুরের কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁহার অপর দুই ভ্রাতার নাম বৃন্দাবন ও রাধাকৃষ্ণ। 'পদামৃত সমুদ্র' সংকলনকারী, জয়পুরাধিপতি দ্বিতীয় জয়সিংহের সভা-পণ্ডিত দিগ্বিজয়ী কৃষ্ণদেব ভট্টের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে জয়ী রাধামোহন ঠাকুর কৃষ্ণপ্রসাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ (লস্কর)— ইনি বহু বৈষ্ণব-পদাবলী এবং একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেন। তাঁহার রচিত পদাবলীর অধিকাংশই লুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী পাতেণ্ড গ্রামের উত্তর রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থ কুলে অনুমান ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। লস্কর তাঁহাদের রাজদত্ত উপাধি। সিউড়ীর নিকটবর্ত্তী দুর্গাপুরে বিবাহ করিয়া কৃষ্ণদাস বসতি স্থাপন করেন। তিনি উত্তমরূপ ফারসী ও কিঞ্চিৎ নাগরী শিক্ষা করেন এবং কিছুকাল সিউড়ীতে ফরে

আমীনের কর্ম্ম করেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রসাদ ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা, সাধুসংসর্গ এবং তীর্থপর্য্যটনেই জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। অনুমান ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক—বাঙ্গালী শিক্ষাব্রতী। ১২৭৩ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ঢাকা জিলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহাদের বংশে তিনিই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐসময়েই ঢাকায় তিনি ব্রাহ্মনেতা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। কলিকাতা সিটি কলেজ হইতে তিনি বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি নব প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ঐপদে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে অনেক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় স্থিরবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়া প্রশংসা লাভ করেন।

অতঃপর তিনি দীর্ঘ ষোল বৎসরকাল লক্ষ্ণৌ নগরীর প্রসিদ্ধ দেশনেতা গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মার 'এড্ভোকেট' (The Advocate) পত্রিকা সম্পাদন করেন এবং সেই সংস্রবেও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত গিরিডি নামক স্বাস্থ্যনিবাসে তিনি এক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া অশেষ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক উহার উন্নতি বিধান করেন। এসকল কার্য্য তিনি এরূপ নীরবে, লোককোলাহলের অন্তরালে করিতেন যে, অধিকাংশ লোকই তাঁহার কৃতিত্বের কথা জানিতে পারিত না। তাহার পর তিনি কিছুকাল কটকে একটী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। ১৯১৬ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্ম্মিণী লেডী অবলা বসুর সহকর্ম্মীরূপে নারীশিক্ষা সমিতি স্থাপন করেন এবং সুদীর্ঘ ১৯ বৎসরকাল প্রাণ মন ঢালিয়া ঐ সমিতির কার্য্য পরিচালনা করেন। বাঙ্গালার অনাথা বিধবাদিগকে সাধারণ লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু অর্থকরি বিদ্যা শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে অপরের গলগ্রহ হইবার ক্লেশ ও নির্য্যাতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঐ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণপ্রসাদের প্রাণপণ পরিশ্রমে ঐ সমিতির তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন জিলায় প্রায় দুইশত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

কৃষ্ণপ্রসাদ নির্ব্বিরোধী, পরিশ্রমী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর্ম্মবীর ছিলেন। যশ ও খ্যাতির প্রত্যাশা না করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া তিনি লোকহিতকর কাজ করিয়া গিয়াছেন। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে কলিকাতা সহরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণপ্রসাদ সেন—বাঁকুড়ার অধিবাসী ও চণ্ডিদাসের আখ্যায়িকার রচয়িতা। তিনি আনুমানিক ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে ছাতিনার রাজা বলাই নারায়ণের "চণ্ডী চরিতামৃত" গ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। সেই গ্রন্থের নাম খুব সম্ভব "বাসলী ও চণ্ডীদাস" ছিল। উহা মুখ্যতঃ কবি চণ্ডীদাসেরই রচিতাখ্যান।

কৃষ্ণবল্লভ দেব—তিনি চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজ মর্দ্দন দেবের পৌত্র ও রমাবল্লভ দেবের পুত্র। কৃষ্ণবল্লভের পুত্রের নাম হরিবল্লভ দেব। ১৪১৪-১৪৮৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত সম্ভবত দনুজ-মর্দ্দন দেব বাঙ্গলার কতক অংশের রাজা ছিলেন।

কৃষ্ণবল্লভ শ্রীচন্দন পাল মাড়ি-রাজা—তিনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত নারায়ণগড়ের চতুর্ব্বিংশতিতম নরপতি। ১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা রাজবল্লভের মৃত্যুর পরে অল্প বয়সে তিনি রাজা হন। ইংরেজ সরকার পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়া, জমিদারী পরিচালনার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। রাণীর ও দেবসেবার জন্য রাণীর হস্তে বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা প্রদত্ত হইত। রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিবার সময়ে, প্রচুর সঞ্চিত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রাজমাতা রাণী অভয়া দেবী তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া বৃন্দাবন হইতে 'ব্রজ-নাগর' নামক একটী বিগ্রহ আনয়ন করেন। তিনি স্বীয় ভবনে এই বিগ্রহ স্থাপন ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন। কৃষ্ণবল্লভ পরলোক গমন করিলে, ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে জগৎ বল্লভ রাজা হন। গন্ধর্ব্ব শ্রীচন্দন পাল রাজা দেখ।

কৃষ্ণ বাহাদুর—তিনি নেপালের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি জঙ্গ বাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং নেপাল রাজের অন্যতম সহকারী সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার পিতা বাল নরসিংহ, পিতামহ রণজিৎ কুমার রাণা, প্রপিতামহ রামকৃষ্ণ রাণা ইহারা সকলেই নেপাল অধিপতিদের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহাদের শৌর্য্যে নেপাল ভূপতির রাজ্য সম্পদ ও যশ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। জঙ্গ বাহাদুর দেখ।

কৃষ্ণবিহারী সেন—প্রসিদ্ধ সাংবাদিক বক্তা ও গ্রন্থকার। তিনি স্বনামপ্রসিদ্ধ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম প্যারী মোহন সেন। তিনি পিতার কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে (১২৫৩ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ) তাহার জন্ম হয়। বাল্যকালেই পিতৃহীন হইয়া কৃষ্ণবিহারী জ্যেষ্ঠতাতের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়া, পরে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন। ক্রমে কৃতিত্বের

সহিত প্রবেশিকা ও পরবর্ত্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি কুড়ি টাকা বৃত্তি পান এবং এম-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। স্কুলে পড়িবার সময়েই ইংরেজী রচনায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা জন্মে এবং ইণ্ডিয়ান মিরার প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন। কলেজে পড়িবার সময়েই অগ্রজ কেশবচন্দ্রের প্রভাব তিনি বিশেষ ভাবে অনুভব করেন এবং শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করিয়া, সস্ত্রীক কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। দেশ বিখ্যাত আনন্দ মোহন বসু ও ব্রাহ্ম আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীও ঐদিনেই দীক্ষা গ্রহণ করেন।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণবিহারী প্রথমে (১৮৭২ খ্রীঃ) কলিকাতা শিক্ষালয়ের (Calcutta School) প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। পরে ইহার রেক্টর (Rector) হন। ঐ শিক্ষায়তনটিই পরে অ্যালবার্ট স্কুল নাম প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে অ্যালবার্ট কলেজে (Albert College) পরিণত হয় (১৮৮১)। ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ ও জয়পুর শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা (Director of Public Instruction) হইয়া জয়পুরে গমন করেন। দেড় বৎসর কাল দক্ষতার সহিত ঐ কাজ করিয়া স্বেচ্ছায় উহা পরিত্যাগ করেন। কয়েক বৎসর পরে (১৮৮৩খ্রীঃ) তিনি মাসিক ছয়শত টাকা বেতনে আবকারী বিভাগে উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু অধিক কাল ঐ পদে কাজ করেন নাই।

কৃষ্ণবিহারী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য এবং কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষক হইয়াছিলেন। তিনি সুবক্তা ছিলেন। নানাস্থানে তাঁহার ধর্ম্ম ও সাধারণের উপযোগী বিষয় সকলের উৎকৃষ্ট বক্তৃতা জনসাধারণকে মুগ্ধ করিত। কেশবচন্দ্রের কন্যার সহিত কুচবিহারের রাজার বিবাহ উপলক্ষে যখন ব্রাহ্ম সমাজে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন কৃষ্ণবিহারী ইণ্ডিয়ান মিরার ও সানডে মিরার (Sunday Mirror) নামক পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়া যোগ্যতার সহিত উহা পরিচালনা করিতে থাকেন। তাহার কিছুকাল পরে তিনি 'দি লিবারেল অ্যাণ্ড দি নিউ ডিস্‌পেন্‌সেসন' (The Liberal and the New Dispensation) নামক পত্রিকার সম্পাদকের পদ লাভ করেন (১৮৮২ খ্রীঃ)।

কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি নানাভাবে কেশবচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাহারই ফলে কলিকাতা টাউন হল ও অ্যালবার্টহলে কেশবচন্দ্রের তৈলচিত্র রক্ষিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্রকে "কেশবচন্দ্র

পদক” দিবার ব্যবস্থা হয়। তাঁহারই প্রধান চেষ্টায় কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভার সর্ব্বসাধারণের উপর প্রদত্ত হয় এবং তজ্জন্য ন্যাসরক্ষক মণ্ডলী (Trustees) নিযুক্ত হন। মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাঙ্গিন উন্নতি ও প্রসারের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণবিহারী সুলেখকও ছিলেন। তৎরচিত 'অশোক চরিত' বাঙ্গালা ভাষায় অশোকের প্রথম ধারাবাহিক কাহিনী। তদ্ভিন্ন অশোক চরিত (নাটক); নববিধান কি? প্রভৃতি আরও কয়েক খানি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। তিনি বুদ্ধদেবের একখানি বিস্তৃত জীবন চরিত লিখিতে আরম্ভ করেন কিন্তু উহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ইংরেজি, ফরাসী, সংস্কৃত ও পালি ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল।

শিক্ষকরূপে তিনি সর্ব্বদাই ছাত্রদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন। তৎকালীন প্রখ্যাতনামা ইংরেজ অধ্যাপকগণও তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বৎসর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান সভায় (Convocation) সার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট (Sir Alfred Croft) ছাত্রবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে কৃষ্ণবিহারীর জীবন সকল ছাত্রেরই আদর্শ হওয়া উচিত। সকলেই তাঁহার জীবন অনুধাবন করিয়া উপকৃত হইবেন।

কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর কৃষ্ণবিহারীরও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। একাধিকবার গুরুতর পীড়ার আক্রমণ হইতে কোনও ক্রমে রক্ষা পাইয়া ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে (জ্যৈষ্ঠ ১৩১২) বহুমূত্র রোগে তিনি পরলোক গমন করেন।

কৃষ্ণবিহারী সোম—তিনি চুঁচুড়ার জমিদার ঘনশ্যাম সোম মহাশয়ের আট পুত্রের মধ্যে চতুর্থ ছিলেন। ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে ওলন্দাজ সরকারে দেওয়ানী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজ সরকারের অধীনে প্রথমে একটী সামান্য কর্ম্মে পরে মুনসেফের পদ প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল শ্রীরামপুরে উক্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র মদনগোপাল ও রামগোপাল মুনসেফ হইয়াছিলেন। এই বংশ বহু সৎকার্য্যের জন্য বিখ্যাত। বলভদ্রসোম দেখ।

কৃষ্ণভট্ট—(১) তিনি কালিদাস কৃত রঘুবংশের অন্যতম টীকাকার।

কৃষ্ণভট্ট—(২) একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। 'ঔষধি প্রকার' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

কৃষ্ণভট্ট আর্দে — তিনি খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কাশীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রঘুনাথভট্ট। মঞ্জুষা বা জাগদীশী নাম্নী ন্যায়ের টীকা তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি শেষ বয়সে নির্ণয় সিন্ধুর উপর দীপিকা নাম্নী এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন।

কৃষ্ণভামিনী দাস — কলিকাতার ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠাত্রী ও নারীকল্যাণ ব্রতী একজন নীরব কর্ম্মী। নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। দশম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী (Attorney) শ্রীনাথদাস মহাশয়ের পুত্র দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের অনতিকাল মধ্যে মাতৃবিয়োগের পর, দেবেন্দ্র নাথ ভগ্নস্বাস্থ্য হইলে চিকিৎসকগণ তাঁহাকে সমুদ্রবায়ু সেবনের ব্যবস্থা দেন; কিন্তু এই পরামর্শে পিতা বিশেষ ভ্রূক্ষেপ না করায়, দেবেন্দ্রনাথ সেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু পত্নী কৃষ্ণভামিনী তাঁহাকে স্বাস্থ্য ও জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য উৎসাহিত করিতে থাকেন, এমন কি তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আপনার যাবতীয় অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া অর্থ প্রদানের প্রস্তাব লইয়া কুণ্ঠিতভাবে স্বামীর নিকট উপস্থিত হন। যাহা হউক শ্রীনাথ দাস অবশেষে জ্ঞান লাভের জন্য পুত্রের আগ্রহ দেখিয়া, তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। এই সময় কৃষ্ণভামিনী দুইটি শিশু সন্তানের জননী। স্বামীর প্রবাসকালে তাঁহার একটী সন্তানের মৃত্যু হয়। পাছে প্রবাসে স্বামীর জ্ঞানার্জ্জনে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে এই দুঃসহ অপত্যশোকে অধীর না হইয়া, কৃষ্ণভামিনী উহা নীরবে সহ্য করেন এবং স্বামীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য বিদ্যাচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রায় পাঁচ বৎসর বিলাত প্রবাসের পর, পিতার পীড়ার সংবাদে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে দেশে আগমন করেন। পাঁচ মাস পরে তিনি পুনরায় বিদ্যালাভের জন্য বিলাতে যাইবার আয়োজন করিলে, পত্নী কৃষ্ণভামিনীও জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য স্বামীর অনুগামিনী হইতে কৃতসঙ্কল্প হন। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব এমন কি দেবেন্দ্রনাথও তাঁহাকে এই কর্ম্মে নিরস্ত করিতে চাহিলেও, প্রকৃতা সহধর্ম্মিণীর ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগমনের সঙ্কল্পে অটল রহিলেন। অতঃপর দেবেন্দ্র নাথ সস্ত্রীক পুনরায় বিলাত যাত্রা করেন। এখানে কৃষ্ণ ভামিনী ব্রিটিশ মিউজিয়মের গ্রন্থাগারে দীর্ঘ ৮।৯ বৎসর বিদ্যালোচনায় অতিবাহিত করেন। অনন্তর দেশে

প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, কয়েকটি পারিবারিক কারণে গৃহের সহিত দেবেন্দ্র নাথের প্রায় সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়। কেবল তাঁহার একমাত্র কন্যা তিলোত্তমাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইতেন। এই সময় দেবেন্দ্র নাথ বরিশালে অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার কিছুকাল পরে দেবেন্দ্রনাথের পরলোক গমনে কৃষ্ণভামিনী নিতান্ত নিরাশ্রয় ও শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের মধ্যম পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। ইহার অল্পকাল পরেই তাঁহার একমাত্র কন্যা তিলোত্তমার মৃত্যু ঘটে। অপত্যশোক কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, তিনি স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন এবং ভারত-স্ত্রীমণ্ডল প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান কীর্ত্তি। ইহার জন্য তিনি তাঁহার স্বামীর রচিত পুস্তক সমূহের তিন হাজার টাকা বার্ষিক আয় প্রদান করেন। বিশিষ্ট ধনী পরিবারের বধূ হইলেও, তিনি অতিশয় অনাড়ম্বর সরল জীবন যাপন করিতেন। কত অনাথা বালিকা এবং আশ্রয়হীনা বিধবা যে কত ভাবে তাঁহার সাহায্য লাভে ধন্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নারী কল্যাণে ব্রতী বহুপ্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। প্রশংসা বা নিন্দার প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তিনি নীরবে কর্ম্ম করিয়া যাইতেন। তিনি আজন্ম-শিক্ষক ও প্রকৃত বিদুষী ছিলেন। স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ না পাইলেও বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণভারতী—তিনি আসাম প্রদেশের ষোড়শ শতাব্দীর একজন গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—'সন্তনির্ণয়'। এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থে তিনি শঙ্করাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া, চৈতন্য মহাপ্রভু ও আসামের শঙ্কর দেব, মাধব দেব প্রভৃতির বিবরণ অতি সুন্দররূপে প্রদান করিয়াছেন।

কৃষ্ণমাণিক্য, মহারাজ — তিনি ত্রিপুরাধিপতি মুকুন্দ মাণিক্যের তৃতীয় পুত্র। মহারাজ মুকুন্দ মাণিক্য বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলে, রুদ্রমণি ঠাকুর নামক রাজবংশীয় এক ব্যক্তি ১৭৩৮ খ্রীঃ অব্দে জয়মাণিক্য নাম গ্রহণ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে কৃষ্ণমাণিক্যের রাজ্যারোহণ পর্য্যন্ত (১৭৬০ খ্রীঃ অব্দ) রাজ্যে অতিশয় অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। ক্রমে জয়মাণিক্য, ইন্দ্রমাণিক্য, জয়মাণিক্য ২য় বার, উদয়মাণিক্য, জয়মাণিক্য ৩য় বার, ইন্দ্রমাণিক্য ২য় বার, জয়মাণিক্য ৪র্থ বার ও বিজয়মাণিক্য, রাজা হইয়াছিলেন। এই

অরাজক অবস্থার সময়ে বিজয়মাণিক্য পরলোক গমন করেন এবং কৃষ্ণমাণিক্য সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু সমসের গাজী নামক এক দস্যুপতি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার প্রয়াসী হন। তখন কৃষ্ণমাণিক্য উদয়পুর হইতে পলায়নপূর্ব্বক বর্ত্তমান আগড়তলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি বঙ্গের নবাব মীরকাশিমের শরণাপন্ন হইলেন। নবাব মীরকাশিম, কৃষ্ণমাণিক্যের সাহায্যার্থ একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। সেই সৈন্য সমসের গাজীকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া নবাব সমীপে উপস্থিত করিলে, নবাবের আদেশে সমসের গাজী তোপের মুখে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। রাজদণ্ড ধারণ করিবার পূর্ব্বে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যকে যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, ত্রিপুরা রাজ বংশের কেন, অপর রাজবংশীয় অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই সেইরূপ ঘটিয়াছিল। রাজদণ্ড ধারণ করিবার পরেই রাজস্ব সংগ্রাহক ফৌজদারের সহিত তাঁহার প্রথমে কলহ, পরে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ফৌজদার রাজাকে দমন করিবার জন্য নবাব সমীপে সৈন্য প্রার্থনা করিলেন। নবাব ইংরেজ গভর্ণর বান্‌সিটার্ট সাহেবকে সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে গভর্ণর চট্টগ্রামের সীমারেখা প্রসারিত করিবার এই উত্তম সুযোগটী গ্রহণ করিতে খুবই আগ্রহান্বিত হইলেন। তিনি চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা বারলেষ্ট সাহেবকে ত্রিপুরা অধিকার করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে ইংরাজ সেনাপতি মথি ২০৬ জন পদাতিক ও দুইটী তোপ সহ ত্রিপুরার রাজধানী কৈলার গড় দুর্গের সমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রবাদ এই যে মথি সাহেব প্রলোভনে একজন রাজকীয় প্রধান কর্ম্মচারীকে হস্তগত করিলেন। এই বিশ্বাসঘাতক রাজকীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিল। রাত্রিকালে রাজকীয় সমস্ত সৈন্য পলায়ন করিল। মহারাজ সেনাপতি মথির হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্র ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয় (১৭৬২)। জগৎমাণিক্যের বংশধর বলরাম মাণিক্য তখন চাকলা রোসনাবাদের শাসনভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু কৃষ্ণ মাণিক্য অল্পকাল পরেই বলরামকে তাড়াইয়া রোসনাবাদ পুন অধিকার করেন।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য দাতা, দয়ালু, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ নরপতি ছিলেন। কুমিল্লার সতর রত্ন মন্দির তাঁহার সময়ে নির্ম্মিত হয়। সমসের গাজীর পরাজয়ের পর তাঁহার সমস্ত বিষয় মহারাজের অধিকারে আসিলেও, তিনি গাজীর প্রদত্ত নিষ্কর বাজেয়াপ্ত করেন নাই। তাঁহার সর্ব্ব-

প্রধান কীর্ত্তি চৌদ্দগ্রামের নমশূদ্র জাতীয় পাল্কীবাহক দিগকে একেবারে জল আচরণীয় শূদ্র জাতিতে উন্নিত করা। অনপত্য মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজধর-মাণিক্য রাজা হন।

কৃষ্ণমিশ্র—(১)তিনি 'প্রবোধ চন্দ্রোদয় নামক নাটকের প্রণেতা। ইহা একটী উৎকৃষ্ট দার্শনিক নাটক। শঙ্করের মতবাদ উপজীব্য করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত। বুন্দেল খণ্ডের চন্দেল বংশীয় নরপতি কীর্ত্তিবর্ম্মার পরিতোষের নিমিত্ত ১০৬৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার সম্মুখে ইহা প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কীর্ত্তিবর্ম্মার ব্রাহ্মণ জাতীয় সেনাপতি গোপাল, চেদীবংশীয় পরাক্রান্ত কর্ণদেবকে পরাস্ত করিয়া, কীর্ত্তিবর্ম্মাকে পুন রাজপদে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। গিধোরের বর্ত্তমান রাজবংশ তাঁহারই বংশধর।

কৃষ্ণমিশ্র— (২) তিনি প্রহ্লাদ চরিতের রচয়িতা। তাঁহার পিতার নাম রামেশ্বর।

কৃষ্ণমিশ্র—(৩) তিনি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। 'ফলরত্ন মালা' নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

কৃষ্ণমোহন—তিনি অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা। সম্ভবত তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। (১) 'আনন্দসিন্ধু'- ইহা একটী বৈষ্ণব স্মৃতি নিবন্ধ। (২) অষ্টাদশ লহরীতে সম্পূর্ণ 'কমলোদয়' কাব্য। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে আলোচিত পুরাণ, আগম প্রভৃতির একটী ক্ষুদ্র তালিকা দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'বিশ্বানন্দ' 'জয়ষষ্টি' 'আগমচন্দ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থও তাঁহার রচিত।

কৃষ্ণমোহন দাস—ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগের অন্যতম সংবাদ পত্র পরিচালক। ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে তিনি কলিকাতা নগরে "সম্বাদ তিমির নাশক" নামক পত্রিকা প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। পরবর্ত্তী কার্ত্তিক মাসে (বাং ১২৩০) ইহা প্রকাশিত হয়। ইহা ১২৩৭ সাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিল বলিয়া, উদার মতাবলম্বীদিগকে গালাগালি করাই ঐ পত্রিকার প্রধান কাজ ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় (রেভা-রেণ্ড, ডাক্তার) — বিখ্যাত বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক, সাহিত্যিক ও বক্তা। ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে (১২২০ বঙ্গাব্দে) কলিকাতার অন্তর্গত শ্যামপুকুরে মাতুল গৃহে কৃষ্ণমোহনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতার আর্থিক অসচ্ছলতা বশতঃ কৃষ্ণমোহন মাতুলালয়ে অবস্থান করিয়াই বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রথমে

হেয়ার স্কুল ও পরে হিন্দু কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। হিন্দু কলেজের তৎকালীন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডিরোজিওর (DeRozario) শিক্ষা ও চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া, কৃষ্ণমোহন হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস হারান। ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যু হইলে, তিনি হেয়ার স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ইহার অনতিকাল পরেই গৃহ হইতে বহিস্কৃত হইয়া, দক্ষিনারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে বিখ্যাত খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক ডফ (Alexander Duff) সাহেবের নিকট তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের চারিবৎসর পরে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বামীর অবলম্বিত ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং পাঁচ বৎসরের পর কৃষ্ণ-মোহন আচার্য্য নিযুক্ত হন। দীর্ঘ পনর বৎসর যাবৎ তিনি উক্ত পদে অধিষ্টিত ছিলেন। তাঁহারই কর্ম্মক্ষেত্র রূপে ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও মানিকতলার সংযোগ স্থলে এক ভজনালয় নির্ম্মিত হয়। উহা 'কৃষ্ণ বন্দ্যো'র গির্জ্জা নামে প্রসিদ্ধ। অতঃপর ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে কৃষ্ণ মোহন বিশপস্ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং যোগ্যতার সহিত দশ বৎসর অধ্যাপনা কার্য্য পরিচালন করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারত সভার সভাপতি পদে বৃত, ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে নাগরিকগণের পক্ষ হইতে কলিকাতা পুরতন্ত্রের (Municipality) প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

কৃষ্ণমোহন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত, হিন্দী, তামিল ও উড়িয়া ভাষার পরীক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বার্থ সংগ্রহ, পঞ্চরাত্র, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি হিন্দু দর্শন শাস্ত্র এবং কালিদাসের কতিপয় কাব্য ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। এই সকল ভারতীয় ভাষা ব্যতীত তিনি ইংরাজী, ল্যাটিন, গ্রীক্, আরবী, ফার্শী প্রভৃতি বিদেশী ভাষায়ও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি অনেকগুলি ইংরাজী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন এবং নিজেও একখানি বাঙ্গালা ও একখানি ইংরাজী পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি, এল্ (Doctor of Laws) ও সরকার বাহাদুর সি, আই, ই, (C. I. E.) উপাধি প্রদান করেন।

কৃষ্ণমোহনের দুই কন্যার মধ্যে প্রথমার সহিত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্র মোহনের ঠাকুরের বিবাহ হয়, (তিনিই জ্ঞানেন্দ্র মোহনকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।) অপরা কন্যা মনোমোহিনী, হুইলার নামক একজন পাদ্রীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, কৃষ্ণমোহনের হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রাদির প্রতি কোনও বিরুদ্ধ ভাব ছিল না। বরঞ্চ তিনি পুরাণাদি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধাদি অনেক সাধারণ সভায় পাঠ করিতেন।

এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে যাঁহারা প্রথম উৎসাহী ছিলেন কৃষ্ণমোহন তাঁহাদেব অন্যতম। ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে বীটন সাহেব যখন কয়েক জন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীদের সহায়তায় দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন, তখন তিনি নানা ভাবে তাঁহার পোষকতা করেন।

সুবিখ্যাত এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার (Encyclopædia Britanica) অনুকরণে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় একখানি মহাকোষ সংকলন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অধিক দূর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'রিফর্ম্মার' (Reformer) নামক পত্রিকার সহিত প্রতিযোগীতা করিয়া তিনি ইঙ্কোয়ারার (Inquirer) নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তৎপূর্ব্বে পার্থিয়ন (Parthion) ও হেস্‌পারাস (Hasperous) প্রভৃতি পত্রিকায়ও তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। উক্ত পত্রিকায় হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি বিদ্বেষসূচক প্রবন্ধাধি প্রকাশিত হইত।

তিনি 'সর্ব্বার্থ সংগ্রহ' নামে একখানি দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন (১৮৪৫ খ্রীঃ)। তাহাতে মহাপুরুষদের জীবনী, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, প্রাচীন কাহিনী প্রভৃতি প্রকাশিত হইত। ঐ পত্রিকা সম্পাদনেই তাঁহার বিবিধ শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় নানা বিষয়ে এইরূপ অসাধারণ পণ্ডিত বাঙ্গালীর মধ্যে অধিক জন্মগ্রহণ করেন নাই। ১২৯২ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে বাহাত্তর বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য—জনৈক কবি ও সঙ্গীত রচয়িতা। তিনি অর্থের বিনিময়ে ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর প্রমুখ কবিওয়ালাগণের জন্য সঙ্গীত রচনা করিতেন। এতদ্ভিন্ন বৈষ্ণব সঙ্গীত তাঁহার রচনার বিষয় ছিল। কৃষ্ণমোহন বিখ্যাত কবি. সঙ্গীত রচয়িতা ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী ও গদাধর মুখোপাধ্যায়ের সমসাময়িক ছিলেন।

কৃষ্ণমোহন মজুদার—ইনি ধর্ম্ম এবং অধ্যাত্ম বিষয়ে বিবিধ সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করিয়া বিখ্যাত হন। তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের এক জন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার ব্রহ্মসভার জন্য বহু গভীর ভাবপূর্ণ ধর্ম্ম সঙ্গীতরচনা করেন। তাঁহার রচিত

সঙ্গীতসমূহ বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। কৃষ্ণমোহনের ইংরাজী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায়ও বিলক্ষণ অধিকার ছিল। কলিকাতা যোড়া-সাঁকো ও পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুর পরিবার ও বহু সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তির নিকট হইতে তাঁহার নিয়মিত মাসহারার বন্দোবস্ত ছিল।

কৃষ্ণমোহন মল্লিক—ইনি ১৮০১ খ্রীঃ অব্দে চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণমোহন ইংরাজী ভাষায় চন্দননগরের প্রাচীনতম লেখক। তাঁহার অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি গভীর চিন্তা ও গবেষণার পরিচায়ক। তাঁহার সময়ে ক্রমশঃ লুপ্ত-প্রায় দেশীয় শর্করা শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহাউসী (Lord Dalhousie) ভূয়সী প্রশংসা করেন ও উহা মুদ্রিত করিবার অনুমতি দেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত ম্যান্‌চেষ্টারের সুলভ বস্ত্র ও আমাদের বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ, রৌপ্য মুদ্রা বিনিময়ে আমাদের ক্ষতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত ও গবেষণাপূর্ণ। তিনি দুই খণ্ডে, Brief History of Bengal Commerce নামক পুস্তক রচনা করেন। তিনি ভারত সরকারের জুডিসিয়াল সেক্রেটারীর (Judicial Secretary) অধীনে কাজ করিতেন। 'মুখার্জ্জি ম্যাগাজিন' নামক পত্রিকার তিনি একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি পর-লোক গমন করেন।

কৃষ্ণভট যোগী.— ১১২৫ খ্রীঃ অব্দে, দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের রাজত্ব কালে কৃষ্ণভট 'মানভাব' বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। কথিত আছে তাঁহারা অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া কুলস্ত্রীর সতীত্ব নাশ করিতে আরম্ভ করিলে, রাজা রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে অতিশয় শাস্তি দেন। বেরার প্রদেশে, নরমঠ, নারায়ণমঠ, রেষিমঠ, প্রবরমঠ ও প্রকাশমঠ নামে তাঁহাদের প্রধান পাঁচটী মঠ আছে। দত্তাত্রেয় প্রণীত কৃষ্ণচরিতামৃত, ভগবদ্‌গীতা, নিমনিধি, লীলামৃতসিন্ধু, বাললীলা, গোপীবিলাস, রুক্মিণীস্বয়ম্বর প্রভৃতি তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ।

কৃষ্ণযজ্ব—তিনি 'মীমাংসা পরিভাষা' নামে একখানা প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণযাদব—তিনি দেবগিরির যাদব বংশীয় নরপতি সিজ্ঘনের পৌত্র। ১২৪৭ খ্রীঃ অব্দে সিজ্ঘনের মৃত্যুর পরে তিনি পিতামহের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি হয়শাল, গুর্জ্জর ও মালব রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া ছিলেন। ১২৬০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরে, তাঁহার ভ্রাতা মহাদেব

রাজা হইয়া ১২৭১ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে কৃষ্ণের পুত্র রামদেব ১২৭১—১২৯৪ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই রামদেবকেই আলাউদ্দিন খিলিজী পরাস্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করেন।

কৃষ্ণরাজ—তিনি ধার নগরের প্রমার বংশীয় প্রথম স্বাধীন নরপতি। তিনি প্রথমে কণৌজের প্রতীহার বংশীয় নরপতিদের সামন্ত নরপতি ছিলেন। প্রতীহার বংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। প্রমার বংশের প্রাচীন ইতিহাস এই যে তাঁহারা রাজপুতানার অগ্নিকুলেব একটী শাখা। তাঁহারা মাহেশ্বতী নগরীতে সর্ব্ব প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পরবর্ত্তী সময়ে বিন্ধ্য মেরুর শৃঙ্গ দেশে ধারা ও মান্দু নামে দুইটী নগর স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত চিতোর, উজ্জয়িনী, চন্দ্রভাগা, আবু, চন্দ্রবতী, মৌ, মৈদান, প্রমারবতী, বিথার, লোদুর্ব্বা ও পত্তন প্রভৃতি নগর তাঁহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। রাম নামে প্রমার কুলে একজন সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। গিহলোট বংশের উন্নতির সময়ে প্রমার বংশের ক্ষমতা অনেক হ্রাস পাইয়াছিল। তৎপরে কৃষ্ণরাজের সময়ে তাঁহাদের ক্ষমতা আবার বৃদ্ধি পায়। কৃষ্ণরাজ খুব সম্ভব ৯১৪—৯৩৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে বৈরসিংহ (বজ্রট) ৯৩৪—৯৫৪ সাল, ৯৫৪—৯৭৩, বাকপতি (মুঞ্জ) ৯৭৩—৯৯৭ সিন্ধুরাজ (কুঞ্জ) ৯৯৭—১০১০, এবং ভোজ ১০১০ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই ভোজ নরপতিই অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।

কৃষ্ণরাজ প্রথম—তাঁহার সম্পূর্ণ নাম কৃষ্ণরাজ অকালবর্ষ। তিনি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকুট বংশীয় নরপতি প্রথম কর্কের পুত্র। তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুত্র দন্তীদুর্গ অনপত্য অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, ৭৫৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজ্য লাভ করেন। তিনি চালুক্যদিগকে বিশেষ রূপে পরাজিত করিয়াছিলেন। এলাপুরের (বেরুল বা এলোরা) বিখ্যাত শিবমন্দির তাঁহারই আদেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার নির্ম্মাণ প্রণালী এমনই মনোমুগ্ধকর যে, উহা দর্শন করিবার জন্য শত শত লোক ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে আসিয়া থাকেন। কৃষ্ণরাজের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র গোবিন্দ (দ্বিতীয়) ৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে রাজা হন।

কৃষ্ণরাজ দ্বিতীয় — তাঁহার সম্পূর্ণ নাম—কৃষ্ণরাজ শুভতুঙ্গ প্রথম অকালবর্ষ। তিনি রাষ্ট্রকুটবংশীয় নরপতি সর্ব্বনৃপতুঙ্গ প্রথম অমোঘবর্ষের পুত্র। তিনি ৮৭৫—৯১১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পৌত্র তৃতীয় ইন্দ্র নিত্যবর্ষ রাজা হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণরাজ তৃতীয়—তাঁহার সম্পূর্ণ নাম কৃষ্ণরাজ অকাল বর্ষ। তিনি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশীয় নরপতি তৃতীয় অমোঘবর্ষের পুত্র। ৯৪০—৯৬৮ খ্রীঃ অব্দে পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তিনি একজন পরাক্রান্ত সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত তাঁহার পদানত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা খোত্তিগ রাজা হন।

কৃষ্ণরাম (কিষণ রাম)—জয়পুরাধিপতি মহারাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে আনীত শিলাদেবীর পুরোহিত রত্নগর্ভ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জামাতা, রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পৌত্র এবং জয়পুরাধিপতি মহারাজ সওয়াই জয়সিংহের প্রধান মন্ত্রী বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তীর মাতুল। ভাগিনেয় বিদ্যাধর মহারাজের প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিবার পূর্ব্ব হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি মহারাজের দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কৃষ্ণরাম দত্ত--তিনি রাধিকা মঙ্গল নামক একখানা কাব্য লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থে কৃষ্ণ মথুরাপুরী গমন করিলে, বৃন্দাবনস্থ তাঁহার সখা ও সখীগণের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। শেষ অংশে নন্দ, যশোদা প্রভৃতির মথুরায় আগমন বিবৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা দুইশত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত।

কৃষ্ণরাম দাস—অনুমান ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী নিমতার কায়স্থ কুলে কৃষ্ণরামের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ভগবতী দাস।

কৃষ্ণরাম 'দক্ষিণ রায়ের উপাখ্যান' বা 'রায়মঙ্গল' 'বিদ্যাসুন্দর' বা 'কালিকা মঙ্গল' 'অশ্বমেধ পর্ব্ব' ও 'ভজন মালিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। কথিত আছে সুন্দরবনের ব্যাঘ্রভয় নাশক দেবতা দক্ষিণরায় কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া কৃষ্ণরাম তাঁহার মাহাত্ম্য প্রচার উদ্দেশ্যে রায়মঙ্গল রচনা করেন। বিদ্যা ও সুন্দরের কাহিনী অবলম্বন পূর্ব্বক যাঁহারা আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছিলেন. কৃষ্ণরাম তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম। ভারতচন্দ্রের সুবিখ্যাত বিদ্যাসুন্দর রচনার প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে, তাঁহার কালিকামঙ্গল রচিত হয়। শেষ জীবনে কৃষ্ণরাম শ্রীচৈতন্যদেবের একজন অনুরাগী ভক্ত হন।

কৃষ্ণরাম ন্যায়পঞ্চানন — নদিয়া জিলার অন্তর্গত উলা বা বীরনগরের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে স্বীয় নামাঙ্কিত এক পতাকা উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় আবাস স্থলের এক উচ্চ স্থানে ইহা স্থাপন করিয়া গৌরব অনুভব করিতেন।

কৃষ্ণরাম বসু — হুগলী জেলার অন্তর্গত তড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম দয়ারাম বসু। প্রথমে কলিকাতায় লবণের ব্যবসায় ও পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে হুগলীর দেওয়ানী করিয়া তিনি বিপুল বিত্তের অধিকারী হন। বঙ্গদেশ ভিন্ন কাশী, কটক, পুরী, ভাগলপুর প্রভৃতি বঙ্গের বাহিরে বহুস্থানে দান ও জনহিত-কর কার্য্যের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীরামপুরের মাহেশের রথ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বগ্রাম তড়া হইতে মথুরাবাটী পর্য্যন্ত একটী পথ নির্ম্মাণ করান; তাঁহার নাম অনুসারে উক্ত পথ কৃষ্ণজাঙ্গাল নামে পরিচিত। তীর্থ যাত্রীদের পথক্লেশ প্রশমনের জন্য তিনি পুরী হইতে কটক পর্যান্ত প্রায় বিংশ ক্রোশ পরিমিত পথের উভয় পার্শ্বে আম্র বৃক্ষশ্রেণী রোপণ করাইয়া উহাকে ছায়াশীতল করেন এবং তীর্থযাত্রীগণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য পুরীর বাহিরে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করান। পুরীতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথ নির্ম্মাণ তাঁহার অপর কীর্ত্তি, এই রথের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তিনি বহু টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। ভাগলপুরের সন্নিকটে গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিত এক পর্ব্বতের উপর তিনি এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী জীবনে তিনি কাশীবাসী হন। সেখানেও তিনি বহু শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

কৃষ্ণরামের পুত্র রামপ্রসাদ এক-জন সাধক ও সুকবি ছিলেন। রাম-প্রসাদের পুত্র সাধু রামগতি (লালা রামগতি) পঞ্চাশ বৎসর বয়সে যোগা-ভ্যাস মানসে কাশীবাসী হইয়া নব্বই বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী মণিকর্ণিকা ঘাটে স্বামীর চিতায় প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার সহ-গমন করেন। রামগতি 'মায়া তিমির চন্দ্রিকা' 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। তাঁহার কন্যা আনন্দময়ীও অসাধারণ বিদুষী ও কবিত্বশক্তিশালিনী ছিলেন।

কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য, ন্যায়বাগীশ— এই বিখ্যাত পণ্ডিতের পূর্ব্ব নিবাস নদিয়া জিলার অন্তর্গত শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী মালীপোতা গ্রামে ছিল। আসাম প্রদেশের আহম বংশীয় নরপতি রুদ্রসিংহ, হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানাদি করিতে অভিলাষী হইয়া (১৬৯৬—১৭১৪ খ্রীঃ অঃ) তাঁহাকে বঙ্গদেশ হইতে আনয়নপূর্ব্বক কামরূপে প্রচুর বৃত্তি ও ভূমি প্রদান করিয়া স্থাপন করেন এবং স্বয়ং তাঁহার নিকট শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কামাখ্যা দেবীর মন্দির রক্ষার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। রাজা রুদ্রসিংহের মৃত্যুর

পরে, তাঁহার পুত্র শিবসিংহও তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। আসাম প্রদেশের প্রায় সমস্ত শাক্ত তাঁহার শিষ্য। তাঁহার বংশধরেরা পার্ব্বতীয়া গোসাই নামে খ্যাত। এমন এক সময় ছিল, যখন বহু অহিন্দু হিন্দু সমাজে আশ্রয় লাভ করিয়া, সমাজদেহের পুষ্টি সাধনা করিয়াছিল।

কৃষ্ণরাম রায় — তিনি বর্ত্তমান বর্দ্ধমান রাজাদেরই পূর্ব্বপুরুষ। তিনি ঘনশ্যাম রায়ের পুত্র। দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীবের নিকট তিনি প্রথম সনন্দ ও রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৬৯৭ খ্রীঃ অব্দে চিতুয়াবরদার জমিদার শোভাসিংহ, রহিম খাঁর সহিত মিলিত হইয়া বর্দ্ধমান আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধে কৃষ্ণরাম রায় নিহিত হন। তাঁহার পুত্র জগৎরাম ১৭০২ খ্রীঃ অব্দে দ্বিতীয় সনন্দ পাইয়াছিলেন। জগৎরাম রায় দেখ।

কৃষ্ণরাম রায়, রাজা — তিনি যশোহরের অন্তর্গত চাচড়ার জমিদার মনোহর রায়ের পুত্র। ১৭০৫ খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যুর পরে জমিদারী প্রাপ্ত হন। তিনি অতিশয় কর্ম্মঠ ক্ষমতাশালী জমিদার ছিলেন। তিনি পৈত্রিক জমিদারী অনেক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৭২৯ খ্রীঃ অব্দে রাজা কৃষ্ণরাম রায় পরলোক গমন করিলে, শুকদেব রায় রাজা হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণরাম সেন—বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত গোড়াগাছা গ্রাম নিবাসী দুর্গাদাস সেন রুনসী নিবাসী পাহিদাস বংশীয় হরেকৃষ্ণ রায়ের ভগিনীকে বিবাহ করিয়া, হরেকৃষ্ণের সহায়তায় মৈমনসিংহের অন্তঃপাতী কীর্ত্তিপাশায় বসতি স্থাপন করেন। ইনি কীর্ত্তিপাশার জমিদার বংশের আদি পুরুষ। দুর্গাদাসের পুত্র চিকিৎসা ব্যবসায়ে কৃতবিদ্য রামজীবন সেন। রামজীবনের দুই পুত্র রামগোপাল ও রামেশ্বর। রামগোপালের পুত্র রামকেশব, তৎপুত্র রামগতি, তৎপুত্র রাজকৃষ্ণ। রাজকৃষ্ণের পুত্র রঘুনাথ সেন রায় কান্দির রাজসরকারের কর্ম্ম করিয়া অর্থ ও জমিদারী লাভে সমর্থ হন। রঘুনাথের দুই পুত্র চন্দ্রনাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র।

রামজীবনের কনিষ্ঠ পুত্র রামেশ্বরের চারি পুত্র—কাশীরাম, কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম ও বলরাম ইঁহাদের প্রথমোক্ত তিন সহোদর ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের অধীনে কার্য্য করিতেন।

কাশীরামের পুত্র হরেকৃষ্ণ, তৎপুত্র রামকিশোর, তৎপুত্র বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক কৃষ্ণমোহন। তাঁহার পুত্র কাশীচন্দ্র। কাশীচন্দ্রের পুত্র কালীপ্রসন্ন।

রামেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণরাম ১৬৮৮ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা জয়নারায়ণের দেওয়ানের

কার্য্য করিতেন। বর্গীর হাঙ্গামায় রাজা জয়নারায়ণ বাকী খাজনা দিতে অসমর্থ হইলে, বাঙ্গলার নবাব আলীবর্দ্দীর আদেশে ঢাকার শাসনকর্ত্তা মোহাম্মদ রেজাকে ও পরে তাঁহার পরিবর্ত্তে তাঁহার দেওয়ান কৃষ্ণরামকে বন্দী করেন। কিন্তু তাঁহার প্রভুভক্তি ও অন্য সদগুণাবলী দর্শনে নবাব এতই মুগ্ধ হইয়া ছিলেন যে, তাঁহাকে মুক্তি দিয়া তাঁহার প্রভুর জমিদারী প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ দেন। রাজা জয়নারায়ণ তদীয় দেওয়ানের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার পুত্রের নামে এক বৃহৎ জমিদারী প্রদান করেন। ইহা ভিন্ন কৃষ্ণরাম নবাব সরকার হইতে মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি কীর্ত্তিপাশার জমিদার বংশ মজুমদার বাড়ী নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে। কৃষ্ণরাম ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল ছিলেন। অসাধারণ বুদ্ধি বলে বিপুল ভূসম্পত্তি, অর্থ ও যশের অধিকারী হন এবং বহু অর্থ সৎপাত্রে দান করেন। ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দে দেওয়ান কৃষ্ণরাম পরলোক গমন করেন। তাহার এক পুত্র রাজারাম ও এক কন্যা জয়মালা বর্ত্তমান ছিল।

কৃষ্ণরায়— তিনি বিজয়নগরের তুলব বংশীয় নরপতি। তিনি ১৫০৯-১৫২৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বলিতে গেলে তিনিই এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়েই বিজয়নগর রাজ্য সর্ব্বোচ্চ গৌরব লাভ করিয়াছিল। বাহমনি রাজ্যের ধ্বংসের পরে দাক্ষিণাত্যে পাঁচটী মুসলমান রাজ্যের উদ্ভব হয়। (১) বিজাপুরে আদিলশাহী, (২) আহাম্মদ নগরের নিজাম শাহী, (৩)বেরারের ইমাদ শাহী, (৪) গোলকুণ্ডার কুতুব শাহী ও (৫) বিদরের বারিদ শাহী। তন্মধ্যে বিজাপুরই সকলের শ্রেষ্ঠ ছিল। কৃষ্ণরায় এই বিজাপুরের নবাবকে পরাস্ত করিয়া, বিজাপুর নগর পর্য্যন্ত অধিকার করেন। বাহমনি রাজ্যের গুলবর্গ নগরও একবার অধিকার করিয়া তথাকার দুর্গ নষ্ট করেন। কৃষ্ণরায় যেমন সেই সময়ে একজন অসাধারণ বীর ছিলেন, তেমনই একজন বীরোচিত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিও ছিলেন। সেই সময়ে পরাজিত শত্রুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল। কৃষ্ণরায় পরাজিত শত্রুর প্রতি কখনও নিষ্ঠুরাচরণ করিতেন না। তিনি বিদ্যোৎসাহী, দানশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার রাজ্যসীমা বর্ত্তমান মাদ্রাজ বিভাগের প্রায় সমস্ত ও মহীশূর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য তাঁহার রাজ্যান্তর্গত ছিল। কৃষ্ণরায়ের পরবর্ত্তী বংশধরেরা যোগ্যব্যক্তি ছিলেন না। সদাশিব রায়ের সময়ে ১৫৬৫ খ্রীঃ অব্দে তালিকোটার যুদ্ধে এই রাজ্য একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আনেগুন্দির বর্ত্তমান রাজারা বিজয়নগরের রাজাদেরই বংশধর।

কৃষ্ণলাল দত্ত—প্রসিদ্ধ হিসাবতত্ত্ববিদ্ বাঙ্গালীর রাজকর্ম্মচারী। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে যশোহর জিলার অন্তর্গত নড়াইলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দ্বারিকানাথ দত্ত। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে তিনি অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার পূর্ব্বক ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হরিশ্চন্দ্র স্মৃতি-পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উক্ত কলেজ হইতে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সেই বৎসরই ভারত সরকারের অধীনে কনট্রোলার জেনারেলের (Comptroller General) আফিসে মাত্র পঞ্চাশ টাকা বেতনে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর স্বীয় প্রতিভা এবং কর্ম্মদক্ষতা গুণে দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে করিতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এসিষ্ট্যাণ্ট কনট্রোলার জেনারেলের (Assistant Comptroller General) পদপ্রাপ্ত হন। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল হইতে ১৯০২ খ্রীঃ অব্দ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিনি মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের হিসাব পরীক্ষক ছিলেন। ঐ সময় তিনি মাদ্রাজ প্রদেশের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির জন্য এক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের হিসাব রাখার প্রণালী প্রবর্ত্তন করেন এবং অন্যান্য সমস্ত প্রদেশে পূর্ব্বেই তিনি 'মিউনিসিপ্যাল একাউন্টস কোড' (Municipal Accounts Code) প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎপর তাঁহাকে পুনরায় ভারত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। ১৯০৩ হইতে ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরই তিনি ভারত সরকারের বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবার ভার প্রাপ্ত হইতেন। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে এপ্রিল মাসে তাঁহাকে ডাকঘর সমূহের সর্ব্বাধ্যক্ষ (Controller) নিযুক্ত করা হয়। ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি ডাক বিভাগের হিসাব রাখার ও হিসাব পরীক্ষার সহজ প্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষভাবে ভার প্রাপ্ত হন। ১৯১০ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রধান হিসাব-রক্ষকের (Accountant General) পদ প্রাপ্ত হন এবং সেই সময়ই তাঁহাকে ভারতবর্ষের দ্রব্যাদির মূল্য-বৃদ্ধি সম্বন্ধে তদন্ত কার্য্য পরিচালনার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হয়। তদানীন্তন অর্থ-সচিব সার গায়্ ফ্লিটউড উইলসন (Sir Guy Fleetwood Wilson) তাঁহাকে অর্থবিভাগের যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৯১৩ সালে তিনি মাদ্রাজের প্রধান হিসাব-রক্ষক (Accountant General) হন এবং ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তৎপর ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দে ভারত গবর্ণমেণ্টের সুপারিশ-ক্রমে মহীশূর সরকার তাঁহাকে রাজস্ব

সম্বন্ধীয় বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। তিনি ঐ কার্য্যে পনর মাস নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সময় মহীশূর সরকারের আর্থিক বিধিব্যবস্থা প্রণালী সম্পূর্ণ নূতনভাবে গড়িয়া তুলিয়া তিনি যে ব্যবস্থা প্রদান করেন মহীশূর সরকার তাহার উচ্চ প্রশংসা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার সার ল্যান্সলট সাণ্ডারসনের (Sir Lancelot Sanderson) অনুরোধক্রমে ১৯১৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের (Registrar) পদ গ্রহণ করেন। উক্ত পদে তিনি প্রায় দুই বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরূপে ভারতীয় মুদ্রানীতি সম্পর্কে নিযুক্ত রয়েল কমিশনের (Royal Commission on India Currency.) সমক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে ভারত সরকার তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। পরে পাতিয়ালা রাজ্যের আর্থিক অবস্থার সুব্যবস্থার করিবার জন্য পাতিয়ালার মহারাজা তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু কয়েক মাস পরে তিনি ঐ পদ ত্যাগ করেন। কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিতও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কিছুকাল কলিকাতা কর্পোরেশনের সরকারী মনোনীত সদস্য ছিলেন। হিন্দু ফ্যামিলি এ্যানুইটি ফণ্ডের (Hindu Family Annuity Fund) অবস্থা একবার অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে। তিনি উহার কর্ম্মাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া আমূল সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একজন ট্রাষ্টি (Trustee) ছিলেন।

কৃষ্ণলাল বসাক—বাঙ্গালী ব্যায়ামবীর। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার আহিরীটোলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়স হইতেই ব্যায়ামে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ জন্মে এবং অল্পকাল মধ্যেই তিনি ঐ বিষয় পারদর্শিতা লাভ করেন। মাত্র সতের বৎসর বয়স হইতেই তিনি বিভিন্ন ইয়োরোপীয় পরিচালিত সার্কাস দলে ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারীনগরের আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীতে ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া, বিশেষ সম্মান লাভ করেন। পরবর্ত্তীকালে দেশ প্রসিদ্ধ নেতা এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী মতিলাল নেহরু তাহাকে তথায় লইয়া যান। বিভিন্ন সার্কাস দলের সঙ্গে তিনি পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করেন। পরে নিজেও একটি সার্কাসের দল গঠন করেন। উহা প্রথমে গ্রেট ইষ্টার্ণ (Great Eastern) ও পরে হিপোড্রোম (Hippodrome) নামে

পরিচিত ছিল। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের (১৯৩৫ খ্রীঃ অক্টোবর) কার্ত্তিক মাসে কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে তিনি পরলোক গমন করেন।

কৃষ্ণশর্ম্মা—তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—'মকরন্দ অভিনব তামরস'।

কৃষ্ণশাত বাহন—তিনি দাক্ষিণাত্যের শাতবাহন বংশীয় একজন নরপতি ছিলেন। সম্ভবত এই বংশ খ্রীঃ পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিল। এই বংশের কৃষ্ণ, সিমুক, শ্রীশাতকর্ণী ও গৌতমীপুত্র এই চারিটী নাম মাত্র পাওয়া গিয়াছে। সিমুকের পরে তাহার ভ্রাতা কৃষ্ণ রাজা হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণশাস্ত্রী চিপ্‌লুনকার — মারাঠা সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দে পুনা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। প্রথমে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। পরে ইংরেজী শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তিনি ভালরূপে ইংরেজী শিক্ষা করেন।

তিনি কিছুকাল পুনা কলেজে মারাঠি ভাষার অধ্যাপকের কাজ করেন। পরে পুনা ট্রেনিং কলেজের (Training College) অধ্যক্ষ হন। তিনি কিছুকাল দেশীয় সংবাদ পত্র সমূহের মতামত সংগ্রাহকের পদেও নিযুক্ত ছিলেন। ঐ পদ বর্ত্তমানকালের সরকারী অনুবাদকের কাজের তুল্য ছিল। তিনি ইংরেজী ও সংস্কৃত হইতে অনেক গ্রন্থ মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করেন। 'শালাপত্রক' নামক একখানি মারাঠি পত্রিকা সম্পাদনও করেন।

১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণহরি দাস—তাঁহার জন্ম স্থান রংপুরের অন্তর্গত মহীসুর গ্রামে। তিনি জাতিতে রাজবংশী ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম পক্ষিনী। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি উপনিষদের ভাব অবলম্বন করিয়া হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সত্য-পীরের গান, জঙ্গনামা, নচিনামা প্রভৃতি গ্রন্থে সেই ভাবই প্রচার করিয়াছেন। তিনি বহু পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণাচার্য্য—(১) তিনি একজন বৌদ্ধ তান্ত্রিক। খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—সম্পুট তিলক।

কৃষ্ণাচার্য্য—(২) 'যোগরত্ন মালা' নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত। এই গ্রন্থ এক্ষণে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

কৃষ্ণানন্দ— এই কবির রচিত এক-খানা 'মনসার ভাসান' পাওয়া গিয়াছে। 'কদ্রুবিনতা সংবাদ' নামক গ্রন্থ রচয়িতা আর এক কৃষ্ণানন্দ ছিলেন। এই উভয়ই এক ব্যক্তি কি না বলা সহজ নহে।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ — এই অসাধারণ পণ্ডিত খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে নবদ্বীপে বর্ত্তমান ছিলেন। তন্ত্রের পঞ্চ মকারের (মৎস্য, মাংস, মদ্য, মৈথুন ও মুদ্রা) প্রাদুর্ভাব-কালে তিনি আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম মহেশ্বর গৌড়াচার্য্য এবং কনিষ্ঠভ্রাতার নাম মাধবানন্দ সহস্রাক্ষ। মাধবানন্দ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বর্ত্তমান কালের নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন তাঁহারই বংশধর। তান্ত্রিক ব্যভিচার হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য, তিনি তন্ত্র-সার নামে একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, দেশ হইতে বহু পরিমাণে তান্ত্রিক ব্যভিচার দূরীভূত হয়। বর্ত্তমান সময়ে যে কালী মূর্ত্তির পূজা হয়, তাহা আগম বাগীশ কর্ত্তৃকই প্রচারিত হইয়াছিল। কৃষ্ণানন্দের পৌত্র গোপাল 'তন্ত্র-দীপিকা' নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই বংশে অনেক পণ্ডিত ও সাধক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

কৃষ্ণানন্দ তীর্থ (আচার্য্য অচ্যুত) — একজন অদ্বৈত বাদী বৈদান্তিক। তিনি 'কৃষ্ণালঙ্কার' নামে অপ্পয় দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্তলেশের' টীকা ও 'বনমালা' নামে তৈত্তিরীয় উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্যের টীকা প্রণয়ন করেন। কাবেরী তীরবর্ত্তী নীলকণ্ঠেশ্বর কৃষ্ণানন্দের আবির্ভাব স্থান এবং স্বয়ং প্রকাশানন্দ সরস্বতী কৃষ্ণানন্দের শিক্ষাগুরু ছিলেন। কৃষ্ণানন্দ অতিশয় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। অদ্বৈতদর্শনে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁহার রচিত টীকাদ্বয় তাঁহার সূক্ষ্ম দার্শনিক দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। এত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও কৃষ্ণানন্দের চরিত্রে অভিমানের লেশমাত্র ছিল না।

কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি— (১) তিনি কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭২৮— ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দ) অন্যতম সভা-পণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল।

কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি—(২) নদিয়া জিলার চাপিলা গ্রামের অধিবাসী। তিনি একজন অসাধারণ জ্যোতিষী ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধা রাণীভবানী একটী পুরশ্চরণ উপলক্ষে গ্রহণ গনণায় আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া, পুরস্কার স্বরূপ প্রচুর ব্রহ্মত্র ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণানন্দ ব্যাস রাগসাগর— সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের আশ্রয়েই পালিত হইয়া ছিলেন এবং রাজা বাহাদুরই তাঁহার সঙ্গীত নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 'রাগ সাগর' উপাধি দেন। রাজবাটীতে সঙ্গীতের আলোচনা সভায় তিনিই মীমাংসক হইতেন। রাজা রাধাকান্ত

দেব বাহাদুরের শব্দ কল্পদ্রুমের অনুকরণে কৃষ্ণানন্দ 'রাগ কল্পদ্রুম' নামে সঙ্গীত শাস্ত্রের এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ইহাতে বিবিধ রাগ রাগিনীর বিবরণ এবং সেই সকল রাগ রাগিণীর সংগীত সন্নিবিষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গলা, হিন্দি, কর্ণাটী, মারহাঠী, গুজরাতি, উড়িয়া, আরবী, ফারসী, ইংরেজী প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় বহু সংগীত সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহা প্রকাণ্ড তিন খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে ইহা প্রথম মুদ্রিত হয়।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী—(১)'কাকচণ্ডেশ্বরীতন্ত্র' নামক গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। ১২৫৬ বঙ্গাব্দে এই গ্রন্থ কাশী নগরীতে লিখিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণানন্দব্রহ্মচারী—(২)তিনি একজন তান্ত্রিক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী। তাঁহার জন্মস্থান হাওড়া জিলায়। আজীবন কুমার থাকিয়া তিনি তন্ত্রোক্ত সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের বিশেষতঃ উত্তর ভারতের সমুদয় তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও বিশেষ কর্ম্মী ছিলেন। ভারতের বহুতীর্থ স্থানে বাঙ্গালীরা সচরাচর আশ্রয় পাইত না। এই অবস্থা দর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয়। তিনি অদম্য উৎসাহে এই অবস্থার প্রতীকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, রাজপুতানা, পাঞ্জাব, বেলুচিস্থান, হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশ প্রভৃতি বহুস্থানে তিনি ৩২টী কালীবাড়ী স্থাপন করিয়া বাঙ্গালী ও অপরের থাকিবার ও তীর্থভ্রমণের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার বিশেষ চেষ্টায় পাঞ্জাবে তান্ত্রিক মত প্রচার লাভ করে। তাঁহার জন্ম ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দে। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে প্রয়াগতীর্থে ৯২ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী — এই দার্শনিক পণ্ডিত জৈমিনী সূত্রের কারিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণানন্দ স্বামী—প্রবাসী বাঙ্গালী সন্ন্যাসী। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনগুপ্ত। হুগলী জিলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ায় তাঁহার নিবাস ছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ও চিন্তাশীল ছিলেন। পঠদ্দশায় তিনি সুললিত কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিয়া প্রশংসা লাভ করেন। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়েতে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং কার্য্য ব্যপদেশে জামালপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। ঐ সকল স্থানে তিনি সর্ব্বদাই প্রবাসী বাঙ্গালীদের ধর্ম্ম ও নৈতিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট থাকিতেন। সন্ন্যাসাশ্রম

গ্রহণ করিয়া, তিনি কাশীতে অবস্থান করেন। সন্ন্যাস জীবনে তিনি বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও ভক্তিরসাত্মক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'গীতার্থ-সন্দিপনী' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সুললিত ও বিশদ ব্যাখ্যা, 'ভক্তি ও ভক্ত' নামক সাধু মহাত্মাদের জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থ সাধারণে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-মাসে তিনি কাশীধামে স্ব-প্রতিষ্ঠিত যোগাশ্রমে দেহরক্ষা করেন।

কৃষ্ণানন্দাচার্য্য — তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। তিনি শ্রীনিবাস কৃত শুদ্ধিদীপিকার 'প্রভা' নামে এক টীকা রচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণেন্দ্র রায়, রাজা — তিনি রাজসাহির অন্তর্গত বলিহারের রাজা ছিলেন। তিনি অতিশয় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। বিবিধ সঙ্গীত, কবিতা, ও নীতি বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। বাঙ্গালা ১৩০৫ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

কেতকাদাস—ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাস রচিত মনসার ভাসান অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থের নামেই বুঝা যায়, ইহা মনসা দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারার্থ লিখিত। কবিদ্বয়ের জন্মস্থান বর্দ্ধমান অথবা হুগলীতে ছিল। কারণ এই গ্রন্থে উল্লিখিত বহু গ্রাম্যশব্দ ঐ অঞ্চলেই ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত বেহুলা যেসকল নদী ও স্থানের উপর দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও ঐ অঞ্চলেই বিদ্যমান রহিয়াছে।

কেতু— তিনি চিতোরের রাণা রায়মল্লের ভ্রাতুষ্পুত্রী। বুন্দীর বীর রাজা নারায়ণ সিংহের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, এই বিবাহের একটী বিশেষত্ব আছে। চিতোরের অধিপতি রায়মল্ল (১৪৭৪-১৫০৯ খ্রীঃ) মালবপতি গিয়াস-উদ্দিন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। এমন সময়ে বুন্দির রাজা নারায়ণ সিংহ রাণা রায়মল্লকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া গিয়াসউদ্দিনকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করেন। রাণা রায়মল্ল এই উপকারী বন্ধুকে সাদরে স্বীয় দুর্গে অভ্যর্থনা করেন। এমনকি পুরমহিলারাও অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। এই সময়ে রায়মল্ল রাজকুমারী কেতুর মনোভাব জানিতে পারিয়া নারায়ণ সিংহের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন।

কেদারনাথ কবিকণ্ঠ—২৪পরগণার অন্তর্গত খাঁটুরার তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামরুদ্র ন্যায় বাচস্পতির অন্যতম বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, সর্দ্দার —১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার অন্তঃ

পাতী তালতলা নিয়োগীপুকুরে কেদার নাথের জন্ম হয়। হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে বি, এ, ও পর বৎসর বি, এল্, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর নেপালের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মহারাজা স্যার জঙ্গ বাহাদুর ও তদীয় ভ্রাতা জেনারেল বীর সমসের জঙ্গ রাণা বাহাদুরের পুত্রগণের গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া নেপাল গমন করেন।

নেপাল রাজ্যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের প্রথম উদ্যোক্তাগণের তিনি অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ও উদ্যমে দরবার স্কুল ও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি উক্ত স্কুলের অধ্যক্ষ (Principal) নিযুক্ত হন। মহারাজ চন্দ্র সমসের জঙ্গ বাহাদুর, নেপালের প্রধান সেনাপতি প্রমুখ বহু উচ্চ পদস্থ সম্ভ্রান্ত নেপালী রাজপুরুষ তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার উপদেশ ও অনুপ্রেরণায় বহু শিক্ষিত নেপালী যুবক আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশ গমন করেন। শিক্ষা ভিন্ন শাসন প্রভৃতি যাবতীয় বিভাগের বহু জটিল ব্যাপারে রাজপুরুষ গণ তাহার পরামর্শ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের দিল্লীর দরবারে নেপাল সরকার যে দূত প্রেরণ করেন, কেদারনাথ তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য করেন। নেপাল সরকার তাঁহার গুণ ও বিভিন্ন বিভাগে কার্য্য কুশলতায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ সম্মান সর্দ্দার উপাধিতে ভূষিত করেন।

কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কেদারনাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু অনতিকাল পরে ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে তাহার মৃত্যু হয়।

কেদারনাথ দত্ত—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য যুগের একজন বাঙ্গালী উপন্যাস-কার। তিনি 'চমৎকার মোহন' নামক একখানি দ্বৈভাষিক পত্রিকা কিছুকাল পরিচালনা করেন। প্রিয়ম্বদ, নলিনী-কান্ত, বঙ্কক চরিত নামক তিন খানি পুস্তক কেদারনাথের রচিত বলিয়া কথিত হয়। প্রথম দুই খানি উপন্যাস বা আখ্যান; শেষোক্ত খানি নীতিমূলক আখ্যায়িকা। এই সকল পুস্তক ১৮৫৫ হইতে ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে প্রকশিত হয়। তৎসম্পাদিত 'চমৎকার মোহন' পত্রিকায় নানাবিধ সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়।

কেদারনাথ দত্ত, ভক্তিবিনোদ—নদিয়া জিলার অন্তর্গত উলা বা বীর-নগর গ্রামে ১২৪৫ বঙ্গাব্দে ১৮ই ভাদ্র মাতুলালয়ে কেদারনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আনন্দচন্দ্র দত্ত হাটখোলার কায়স্থ জাতীয় বালী সমাজের অন্তর্গত দত্ত বংশীয় ছিলেন।

বীরনগরের বিখ্যাত দানবীর জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মুস্তোফীর দ্বিতীয়া কন্যা জগৎ মোহিনীকে আনন্দচন্দ্র বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়েই বাস করেন। কেদারনাথের জন্ম হইলে মাতামহ ঈশ্বরচন্দ্র, ফুলিয়া ও নবলা গ্রামের জমিদারী স্বীয় দৌহিত্রকে যৌতুক স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত কেদার নাথ উলায় থাকিয়াই লেখা পড়া শিক্ষা করেন। তৎপরে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। ১৮৫৩ সালে বীরনগরে মহামারী আরম্ভ হইলে তিনি মাতাকে নিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। কিন্তু বীরনগরের সহিত একবারে সম্বন্ধ ত্যাগ করেন নাই। ১৮৬৬ সালে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৯৪ সালে অবসর গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি ইংরেজি, লাটিন, সংস্কৃত, হিন্দি, উড়িয়া, উর্দ্দু, ফারসী প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বৈষ্ণব সমাজের উন্নতি কল্পে তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত, জীবধর্ম্ম, প্রেমপ্রদীপ, বিজন গ্রাম, সন্ন্যাসী প্রভৃতি বঙ্গভাষায় লিখিত, সংস্কৃতে— শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণ মঙ্গল স্তোত্র, দত্ত কৌস্তুভ, আম্নায় সূত্র, উর্দ্দুতে বালিদে রেজিষ্ট্রী, ইংরেজিতে Pourade, The Muts of Orissa, Our Wants, The Bhagabata Speech, Gautam Speech প্রভৃতি এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারার্থ তিনি একখানা মাসিক পত্রিকাও সম্পাদন করিতেন।

কেদারনাথ দাস-ডাঃ সার এম-ডি, সি-আই-ই, এফ-সি-ও-জি—ভারত বিখ্যাত ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বর্গীয় যাদবকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। জেনারেল এসেম্বলী ইনষ্টিটিউট (General Assembly Institute) বর্ত্তমান স্কটিস চার্চ্চ কলেজ) হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর, তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য তাঁহার এরূপ আগ্রহ ছিল যে, পিতার অজ্ঞাতসারে টাকা সংগ্রহ করিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। কয়েকদিন পরে তাঁহার পিতা ইহা জানিতে পারেন এবং তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া আর বাধা দেন নাই। মেডিকেল কলেজে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং শেষ পরীক্ষায় ধাত্রী বিদ্যায় তিনি পুরা নম্বর প্রাপ্ত হন।

তৎপূর্ব্বে আর কেহ এত নম্বর পান নাই। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এম্-বি এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজের এম্ ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সাত বৎসর মেডিকেল কলেজের রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি ভারতীয় মেডিকেল কংগ্রেসের (Indian Medical Congress) প্রথম সেক্রেটারী ছিলেন। সেই সময় হইতেই তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। ১৯১৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি সি, আই, ই, O .I. E., উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রসব করাইবার এক প্রকার যন্ত্র বাহির করেন। তাহা তাঁহার নামে (Das Forceps) পরিচিত। প্রায় পাচ বৎসর ক্যাম্বেল স্কুলে থাকিবার পর তিনি ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক এবং হাসপাতালে উক্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক হন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আমেরিকায় প্রসূতি বিজ্ঞান ও স্ত্রীরোগ সম্বন্ধীয় নিখিল বিশ্ব সম্মেলনের (World Conference অধিবেশনে যোগদান করেন। এই অধিবেশন হইতে ফিরিয়া আসিয়াই, সেই বৎসর তিনি কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত উক্ত পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উদরে অস্ত্রোপচার করিয়া সন্তান বাহির করার কৌশলে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এইরূপ অস্ত্রোপচারে তাঁহার সমকক্ষ অতি অল্পই ছিল। মাত্র বার মিনিট সময়ের মধ্যে তিনি এই অস্ত্রোপচার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। সমগ্র পৃথিবীতে মাত্র আর একজন তাহা অপেক্ষা কম সময়ে ঐরূপ অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করিতেন। ধাত্রী বিদ্যায় এবং স্ত্রীরোগে তাঁহার ন্যায় বিশেষজ্ঞ পৃথিবীর মধ্যে যে অতি অল্পই আছেন, সমগ্র জগৎ তাহা এক বাক্যে স্বীকার করিতেন। তাঁহার হাতের অঙ্গুলিগুলী অস্বাভাবিক লম্বা ছিল। এই অঙ্গুলীগুলিই অসাধ্য সাধন করিয়াছে। তিনি প্রসবতত্ত্ব, গর্ভমোচন এবং স্ত্রীরোগ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন এবং তাহার অনেকগুলি ভারতের চিকিৎসা বিদ্যালয় সমূহে পঠিত হইতেছে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নাইট (Knight) উপাধি এবং এফ সি ও জি উপাধি লাভ করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই কেবল শেষোক্ত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল তাঁহাকে 'ধাত্রী-বিদ্যার্ণব' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। তিনি বহুদিন ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাত্রীবিদ্যার পরীক্ষক, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিভাগের সদস্য এবং চিকিৎসা বিদ্যার কমিটির

(Faculty of Medicine) অধ্যক্ষ (Dean) ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি মেডিকেল কলেজসমূহের পরিদর্শক, রেডক্রস সোসাইটী (Red Cross Society), সেণ্টজন এম্বুলেন্স (St. John Ambulance), এসিয়াটিক সোসাইটী (Asiatic Society) এবং অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন এবং কলেজ ও হাসপাতালের উন্নতির জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় ঐ কলেজে ধাত্রী-বিদ্যা সম্পর্কীয় একটি বিরাট শুশ্রূষা বিভাগ নির্ম্মিত হয়। উহা 'সার কেদারনাথ দাস প্রসূতি হাসপাতাল' নামে পরিচিত। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ৩০শে ফাল্গুন (১৩ই মার্চ্চ ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দ) শুক্রবার সত্তর বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

কেদার নাথ মজুমদার— বাঙ্গালী গ্রন্থকার ও পত্রিকা সম্পাদক। তিনি ময়মনসিংহ জিলার অধিবাসী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষালাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই, কিন্তু অধ্যবসায় ও স্বাবলম্বন গুণে তিনি পরবর্ত্তী জীবনে গ্রন্থকার ও সাংবাদিক রূপে খ্যাতি লাভ করেন।

যৌবনকালেই প্রায় সাতাইশ বৎসর বয়সে, তিনি 'কুমার' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়া কিছুকাল পরিচালনা করেন। পরে ১৩০৬ বঙ্গাব্দে তিনি 'বাসনা' নামে আর একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তদ্ভিন্ন তিনি কিছুকাল 'আরতি' নামেও একখানি পত্রিকা সম্পাদন করেন। আরতি ১৩০৭ বঙ্গাব্দে প্রচারিত হয়।

উহার কিছুকাল পরে তিনি বাত-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া চলচ্ছক্তি রহিত হন। কিন্তু সাহিত্য সেবার অদম্য উৎসাহ তাহার বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। কতিপয় বর্ষ পরে ১৩১৯ বঙ্গাব্দে তিনি 'সৌরভ' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকাখানি দীর্ঘকাল চলিয়াছিল।

ময়মনসিংহের ইতিহাস, ময়মনসিংহের বিবরণ, ঢাকার বিবরণ প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাকে ঐতিহাসিক খ্যাতি দান করে। 'বাঙ্গালার সাময়িক সাহিত্য' ও 'রামায়ণের সমাজ' নামক বহুমূল্য গ্রন্থ দুইটি তাহার সাহিত্যিক খ্যাতি বিশেষ বৃদ্ধি করে। তদ্ভিন্ন শুভদৃষ্টি, স্রোতের ফুল, সমস্যা, চিত্র, প্রভৃতি উপন্যাসাদি এবং বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকও তিনি রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন বঙ্গের গ্রন্থকারদের অকারাদি বর্ণ ক্রমে একখানা জীবনচরিত প্রণয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৯২৬ খ্রীঃ মে মাস) ময়মনসিংহ নগরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

কেদারনাথ রায়—(১) একজন গ্রাম্য কবি। বর্দ্ধমান জিলার রাণীগঞ্জ মহকুমায় অন্তর্গত অণ্ডাল গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ১২৫৭ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামচন্দ্র রায়। সামান্য কৃষি কার্য্য দ্বারাই তাহাদের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইত, তিনি সেই জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। স্বাভাবিক প্রতিভা বলে তিনি উচ্চ ভাবপূর্ণ বহু সংগীত রচনা করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কবির দল, দরবেশ ও বাউল সম্প্রদায়ের জন্যও তিনি সংগীত রচনা করিয়া দিতেন। ১৩০৮ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

কেদারনাথ রায় — (২) উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত রঘুনাথপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ১৮৬৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া দশ টাকার বৃত্তি পান। ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কিছুদিন সেই জন্য তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহার স্ত্রী সৌদামিনীকে তাঁহার নিকট আসিতে দেন নাই। পরে স্ত্রী নিকটে আসিলে তাঁহাকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। এই সময়ে অতিকষ্টে তাঁহার দিনপাত হইত। ১৮৭৪ সালে তিনি বি, এ পাশ করিয়া ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত হন। ১৮৭৬ সালে তিনি এম, এ ও তাহার পর বৎসর বি, এল পরীক্ষা পাশ করেন। তিনি রংপুরে যাইয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৮৭৮ সালে তিনি মুন্‌সেফের পদ প্রাপ্ত হন। দশ বৎসর চাকুরীর পর ১৮৮৮ সালে ষ্টেচুটারী সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি প্রথমে সহকারী মাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি জিলার জজ হন। ১৮৯১ সালে তাঁহার পত্নী বিয়োগের পর, তিনি প্রসিদ্ধ চণ্ডীচরণ সেনের বিদুষী কন্যা কামিনী সেনকে বিবাহ করেন। তিনি প্রথম জীবনে সংগ্রামের ভিতর দিয়া যাপন করিয়া বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, সন্তানদের শিক্ষার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার চরম পত্রেও তিনি সন্তানদের ও স্ত্রীর আবশ্যকীয় খরচ বাদে উদ্বৃত্ত অর্থ ধর্ম্মার্থে ব্যয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার উন্নত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০৯ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

কেদার মিশ্র—তিনি বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি দেবপালের বিখ্যাত মন্ত্রী দর্ভপাণির পৌত্র ও সোমেশ্বরের পুত্র। পিতামহের পরলোক গমনের পরে পৌত্র কেদারমিশ্র দেবপালের (৮৩৪—৮৭৪ খ্রীঃ অব্দ) মন্ত্রী হইয়া-

ছিলেন। এই মন্ত্রী কেদার মিশ্রের বুদ্ধিবলে রাজা দেবপাল উৎকল, দ্রবিড়, গুর্জ্জর, হুন প্রভৃতি রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়াছিলেন। রাজা দেবপালের পরে তৎপুত্র শূরপাল বঙ্গের অধিপতি হইয়াছিলেন। সেই বৃহস্পতি প্রতিকৃতি কেদার মিশ্রের যজ্ঞস্থলে, "সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য শক্র সংহারকারী নানা সাগর মেখলা ভরণা বসুন্ধরার চিরকল্যাণকামী শ্রীশূর পাল নামক নরপাল স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, অনেকবার শ্রদ্ধা সলিলাপ্লুত হৃদয়ে নতশিরে, পবিত্র শান্তি বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন।" কেদার মিশ্রের মাতার নাম রল্লাদেবী। তাঁহার পুত্র প্রসিদ্ধ ভট্ট গুরব মিশ্র।

বংশাবলী

গর্গদেব—পত্নী ইচ্ছাদেবী।
|
দর্ভপাণি—পত্নী শর্করা দেবী
|
সোমেশ্বর—পত্নী রল্লাদেবী
|
কেদার মিশ্র
|
গুরব মিশ্র—

কেদার রায় — বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের (বার ভুঞার) অন্যতম, বিক্রমপুরের অন্তর্গত শ্রীপুরের স্বাধীন নৃপতি। তাঁহার ভ্রাতার নাম চাঁদ রায়। মতান্তরে চাঁদ রায় কেদার রায়ের পিতা। মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষ ভাগে তিনি শ্রীপুরে রাজত্ব করিতেন।

কেদার রায়ের পূর্ব্ব পুরুষ নিমরায় কর্ণাটের অধিবাসী ছিলেন। তিনিই বাঙ্গালায় আগমন পূর্ব্বক পদ্মাতীরে বসতি স্থাপন করেন। এই রায় বংশ 'দে' উপাধিধারী বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন।

ঈশা খাঁ নামক অপর ভৌমিকের সহিত কেদার রায়ের যে সংঘর্ষ ঘটে তাহারই পরিণতি হয় মুঘলের সহিত সংঘর্ষে। কথিত আছে কেদার রায়ের ভবনে আমন্ত্রিত ঈশা খাঁ, সোণামণি নাম্নী কেদারের অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী বিধবা ভগ্নীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। ঈশা খাঁ প্রথমে কেদারের নিকট সোণামণির পাণিপ্রার্থী হন। কেদার সেই প্রস্তাব বিরক্তির সহিত প্রত্যাখ্যান করেন এবং ঈশা খাঁকে শাস্তি দিবার জন্য তাঁহার কয়েকটী দুর্গ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। এমন কি তিনি ঈশা খাঁর রাজধানী খিজিরপুরও লুণ্ঠন করেন। ঈশা খাঁও প্রতিশোধ লইবার জন্য শ্রীমন্ত খাঁ নামক এক বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণ অমাত্যের সাহায্যে সোণামণিকে হরণ করেন। এই ঘটনায় কেদার রায় মুসলমান মাত্রেরই উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মুঘলের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া নিজেকে স্বাধীন ভূপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর সোণারগাঁ পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ঐ সোণারগাঁ পরগণা ও সন্দীপ পরগণা একই কালে মুঘলের অধিকৃত হয়। কেদার রায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সন্দীপ পরগণা অধিকার করেন (১৬০২ খ্রীঃ)। এই সন্দীপ অধিকার ব্যাপারে কেদারের পর্তুগীজ সেনাপতি কার্ভালো বিশেষ রণনৈপুণ্য প্রকাশ করেন। সন্দীপ প্রকৃতপক্ষে মুঘলদিগের সম্পূর্ণ অধিকারে ছিল না। তথায় আরাকানি মগদিগেরও যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল। সুতরাং উহা অধিকার করিবার জন্য কেদার রায়কে মগদিগের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। একাধারে পর্তুগীজ মগ, ও মুঘলদিগকে পরাভূত করিয়া কেদার রায়কে উহা অধিকার করিতে হয়।

এই সময়েই, সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র খুরম্ জাহান্‌গীর উপাধি ধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারই আদেশে মহারাজা মানসিংহ বারভূঞাদের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্য বাঙ্গালায় আগমন করেন। এই দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই মনোমালিন্য ছিল। তাঁহাদের অনেকেই পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতেন। তদুপরি ঘরশত্রু বিভীষণেরও অভাব ছিলনা। মানসিংহ এই সকল সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার বুদ্ধি কৌশলে প্রায় সকল ভৌমিকই মুঘল প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইলেন। কেবল যশোহরের প্রতাপাদিত্য ও শ্রীপুরের কেদার রায় মস্তক অবনত করিতে সম্মত হইলেন না, ফলে মুঘলে বাঙ্গালীতে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মানসিংহ প্রথমে কেদার রায়ের ক্ষমতায় বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার প্রথম কয়েকটি চেষ্টা বিফল হওয়ায় তিনি বিস্তৃত সমরায়োজন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সংগ্রামে মন্দারায় মানসিংহের প্রধান সেনাধ্যক্ষ ছিলেন এবং মধুরায় ও কার্ভালো কেদার রায়ের সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই শেষ সংগ্রাম প্রধানত নৌযুদ্ধ হইয়াছিল মেঘনার উপকূলে মুঘল ও বাঙ্গালীর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মুঘল সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। কেদারের পূর্ব্বোক্ত সৈন্যাধ্যক্ষগণ অসীম বীরত্ব প্রকাশ করেন। মানসিংহ এই পরাজয়েও ভগ্নোদ্যম হইলেন না। তিনি কেবল সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং প্রথমে প্রতাপাদিত্য ও ভূষণার মুকুন্দ রায়কে বিধ্বস্ত করিয়া তিনি পুনরায় শ্রীপুর আক্রমণ করিলেন। এবার জলে ও স্থলে কয়েক দিন ধরিয়া তুমুল সংঘর্ষের পর কেদার রায় মুঘল বাহিনীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কি ভাবে কেদারের মৃত্যু ঘটে (১৬০৪ খ্রীঃ) তাহা নিশ্চিত রূপে জানা যায় না।

এতদুপলক্ষে কয়েকটি কিংবদন্তি আছে মাত্র। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে মানসিংহ কেদারকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া গুপ্ত-ঘাতক দ্বারা তাঁহার বধ সাধন করান। কেদারের পতনের মূলে কতিপয় বিশ্বাস ঘাতক কর্ম্মচারীর যোগ ছিল। নৌযুদ্ধে কেদার রায় অসীম ক্ষমতাশালী ছিলেন। নদী বহুল বিক্রমপুরে সেই জন্যই সহসা মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেদার রায়ের রাজধানী পদ্মার কীর্ত্তিনাশা স্রোতের কুক্ষিগত হইয়াছে। তাঁহাদের কতিপয় কীর্ত্তি বহুকাল পর্য্যন্ত লোকের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। তন্মধ্যে রাজাবাড়ীর মঠ সমধিক প্রসিদ্ধ।

'আকবর নামা' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে চাঁদ রায়কে কেদার রায়ের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। চাঁদ রায় ভূষণা দুর্গের অধিপতি ছিলেন। চাঁদ রায়ের মৃত্যুর পর ঈশা খাঁর মধ্যস্থতায় ঐ দুর্গ কেদার রায়ের অধিকার ভুক্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার বিশাল জমিদারীর অধিকাংশই ঈশা খাঁর বংশ-ধরদের হস্তগত হয়। কেদারের ইষ্ট-দেবতা শিলামাতাকে মানসিংহ স্বদেশে লইয়া যান। (মতান্তরে যশোহরের প্রতাপাদিত্যের ইষ্টদেবী যশোরেশ্বরীকে মানসিংহ লইয়া যান। কিন্তু এই মত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া স্থিরিকৃত হইয়াছে)।

কেদারেশ্বর রায়—আসাম প্রদেশের অন্তর্গত জয়ন্তিয়া রাজ্যের অন্যতম রাজা। তাঁহার পরে ক্রমে ধনেশ্বর রায়, কন্দর্প রায় ও জয়ন্ত রায় নামে আরও তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তাঁহারা খ্রীঃ ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দিতে বর্ত্তমান ছিলেন।

কেনেডী, জেমস্—(James kennedy) ভারত প্রবাসী ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী। ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রেভাঃ, জে, কেনেডী, কাশীনগরীতে ধর্ম্মযাজক ছিলেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া, ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভারতে আগমন করেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কয়েকটী জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিয়া ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর (Royal Asiatic Society) অবৈতনিক ধনাধ্যক্ষ ছিলেন। ইম্পিরিয়েল গেজেটিয়ারের (Imperial Gazeteer) জন্য তিনি ভারতীয় মধ্যযুগের ইতিহাস লিখিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত Early Commerce of Babylon & India, Buddhist Gnosticism, The System of Basilides, History of N. W. P. প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত। তিনি সাময়িক পত্রেও

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

কেনেডী, ভানস্ (Vans Kennedy) —তাঁহার পিতার নাম রবার্ট কেনেডী। ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দে এডিনবরা সহরে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি বোম্বে নগরে পদার্পণ করেন। তিনি ভারতবর্ষের কয়েকটী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া ১৮০৭ খ্রীঃ অব্দে শিরোর নামক স্থানে অবস্থিত পেশোয়ার দরবারের দ্বিভাষীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তৎপরে ১৮১৭—১৮৩৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি বোম্বের সৈন্যদলের জজএডভোকেট জেনেরেলের পদে (Judge Advocate Generel) প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে প্রাচ্য ভাষার অনুবাদকের পদে কিছুদিন ছিলেন। এই অসাধারণ পণ্ডিত বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ লিখিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে Ancient Chronology and History of Persia, A Maharatta Dictionary, Ancient Hindu Mythology, The Vedanta Philosophy of the Hindus. প্রভৃতি প্রধান। তিনি বোম্বের সাহিত্য সভার (The Bombay Literary Society) একজন প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দের ২৯শে ডিসেম্বর তিনি বোম্বে নগরে পরলোক গমন করেন।

কেন্দু কুলাই—আসাম প্রদেশের মহাপুরুষীয় সম্প্রদায়ভুক্ত একজন পরম জ্ঞানী সাধু। তিনি নরপতি ধর্ম্মপালের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

কেবলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—খ্যাতনামা বাঙ্গালী গীতবাদ্য বিশারদ। নদীয়া জিলার অন্তর্গত বীরনগর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি একজন বিখ্যাত পাখোয়াজ বাদক ছিলেন। তাঁহার পাখোয়াজ যন্ত্রটী সার্দ্ধ তিন হস্ত দীর্ঘ ছিল। বাদ্যযন্ত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তিনি বহু স্থানে নিমন্ত্রিত হইতেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

কেবলকৃষ্ণ বসু—ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল উপবিভাগের অন্তর্গত কেদারপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত রামনিধি বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। স্বীয় গুরুর আদেশে বহুস্থলে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়া প্রাপ্ত অর্থ গুরুকে প্রদান করিতেন। তিনি শৈব ছিলেন, সে জন্য শিবমাহাত্ম্য প্রচারার্থ স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ড পয়ারাদি ছন্দে (৭০ বৎসর বয়সে ১২৩৭ বঙ্গাব্দে)

রচনা করেন। ইহা ছাড়া তাঁহার রচিত একখানা সত্যনারায়ণের পাঁচালীও আছে। অনপত্য কেবলকৃষ্ণ দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন।

কেবলপুরী—দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও কোনও সন্ন্যাসী বিশেষ ক্ষমতাপন্ন হইয়া এক একটী সন্ন্যাসীদল গঠন করিয়াছেন। তাহাদের নাম মড়ী বা সম্প্রদায়। সমুদয়ে বায়ান্নটী (৫২টী) মড়ী আছে। পুরী সন্ন্যাসী দল ভুক্ত কেবলপুরী এইরূপ একটী মড়ীর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার নামানুসারে তাঁহার মড়ীকে কেবলা মড়ী বলে।

কেবলরাম আচার্য্য— তাঁহার বাসস্থান নবদ্বীপের সন্নিহিত ছিল। ১৬২১ শকে (১৬৯৯ খ্রীঃ) এই অসাধারণ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত 'খেটিকা' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে স্ফুট গণনা ও পঞ্চাঙ্গ সাধন বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

কেবলরাম পঞ্চানন— এই গণিতজ্ঞ জ্যোতিষী পণ্ডিত ১৬৮৪ শকে (১৭৬২ খ্রীঃ) 'গণিত রাজ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। 'রেখা প্রদীপ' নামক একখানা গ্রন্থও তাঁহারই রচিত।

কেম্পগৌর—তেলিকুটার যুদ্ধে বিজয়নগরের পতনের পর, বিজয় নগরের অধীনস্থ সামন্ত নরপতিরা অনেকেই স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বিজাপুরের নবাব ঐ সকল রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় রাজ্য সীমা বর্দ্ধনের অভিলাষী হইলেন এবং এই অভিপ্রায়ে বিজাপুরের নবাবের সেনাপতি রাণ্ডোলা খাঁ ও শাহজী (ছত্রপতি শিবাজীর পিতা) বেঙ্গালোরের নরপতি কেম্পগৌরের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ১৬৩৭ খ্রীঃ অব্দে পরাস্ত করেন এবং তাঁহার রাজ্য বিজাপুর রাজ্যভুক্ত হয়।

কেম্বেল, সার আর্চ্চিবল্ড — (Sir Archibald Campbell) ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে উত্তর আমেরিকায় ফরাসীদের সঙ্গে কুইবেক (Quebec) নগরের যুদ্ধে তিনি আহত হন। তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কাজ করিয়া ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দের ৬ই এপ্রিল মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন এবং পরে প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। কর্ণাট প্রদেশের বিরক্তিকর রাজস্ব মীমাংসা তাঁহার এক বিশেষ কীর্ত্তি। স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় তিনি ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

কেম্বেল, সার আরচিবল্ড, বেরনেট—(Campbell Sir Archibold, Baronet) তাঁহার পিতার নাম কাপ্তান এ, আরচিবল্ড। জন্ম ১৭৬৯ খ্রীঃ, ১৭৮৭ সালে তিনি সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিয়া পর বৎসর বোম্বাই নগরে আগমন করেন। ১৭৯০—১৭৯২ সাল পর্য্যন্ত বোম্বের শাসনকর্ত্তা ও প্রধান সেনাপতি সার রবার্ট এবারক্রম্বির

Sir Robert Abercromby) অধীনে কাজ করেন। তৎপরে তিনি শ্রীরঙ্গপত্তন, কোচিন প্রভৃতি স্থানে কাজ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপরে পর্টুগালে ও অন্যান্য স্থানে কিছুদিন কাজ করিয়া ১৮২১ সালে তিনি পুনরায় ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৮২৪—২৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি প্রথম বর্ম্মা যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং সেই সময়ে প্রোম ও রেঙ্গুন নগর অধিকার করেন। ১৮২৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে য়ান্দাবু নগরের সন্ধিতে বর্ম্মা যুদ্ধের অবসান হয়। ১৮২৯ সাল পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশ শাসন করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং ১৮৩১ সালে বেরনেট হন। ১৮৩৯ সালে ৭০ বৎসর বয়সের সময়ে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর প্রধান সেনাপতির পদ তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। ১৮৪৩ সালের ৬ই অক্টোবর তিনি পরলোক গমন করেন।

কেম্বেল, সার জর্জ—(Sir George Campbell) তাঁহার পিতা সার জি, কেম্পবেল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে মেডিকেল অফিসার ছিলেন। ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভারতে আগমন করিয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কার্য্যে নিযুক্ত হন। পাঞ্জাব প্রদেশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইলে, তিনি ১৮৪৯ সালে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'বর্ত্তমান ভারত' নামক (Modern India) গ্রন্থ লিখেন। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি ফার্লোর ছুটিতে ছিলেন, সেই সময়ে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। তৎপরে তিনি শতদ্রু প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তিনি যথেষ্ট কর্ম্মনিপুণতার পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বড়লাটের আদেশে সিপাহী বিদ্রোহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তৎপরে তিনি কিছুদিন অযোধ্যা প্রদেশের দ্বিতীয় শাসনকর্ত্তার পদে ছিলেন। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম জজের পদ লাভ করেন। ১৮৬৬—৬৭ খ্রীঃ অব্দে উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ কমিশনের তিনি প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে তিনি মধ্যভারতের চীফ কমিশনার হন। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ হইতে ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ছিলেন। তাঁহার সময়েই ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী বড়লাট লর্ড মেও আন্দামান বন্দীনিবাস পরিদর্শন কালে, একজন ওহাবী মুসলমান বন্দীকর্ত্তৃক নিহত হন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি—নরমান

সাহেব (Justice John Paxton Norman) ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর নিহত হন। তাঁহারই সময়ে গারো ও লুসাই পাহাড়ের অন্তর্গত অসভ্য জাতিরা বিদ্রোহী হইয়াছিল। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দের বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষও তাঁহারই সময়ে হইয়াছিল। কেম্বেল সাহেব বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁহার অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। তবু তিনি দেশের সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার উন্নতি কল্পে বিশেষ চেষ্টা করেন। ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি কেওরো নগরে দেহত্যাগ করেন। The Ethnology of India, The Capital of India, The Tenure of Land in India, The Eastern Question প্রভৃতি সুচিন্তিত গ্রন্থ তাঁহারই লিখিত।

কেয় দেব—তিনি প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বেত্তা শারঙ্গের পুত্র। তিনি নিজেও একজন বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। 'পথ্যাপথ্য বিবোধক' 'নাম রত্নাকর' 'নাম সাগর' 'রসামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত। দ্রব্যগুণ সম্বন্ধীয় তাঁহার পথ্যাপথ্য বিবোধক গ্রন্থ আট পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

কেয়ামদ্দিন শাহ—একজন বিখ্যাত দরবেশ। চট্টগ্রামের বংশখালীর অধীন ওসখাইন গ্রামের বিখ্যাত ফকির আলী রেজা বা কানু ফকির তাঁহার শিষ্য ছিলেন। আলী রেজা বহু গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

কেয়ার্ড, সার জেমস্ (Sir James Caird) — তিনি একজন পৃথিবী বিখ্যাত কৃষিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি সার রিচার্ড ষ্ট্রেচির দুর্ভিক্ষ কমিশনের অন্যতম সভ্য হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। ছয় মাস কাল এদেশে অবস্থানপূর্ব্বক তিনি India, The Land and the people নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৯২ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তিনি পরলোক গমন করেন।

কেয়ূরবর্ষ, হৈহয়—কলচুরির চেদী বংশীয়েরা হৈহয় বংশেরই একটী শাখা। কি করিয়া তাঁহারা ঐ নাম প্রাপ্ত হইলেন, তাহা দুর্জ্ঞেয়। ৮৫০ খ্রীঃ অব্দে কোক্কল্ল দেবের সময় হইতেই তাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কেয়ূরবর্ষ হৈহয় কোক্কল্ল দেবেরই পৌত্র ও মুগ্ধতুঙ্গের (প্রসিদ্ধ ধবল) পুত্র। তিনি ৯৫০ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন এবং চালুক্য বংশের এক সামন্ত নরপতির কন্যা নহলা দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে লক্ষ্মণদেব রাজ্য লাভ করেন।

কের্ন, জন হেনরী কেস্‌পার – (John Henry Caspar, Kern) তিনি জাতিতে ওলন্দাজ (Dutch)। ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে যাবাদ্বীপে তাহার জন্ম হয়। তিনি হলণ্ড দেশের ইউট্রেকৃট ও লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। সংস্কৃতে তিনি বিশেষ কৃতবিদ্য ছিলেন। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিয়া তিনি ১৮৬৩—১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত কাশীর কুইনস্ কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের কার্য্য করেন। তৎপরে তাঁহার স্বদেশে লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক হন। এই বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত কালিদাসের শকুন্তলা, বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ ওলন্দাজ ভাষায় অনুবাদ করেন। ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস তাঁহার এক বিখ্যাত গ্রন্থ। রাশিয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত বয়টলিংকে (Bohtlingk) সংস্কৃত অভিধান প্রণয়নেও সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি বহু দেশের বিদ্বজ্জন মণ্ডলীর সভ্য ছিলেন।

কেরল নীলকণ্ঠ সোমযাজী—দাক্ষিণাত্যের মালাবার প্রদেশবাসী একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। ১৫০০ খ্রীঃ অব্দে তিনি আর্য্যভটের উপর এক টীকা রচনা করেন।

কেরলবর্ম্মা, রাজা—তিনি মালাবারের চিরকল নামক স্থানের রাজা। তিনি তাঁহার মাতামহের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের কোনও কোনও স্থানের নিয়ম এই যে পুত্র রাজ্যাধিকারী হয় না। কন্যা রাজ্য লাভ করেন। তাঁহার পরে সেই কন্যারই পুত্র রাজ্য লাভ করেন। তখন কন্যার পিতা পেন্‌সন প্রাপ্ত হন। তিনি কোলত্তরী রাজবংশের এক শাখার বংশধর। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ প্রসিদ্ধ মালাবার সম্রাট চেরমান পেরুমল ৩৫২ খ্রীঃ অব্দে সমস্ত রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে রামবর্ম্মা চিরকলের রাজা ছিলেন। টিপু সুলতান তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে, তাহার হস্তে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইবার ভয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন।

কেরামত আলী, সৈয়দ — তিনি জৌনপুরের অধিবাসী ছিলেন। আঠার বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি জ্ঞানলাভার্থ জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ নগরে গমন করেন। তথায় দুই বৎসর যাপন করিয়া পারস্য দেশে গমন করেন এবং তথায় দশ বৎসর যাপন করেন তৎপরে তিনি পারস্য, তুর্কিস্থান প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। এই সময়ে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী আর্থার কনোলীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কেরামত আলী একবার এক বিপদ হইতে

তাঁহাকে রক্ষা করেন। এই কনোলীর অনুরোধে তিনি আফগানিস্থানের আমীর দোস্ত মোহাম্মদ খাঁর দরবারে ইংরেজ দূতরূপে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনিই রাশিয়া ও ফরাসীদের আমীরের সহিত ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়া দেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রাপ্ত হন। পারস্য, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশ সম্বন্ধে রাশিয়া কি নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছে এসম্বন্ধে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হইয়াছিল। ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি হুগলীর প্রসিদ্ধ ইমামবাড়ার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে আশী বৎসর বয়সে এই স্থানেই তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি মুসলমান সমাজের অতি সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীরাও তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন।

কেরী, উইলিয়াম — (William Carey) (১) বিখ্যাত খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাজক ও শিক্ষাব্রতী। ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের নর্দাম্পটন শায়ারের একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে এক দরিদ্র গৃহস্থ পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম এডমণ্ড কেরী (Edmund Carey)। বাল্যকালে দারিদ্র্য বশতঃ অধিক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু জ্ঞান পিপাসা তাঁহার বিশেষ প্রবল ছিল বলিয়া নানা স্থান হইতে উৎকৃষ্ট পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া তিনি পাঠ করিতেন। বিভিন্ন দেশের বিবরণ, ভ্রমণ কাহিনী এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থই তাঁহার সবিশেষ প্রিয় ছিল। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তিনি অর্থকরী বিদ্যালাভের জন্য এক পাদুকা নির্ম্মাতার অধীনে কাজ শিখিবার জন্য প্রেরিত হন।

শৈশব কাল হইতেই তাঁহার মনে ধর্ম্মভাবের উন্মেষ লক্ষিত হয় এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই ধর্ম্মপ্রাণতার সহিত স্বাধীন চিন্তাশীলতাও তাঁহার চরিত্রের এক বিশেষ লক্ষণ ছিল। ক্রমে ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করিয়া এবং সাময়িক ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া তিনি ধর্ম্মযাজকের যোগ্যতা লাভ করেন এবং অবশেষে মূলটন নামক স্থানের স্থায়ী আচার্য্য (Pastor) নিযুক্ত হন।

প্রসিদ্ধ ইংরেজ নাবিক ও ভূপর্য্যটক ক্যাপ্টেন কুক (Captain Cook) ১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দে প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপে অসভ্য অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক নিহত হন। সেই সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে তথায় মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাহার কতিপয় বর্ষ পরে কুকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত

হয়। ঐ পুস্তক পাঠে কেরীর মনে ঐ কুসংস্কারাপন্ন অসভ্য লোকদের মধ্যে খ্রীষ্টের বার্ত্তা প্রচার করিবার এক প্রবল আগ্রহ হয়। বিশেষতঃ ঐ পুস্তকে কুক যে স্থানে আবেগের সহিত খ্রীষ্টানদিগকে ঐ অসভ্য জাতি সকলের নিকট খ্রীষ্টের বার্ত্তা প্রচার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থান পাঠ করিয়া কেরী অধীর হইয়া উঠিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহার আকুল আগ্রহ কার্য্যে পরিণত করিবার কোনও সুযোগ তিনি পান নাই। প্রথম প্রথম তিনি এ বিষয়ে কোনও উৎসাহ পান নাই। জনসাধারণের মনে এ বিষয়ে আগ্রহ জন্মাইবার জন্য তিনি, অনেক পরিশ্রম করিয়া নানা স্থান হইতে উপকরণ সংগ্রহপূর্ব্বক পৃথিবীর নানা স্থানের অর্দ্ধ-সভ্য অথবা অসভ্য জাতী সকলের রীতিনীতি, জীবন ধারণের প্রণালী সমূহের বিবরণ সংকলিত একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। অবশেষে তাঁহার নানারূপ চেষ্টার ফলে এবং অনেক কষ্টের পর মাত্র পাঁচজন পরম উৎসাহী যুবক ধর্ম্মযাজকরূপে পৃথিবীর দূর দূরান্তর স্থানে খ্রীষ্টের বার্ত্তা প্রচার করিবার জন্য প্রস্তুত হন। প্রথমে স্থির হয় যে তাঁহারা প্রশান্ত মহাসাগরের কোনও দ্বীপে যাইয়া প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিবেন। কিন্তু জন টমাস (John Thomas) নামক ভারত প্রত্যাগত একজন পাদ্রীর পরামর্শে তাঁহারা বঙ্গদেশে আগমন করা স্থির করিলেন। ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে নবেম্বর মাসে পূর্ব্বোক্ত জন টমাস, উইলিয়ম কেরী ও তাঁহার পত্নী, তাঁহাদের চারিটি পুত্র এবং কেরীর এক শ্যালিকা ভারতে উপস্থিত হন।

কেরী প্রথমে সপরিবারে ব্যাণ্ডেলে ও পরে নদীয়াতে কিছুকাল বাস করেন। ঐ সময়ে তাঁহারা বিশেষ অর্থকষ্টে পড়েন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত জন টমাসেরই সাহায্যে সুন্দরবনের এলাকায় চাষের উপযুক্ত জমী লইয়া তথায় গমন করেন। অল্পকাল পরেই আবার তিনি টমাস সাহেবেরই চেষ্টায় মালদহ জিলার অন্তর্গত মদনপুর নামক স্থানে নীলকুঠীর অধ্যক্ষ হইয়া গমন করেন। তথায় তিনি প্রায় পাঁচ বৎসর ছিলেন। সেইখানে থাকিবার সময়েই তিনি ভালরূপ বাঙ্গালা ও কিছু হিন্দি ভাষা শিক্ষা করেন এবং বাইবেলের নূতন ও পুরাতন অংশ (New & Old Testament) বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন। অনূদিত পুস্তক মুদ্রিত করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা হয়। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, দশ-হাজার খণ্ড বই ছাপাইতে প্রায় ষাট হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে। অগত্যা নিতান্ত নিরাশ হইয়া দুঃখের সহিত মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রাখিতে বাধ্য হইলেন।

ঐ স্থানে থাকিতেই তিনি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গ্রাম্য বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার আয়োজন করেন। উন্নতচরিত্র, ধর্ম্মপ্রাণ উদারহৃদয়, দরিদ্রের দুঃখে সহানুভূতি প্রভৃতি মহৎগুণের জন্য তিনি উত্তর বঙ্গের অনেক স্থানে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন।

নীলকুঠীর কাজে লাভ না হওয়াতে কুঠীর মালিক উহা তুলিয়া দেন। তখন কেরী কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া খিদিরপুরে বাস করিতে থাকেন।

এই সময়ে আরও চারি জন ইংরেজ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করেন। ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচারকদিগকে এদেশে আসিতে দিতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। পাদ্রীগণ কলিকাতায় পৌঁছিলেই কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগকে দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে পাঠাইয়া দিতেন। কিছুকাল পরে কেরীও সেই সংবাদ পাইয়া তথায় তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহারা প্রথমে ইয়োরোপীয় বালক-বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়টি বিশেষ লোক-প্রিয় হয়। তাহার আয় হইতে কেরী প্রভৃতি মাসে তিন চারি শত টাকা তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্যয় করিতেন। এই শ্রীরামপুরে কয়েক বৎসর চেষ্টার পর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর কৃষ্ণপাল নামক এক-জন ঘোষ বংশীয় যুবক খ্রীষ্টধর্ম্মে প্রথম দীক্ষিত হয়।

এদেশে আসিয়া অবধি কেরী বাঙ্গালা ভাষায় বাইবেল ছাপাইবার চেষ্টা করিতে থাকেন। পূর্ব্বোক্ত মদনবাটীর নীলকুঠীর কাজে নিযুক্ত থাকিবার সময়েই তিনি বাইবেলের অনেক অংশ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া ফেলেন। প্রথম কলিকাতায় এক মুদ্রাযন্ত্রে ছাপাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যয় বাহুল্যের জন্য উহা পরিত্যাগ করেন। কিছুকাল পরে তাঁহার পরম হিতৈষী মদনবাটীর নীলকুঠীর মালিক উড্‌নী সাহেব তাঁহাকে একটা মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া দেন। কিন্তু তখনও অক্ষর সংগৃহীত হয় নাই। শ্রীরামপুরে থাকিবার সময়ে তিনি পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তির সন্ধান পান। পঞ্চানন ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র মনোহরকে কেরী অক্ষর নির্ম্মাণের ভার দেন। তাহারাই অক্ষর ঢালাই করে, তাহা দ্বারা ১৮০১ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে বাইবেলের সমগ্র নূতন বিধান (New Testament) মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইংলণ্ডের তদানীন্তন ভূপতি তৃতীয় জর্জ্জ ও ডেন-মার্কের রাজা ফ্রেডারিককে (Frederick) ঐ পুস্তক এক এক খণ্ড উপহার দেওয়া হয়।

১৮০১ খ্রীঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (Fort William College) স্থাপিত হইলে, কেরী ঐ কলেজে বাঙ্গালার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে কিছুকাল তিনি সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষাও শিক্ষা দিতেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু ও গোলকনাথ শর্ম্মা তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন। ঐ কলেজের ইংরেজ ছাত্রদের অধ্যয়নের জন্য কেরী নিজে কয়েক খানি বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করেন এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদের দ্বারাও কয়েক খানি পুস্তক রচনা করান। ১৮০১ খ্রীঃ অব্দেই কেরী রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। ঐ সকল পুস্তক শ্রীরামপুরেই মুদ্রিত হয়।

প্রায় উনত্রিশ বৎসর কেরী ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি বহু ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করেন। ঐ সকল দেশীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিবার ইচ্ছাতেই তিনি ভাষা শিক্ষা করেন। কলেজে অধ্যাপক রূপে কাজ করিলেও এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি খুব সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। ইংরেজ কোম্পানী বাহাদুরেরা এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা যথাসাধ্য কেরী ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে থাকেন। শ্রীরামপুর তখনও দিনেমার-রাজাধিকৃত ছিল বলিয়া কেরী কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য পাইতেন। ক্রমে ক্রমে কেরীর ধর্ম্মভাব ও অন্যান্য মহৎগুণের পরিচয় লাভ করিয়া উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের মনে বিরুদ্ধ ভাব অনেকটা প্রশমিত হয়। ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা লালবাজারের সন্নিকটে (বর্ত্তমান বহুবাজার ষ্ট্রীটে) কেরী একটি ভজনালয় নির্ম্মাণ করেন। সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর কাল ঐ স্থান হইতে তিনি খ্রীষ্টের বাণী লোক সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন।

কেরী ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা শ্রীরামপুর হইতে চুয়াল্লিশটি ভাষায় খ্রীষ্টিয় নানাবিধ ধর্ম্ম পুস্তক অনুবাদ করেন। তন্মধ্যে কেরী স্বয়ং চব্বিশটি ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে বাইবেলের কিয়দংশ সংস্কৃত ভাষায়ও অনুবাদ করেন।

শুধু খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মশাস্ত্র অনুবাদেই কেরীর সাহিত্য চর্চ্চা নিবদ্ধ ছিল না। তিনি সংস্কৃত মূলক ভাষা সমূহের একখানি অভিধানও সংকলন করেন। তেলেগু ও পাঞ্জাবী ভাষার ব্যাকরণ, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, সংস্কৃত রামায়ণের ইংরেজী অনুবাদ প্রভৃতি আরও গ্রন্থ তাঁহারা রচনা করেন। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডে তাহাদের অনেকগুলিই বিনষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন কেরীর অপর এক মহৎকীর্ত্তি। তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই শ্রীরামপুরের চতুষ্পার্শ্বে তাঁহারা অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে ঐ সকল পাঠশালার ছাত্র সংখ্যা প্রায় দশ হাজার হইয়াছিল। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই জুলাই শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। "এসিয়া মহাদেশের খ্রীষ্টিয়ান এবং তরুণ বয়স্ক লোকদের নিমিত্ত প্রতীচ্য সাহিত্য ও প্রাচ্য বিজ্ঞান শিক্ষাদানার্থ" ঐ কলেজ স্থাপিত হয়। ডেনমার্কের তদানীন্তন রাজা ৬ষ্ঠ ফ্রেডরিক উক্ত কলেজের প্রথম সর্ব্বাধ্যক্ষ (Governor এবং ভারতের বড়লাট লর্ড হেষ্টিংস উহার প্রথম সহায়ক (Patron) হইয়াছিলেন। কলেজের গৃহ নির্ম্মাণ ও অন্যান্য বিষয় বাবদ প্রায় আড়াইলক্ষ টাকা ব্যয় হয়। প্রথম বৎসর প্রায় একশত ছাত্র লইয়া কাজ আরম্ভ হয়। এই ছাত্রদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, মুসলমান, বাঙ্গালী ও অন্যান্য প্রদেশের ছাত্র ছিল। ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে ডেনমার্কের রাজা ঐ কলেজকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ে উপাধি দান করিবার ক্ষমতা দিয়া এক সনন্দ (Charter) প্রদান করেন। বলিতে গেলে শ্রীরামপুর কলেজেই ভারতের প্রথম রাজকীয় সনন্দ প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এই সকল শিক্ষাদান ও ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও কেরী দেশে অনেক প্রচলিত কুরীতি নিবারণেরও যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন, সতীদাহ নিবারণ প্রভৃতি কার্য্যেও তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

কেরী উদ্ভিদ বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন এবং এদেশের কৃষিকার্য্য ও উদ্যান শিল্পের উন্নতির জন্য অনেক পরিশ্রম করেন। তাঁহারই উৎসাহে ভারতীয় কৃষি সমিতি স্থাপিত হয়। রক্সবার্গ নামক তাঁহার এক বন্ধু ভারতীয় পুষ্প প্রভৃতি সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া অকালে পরলোক গমন করেন। কেরী সেই পুস্তকখানি সংশোধিত করিয়া প্রকাশিত করেন। কলিকাতার অপর পারে শিবপুরের প্রসিদ্ধ উদ্যানে তাঁহার মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপনা করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সরকার হইতে তজ্জন্য তাঁহাকে পেন্সন দেওয়া হয়।

১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে এই মহাপ্রাণ কর্ম্মবীর নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

কেশব—(১) বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে (৭৯৫—৮৩৪ খ্রীঃ ভাস্কর উজ্জ্বলের পুত্র কেশব, ৮২১ খ্রীঃ

অব্দে মহাবোধী নামক স্থানে সহস্র দ্রম্ম (রৌপ্য মুদ্রা) ব্যয় করিয়া একটী দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন এবং একটি চতুর্ম্মুখ মহাদেব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কেশব—(২) একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত, তিনি 'মুহূর্ত্তকল্পদ্রুম' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন। এক কেশব ১৪২০ শকে (১৪৯৮ খ্রীঃ) 'মুহূর্ত্ততত্ত্ব' নামক এক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন। অপর এক কেশব 'সন্তান দীপিকা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। আবার 'সুধা রঞ্জিনী' নামক ফলিত জ্যোতিষ গ্রন্থের প্রণেতা আর এক কেশবের বিবরণ পাওয়া যায়। ইহারা সকলে একই কেশব, না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

কেশব—(৩) তিনি অজ্ঞান ঠাকুর নামেও পরিচিত। দুইশত বৎসরেরও অধিক হইবে তিনি শ্রীহট্ট জিলার ইটা পরগণার অন্তর্গত বুড়ীকোণা গ্রামে নমশূদ্র ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম বয়সেই সন্ধ্যা-পূজায় বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব দর্শনে লোকের মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কথিত আছে রাখালেরা গরু হারাইলে তিনি তাহার সন্ধান বলিয়া দিতেন! রুগ্ন ব্যক্তি তাঁহার হস্তস্পর্শে আরোগ্য লাভ করিত। এই সব কারণে দিন দিন তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময়ে কুতব শাহ নামক এক বিখ্যাত মুসলমান ফকির ঐ প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিতও কেশব ঠাকুরের প্রণয় জন্মে। শেষ বয়সে তিনি সংসার ত্যাগী বৈরাগী হইয়াছিলেন। এই সময়ে ঔষধাদির জন্য তাঁহার নিকট এত লোক সমাগম হইত যে, তিনি মুহূর্ত্তও অবসর পাইতেন না। একবার তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলে, বহু লোক তাঁহার বহির্গমনের প্রতীক্ষায় বাহিরে অবস্থান করিতে লাগিল, কিন্তু সে দিন তিনি আর বাহিরে অসিলেন না। এই রূপে ক্রমাগত সাতদিন তিনি বাহির না হওয়ায়, সমাগত লোকেরা দরজা ভগ্ন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তিনি যে কোথায় গেলেন তাঁহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

কেশবকান্ত সিংহ—তিনি আসামের শেষ আহম বংশীয় স্বাধীন নরপতি চন্দ্রকান্ত সিংহের পৌত্র। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। এই বংশীয় নরপতিরা বহুকাল আসাম প্রদেশে রাজত্ব করিয়া ছিলেন। তাঁহারা বর্ম্মা প্রদেশের উত্তর স্থিত শানদেশ হইতে আসাম দেশে আগমন করিয়া ছিলেন। এই আহম বংশীয় চাহম ফা, হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ১৪৯৭ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তাঁহার প্রপৌত্র চুতুম হলা হিন্দু নাম জয়ধ্বজ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীবের সমসাময়িক ছিলেন। রাজা জয়ধ্বজ এক জন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট মীর জুম্‌লা নামক এক সেনাপতিকে আসাম জয় করিতে প্রেরণ করেন। মীর জুম্‌লা বিশেষরূপে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জয়ধ্বজ মুঘলদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন। ১৬৯৫ খ্রীঃ অব্দে রাজা রুদ্র সিংহ রাজা হন। তিনি এই বংশের এক জন শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তিনি শান্তিপুর অঞ্চল হইতে কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য ন্যায়বাগীশকে আসামে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার নিকট শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজারা অতি অকর্ম্মণ্য নরপতি ছিলেন। রাজা গৌরীনাথ দরং রাজ্যের কোচ রাজা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলে, ১৭৯২ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎপরে পূর্ব্বআসাম বর্ম্মার রাজা অধিকার করেন। ১৮২৬ খ্রীঃ অব্দে আসাম ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীন হয়। তদবধি তাঁহারা নামে মাত্র রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া গোহাটী নগরে অবস্থান করেন। গৌরীনাথের পরে তাঁহার ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত অগ্রজের উপাধি পাইয়াছিলেন। কেশবকান্ত এই চন্দ্রকান্তেরই পৌত্র। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

কেশব কাশ্মীরী—কাশ্মীর দেশবাসী এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিদ্যার বিচারে বঙ্গদেশ জয় করিবার জন্য, নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া, তথাকার পণ্ডিত মণ্ডলীকে তর্ক যুদ্ধে আহ্বান করেন। নিমাই পণ্ডিত তাঁহার সহিত বিচার করিবার জন্য গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তখনকার গঙ্গার শোভা বর্ণন করিয়া একটী স্তোত্র রচনা করিলেন। সকলে তাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু নিমাই পণ্ডিত তাঁহার প্রত্যেকটী শ্লোকের অলঙ্কারের দোষ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। কেশব কাশ্মীরী ম্লান মুখে প্রস্থান করিলেন। এই নিমাই পণ্ডিতই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য।

কেশব গোঁসাই—আসাম প্রদেশে মহাপুরুষ শঙ্কর দেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তিনি একজন গুরু। আহম নরপতি গদাধর সিংহ ও রুদ্র সিংহের রাজত্বকালে (১৬৮১ খ্রীঃ অব্দ—১৭১৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত) তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। গদাধরসিংহ বৈষ্ণব গোঁসাইদের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে, কেশব দেব গোঁসাই তাঁহার ওনিয়াতি নামক স্থানের ছত্র হইতে পলায়নপূর্ব্বক ভুটিয়া জাতির আশ্রয়ে

আত্মরক্ষা করেন। ১৬৯৬ খ্রীঃ অব্দে রাজা গদাধর সিংহ পরলোক গমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রসিংহ রাজা হন। তিনি বৈষ্ণব বিদ্বেষী না হইয়া বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। কেশব গোসাইকে তিনি তাঁহার পলায়িত গুপ্ত স্থান হইতে আনয়নপূর্ব্বক গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে তিনি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ছিলেন।

কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী—ময়মনসিংহের অন্তর্গত, মুক্তাগাছার জমিদার বংশের তিনি অন্যতম সুসন্তান। তিনি অতি সদাশয় লোক ছিলেন। জমিদার বলিয়া তাঁহার কিছু-মাত্র গর্ব্ব ছিল না। তিনি সর্ব্বসাধারণের সহিত জনহিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা যোগ দিতেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ওকালতি পাশ করিয়া, তিনি ময়মনসিংহ সদরে ওকালতী করিতেন। এই আইন ব্যবসায়েও স্বাধীন বুদ্ধির পরিচয় দিয়া, তিনি যথেষ্ট যশ ও সম্মান লাভ করেন। তাঁহার আত্মসম্মান বোধ অতিশয় প্রখর ছিল। একবার ঢাকা নগরে তথাকার প্রতাপান্বিত জমিদার ওয়াইজ সাহেবের প্রধান কর্ম্মচারী ডন সাহেবের গাড়ীর সহিত কেশব বাবুর গাড়ীর সংঘর্ষ হয়। ইহাতে ডন সাহেব অতিশয় উত্তেজিত হইয়া, কেশব বাবুকে আক্রমণ করেন। কেশববাবু পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট প্রহার করিয়া আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। ডন সাহেবও এই অপমানের বিষয় ভুলিয়া যান নাই। ১৮৬৬ সালে ময়মন-সিংহে কৃষি প্রদর্শনী মেলা হয়। সেই মেলার কার্য্যপরিচালনার ভার ডন সাহেবের হাতে ছিল। এই মেলার প্রবেশ পথে একদিন ডন সাহেব কেশব বাবুকে অপমান করেন। বলাবাহুল্য এজন্য তাঁহাকে কেশব বাবুর নিকট ক্ষমা চাহিতে হইয়াছিল। কেশব বাবু সাধারণতঃ কেশব মহারাজ নামেই অভিহিত হইতেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ রেলওয়ে আন্দোলনের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। তাঁহার গৃহ সমুদয় রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল। ভূম্যধিকারী সভা তাঁহারই যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ময়মনসিংহের সারস্বত সমিতির তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন এবং বহু বৎসর তাহার সভাপতি ছিলেন। 'আফগান বিবরণ' ও Law of Adoption গ্রন্থ তাঁহারই রচিত। তাঁহার একটী প্রকাণ্ড পুস্তকালয় ছিল। বহু সাহিত্যিক তাঁহার নিকট সাহায্য পাইতেন। তিনি ময়মনসিংহ সিটিস্কুল স্থাপন কর্ত্তাদের অন্যতম ছিলেন। এই স্কুলই পরে আনন্দমোহন কলেজে পরি-ণত হয়। তিনি একজন অসীম সাহসী শিকারী ছিলেন। তিনি যেরূপ

আতিথেয় সেইরূপ দাতাও ছিলেন। একবার তিনি এক ভিখারিণীকে এক-দিনের উপার্জ্জিত সমস্ত টাকা দান করিয়াছিলেন। অনেক দরিদ্র ছাত্র ও দুস্থ লোক তাঁহার নিকট নিয়মিত সাহায্য পাইত। জীবনের শেষভাগে তিনি কাশীবাসী হইয়াছিলেন। কাশীতেই ১২৯৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি পরলোক গমন করেন।

কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়— তিনি রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুণ্ডির জমিদার বংশের স্থাপনকর্ত্তা। তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস বর্দ্ধমান জিলায় ছিল। তাঁহার পিতার নাম শঙ্কর মুখোপাধ্যায়। কেশব সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে আসাম অভিযানে গমন করিয়া-ছিলেন। মানসিংহ কুণ্ডিতে (তৎকালে সূর্য্য কুণ্ডী নামে খ্যাত) উপস্থিত হইয়াই দিল্লীর সম্রাটের অসুস্থতার সংবাদ প্রাপ্ত হন। সেজন্য আসাম অভিযান পরিত্যক্ত হয়। মানসিংহ কেশবচন্দ্রকে কুণ্ডি পরগণার শাসন-কর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া দিল্লী গমন করেন। পরে ১৬২৮ খ্রীঃ অব্দে জাহা-ঙ্গীরের রাজত্বকালে কেশবচন্দ্র দিল্লীতে গমন করেন এবং প্রচুর 'পেসকশ' ও দুই বৎসরের খাজনা অগ্রিম প্রদান পূর্ব্বক কুণ্ডি পরগণার জমিদারীর সনন্দ ও 'রায় চৌধুরী' উপাধি প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে ঢাকা বাঙ্গালার রাজধানী ছিল এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র খুরম (পরে সম্রাট শা-জাহান) বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন (১৬২২—১৬২৬ খ্রীঃ অব্দ)। তিনি বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তার নিকট যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। মৃত্যুকালে তিনি আট পুত্র রাখিয়া যান। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামদেব চারি আনা এবং অবশিষ্ট সাতজন বার আনা অংশ সমান অংশে প্রাপ্ত হন। এই বংশে বহু জ্ঞানী, সাধু, বিদ্বান, সৎকর্ম্মানু-রাগী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্র রায়-- প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী সাংবাদিক। অতি সামান্য অবস্থা হইতে মেধা ও অধ্যবসায় বলে তিনি জীবনে বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে ফরিদপুর জিলার এক সামান্য গৃহস্থ পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। বিদ্যালয়ে কিছুকাল ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছিলেন মাত্র। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সামান্য ভাবে ইংরাজীতে প্রবন্ধ রচনা করিতে অভ্যাস করেন। প্রথমতঃ অধুনা লুপ্ত 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ (Indian Daily News) নামক দৈনিক সংবাদ পত্রে তাঁহার রচনা প্রকাশ হইতে থাকে। ক্রমে একাধিক ইংরেজী সংবাদ পত্রে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে। সংবাদ পত্র

সমূহের সংস্রবে আসিয়া তিনি সঠিক সংবাদ যথাসময়ে সরবরাহ করিবার বন্দোবস্তের অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করেন। তৎফলে মিঃ (পরে সার) এডওয়ার্ড বাক (Mr Edward Buck) ও আর একজন বাঙ্গালী সহকারীর সহিত একত্র হইয়া তিনি সংবাদ পত্রে সংবাদ সরবরাহের একটী আফিস খুলেন (১৯০৮ খ্রীঃ)। ক্রমে কেশবচন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রম, অসাধারণ ব্যবসায়বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে উহা 'অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেস' (Associated Press) নামে সংবাদ সরবরাহের এক বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বিখ্যাত ভূপর্য্যটক স্বেন হেডিন (Sven Hedin) যখন তিব্বত পরিক্রমায় গমন করেন, তখন কেশবচন্দ্র তাঁহারই নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া, জগতের নানা স্থানে প্রেরণ করেন।

অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেস পরে রয়টার (Rueter) নামক প্রসিদ্ধ বিলাতী সংবাদ প্রেরক প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিত হইয়া যায়। উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য ও সহকারী সমর্থনের জন্যই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া এই ব্যবস্থায় সম্মত হইতে হয়। এই ব্যবস্থার পর তিনি মৃত্যুকালাবধি ঐ সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের এক দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

তিনি কিছুকাল ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষৎ (Indian Legislative Assembly) ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের (Council of State) সদস্য ছিলেন। ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দে তিনি পূর্ব্বোক্ত সাংবাদিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংবাদ পত্র সেবীদের বৈঠকে যোগদান করেন। তদ্ভিন্ন ভারতেও তিনি নানাবিধ জনস্বার্থ সংবলিত সমিতির সদস্যরূপে লোক-সেবার সুযোগ লাভ করেন।

মৃত্যুর প্রাক্কালেও তিনি ব্যবস্থা পরিষদে, ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হ্রাস করিবার জন্য, যে আইন বিধিবদ্ধ হইবার কথা ছিল, তাহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিবার জন্য সংবাদাদি সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন। মাত্র সাতান্ন বৎসর বয়সে, ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের সময়েই পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া অল্পকাল পরেই দেহত্যাগ করেন।

কেশবচন্দ্র সেন—ভারত বিখ্যাত ধর্ম্মনেতা, বক্তা ও জনসেবক। তাঁহার পিতার নাম প্যারীমোহন সেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নবেম্বর (১২৪৫ বঙ্গাব্দের ৩রা অগ্রহায়ণ) কলিকাতা নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন সেই সময়ের কলিকাতার বৈদ্য সমাজের একজন বিশিষ্ট লোক ছিলেন।

বাল্যজীবন ও শিক্ষা।

কেশবচন্দ্রের বাল্যকালেই প্যারী-

মোহনের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার শিক্ষা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্রের তত্ত্বাবধানেই সম্পন্ন হয়। কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীটস্থ বর্ত্তমান অ্যালবার্ট হল নামক ভবনের সন্নিকটস্থ এক সামান্য পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। পরে, হিন্দু কলেজ, হিন্দু মেট্রপলিট্যান (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর) কলেজ প্রভৃতি স্থানেও তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েই তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। গণিত শাস্ত্রে তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন না বলিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা অথবা উপাধি লাভ করিতে পারেন নাই। বাল্যকাল হইতেই তিনি গম্ভীর প্রকৃতি, আত্মপ্রত্যয়ী, ধর্ম্মপ্রাণ এবং নীতি পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। সদ্‌গ্রন্থ পাঠে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সুরুচিসম্পন্ন আমোদ কৌতুকও তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল এবং ইংরেজ কবিদের কাব্য পাঠে বিশেষ আসক্তি ছিল। নির্জ্জন স্থানে বসিয়া আত্মচিন্তা করা, গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব সকল আলোচনা করা অথবা মহাপুরুষদের বাণী সকল পাঠ করা, তাঁহার বিশেষ প্রিয় কার্য্য ছিল। যৌবনকালেই বিষয় বৈরাগ্য তাঁহাকে অভিভূত করে। অল্পভাষী, ধীর প্রকৃতি চিন্তাশীল কেশবচন্দ্রকে সমবয়স্ক সহচরগণ অহঙ্কারী দাম্ভিক বলিয়া মনে করিতেন। অষ্টাদশবর্ষ বয়সে কুল প্রথানুযায়ী কেশবচন্দ্রের বিবাহ সম্পন্ন হয়। যৌবনসুলভ চাপল্য ও সুখপ্রিয়তা তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর তিনি পূর্ব্বেরই ন্যায় নিজেকে কঠোর নৈতিক শাসনাধীনে রাখিয়া বৈরাগ্য-ভাব প্রণোদিত হইয়া নির্জ্জন বাস ও শাস্ত্রানুশীলনেই অতিবাহিত করিতেন। নিজের নৈতিক জীবন উন্নত রাখা এবং অন্যকেও তদ্বিষয়ে সাহায্য করা কৈশোর হইতেই কেশবচন্দ্রের বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় ছিল। মাত্র সতের বৎসর বয়সেই, তিনি বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (The British India Society) নামে একটি সমিতির কাজে উৎসাহের সহিত যোগ দেন। তৎকালীন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং খ্যাতনামা খ্রীষ্টান পাদ্রীরা ঐ সমিতির কাজের সহিত যুক্ত ছিলেন। ঐ সমিতির পক্ষ হইতে ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাদেরই বাসভবনে একটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সেখানে অন্যান্য বিষয়ের সহিত ছাত্রদের নৈতিক জীবন উন্নতিরও চেষ্টা করা হইত। ঐ সময়েই আর একটি ঘটনা তাঁহার জীবনের উপর বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমানকালের আই-এ পরীক্ষার সমতুল, উচ্চ-বৃত্তি পরীক্ষা (Senior

Scholarship Examination) দিবার সময়ে, তিনি পরীক্ষা স্থলে অন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন এই সন্দেহে পরীক্ষা গৃহ হইতে বিতাড়িত হন। এই ঘটনায় তাঁহার মনে ঘোর ক্ষোভের উদ্রেক হয়। নিজের নৈতিক জীবনের উপর কলঙ্কের দাগ পড়িয়াছে এই চিন্তায় তাঁহার মনে তীব্র অনুতাপ উপস্থিত হয়। পরবর্ত্তীকালে, 'জীবন বেদ' নামক নিজ ধর্ম্ম জীবনের অভিজ্ঞতা জড়িত উপদেশ গ্রন্থে তিনি ঐ সময়ে নিজের অনুতাপ দগ্ধ জীবনের এক বিশদ বিবরণ দিয়াছিলেন। ঐ সময় হইতেই তিনি থিওডোর পার্কার (Theodore Parkar)প্রমুখ পাশ্চাত্য ধর্ম্মনেতাদের উপদেশাদি পাঠ করিয়া অনেকাংশে সান্ত্বনা লাভ করেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি গুড উইল ফ্রেটার্নিটি (Good Will Fraternity) নামে একটি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নিজ বাস গৃহেই ঐ সঙ্ঘের অধিবেশন হইত। সেই স্থলে তিনি পূর্ব্বোক্ত পাশ্চাত্য মনীষীগণের গ্রন্থাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন।

ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান।

বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র 'বাইবেল' তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। পরবর্ত্তী জীবনেও বাইবেল তাঁহার বিশেষ প্রিয় পুস্তক ছিল। এই বাইবেল পাঠ করিয়াই তিনি প্রধানতঃ নিরাকার উপাসনাতত্ত্বে জ্ঞান লাভ করেন। কিছুকাল পরে রাজনারায়ণ বসুর 'ব্রাহ্মধর্ম্ম কি' নামক পুস্তক পাঠ করিয়া রামমোহন প্রবর্ত্তিত ভারতীয় একেশ্বরবাদের সহিত পরিচয় লাভ ঘটে। তৎপরে ধীরে ধীরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচয় হয়। এই সময়েই প্রচলিত সামাজিক প্রথানুযায়ী তাঁহাকে গুরু মন্ত্র দিবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কেশবচন্দ্রের ঘোরতর অনিচ্ছা ও আপত্তিতে তাহা সম্ভব হয় নাই। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের মতবাদমূলক পুস্তিকাদি আনিয়া তাঁহার মাতাকে প্রদান করেন। মাতাও তাহা পাঠ করিয়া আকৃষ্ট হন এবং তদবধি পুত্রের নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে আর কিছু করিতে বলেন নাই। কিন্তু পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়স্বজন কেশব চন্দ্রের দেশ প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরাগ দেখিয়া বিশেষ রুষ্ট হন এবং নানাভাবে তাঁহাকে নিগৃহীত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সকল প্রকার বাধা বিপত্তির মধ্যেও কেশবচন্দ্র ধর্ম্ম বিশ্বাসে অটল ছিলেন। বরঞ্চ তৎফলে দেবেন্দ্র নাথের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্রমে তিনি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া পড়েন এবং ধীরে ধীরে প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন। (১৮৫৭ খ্রীঃ) স্বভাবসুলভ চিন্তাশীলতা, ধর্ম্মভাব

নীতিপরায়ণতা প্রভৃতি মহদ্‌গুণের জন্য অল্পকাল মধ্যেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে তিনি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য মনোনীত হন। তদুপলক্ষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি প্রদান করেন। ঐ সময়ে তিনি সস্ত্রীক ঠাকুরভবনে গমন করাতে পৈতৃক বাসভবন হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সপরিবারে দেবেন্দ্রনাথের ভবনেই বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে জ্ঞাতি-গণের চক্রান্তে তিনি স্বীয় বিষয় সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিলেন। পরে রাজবিধির সাহায্যে তিনি উহা পুনঃ লাভ করেন এবং কলুটোলাস্থ পৈত্রিক বাসভবনে নবজাত প্রথম পুত্রের জাতকর্ম্ম ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করেন।

ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া কেশবচন্দ্র কেবল নিজে অথবা কয়েকটি ধর্ম্মবন্ধুকে লইয়া ধর্ম্ম আলোচনায় তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মসমাজকে একটি শক্তিশালী কার্য্যকুশল ধর্ম্মসম্প্রদায়রূপে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন। তদু-পলক্ষে তিনি যে বিভিন্নভাবে নিজের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসার করেন তাহা বাস্ত-বিকই আশ্চর্য্যজনক। প্রথমে তিনি নিজ কলুটোলাস্থ বাস ভবনে কয়েকটি নিজ মতানুযায়ী যুবককে লইয়া 'সঙ্গত সভা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। চরিত্রোন্নতি ও সমাজ সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে তথায় আলোচনা হইত। উপবীত ত্যাগ, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের আয়োজন প্রভৃতি ও তাঁহাদের আলোচনার বিষয় ছিল। ঐ সঙ্গত সভা প্রতিষ্ঠার ফলে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যুগের অনেক রক্ষণশীলতা বিনষ্ট হয়। এই সঙ্গত সভার ভিতর দিয়া কেশবচন্দ্র ধর্ম্মমত ও জীবন এক করিবার চেষ্টা করিতেন এবং সত্যরক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রাণগত চেষ্টা ছিল। পরবর্ত্তীকালে কেশব-চন্দ্রেরই 'ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান' নামক পুস্তিকা প্রচারের ফলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও উপবীত ত্যাগ করেন এবং তাঁহারই গৃহে প্রথম ব্রাহ্মমতে এক বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহচরগণের অগ্রগতির প্রাবল্যে ব্রাহ্মসমাজেও অনেকের মনে আশঙ্কার উদয় হয়। প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঐরূপ তীব্র অভিযানকে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেন এবং তৎফলে তাঁহাদের অনেকে একটু পার্থক্য অবলম্বন করিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের এই সমাজ সংস্কারমূলক কার্য্যে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা বিশেষ উৎফুল্ল হন। তাঁহা-দের আশা হইয়াছিল যে কালক্রমে ব্রাহ্মসমাজ এদেশীয় খ্রীষ্ট সমাজেরই অঙ্গীভূত হইয়া যাইবে। এই সঙ্গত

সভার সদস্যগণই পরে কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে প্রধান সহায় হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার মতাবলম্বীদিগের অত্যুগ্র সংস্কারমূলক আন্দোলনে ব্রাহ্ম সমাজের প্রাচীন সম্প্রদায় বিশেষ শঙ্কিত হন। তাঁহারা কেশবচন্দ্রের অগ্রগতির সহিত সমানতালে চলিতে পারিলেন না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত এজন্য অনেক বিষয়ে তাঁহার মতানৈক্য ঘটিতে লাগিল। তৎফলে কেশবচন্দ্র তাঁহার মতানুসারী ব্যক্তিদিগকে লইয়া ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দের ১১ই নবেম্বর 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। তৎপূর্ব্বেই তিনি নানাস্থানে বক্তৃতা প্রদান, ইণ্ডিয়ান মিরার (Indian Mirror) নামক পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা জনসমাজে তাঁহার মত প্রচার করিতে থাকেন। এই কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ সাহসের এবং অভূতপূর্ব্ব কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেশবের 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপনের উদ্যোগ হওয়াতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত প্রাচীন সমাজ 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ' নাম ধারণ করে। কলিকাতাস্থ যোড়াসাঁকো অঞ্চলে চিৎপুর রোডে রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ভবন তাঁহাদের উপাসনালয় ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজ অনেকাংশে একতন্ত্র ছিল। যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবংশই প্রধানতঃ ঐ সমাজের কর্ত্তা ছিলেন। কেশবচন্দ্র নিজ প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় সমাজকে যথা সম্ভব জনমতের অধীনরূপে পরিচালনা করিবার মনস্থ করেন। সেই কারণে তিনি নূতন সমাজের সদস্যগণকে লইয়া একটি সাধারণ সভা সংগঠন করেন। তৎসঙ্গে একটি প্রচার বিভাগও স্থাপিত হয়। সাধারণের অর্থে এবং সকলের সমবেত অভিপ্রায়ে উহার সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে থাকে।

১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী প্রমুখ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যগণ তথায় সপ্তাহান্তে ইংরেজী ও বাঙ্গালায় ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করিতেন। কেশবচন্দ্রই প্রধানতঃ ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতেন। কয়েকবৎসরের মধ্যে ভবানীপুরে উহার একটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের নিকট ব্রহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং বহুদিন ধরিয়া উহার কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়াছিল।

১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দেরই প্রায় শেষভাগে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের সহিত জল

পথে সিংহল ভ্রমণে গমন করেন। ঐ ভ্রমণের ফলে দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম ভাবের গভীর যোগ-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। উহার কিছুকাল পরে তিনি, আত্মীয় স্বজনদের অনুরোধে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে (Bank of Bengal) একটি কেরাণীর কাজ গ্রহণ করেন। ঐ পদে তিনি ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের জুলাই পর্য্যন্ত কাজ করেন। তৎপরে ব্রাহ্ম সমাজের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিয়োগ করিবার জন্য তিনি উহা পরিত্যাগ করেন। উক্ত বৈষয়িক কাজে লিপ্ত থাকিবার সময়েই ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দের জুন মাস হইতে তিনি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া প্রচার করিতে থাকেন। সর্ব্বমোট বার খানি পুস্তিকা প্রকাশ হয়। প্রথমখানির অভিধান ছিল 'যুবক বঙ্গ, ইহা তোমাদের জন্য' (Young Bengal, This is for You) তদ্ভিন্ন 'প্রেমের ধর্ম্ম', প্রার্থনাশীল হও' প্রভৃতি নামে আরও কয়েকখানি পুস্তিকা প্রকাশ হয়। যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মাকাঙ্খা জাগ্রত করা, তাহাদিগকে ন্যায় ও সাধুতার পথে চলিতে সাহায্য করাই এই সকল পুস্তিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল প্রকাশের ফলে দেশের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক আন্দোলন উপস্থিত হইল। অল্পকাল মধ্যেই তিনি যুবক সম্প্রদায়ের অবিসংবাদী নেতা রূপে পরিগণিত হইলেন। শত শত যুবক তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিতে উদ্গ্রীব হইয়া থাকিত। ইহারই কিছুকাল পরে, তিনি পূর্ব্বোক্ত সঙ্গত সভা প্রতিষ্ঠা করেন। সঙ্গত সভার সদস্যগণের মধ্যে অল্পকালেই যাহাতে গভীর ধর্ম্মভাব, বিবেকানুবর্ত্তীতা কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য সর্ব্বপ্রকার দুঃখবরণ, প্রভৃতি এই সকলভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই কেশবচন্দ্র ধর্ম্মজীবন সংঘঠন ও ধর্ম্ম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য ব্যাঙ্কের কাজ ছাড়িয়া দেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে ১৩ই এপ্রিল (১২৬৯ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ) কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে বৃত হন। তৎসঙ্গে দেবেন্দ্র নাথ তাঁহাকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিও প্রদান করেন। দেবেন্দ্রনাথের এই কার্য্যে প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মেরা বিশেষ সন্তুষ্ট হন নাই। কিন্তু কেশবচন্দ্রের প্রতিভা ও কার্য্য ক্ষমতার উপর দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ আস্থা ছিল বলিয়া তিনি অন্যদের আপত্তিকে বিশেষ বিবেচনার মধ্যে আনেন নাই। তাহার পূর্ব্ব হইতেই, জনসাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য কেশবচন্দ্র বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। উপযুক্ত সুযোগ ও কর্ম্মীর অভাবেই নিজ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ক্রমে

অনুরাগী সহকর্ম্মীদের উৎসাহে তিনি নিজে প্রথমে শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া প্রভৃতি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে প্রচার কার্য্যে গমন করিতে থাকেন। পরে দীর্ঘকাল পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানেও ভ্রমণ করেন। এই সকল কার্য্যে যাহারা তাঁহার সঙ্গে উৎসাহের সহিত যোগ দিয়া কাজ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উমানাথ গুপ্ত, অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ বসু, অঘোরনাথ গুপ্ত, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি প্রধান। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রচার যাত্রার ফলে দেশে এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়। একদিকে যেরূপ উন্নতিশীল ব্যক্তিগণ কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার সাহচর্য্য লাভ করিয়া নিজদিগকে উপকৃত মনে করিতে লাগিলেন, অপর দিকে, রক্ষণশীল সম্প্রদায়ও বিশেষ ভাবে নূতন ধর্ম্মমত ও উন্নত ভাবধারার প্রভাবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উহার গতিরোধে বদ্ধপরিকর হইলেন। নানা স্থানে কেশবচন্দ্রের মতানুযায়ী ব্যক্তিদিগের উপর কঠিন নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। উদীয়মান ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রভাব হইতে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য নানা স্থানে 'হিন্দু হিতৈষী সভা' প্রতিষ্ঠিত হইল। এই ধর্ম্ম প্রচার উপলক্ষে কেশবচন্দ্র বাঙ্গালা দেশের ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও উত্তর বঙ্গের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এইরূপ প্রচারের ফলে মফস্বলের নানা স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নূতন নূতন প্রচারক নিযুক্ত হন। এই প্রচার কার্য্য বরাবরই চলিয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজে নানাবিধ কার্য্য। কেশবচন্দ্রই প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজে নানারূপ সমাজ সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীনে ব্রাহ্ম-সম্প্রদায় হিন্দু সমাজের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াই ঔপনিষদিক ব্রহ্মপূজা গ্রহণ করেন। সামাজিক ক্রিয়া কলাপাদি প্রায় প্রচলিত দেশাচার মতই অনুষ্ঠিত হইত। কেশবচন্দ্র প্রথম অসবর্ণ বিবাহ ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে দেবেন্দ্রনাথের কন্যা সুকুমারীর বিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইলেও উহা অসবর্ণ বিবাহ ছিল না। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে, কেশবচন্দ্রের বিশেষ চেষ্টায় কলিকাতা নগরীতে প্রথম অসবর্ণ ব্রাহ্মবিবাহ সম্পন্ন হয়। দেবেন্দ্রনাথ উক্ত বিবাহ সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন না করিলেও, উহার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই।

ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্য প্রথম অবস্থায় হিন্দু প্রথানুযায়ী, ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতে মনোনীত হইতেন। কেশবচন্দ্র এই ব্যবস্থায় তীব্র প্রতিবাদ করেন। যদিও তিনিই প্রথম অ-ব্রাহ্মণ আচার্য্য

ছিলেন, তথাপি তিনি উপবীতধারী আচার্য্য নিয়োগের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন করেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রথমতঃ এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। পরিশেষে কেশবচন্দ্রের আন্দোলনে বাধ্য হইয়াই, তাঁহার সহকর্ম্মীদের মধ্য হইতে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে ব্রাহ্মসমাজের 'উপাচার্য্য' নিযুক্ত করিলেন। ইহাঁরা ব্রাহ্মণ হইলেও উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই নিয়োগের ফলে পূর্ব্ববর্ত্তী উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণের পদচ্যুতি ঘটে। তৎফলে প্রাচীন পন্থী ব্রাহ্মদের মধ্যে ঘোরতর অসন্তোষ উপস্থিত হয়।

কেশবচন্দ্রের 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরই প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্ম সমাজের নেতা, আচার্য্য ও পরিচালক ছিলেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য জনমতানুবর্ত্তীতার দ্বারা পরিচালনা করার চেষ্টা করেন। প্রথম প্রথম দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে কিছু সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের অতিদ্রুত অগ্রগতির ফলে প্রাচীন পন্থীরা ভীত হইয়া পড়েন এবং সমাজ পরিচালনা সম্পর্কে নানা ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া নব্য সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের বিরোধ ঘটিতে থাকে। এই সকল বিরোধই বৃহদাকার ধারণ করাতে, এবং প্রাচীনপন্থীদিগকে স্বমতে আনয়ন করিতে অসমর্থ হইয়া কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নারীদিগকে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান ও তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা ও ধর্ম্মভাব প্রচলনের চেষ্টাও কেশবচন্দ্রের অন্যতম কীর্ত্তি। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে তিনি যে তাঁহার পত্নীকে লইয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে গমন করিয়াছিলেন, তাহাই এ বিষয়ে তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি, ধর্ম্মবন্ধুদিগের পত্নীদের মধ্যেও যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বৈশিষ্ট প্রচারের সুবিধা হয়, তাঁহারাও যাহাতে সমাজের উপাসনাদিতে যোগ দিয়া উপকৃত হইতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে 'ব্রাহ্মিকাসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথকভাবে, পৃথকদিনে এই ব্রাহ্মিকা সমাজের অধিবেশন হইত। কেশবচন্দ্রই প্রধানতঃ ঐ অধিবেশনগুলিতে উপস্থিত থাকিয়া উপদেশাদি দিতেন। এই ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বেই, হিন্দু মহিলাদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এক আয়োজন হয়। পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন, পরীক্ষা গ্রহণ, সাফল্যের জন্য পুরস্কার প্রদান প্রভৃতি দ্বারা অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হয়। তদ্ভিন্ন 'বামাবোধিনী' নামে মহিলাদের জন্য একখানি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত

হইতে আরম্ভ করে। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত উহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। এদেশে নারীদিগের উপযোগী ইহাই প্রথম পত্রিকা। কেশবচন্দ্র এই ভাবে ধীরে ধীরে নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ও অন্যান্য যে সকল উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার সহকর্ম্মীদের মধ্যে অনেকে তাহা যথেষ্ট মনে করেন নাই। এই শেষোক্ত সম্প্রদায় অধিকতর এবং দ্রুত উন্নতির চেষ্টা করিতে থাকেন। কেশবচন্দ্র সাক্ষাৎ ভাবে বাধা না দিলেও, তাঁহাদের কার্য্যে বিশেষ আগ্রহ দেখান নাই। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে জনহিত-ব্রতিনী ইংরেজ মহিলা কুমারী মেরী কার্পেণ্টার এদেশে আগমন করেন। ব্রাহ্মিকাসমাজের পক্ষ হইতে তাহাকে একটি অভিনন্দন দেওয়া হয়। তাহার-পর একদিন কেশবচন্দ্রের বাসভবনে, উপাসনাদির পর, কেশবচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে সংস্কারপন্থী ব্রাহ্মদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ নিজ পত্নীকে উপস্থিত ধর্ম্মবন্ধুদিগের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। কেশবচন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় এই কার্য্যের প্রতিবাদ করেন। ইহাতে তাঁহার সহকর্ম্মীদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার কার্য্যে অসন্তুষ্ট হন। ইহার কতিপয় বর্ষ পরে (১৮৭১ খ্রীঃ) প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের মধ্যে কেহ কেহ প্রস্তাব করেন যে ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনার সময়ে মহিলাগণ ইচ্ছা করিলে যবনিকার বাহিরে পুরুষদিগের নিকট বসিতে পারিবেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই প্রস্তাবে তাদৃশ মনোযোগ প্রদর্শন না করাতে তাঁহারা নিজেরাই এবিষয়ে অগ্রবর্ত্তী হন। তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীর এবং দুর্গামোহন দাস, প্রথমে পরিবারের মহিলাগণ সহ যবনিকার বাহিরে সকলের মধ্যে বসিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে ব্রাহ্মদের মধ্যে মতভেদ ও আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং ব্রাহ্ম সাম্প্রদায়িক পত্রিকাতে তাঁহাদের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সংস্কার পন্থীরা তাহাতে ভীত না হইয়া, কিছুকালের জন্য পৃথক ভাবে নিজেদের জন্য উপাসনার আয়োজন করেন। পরে তাঁহাদের মধ্যে আপোষ হইয়া যায় এবং ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাগণের বসিবার জন্য পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়।

১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে কেশবচন্দ্র উচ্চ শিক্ষা প্রচারের জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে শিক্ষিত এবং উদার মতাবলম্বী ইংরেজ দিগকে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলে, ভারত প্রবাসী ইংরেজ শাসক কর্ত্তৃপক্ষকে সহজে তন্মতাবলম্বী করা যাইতে পারিবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি

ইংলণ্ডস্থিত কতিপয় মনীষীর সহিত এবিষয়ে পত্রালাপ করিতে থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এবিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহ দান করেন ও সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দেন। ভারত প্রত্যাগত অনেক অবসর প্রাপ্ত উচ্চ রাজ কর্ম্মচারী, কিন্তু এবিষয়ে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। এই সকল পত্র-আলাপের ও অন্যান্য চেষ্টার ফলে পরবর্ত্তী বৎসরে 'কলিকাতা কলেজ' (Calcutta College) নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কেশবচন্দ্র উহার প্রথম অধ্যক্ষ ও কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও উহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অনেক অর্থসাহায্য করেন। কেশবচন্দ্রের সহকর্ম্মীদের মধ্যে অনেকে ঐ বিদ্যালয়ে বিনাবেতনে শিক্ষা দান করিতে থাকেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে কেশবচন্দ্রের বিশেষ উৎসাহ ছিল। রাঁচী, বর্দ্ধমান, চন্দননগর, ভাস্তরা, কোন্নগর প্রভৃতি স্থানে সহকর্ম্মীদের ও জনসাধারণের সাহায্যে তিনি অনেকগুলি বালক ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ভারতীয় সংস্কার সমিতি (Indian Reform Association) স্থাপন করেন, তাহার পক্ষ হইতে, তাঁহারই অন্যতম সহকর্ম্মী হরানন্দ বসু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'কলিকাতা শিক্ষালয়' নামক প্রতিষ্ঠানের ভার গ্রহণ করা হয় এবং পরে উহাকে কলেজে পরিণত করিয়া অ্যালবার্ট কলেজ (Albert College) নাম দেওয়া হয়। কেশবচন্দ্রের অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেন তাঁহার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

নারী শিক্ষার জন্য কেশবচন্দ্র যেসব ব্যবস্থা করেন, তাহা তাঁহার সহকর্ম্মীদের মধ্যে অনেকের নিকট পর্য্যাপ্ত বোধ না হওয়ায়, তাঁহারা পৃথক ভাবে 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। উহার নাম পরে 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' হয় এবং আরও পরবর্ত্তীকালে বর্ত্তমান বেথুন স্কুলের সহিত মিলিত হইয়া যায়।

পরবর্ত্তীকালে নিজ ধর্ম্মমণ্ডলীর মহিলাগণের মধ্যে ধর্ম্মচর্চ্চার বিস্তৃতি সাধনের জন্য তিনি 'আর্য্য নারী সমাজ' নামে একটী সমিতি স্থাপন করেন এবং কিভাবে ঐ মণ্ডলী ভুক্ত মহিলাগণ ধর্ম্ম সাধন পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবেন, তদ্বিষয়ে নানারূপ ব্যবস্থাও প্রদান করেন। এই আর্য্যনারী সমাজের কাজ বহুদিন পর্য্যন্ত সুচারুরূপে চলিয়াছিল। ১৮৬১ সালে তিনি 'ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। উহাতে ব্রাহ্ম নামে পরিচিত ব্যক্তিদিগের সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ক্রিয়া কলাপ কি ভাবে সম্পন্ন করা উচিত তাহাই বিস্তৃতভাবে আলোচিত

ও তত্তৎবিষয়ে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং কেশবচন্দ্রের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া উপবীত পরিত্যাগ করেন। ১৮৬৩ সালে বোম্বাই প্রদেশ হইতে ডাঃ ভাউদাজি নামে একজন উচ্চ শিক্ষিত পার্শী ভদ্রলোক কলিকাতা আগমন করেন। তাঁহার সহিত পরিচয়ের ফলে কেশবচন্দ্র সোসাইটি অব থিষ্টিক ফ্রেণ্ডস্ (Theistic Friends' Society) নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ঐ সমিতি হইতেই প্রথমতঃ স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের পূর্ব্বোক্ত আয়োজন হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজকে একটি শৃঙ্খলাধীন সুনিয়ন্ত্রিত ধর্ম্মসমাজে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন (২৩১ পৃঃ)। এতদুপলক্ষে 'ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা' নামে একটি সমিতি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সভাকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই, প্রাচীন পন্থীদের সহিত, উপবীতধারী আচার্য্য নিয়োগের বিরুদ্ধতা করার জন্য তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ বিবাদের মধ্যস্থতা করিতে অসমর্থ হইয়া, সমুদয় বিষয় পরিচালনা করিবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্রের অন্যতম সহকর্ম্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে পূর্ব্বে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পরিচালনার ভার প্রদত্ত হইয়াছিল। এক্ষণে দেবেন্দ্রনাথ উহা অপরের হস্তে প্রদান করিলেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করিবার জন্য পত্রিকার অভাব বোধ করিয়া, 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় ব্রাহ্মসমাজের কাজ নিয়মতান্ত্রিক ভাবে চালাইবার জন্য আন্দোলন উপস্থিত হয়। তৎফলে প্রাচীন পন্থীদের সহিত কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুগামীদের ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হয়। এতৎ সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজকে সর্ব্বপ্রকারে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ প্রথার প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার জন্যও তিনি দেবেন্দ্রনাথের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। কেশবচন্দ্রের প্রতি অসীম স্নেহ থাকা সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সংস্কার মূলক কার্য্যগুলিকে বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কেশবচন্দ্রও নিজ বিচারলব্ধ চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ না পাইয়া, বাধ্য হইয়া সদলবলে মূল (আদি) ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়া, 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন (১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দ)।

এই সকল চিত্তবিক্ষিপ্তকারী কার্য্যের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার,

ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে দেশে শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন প্রভৃতি কার্য্যে তিনি অবহেলা করেন নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে, এমন কি সুদূর মাদ্রাজ ওবোম্বাই প্রদেশে বহু ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এই প্রচার কার্য্যের জন্য যে সকল স্থানে গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মুঙ্গের অন্যতম। ঐ স্থানে তাঁহার বক্তৃতাদির ফলে প্রবল ভাবোচ্ছাস পরিলক্ষিত হয় এবং তৎফলে কেশবচন্দ্রকে অবতার অথবা অলৌকিক পুরুষজ্ঞানে যে ভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজে আর এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। কেশবচন্দ্রকে সম্মান প্রদর্শনচ্ছলে ব্রাহ্মসমাজে নরপূজার আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া, অনেকে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন। কেশবচন্দ্রের দীর্ঘকালের সহকর্ম্মী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই আন্দোলনকারীদের মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন।

ইংলণ্ডে গমন।

১৮৭০ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন। রাজা রামমোহন রায়ের পরে ইতিমধ্যে আর কোনও ভারতবাসী ধর্ম্মের বার্ত্তা লইয়া পাশ্চাত্য দেশে গমন করেন নাই। পূর্ব্ব হইতেই বক্তা, ধর্ম্মনেতা ও সমাজ সংস্কারক রূপে কেশবচন্দ্রের খ্যাতি ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছিল। তথায়ও তিনি নানা স্থানে বক্তৃতা প্রদান করিয়া নিজের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় ও ভারতবাসীর গৌরব প্রচার করেন। ইংলণ্ডের বহু প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক ও মনীষী তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া নানা ভাবে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি ইংলণ্ডের অনেক প্রসিদ্ধ স্থানে গমন করেন এবং সর্ব্বত্রই রাজোচিত সম্মান লাভ করিয়া দেশের মুখোজ্জল করেন। ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন (Mr Gladstone), এমন কি মহারাণী ভিক্টোরিয়াও তাঁহাকে সাক্ষাৎদান করিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন। মাত্র ছয় মাস কাল তিনি ইংলণ্ডে ছিলেন কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে ভাবে ইংলণ্ডের মনীষা সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজ প্রতিভার পরিচয় দিয়া মহান সম্মানের অধিকারী হন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে কাহারও ভাগ্যে এপর্যান্ত ঘটে নাই।

ভারতে প্রত্যাগমন।

ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে (১৮৭০ খ্রীঃ মার্চ্চ) তাঁহার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসিগণ নানা ভাবে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

বাঙ্গালার বাহিরে প্রচার।

ধর্ম্মপ্রচার ও সমাজসংস্কার মূলক কাজের জন্য কেশবচন্দ্র বাঙ্গালা দেশের

বাহিরেও বহু স্থানে গমন করেন। বাঙ্গালা দেশে কেশবচন্দ্রের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কথা অন্যান্য প্রদেশেও বিস্তার লাভ করিলে, সেই সকল স্থান হইতে তাঁহাকে তথায় যাইবার জন্য আমন্ত্রন করা হয়। তৎকালে ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রথম মাদ্রাজ ও বোম্বাই গমন করেন। তাঁহার ঐ প্রচার যাত্রার ফলে মাদ্রাজে "বেদ-সমাজ" নামে একেশ্বরবাদ মূলক একটি ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। পুনরায় ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভাগলপুর, বাঁকীপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, দিল্লী প্রভৃতি উত্তর ভারতের বহু স্থানে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করেন এবং সর্ব্বত্রই বক্তৃতা প্রদান, ধর্ম্ম আলোচনা প্রভৃতি দ্বারা মহান উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। পরবর্ত্তী বৎসর পুনরায় বিহার, মধ্য-প্রদেশ ও বোম্বাই প্রদেশে গমন করেন। বোম্বাই নগরীতে তিনি তাঁহার স্বভাব সুলভ বাগ্মীতা দ্বারা শিক্ষিত ইংরেজ ও ভারতীয়গণের উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন এবং প্রভূত সম্মান লাভ করেন। তৎপরে ১৮৭১ হইতে ১৮৭৬ সালের মধ্যেও একাধিক বার উত্তর ভারতের নানাস্থানে গমন করিয়া মহান ধর্ম্ম আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। ১৮৮১ সালে তিনি সপরিবারে স্বাস্থ্য লাভার্থ নৈনীতাল গমন করেন। সেই স্থানেও বক্তৃতা প্রদান, ধর্ম্মালোচনা প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা নিজ ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন-কালে, নৈনীতালের শিক্ষিত লোকেরা একটী জনসভায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ১৮৮২ সালে কেশবচন্দ্র 'দেশীয় নারী শিক্ষালয়' (Native Ladies' Institution) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ঐ শিক্ষায়তনটি একটু ভিন্ন প্রণালীতে পরিচালিত হইত। উপস্থিত বালিকা ও মহিলাদিগকে যে সকল বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল, তত্তৎবিষয়ে পরীক্ষা করিয়া পুরস্কারাদি প্রদান করা হইত। বিষয় নির্ব্বাচন অনেকটা ছাত্রীদের অভিরুচির উপর নির্ভর করিত। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গের রত্ন স্থানীয় মনীষীগণ বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। কলিকাতার বর্ত্তমান অন্যতম বালিকাদের কলেজ ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন (Victoria Institution) কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ শিক্ষালয়টির পূর্ব্ব নাম ছিল মেট্রপলিটান গার্ল'স স্কুল (Matropolitan Girls' School)। ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে উহার নাম পরিবর্ত্তন হয়।

নিজ মণ্ডলীর মধ্যে বৈদিক শাস্ত্র

চর্চ্চার জন্য ১৮৮৩ সালে তিনি 'বেদ বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। তৎকালীন খ্যাতনামা বৈদিক পণ্ডিতগণ তথায় অধ্যাপনা করিতেন। এই বিদ্যালয়টি কয়েক বৎসর চলিয়াছিল।

প্রধানতঃ ধর্ম্ম সমাজের নেতা হইলেও দেশের সর্ব্ববিধ অগ্রগতির সহিত কেশব চন্দ্রের যোগ ছিল। সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রিকা পরিচালনা তাহাদের অন্যতম। নারীদিগের উপযোগী পত্রিকা প্রকাশ তিনিই প্রথম করেন। বামা বোধিনী পত্রিকার নাম পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি 'পরিচারিকা' নাম্নী আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটিও দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। ঐ সময়েই "বাল্য বন্ধু" নামে বালক বালিকাদের উপযোগী একটী পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেন। পূর্ব্বে যে সঙ্গত সভার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার পক্ষ হইতে 'ধর্ম্মসাধন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উমেশচন্দ্র দত্ত উহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ঐ পত্রিকাখানি তিন বৎসর চলিয়াছিল। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। দেবেন্দ্রনাথের সহিত ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য প্রণালী সম্পর্কে মতদ্বৈধ হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সমুদয় ভার পুনরায় স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তখন কেশবচন্দ্র উক্ত পত্রিকাখানিকে নিজ মণ্ডলীর মুখপত্র স্বরূপ প্রকাশ করেন। স্ব প্রতিষ্ঠিত "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" যখন "নববিধান" নাম গ্রহণ করে, তখন ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাস হইতে নববিধানের মুখপত্ররূপে ইংরাজিতে "দি নিউ ডিস্‌পেন্‌সেসন" (The New Dispensation) নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। উক্ত পত্রিকাখানি 'নববিধান' এই নামে এখনও প্রকাশিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকাখানিও পাক্ষিক পত্রিকারূপে এখনও বাহির হইতেছে।

১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্রের মিলিত প্রচেষ্টায় "ইণ্ডিয়ান মিরর" (Indian Mirror) নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ বাঙ্গালা মুখপত্র ছিল, মিরর সেইরূপ ইংরেজি পত্রিকা হইল। প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী মনোমোহন ঘোষ কিছুকাল ঐ পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে দেবেন্দ্রনাথের সহিত বিরোধের ফলে মিরর সম্পূর্ণরূপে কেশবচন্দ্রের করায়ত্ত হয় এবং তিনি উহাকে বিশেষভাবে নিজ মণ্ডলীর পত্রিকারূপে প্রকাশ করিতে থাকেন। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে

মিরর দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয়। উহাই খুব সম্ভব দেশীয়গণের পরিচালিত প্রথম ইংরেজি দৈনিক। দীর্ঘকাল পরে উহা কেশবচন্দ্রের সম্পর্কিত ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ সেনের হস্তগত হয় এবং সাধারণ দৈনিক সংবাদপত্ররূপে প্রকাশিত হইতে থাকে।

ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর, পূর্ব্বোক্ত ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসো-সিয়েসনের পক্ষ হইতে 'সুলভ সমাচার' নামে একখানি এক পয়সা মূল্যের দৈনিক বাঙ্গালা পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সুলভ সমাচার বাঙ্গালা দৈনিকের পথ প্রদর্শক এই পত্রিকাখানি বহুদিন পরে কেশবচন্দ্রের হস্ত হইতে চলিয়া যায়।

'সান্‌ডে মিরার' (Sunday Mirror) নামে একখানি পত্রিকাও কেশবচন্দ্র প্রকাশ করেন। তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন কিছুকাল উহার সম্পাদক ছিলেন।

কুচবিহার বিবাহ ও নববিধান

১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দের প্রথম ভাগে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত কুচবিহারের তদানীন্তন রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের বিবাহ হয়। এই বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্ম সমাজে এক ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং তৎফলে "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ" নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। যাঁহারা এই বিষয়ে, কেশবচন্দ্রের কার্য্যের প্রতি-বাদ করিয়া পৃথক হইয়া আসেন, তাঁহাদের প্রধান বক্তব্য ছিল যে কেশব চন্দ্রের কন্যা ও পাত্র উভয়েই পূর্ব্বোক্ত তিন আইনানুসারে অপ্রাপ্ত বয়স্ক। তদ্ভিন্ন ঐ বিবাহ ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে হইবে না এবং বস্তুতঃ তাহা হয়ও নাই। কেশবচন্দ্রকে এ বিষয়ে মত পরিবর্ত্তন করিতে অথবা সম্পূর্ণ ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনু-সারে বিবাহ দিতে বলিয়া কোনও ফল না হওয়াতে পৃথক সমাজের উদ্ভব হয়। (১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দের মে মাস)। এই বিচ্ছেদ কেশবচন্দ্রকে বিশেষভাবে অভিভূত করে এবং তিনি স্বমতানুবর্ত্তী ধর্ম্মবন্ধুগণকে লইয়া (১৮৮০ খ্রীঃ) "নব-বিধান" এই নামে পূর্ব্বোক্ত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজকে নুতনরূপ দান করিলেন। তদবধি কলিকাতাস্থ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের (বর্ত্তমান নাম কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট) ব্রহ্মমন্দির নববিধান মন্দির নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এই "নববিধান"কে তিনি জগতের প্রচলিত সমুদয় প্রধান ধর্ম্মের সারভূত বলিয়া বর্ণনা করেন। নববিধানের ক্ষেত্রে সকল ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, ইহাই তাঁহার, তদুপলক্ষে প্রদত্ত উপদেশের সার মর্ম্ম ছিল।

ধর্ম্মমণ্ডলী গঠন।

ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিবার সময় হইতেই কেশবচন্দ্র নিজ প্রতিভা ও আকর্ষণী

শক্তি বলে কতিপয় ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিকে তাঁহার অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মীরূপে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা কেশবচন্দ্রের চিন্তা ধারার সহিত সম্পূর্ণভাবে নিজদিগকে একীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পূর্ব্বে বৈষয়িক কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাঁহাদিগকে এরূপ অভিভূত করে যে তাঁহারা সমুদয় বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম পথের যাত্রীরূপে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আজীবন কেশবচন্দ্রের একনিষ্ঠ সেবক ও অন্তরঙ্গ ধর্ম্মবন্ধু ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার বিলাস বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া কঠোর দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করেন। সংসারে থাকিয়া গভীর ধর্ম্মসাধন এবং তাহার সহিত কঠিন দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহারা লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া কেশবচন্দ্রকে বড় হইবার যে সাহায্য করেন, তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয়। এই সকল নীরব কর্ম্মীদের নাম সংবাদপত্রের ঘোষণার দ্বারা লোক সমাজে প্রচারিত হইবার সুযোগ পায় নাই। কিন্তু ভারতের সর্ব্বপ্রকার উদার ধর্ম্ম আন্দোলনের ইতিহাস যদি কখনও নিরপেক্ষ লোক দ্বারা লিখিত হয় তবে এই সকল নীরব সাধকগণের ইতিবৃত্ত সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পাইবে। কেশবচন্দ্র এইসকল ধর্ম্ম বন্ধুগণের মধ্যে অনেককে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ করিয়া তুলনা মূলক ধর্ম্ম আন্দোলনের প্রথম বিস্তৃত আয়োজন করেন। তাঁহাদের মধ্যে আচার্য্য গিরিশচন্দ্র সেন ইসলাম ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য, বৃদ্ধবয়সে লক্ষ্ণৌ গমন করিয়া আরবী শিক্ষা করেন এবং কুরাণ, হদিস প্রথম বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। সাধু অঘোর নাথ গুপ্ত সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্য হইতে বুদ্ধ শাক্য সিংহের জীবনচরিত ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস সংকলন করেন। উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দ রায় বেদান্ত ও গীতার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। তৎরচিত গীতার সমন্বয় ভাষ্য একখানি পাণ্ডিত্য পূর্ণ গ্রন্থ। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের ভার প্রাপ্ত হন। ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু, গুরুমুখী ভাষা শিক্ষা করিয়া শিখ ধর্ম্ম শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ নানক প্রকাশ। এতদ্ভিন্ন তাঁহার কর্ম্মীদের অনেকে অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনায় এবং তত্তৎ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে বাঙ্গালার সর্ব্বসাধারণোপোযোগী গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত হন। কেশবচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে পরস্পর ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ, তাহার সার গ্রহণ এবং বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উদার ও মহান তত্ত্ব সমূহ অবগত হইতে না পারিলে, ধর্ম্ম বিষয়ে ভেদ বুদ্ধি ও

প্রতিযোগীতা জগৎ হইতে দূর হইবে না। ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ অথবা কোনও বিশেষ ধর্ম্মের বাহ্যিক প্রণালী পালন দ্বারা ব্যক্তিগত লাভ কিছু হইতে পারে। কিন্তু উহা ধর্ম্মের বহিরাবরণের স্বাদ মাত্র। যে কোনও ধর্ম্মের মূল তত্ত্বের সহিত পরিচিত হইবার, পক্ষে বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপের অনুসরণ মূল্য হীন। প্রকৃত ধর্ম্মসমন্বয় সাধন করিতে হইলে সকল লোককে বিভিন্ন ধর্ম্মের মূল তত্ত্বের সহিত পরিচিত করাইতেই হইবে। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁহার সহকর্ম্মী ও অনুবর্ত্তী দিগকে বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও সেইসকল হইতে সারসংগ্রহ পূর্ব্বক জনসমাজে তাহা প্রচার করিবার ভার অর্পণ করেন।

বক্তা কেশবচন্দ্র।

বাঙ্গালীদের মধ্যে কেশবচন্দ্রই প্রথম ইংরেজি ও বাঙ্গালা বক্তৃতাদ্বারা দেশ ও বিদেশে সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার এই অসাধারণ বাগ্মীতার খ্যাতি, সুদূর পাশ্চাত্য দেশেও প্রচারিত হইয়াছিল এবং তিনি যখন ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অসামান্য বক্তৃতা শক্তি ইংলণ্ডের জনসাধারণের অভূতপূর্ব্ব বিস্ময় ও প্রশংসার বিষয় হইয়াছিল। এদেশেও উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী, এমন কি একাধিক বড়লাট (Governor General) তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে সভায় উপস্থিত থাকিতেন। প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও তদানুষঙ্গিক বিষয় লইয়াই তিনি বক্তৃতা প্রদান করিতেন। তাঁহার Am I an Inspired Prophet ? India asks Who is Christ ? What Myrvellous Mystery, The Trinity; Asia's Message to Europe, Great Men; Jesus Christ : Asia and Europe. England's Duty to India; Christ and Christianity প্রভৃতি বক্তৃতাগুলি সর্ব্বত্র বিস্ময় ও শ্রদ্ধার তরঙ্গে দেশকে আন্দোলিত করিয়াছিল।

বিবিধ কাজ

ব্রাহ্মসমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন যে কেশবচন্দ্রের চেষ্টাতেই হয় সেকথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এইসকল অসবর্ণ বিবাহজাত সন্তানেরা যাহাতে আইনগত কোনরূপ বিপত্তিতে না পড়ে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া এক আইন বিধিবদ্ধ করান। এই আইন ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দের তিন আইন নামে পরিচিত। সমুদয় অসবর্ণ বিবাহ, এমন কি ভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বীদের বিবাহ এই আইন অনুসারে নিবদ্ধ হয়। এই আইন প্রচলন উপলক্ষে তিনি, বিবাহযোগ্যা কন্যার সর্ব্বনিম্ন বয়স নির্দ্ধারণের জন্য বহু দেশীয় ও বিদেশীয় চিকিৎসকের মতামত সংগ্রহ করেন। তদবধি ব্রাহ্ম

সমাজের সমুদয় বিবাহই এই আইন অনুসারে রেজেষ্টারী হইয়া আসিতেছে।

দেশে মদ্যপানের কুফল প্রচার ও মদ্যপান রহিত করিবার জন্য বক্তৃতা প্রদান, পুস্তিকা প্রচার প্রভৃতি বহু উপায় তিনি অবলম্বন করেন এবং সাময়িক ভাবে অংশতঃ সফলতাও লাভ করেন।

যৌবনকাল হইতেই তিনি খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহার মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কখনও কখনও তাঁহার অনুরাগী ব্যক্তিরা মনে করিতেন যে তিনি হয়ত খ্রীষ্ট ধর্ম্মই অবলম্বন করিবেন। কিন্তু খ্রীষ্ট ও তাঁহার ধর্ম্ম মতের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলেও তিনি এদেশস্থ খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-যাজকগণকে কখনও দেশীয় ধর্ম্ম ও সমাজরীতির কুৎসা বা অবৈধ সমালোচনা করিতে সুযোগ দিতেন না। একাধিকবার তিনি প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাদ্বারা খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাজকদিগের অবান্তর ও অনুচিত মন্তব্যের সমুচিত উত্তর দিয়াছিলেন। নিজ ধর্ম্মজীবন পথে তিনি খ্রীষ্টের উপদেশ অনেকাংশে পালন করিয়া চলিতেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনিই আবার ব্রাহ্মসমাজে বৈষ্ণব ধর্ম্মানুগত খোল ও করতাল যোগে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার স্বভাব সুলভ ধর্ম্মানুগত জীবন সংকীর্ত্তনাদি সঞ্জাত ভক্তি ভাবের প্রয়োজনীয়তায় আস্থাবান হয়। এই সংকীর্ত্তন প্রচলন কার্য্যে ব্রাহ্ম সমাজের অনেক লোক তাঁহার বিশেষ বিরোধী ছিল।

সকল ধর্ম্মের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা তাঁহার বিশেষ প্রিয় কার্য্য ছিল বলিয়া নিজ মণ্ডলীর সকল প্রকার কার্য্যে বিভিন্ন ধর্ম্ম সমাজের প্রভাব স্থাপন করিতে প্রয়াস পান। পূর্ব্বোক্ত সঙ্গত সভা এই চেষ্টারই অন্যতম ফল। "সঙ্গত" নামটি শিখদিগের ধর্ম্মালোচনা সভারই অনুকরণ। এইরূপ মণ্ডলীর পরিচালক সভাকে "শ্রীদরবার" এই আখ্যা প্রদান করেন। প্রচারকদিগের নামের পূর্ব্বে "ভাই" শব্দ ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন। এইরূপে তিনি নানাভাবে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার উপায় অবলম্বন করেন।

পূর্ব্বোক্ত (২২৮ পৃঃ) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সংস্রবে তিনি নিজ বাটীতেই একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পল্লীবাসী বালকদিগকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ে সাহায্য করা ভিন্ন নানারূপ সদুপদেশ প্রদান দ্বারা তাহাদের নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করা হইত। পরবর্ত্তী জীবনে, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি কিশোর ও যুবকদিগের মধ্যে মাদক দ্রব্য ব্যবহার রোধ করি-

বার জন্য ব্যাণ্ড অব হোপ (Band of Hope) নামে একটি সঙ্ঘ গঠন করেন। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঐ সঙ্ঘের কাজ অতি উৎকৃষ্টভাবে চলিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত (২৩৬ পৃঃ) রিফর্ম্ম অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে দেশে সুরাপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য "মদ-না-গরল" নামে তিনি একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করেন। পরবর্ত্তীকালে স্থাপিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাখানি কয়েক বৎসর চলিয়াছিল। এই সুরাপানের বিরুদ্ধে, কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে প্যারীচরণ সরকার মহাশয় যখন প্রথম আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন হইতেই কেশবচন্দ্র তাঁহার বিশেষ সহকর্ম্মী ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে প্রথম সঙ্কীর্ত্তন প্রথা প্রচলিত করিয়া (২৪৪ পৃঃ) কেশবচন্দ্র ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দের মাঘোৎসবের সময়ে এক নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির করেন। কেশবচন্দ্রের ঐ কার্য্য ব্রাহ্ম ও অ-ব্রাহ্ম উভয় সম্প্রদায়েরই একাধারে প্রশংসা ও নিন্দা লাভ করে। ঐ সময়েই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নূতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরবর্ত্তী বৎসর আগষ্ট মাসে বিশেষ উৎসব সহযোগে ঐ মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়।

নিজ মণ্ডলীভুক্ত সাধনশীল পরিবারবর্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি ও রক্ষার জন্য ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে কেশবচন্দ্র 'ভারত আশ্রম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্র স্বয়ংও কিছুকাল সপরিবারে ঐ আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন। অনেকটা সাধারণ বাঙ্গালী একান্নবর্ত্তী পরিবারের ব্যবস্থানুযায়ী ঐ আশ্রমের কাজ চলিত এবং কেশবচন্দ্রের সহকর্ম্মীদের মধ্যে একজন বিশেষ ভাবে সকল প্রকার ব্যবস্থা করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মসাধনমার্গে নির্জ্জন চিন্তা, ধ্যান ধারণার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া তিনি ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার সন্নিকটস্থ মুরারীপুকুর নামক স্থানে একটি উদ্যানবাটী ক্রয় করিয়া, তাহাকে 'সাধন কানন' নাম প্রদান করেন। কেশবচন্দ্র স্বয়ং ও তাঁহার অনুগামীগণ অনেক সময়েই সেইখানে নির্জ্জন বাস করিবার জন্য গমন করিতেন। তাঁহাদের নিজেদের আবশ্যকীয় সমুদয় কাজ, এমনকি বাগানের মধ্যে যাতায়তের পথ নির্ম্মাণ, কুটীর নির্ম্মাণ প্রভৃতি সকল কাজই তাঁহারা নিজেরাই করিয়া লইতেন।

ব্রাহ্ম সমাজে যোগদানের প্রথম অবস্থায় ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজ ভিণ্ডিকেটেড (Brahmo Somaj Vindicated) নামে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী

খ্রীষ্টান মনীষী লালবিহারী দে, কর্ত্তৃক "ইণ্ডিয়ান রিফর্মার" (Indian Reformer) নামক পত্রিকায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের যে বিরুদ্ধ সমালোচনা বাহির হয়, তাহারই প্রত্যুত্তর স্বরূপ উক্ত বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। ভাষার গাম্ভীর্য্য, আদর্শের উচ্চতা, ভাবের মহত্বে বক্তৃতাটি বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই প্রশংসা লাভ করে। প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাজক আলেক্জাণ্ডার ডাফ্ (Alexander Duff) কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা পাঠ করিয়া বলেন ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলে এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার চেষ্টা ব্যাহত হইবে। বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে অসবর্ণ বিবাহের বৈধতা স্থিরীকৃত করিবার জন্য যখন আন্দোলন উপস্থিত হয় (১১ পৃঃ) তখন, মনস্বী রাজনারায়ণ বসু "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার বক্তৃতাতে "হিন্দু ধর্ম্ম" অর্থে আদি ব্রাহ্মসমাজের ঔপনিষদিক ব্রাহ্মধর্ম্মকেই বুঝাইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র ঐ বক্তৃতায় বিবৃত যুক্তি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি প্রত্যুত্তরে কতিপয় বক্তৃতা দ্বারা 'হিন্দু ধর্ম্ম" বলিতে যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে বুঝায় না, যুক্তি সহকারে তাহাই প্রতিপন্ন করেন।

ধর্ম্মসমন্বয় জীবনে এবং মণ্ডলী মধ্যে কি ভাবে সাধন করা যায় তদ্বিষয়ে কেশবচন্দ্রের বিশেষ চিন্তা ছিল। এই জন্য তিনি যে সকল প্রণালী অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন, তাহার কিছু উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন জগতের সকল ধর্ম্ম-সংস্থাপক ও অন্যান্য মহাপুরুষদের উপদেশাবলী ও চিন্তাধারার সহিত যোগ' রক্ষা করিবার জন্য তিনি 'পিল্গ্রিমেজ টু সেণ্ট্স (Pilgrimage to Saints) নামে এক আলোচনাসভার ব্যবস্থা করেন। মূশা, সক্রেটিস, শাক্যসিংহ, ভারতীয় ঋষিগণ, খ্রীষ্ট, হজরত মোহাম্মদ, শ্রীচৈতন্য, প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করিবার জন্য এক এক দিন নির্দ্দিষ্ট থাকিত। এই সকল মহাপুরুষদের গুণাবলী আলোচনাপ্রসূত নিজ ধর্ম্ম-জীবনের অভিজ্ঞতা তিনি অতি সুন্দর ভাবে একটী নিবন্ধে প্রকাশ করেন (ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই আশ্বিন ১২৮৭ বঙ্গাব্দ)।

কেশবচন্দ্রের জীবনের যে সকল ঘটনা উল্লেখ করা হইল, তাহা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, তিনি বর্ত্তমান বাঙ্গালার যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ছিলেন। ধর্ম্ম জীবন ও নৈতিক জীবন উন্নত করা ও রক্ষা করা ভিন্ন, নানারূপ জনহিতকর কাজের দ্বারা বাঙ্গালীকে তিনি যে বিভিন্ন বহুমুখী কর্ম্মপন্থা প্রদর্শন করেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার সকল

প্রকার কার্য্যের মধ্যে এক গভীর ধর্ম্ম-জীবনের প্রেরণা ছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যান্য নানা স্থানে ধর্ম্মাচার্য্যরূপে তিনি যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, ভাষার সাবলীল গতি, মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে এবং উদার, উন্নত আদর্শ ও ভাবের প্রাচুর্য্যে তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অতুলনীয় বস্তু। যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বী ও ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির নিকট তাঁহার উপদেশাবলী বহুমূল্যরত্ন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, ইহাতে কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই।

অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে কেশব চন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে স্বাস্থ্য লাভার্থ ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে সিমলা শৈলে গমন করেন। কিন্তু তথায়ও বিশ্রামের অভাব হওয়াতে, স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ঐরূপ অসুস্থ শরীরেই, অক্টোবর মাসে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন এবং কিছুকাল জীবন মরণের সন্ধিস্থলে থাকিয়া ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দের ৮ই জানুয়ারী (২৪শে পৌষ ১২৯০ বঙ্গাব্দ) তিনি মহাপ্রয়াণ করেন। কেশবচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইলে, দেশে যে গভীর শ্রদ্ধাসমন্বিত শোকের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান যুগের ইতিহাসে বিরল। সমসাময়িক পত্রিকাগুলি তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিবে।

কেশব চাঁদ— একজন পাঁচালীকার। তাঁহার দ্বারাও বঙ্গভাষার অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে।

কেশবদাস—কবিবর কেশবদাস হিন্দী ভাষায় 'বিজ্ঞান গীতা', 'সুন্দর বিলাস', 'স্বরূপানুসন্ধান', 'স্বানুভব প্রকাশ', 'সন্তোষ সুরতরু', 'রন্ত প্রভাব' প্রভৃতি উচ্চদরের গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

কেশবদাস মিশ্র — প্রখ্যাতনামা হিন্দী কবি। হিন্দী সাহিত্যে সুরদাস ও তুলসীদাসের পরেই, যে সকল কবি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, কেশবদাস তাঁহাদেরই অন্যতম। ১৫৯২ খ্রীঃ অব্দে কেশবদাস "রসিক প্রিয়া" নামে এক-খানি কাব্য রচনা করেন। তাহার প্রারম্ভে কবি যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি বেতবা নদীতীরস্থ, তুঙ্গারণ্যতীর্থের সন্নিকটস্থ বহু সমৃদ্ধিশালী ওড়ছা নগরে বাস করিতেন। কাশীশ গহরবার কুলোৎপন্ন মধুকর শাহ ওড়ছার অধিপতি ছিলেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র রাজা ইন্দ্রজিৎ কেশবের পরম মিত্র ছিলেন। এই সখারই অনুরোধক্রমে কবি 'রসিক প্রিয়া' নামক কাব্য রচনা করেন। এই রাজা ইন্দ্রজিৎ (১৬৪৮ সম্বৎ) ১৫৯২ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন এবং ঐ বৎসরই রসিকপ্রিয়া রচিত হয়।

কেশবদাস 'মিশ্র' পদবীধারী ধনাঢ্য-ব্রাহ্মণ বংশোৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার

পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যেও অনেকের কবি খ্যাতি ছিল। কবি কেশবদাসের পিতামহ, ওড়ছা নগরীর স্থাপনকর্ত্তা রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাকবি ছিলেন। (ওড়ছা বর্ত্তমান ঝাঁসীর সন্নিকটে)। কেশবদাস স্বয়ং পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রজিতের সভাকবি ছিলেন। একবার কোনও কারণে তদানীন্তন মুঘল বাদসাহ আকবর ইন্দ্রজিতের উপর বিরূপ হইয়া তাঁহার এক কোটী মুদ্রা অর্থ দণ্ড করেন। ইন্দ্রজিতের অনুরোধে কেশবদাস দিল্লী গমন করেন এবং কবি প্রতিভার দ্বারা, সম্রাটের ক্রোধ শান্তিপূর্ব্বক নিজ প্রভুর দণ্ড রহিত করান।

কেশবদাসের কবিতা ছন্দমাধুর্য্যে, অলঙ্কার প্রয়োগের নিপুণতায় এবং স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বরসের প্রাচুর্য্যে বিশেষ লোক প্রিয় হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার কাব্যে নানাস্থলে রাজা ইন্দ্রজিৎ ও অন্যান্য রাজসভাসদগণের নানারূপ উল্লেখ ও বর্ণনা থাকাতে, সমসাময়িক ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণয়ে বিশেষ উপযোগী। কেশবদাস রাজা ইন্দ্রজিৎ ও অন্যান্য সভাসদদিগের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের প্রণয়জনিত নানারূপ আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। সবগুলি বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, সে সকল কাহিনী গুলি হইতে তাঁহাদের পরস্পরের গভীর সৌহার্দ্দ ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সকল আখ্যায়িকা গুলির একটি হইতে জানা যায়, কেশবদাস ১৬৭০ বিক্রমাব্দে (১৬১৪ খ্রীঃ) জীবিত, ছিলেন এবং তখন তাঁহার বয়স ছিয়াত্তর বৎসর হইয়াছিল।

কেশবদাসের অন্যান্য প্রধান গ্রন্থের নাম 'কবি প্রিয়া' (রচনাকাল ১৬০২ খ্রীঃ অব্দ) ও 'রামচন্দ্র'। এই শেষোক্ত গ্রন্থ রচনার জন্য মহাকবি বাল্মিকী স্বপ্নে তাঁহাকে আদেশ দিয়াছিলেন, এইরূপ বর্ণনা আছে। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে অপর প্রসিদ্ধ হিন্দি কবি বিহারীলাল কেশবদাসের পুত্র ছিলেন। কিন্তু এই মত তাদৃশ গৃহীত হয় নাই।

কেশব দীক্ষিত—সাঙ্গলী তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ৯৩৬ খ্রীঃ অব্দে গৌড়ের পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর হইতে আগত, বেদাধ্যায়ী কেশব দীক্ষিত নামক এক ব্রাহ্মণকে রাষ্ট্রকূটবংশীয় চতুর্থ গোবিন্দ একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধন বর্ত্তমান উত্তর বঙ্গ। কেশবের পিতাও একজন বিশেষ বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন।

কেশব দেব — শ্রীহট্টের অন্তর্গত ভাটেরা নামক স্থানের প্রাচীনকালের চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা। (নবগীর্ব্বান দেখ)। এই ভূপতি ২৩২৮ যুধিষ্ঠিরাব্দে শ্রীহট্টনাথ শিবকে বহুতর কৃতদাস, নানা জাতীয় ভৃত্য ও বহু ভূমি দান করিয়াছিলেন।

কেশব দৈবজ্ঞ—(১) প্রাচীন দেবগিরি ও বর্ত্তমান দৌলতাবাদ হইতে ৬৫ মাইল পশ্চিমে নন্দীগ্রাম নামে একটী গ্রাম ছিল। সেই স্থানে কৌশিক-বংশীয় কমলের পুত্র কেশব জ্যোতিষী বাস করিতেন। কেশবের স্ত্রীর নাম লক্ষ্মী ও পুত্রের নাম গণেশ ছিল। এই গণেশই 'গ্রহলাঘব' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রণেতা। কেশব ১৪৯৬ খ্রীঃ অব্দে (১৪১৮ শকে) 'গ্রহকৌতুক' নামক করণ গ্রন্থ এবং তৎপরে 'তিথি সিদ্ধি,' 'গণিত দীপিকা,' 'মূহূর্ত্ততত্ত্ব,' 'সিদ্ধান্ত বাসনা পাঠ,' 'জাতক পদ্ধতি,' 'তাজক পদ্ধতি' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। করণ গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন বলিতে যাইয়া স্বয়ং কেশব বলিয়াছেন যে, করণ গ্রন্থ অনেক আছে বটে; কিন্তু তাহাদের সাহায্যে গ্রহ-স্থান জানিতে হইলে, পট্ট (কাঠের শ্লেট) আবশ্যক হয়। তিনি তাঁহার করণ গ্রন্থ এমন ভাবে লিখিতেছেন যে, তাহাতে পট্ট ব্যবহার না করিয়াও গ্রহস্থান অবগত হইতে পারা যাইবে।

কেশব দৈবজ্ঞ—(২) প্রথম দিবা-করের চতুর্থ পুত্র কেশবও জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দে 'জ্যোতিষ মণিমালা' নামক জাতক গ্রন্থ কেশব রচনা করিয়াছেন।

কেশবনাথ রায়—তিনি বাঙ্গালার সেনবংশীয় নরপতি লক্ষ্মণ সেনের গুরু, অনন্তরাম ওঝার বংশধর, রাজা দেবী-দাসের অষ্টাদশ পুত্রের অন্যতম। রাজা দেবীদাস কোন কারণে বঙ্গের মুসলমান শাসনকর্ত্তার ক্রোধানলে পতিত হন। বঙ্গের শাসনকর্ত্তার সেনাপতি ওমর খাঁ ছাতক (পাবনার দক্ষিণবর্ত্তী স্থান) আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। রাজা দেবীদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র কার্ত্তিক রায় তিন দিন নগর রক্ষা করিয়া অবশেষে যুদ্ধে নিহত হন। রমণীরা বিষপানে আত্মহত্যা করেন। রাজার পুত্র কেশব নাথ ও কাশীনাথ মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহাদেরই বংশধরেরা পাবনা জিলার আমীনপুরের মিঞা ও ঢাকা জিলার এলাচিপুরের মিঞা নামে খ্যাত। রাজা দেবীদাস দেখ।

কেশব বিশারদ—নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ মৌদ্গল্যগোত্রীয় কমলাকর জ্যোতিষীর বংশধর রাজীবলোচন বিদ্যাসাগরের পৌত্র ও প্রাণবল্লভের পুত্র। কেশব বিশারদ যে পঞ্জিকা গণনা করিতেন, তাহা বহু স্থানে প্রচলিত ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কমললোচন বিদ্যাবিনোদও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা বহু স্থানে বিস্তৃত হইয়াছেন।

কেশব বৈদ্য—প্রসিদ্ধ 'মুগ্ধবোধ' গ্রন্থ প্রণেতা বোপদেবের পিতা। তিনি 'সিদ্ধমন্ত্র' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন তাঁহার পুত্র বোপদেব 'সিদ্ধমন্ত্র রচনা'

নামে তাহার এক টীকা রচনা করেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে আত্ম পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন — যিনি মহাদেব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভাস্কর হইতে যিনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং সিংহরাজা হইতে যিনি বিদ্যানুরূপ প্রকৃষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছেন, সেই কেশব বৈদ্য এই 'সিদ্ধমন্ত্র' গ্রন্থের প্রণেতা। 'সিদ্ধমন্ত্র' প্রণেতা ১৬৯টী শ্লোকে যাবতীয় দ্রব্যের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

কেশবভট্ট — দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য নিম্বাদিত্যের কেশবভট্ট ও হরিব্যাস নামে দুইজন শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদিগহইতে নিম্বাদিত্যের অনুবর্ত্তী বৈষ্ণবেরা দুইটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। কেশবভট্টের অনুবর্ত্তীরা বিরক্ত বৈষ্ণব ও হরিব্যাসের অনুবর্ত্তীরা গৃহস্থ বৈষ্ণব। এই কেশবভট্ট যদি টীকাকার কেশবাচার্য্য হন, তবে তিনি খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

কেশব ভারতী — তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া নগরে তাঁহার আবাস ছিল এবং সন্ন্যাসী হইয়া তিনি সেইখানেই বাস করিতেন। ১৫০৯ খ্রীঃ অব্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ২৪ বৎসর বয়সে কাটোয়া নগরে গমন করিয়া উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিনে কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন।

কেশব মিশ্র—(১) শ্রীহট্টের অন্তর্গত বাণিয়াচঙ্গের প্রথম রাজা। তিনিই বাণিয়াচঙ্গ গ্রাম ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র দক্ষ, দক্ষের পুত্র নন্দন, নন্দনের গণপতি ও কল্যাণ নামে দুই পুত্র জন্মে। কল্যাণের পুত্র বাহুধর ও পদ্মনাভ। পদ্মনাভ অতিশয় ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজ্যের আয়তন অনেক বর্দ্ধিত হয়। বাণিয়াচঙ্গের সুবৃহৎ 'সাগর দীঘী' তাঁহারই দ্বারা খনিত হয়। তিনি বিদ্যানুরাগী, দাতা ও প্রজাবৎসল ভূপতি ছিলেন। বর্ত্তমান ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালীপাড়া হইতে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও অন্যান্য স্থান হইতে অনেক ব্রাহ্মণ আনয়নপূর্ব্বক তিনি বাণিয়াচঙ্গে স্থাপন করেন। তাঁহার একাদশ পুত্রের মধ্যে সুন্দর খাঁ জ্যেষ্ঠ ও গোবিন্দ খাঁ কনিষ্ঠ ছিলেন। গোবিন্দ খাঁ প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন।

কেশব মিশ্র— (২) মধ্যযুগের একজন দর্শনাচার্য্য। তিনি 'তর্কভাষা' নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। উহাতে ন্যায় ও বৈশেষিক মত সম্যক প্রকারে আলোচিত হইয়াছে। তিনি মিথিলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার শিষ্য গোবর্দ্ধন মিশ্র 'তর্কভাষা প্রকাশ' নামে উক্ত গ্রন্থের এক টীকা

রচনা করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরপতি হরিহরের সভাপণ্ডিত চিন্নভট্ট 'তর্কভাষা প্রবেশিকা' নামে তর্কভাষার এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তর্কভাষার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পণ্ডিতদের টীকাও প্রচলিত আছে। গোপীনাথ কৃত 'উজ্জ্বলা', রোমবিল্ব বেঙ্কটবুদ্ধ কৃত 'তর্কভাষাভাব', রাম লিঙ্গ কৃত 'ন্যায়সংগ্রহ', মাধবদেব রচিত 'সারমঞ্জরী', ভাস্করভট্ট রচিত 'পরিভাষা দর্পণ', বালচন্দ্র বিরচিত 'তর্কভাষা প্রকাশিকা', নাগেশভট্ট কৃত 'যুক্তি মুক্তাবলী', গণেশ দীক্ষিত কৃত 'তর্ক প্রবোধিনী' প্রভৃতি প্রধান। কেশব মিশ্র ১২৭৫ খ্রীঃঅব্দের সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা পদ্মনাভ মিশ্রও একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন।

কেশবরাম—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। 'ঔষধি নির্ঘণ্টু বা বাল নির্ঘণ্টু' গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

কেশবলাল গোস্বামী — শ্রীহট্টের অন্তর্গত জৈন্তিয়ার স্বর্ণকৌশিক গোত্রীয় কেশবলাল ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রতিনাথ। কেশব দেবার্চ্চনায় সর্ব্বদা রত থাকিতেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার বাল্য চরিত্রে সকলেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আট বৎসর বয়সের সময় তাঁহার উপনয়ন হয়। একদা প্রভাতে কেশবকে বাড়ীতে না পাইয়া গ্রামবাসিগণ জঙ্গলে গিয়া দেখিলেন একটী কদম্ব বৃক্ষের উপর কেশব খেলা করিতেছেন। তখন তাঁহাকে কীর্ত্তন করিয়া বাড়ী আনা হইল। ইহার কিছুকাল পরেই কেশব গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, কোথায় চলিয়া গেলেন দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার সন্ধান পাইলেন না। বহুকাল পরে জানা গেল যে, তিনি বাণিয়াচঙ্গের অধিপতি উমেদ রাজার ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহাকে হিন্দু সন্ন্যাসী জানিতে পারিয়া বিশেষ সমাদর করিলেন এবং তাঁহাকে কিছু ভূমি সম্পত্তি দিতেও অভিলাষী হইলেন। বিশেষ অনুরোধে তিনি একখণ্ড ভূমি গ্রহণ করিলেন। তৎপর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, মায়ের অনুরোধে তিনি দারপরিগ্রহ করিলেন। ধর্ম্মাচরণের জন্য যে, গৃহত্যাগ অত্যাবশ্যক নহে এবং স্ত্রী পুত্র লইয়াও নির্লিপ্তভাবে সাধন ভজন করা যাইতে পারে, কেশবলালের জীবনী আলোচনায় তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়।

কেশব সিংহ—তিনি আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্টের অন্যতম রাজা ও জগন্নাথপুর নামক স্থানের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের পুত্র রমাই বা রাম, রামের পুত্র কেশব, কেশবের পুত্র শনি বা শনাই, শনির পুত্র প্রজাপতি,

প্রজাপতির পুত্র দুর্ব্বার। দুর্ব্বার দিল্লীর সম্রাট হইতে 'খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হন। দুর্ব্বার খাঁর পুত্র রাজসিংহ বা পণ্ডিত খাঁ। রাজসিংহের জয়সিংহ (গোবিন্দ-সিংহ), বিজয়সিংহ ও পরমানন্দ সিংহ নামে তিন পুত্র ছিল।

কেশব সেন — বাঙ্গালার সেনবংশীয় নরপতি লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম পুত্র তাঁহার মাতার নাম তাড়া দেবী। লক্ষ্মণ সেন দেখ।

কেশব স্বামী — মধ্যযুগের একজন আভিধানিক। 'নানার্থার্ণব সংক্ষেপ' নামে একখানি অভিধান তিনি সংকলন করেন। তিনি খুব সম্ভব খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

কেশবাচার্য — শ্রীনিবাসাচার্য্য তদীয় গুরু নিম্বার্কাচার্য্য রচিত অতি সংক্ষিপ্ত বেদান্তভাষ্য 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' অবলম্বনে 'বেদান্ত কৌস্তুভ' নামে যে ভাষ্য প্রণয়ন করেন, আচার্য্য কেশব তাহার টীকাকার এই টীকায় তিনি নিম্বার্কেরই অনুরূপ মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। কেশবের স্থিতিকাল খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ শতকের শেষপাদে বা ষোড়শ শতকের প্রথমপাদে, কারণ তিনি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন।

কেশবাচার্য্য আসুরি — প্রসিদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসী রামানুজ আচার্য্যের পিতা। তিনি আসুরি, সর্ব্বক্রতু, কেশব দীক্ষিত নামেও খ্যাত ছিলেন। আসুরি কেশবাচার্য্য অতিশয় যজ্ঞনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া 'সর্ব্বক্রতু' এই উপনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম কান্তিমতী। তিনি অপত্যলাভে বঞ্চিত থাকিয়া, পুত্র লাভার্থ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং তাঁহার ফলে একটী পুত্র লাভ করেন। তিনিই ভুবন বিখ্যাত রামানুজাচার্য্য। রামানুজাচার্য্য দেখ।

কেশবানন্দ — পাঞ্জাবের একজন নানক পন্থী সাধু ও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। পঞ্জাব প্রদেশের বড় বড় রাজাদের নিকট তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। তাঁহার বেশভূষা সাধারণ সন্ন্যাসীদের ন্যায় ছিল না। তিনি ধুতি, জরির কাজ করা কোট ও মূল্যবান্ পাগড়ী ব্যবহার করিতেন। তাঁহার গৃহসজ্জাও মূল্যবান্ জিনিষ পত্রের ছিল।

কেশবানন্দ মহাভারতী (স্বামী) — তিনি একজন প্রসিদ্ধ হঠযোগী সন্ন্যাসী। গৃহস্থাশ্রমে তাহার নাম ছিল রাধিকা প্রসাদ রায় চৌধুরী। ১২০৩ বঙ্গাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী বাঘাসন গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত ঘুলিয়া গ্রামে মাতার মাতুলালয়ে তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয় এবং বর্দ্ধমান জেলার হাটগাছ গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। রাধিকাপ্রসাদ রামগোপাল ব্রহ্মচারীর নিকট হঠযোগ শিক্ষা করেন এবং তাঁহার নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া

কেশবানন্দ নাম লাভ করেন। অতঃপর স্বীয় গুরুর আদেশমত একজন সিদ্ধ পুরুষের নিকট জ্ঞানযোগ শিক্ষা করিয়া, ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন। কেশবানন্দ বহু ধর্ম্ম উপদেশ সম্বলিত 'আনন্দ গীতা' নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি স্বগ্রামে বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বঙ্গের নমঃশূদ্র প্রভৃতি অনুন্নত শ্রেণীর জাতি সমূহের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য, বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কৃষকগণকে শিক্ষা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য তিনি স্বীয় আশ্রমের সন্নিকটে এক আদর্শ কৃষি উদ্যান ও গোচারণ ক্ষেত্র স্থাপন করেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে এই কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসীর কর্ম্মময় জীবনের অবসান হয়।

কেশবানন্দ স্বামী— এই বাঙ্গালা সন্ন্যাসীর জন্মস্থান কলিকাতার নিকটে ছিল। তিনি ঔষধদ্বারা কঠিন কঠিন রোগ আরোগ্য করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন এবং সেই অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। এজন্য অনেক প্রতিপত্তিশালী লোক তাঁহার অনুগত ছিলেন।

কেশবার্ক—শকের দ্বাদশ শতাব্দীতে নর্ম্মদা নদীর সন্নিহিত প্রদেশে, 'বিবাহ বৃন্দাবন' নামক প্রসিদ্ধ ব্যবহার গ্রন্থ প্রণেতা রাণগ পুত্র কেশবার্ক বর্ত্তমান ছিলেন। গোবিন্দ দৈবজ্ঞ ১৬০৩ খ্রীঃ অব্দে (১৫২৫ শকে) মুহূর্ত্ত চিন্তামণির প্রসিদ্ধ টীকা 'পীযূষধারা' নামক গ্রন্থে বহু গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কেশবার্ক নামক এক জ্যোতিষীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। গণেশ দৈবজ্ঞ এই কেশবার্ক কৃত বিবাহ বৃন্দাবনের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি ১২৪২ খ্রীঃ অব্দে 'ব্রহ্মতুল্যাগণিতসার' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কেশর খাঁ — রাজপুতনার অন্তর্গত বুন্দির রাজা ভনঙ্গ সিংহের রাজত্বকালে ঢাকর খাঁ ও কেশর খাঁ নামক দুইজন পাঠান ভনঙ্গের রাজধানী কোটা আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। ভনঙ্গ সিংহ বুন্দিতে নির্ব্বাসিত হন এবং তাঁহার স্ত্রী কেতুন নামক নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার স্ত্রী অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি স্বামীকে নিকটে আনিয়া কোটা রাজ্য উদ্ধারের একটী সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিলেন। বাসন্তিক ফাগোৎসব নিকটবর্ত্তী হইলে চতুরা রাজপুত রমণী কেশর খাঁকে বলিয়া পাঠান যে, 'কেতুনের যুবতীগণ আপনাদের সহিত হোলি খেলিতে আসিবে আপনি প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন।' কেশর খাঁ এই সংবাদে আনন্দিত হইলেন এবং রাজপুত যুবতীদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। এদিকে রাজপুত

রাণী তিনশত বলিষ্ঠ যুবককে এক-এক-খানি শাণিত তরবারিসহ যুবতী সাজাইয়া আবির গ্রহণপূর্ব্বক কোটা নগরে উপস্থিত হইলেন। পাঠান দলের সহিত হোলি খেলা আরম্ভ হইল, স্বয়ং ভনঙ্গ সিংহ এক প্রবীণার বেশে একটী আবিরের ভাণ্ড লইয়া কেশর খাঁর সহিত খেলা করিতে করিতে তাঁহার মাথায় সেই পাত্রটি ভাঙ্গিয়া দিলেন। অমনি রাজপুতগণ ঘাঘরার ভিতর হইতে স্ব স্ব অস্ত্র বাহির করিয়া পাঠান-দিগকে সংহার করিতে লাগিল এবং অল্প সময় মধ্যেই কেশর খাঁকে সদলে নিহত করিয়া কোটা রাজ্য পুনরায় অধিকার করিলেন। (এই ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন ; তাহা 'কথা ও কাহিনী'তে নিবদ্ধ আছে)।

কেশী, মুনি—জৈন আচার্য্য ও ধর্ম্ম-গুরু। তিনি অন্যতম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন। মহা-বীরের প্রথম শিষ্য ও গণধর ইন্দ্রভূতি গৌতমের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে আলো-চনার ফলে তিনি জৈনমত অবলম্বন করেন। কোশলরাজ প্রসেনজিতের সহিত আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার যে বিচার হয় তাহা দ্বিতীয় উপাঙ্গে বর্ণিত আছে।

কেশুদাস— (১) তিনি রাঠোরবংশীয় রায় সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র। আকবর শাহ তাঁহাকে দুই শতী মনসবদার করিয়া-ছিলেন।

কেশুদাস— (২) খ্যাতনামা হিন্দি কবি। তিনি মুঘল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত ওড়ছার রাজা রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা ইন্দ্রজিৎ সিংহ তাঁহার পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কেশোদাস কিছুকাল রাজা রামচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। কথিত হয় মহারাজ বীরবলকে কবিত্বে মুগ্ধ করিয়া কেশোদাস ছয় লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার লাভ করেন। গোস্বামী তুলসীদাসের তিনি পরম প্রিয় ছিলেন এবং তুলসীদাসের আদেশে 'রামচন্দ্রিকা' নামে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেন।

কেশুদাস মারু, রাজা—যশল্মীরের রাজকুমার, মৈড়তা বংশীয় রাজা কেশুদাস মারু, মুঘল সেনাপতিরূপে উড়িষ্যার মুঘল সুবাদার হাসিম খাঁর সময়ে (১৬০৭—১৬১১ খ্রীঃ) কটকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জগন্নাথের মন্দির আক্রমণ করিলে, খুর্দ্দার রাজা পুরুষোত্তম দেব দশ হাজার অশ্বারোহী ও তিন লক্ষ পদাতিক সৈন্য লইয়া মন্দির রক্ষার্থ গমন করিলেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া কেশুদাসকে তিন লক্ষ টাকা এবং স্বীয় ভগিনীকে তাঁহার নিকট বিবাহ দিলেন। অধিকন্তু এক লক্ষ টাকা কেশুদাসের লোকদিগকে

ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে বাধ্য হইলেন এবং স্বীয় কন্যাকে দিল্লীর সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন।

কেহরসিংহ অকালী, বাবা—তিনি একজন অকালী শিখ সম্প্রদায়ের গুরু। এক সময়ে অকালী গুরুগণ তাঁহাদের চরিত্র ও সংযমদ্বারা শিখ সম্প্রদায়ের যথেষ্ঠ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে এই কেহরসিংহ, পাতিয়ালার মহারাজা নবীনচন্দ্র সিংহকে তাহার শিখধর্ম্মের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের জন্য, ক্ষমা ভিক্ষা করিতে ও অনুতাপ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার চরিত্র বল বুঝা যায়।

কেহরসিংহ, সর্দ্দার—তিনি পাঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরাত জিলার খিবা নামক স্থানের সর্দ্দার। এই সর্দ্দার উপাধি তাহাদের বংশানুক্রমিক। মহারাজ রণজিৎ সিংহের পিতামহ সর্দ্দার চরত সিংহের অধীনে অমর সিংহ একজন সেনাপতি ছিলেন। পরে চরত সিংহের পৌত্র দয়াল সিংহের পুত্র মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধীনেও তিনি কাজ করিয়াছিলেন। অমর সিংহের মৃত্যুর পরে তাঁহার তিন পুত্র ফতে সিংহ দয়াল সিংহ ও মোহর সিংহ মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধীনে কাজ করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কেহর সিংহ এই দয়াল সিংহেরই পৌত্র। সর্দ্দার দয়াল সিংহ ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে আটক নগরের যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া আরও উৎকৃষ্ট জায়গীর প্রাপ্ত হন। ১৮৩২ সালে তিনি এবং ১৮৩৪ সালে তাঁহার পুত্র বিষণ সিংহ পরলোক গমন করেন। এই বিষণ সিংহের পুত্র কিষণ সিংহ ও কেহর সিংহ। ১৮৪৮—৪৯ সালের মুলতান বিদ্রোহে ও ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তাঁহারা ইংরেজ পক্ষে ছিলেন। ১৮৬০ সালে কিষণ সিংহ মৃত্যু মুখে পতিত হইলে কেহর সিংহ রাজ্যাধিকারী হন।

কেহূড় সিংহ—(১) তিনি শালিবাহন-পুরের অধিপতি মঙ্গল রায়ের পৌত্র ও মাজুন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মূলরাজ ও গোগলি নামে কেহূড়ের আরও দুই অনুজ ভ্রাতা ছিলেন। কেহূড় অতিশয় বীর পুরুষ ছিলেন। একদা তিনি যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া এক অশ্ব বিক্রেতার পাঁচশত অশ্ব অপহরণ করিয়াছিলেন। তিনি ঝালোরের রাজা অল্লানসীর এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি ভগবতী তনুদেবীর নামানুসারে তনোট দুর্গ স্থাপন করেন। ৭৩১ খ্রীঃ অব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। ইহার কিছুদিন পরেই বারাহাজাতির সহিত তাঁহাদের সন্ধি স্থাপিত হয় এবং বারাহ-পতির সহিত কেহূড়ের ভ্রাতা মূল রাজের কন্যার বিবাহ হয়। কেহূড়ের

তমু, উটিরাও, চুন্নর, কাফ্রিয়ো ও দায়েম নামে পাঁচ পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই বংশকর পুত্র লাভ করিয়া এক একটি গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন।

কেহূড় সিংহ—(২) যশল্মিরের রাজা তৃতীয় মূলরাজের পুত্র দেবরাজ। মুন্দরপতি রাণার কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সেই রাজদুহিতার গর্ভে দেবরাজের কেহূড় নামে এক পুত্র জন্মে। এই কেহূড় মাতামহ গৃহে দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রমকালে গমন করেন। বিমলা দেবীর গর্ভে রাণা গরসিংহের পুত্রাদি না জন্মাতে তিনি কেহূড়কেই পোষ্য পুত্র গ্রহণে অভিলাষী হইলেন। এদিকে যশিরের পুত্রেরা রাজ্যলাভে বঞ্চিত হইবে বলিয়া, কেহূড়কে হত্যা করেন এবং গরসিংহও গতায়ু হইলেন। কিন্তু বিমলা দেবী ইহাতে নিরস্ত না হইয়া হামিরের জৈত্য ও লূনকর্ণ নামক পুত্রদ্বয়কে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন।

কৈকুবাদ — তিনি দিল্লার সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের পৌত্র ও বঙ্গাধিপ নাসির উদ্দিন মাহামুদের (অন্য নাম বগরা খাঁ) পুত্র। কৈকুবাদের সম্পূর্ণ নাম ময়জ উদ্দিন কৈকুবাদ। পিতামহ গিয়াস উদ্দিন বলবান ১২৮৭ খ্রীঃ অব্দে যখন পরলোক গমন করেন, তখন তাঁহার পিতা নাসির উদ্দিন বাঙ্গালাদেশে ছিলেন। সেইজন্য অমাত্যবর্গ কৈকুবাদকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি পিতামহের কঠোর শাসনের অধীনে থাকিয়াও চরিত্রের সংযম শিক্ষা করেন নাই। ফলে সিংহাসন আরোহণ করিয়াই, সুরা ও সুন্দরীর একান্ত বশীভূত হইলেন। দুষ্ট মন্ত্রী নিজাম উদ্দিন রাজকার্য্যে সর্ব্বপ্রধান হইলেন। এমন কি কুতব উদ্দিনের বংশধরকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া, স্বয়ং দিল্লীর অধিপতি হইতে অভিলাষী হইলেন। তদর্থে নিজাম উদ্দিনের প্ররোচনায় কৈকুবাদ স্বীয় জ্যেষ্ঠতাত পুত্র কৈখুসরুকে নিহত করিলেন এবং ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী খাজে খাতিরকে গর্দ্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইলেন। সম্রাটের পিতা বঙ্গাধিপ নাসির উদ্দিন মামুদ পুত্রের বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য সসৈন্যে শোন নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এদিকে কৈকুবাদও সসৈন্যে ঘর্ঘরা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। নাসির উদ্দিন বুঝিতে পারিলেন, বলপ্রয়োগে কিছু হইবে না। তখন তিনি পুত্রকে অতি বিনয়ের সহিত তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য এইরূপভাবে একখানা পত্র লিখিলেন—"প্রিয় পুত্র, তোমাকে দেখিবার জন্য আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। আর অধিক দিন আমি

তোমার বিরহ সহিতে পারিতেছি না। বৃদ্ধ পিতা জেকব মরিবার পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র যোশেফকে আলিঙ্গন করিবার জন্য যেরূপ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, আমিও তোমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তদপেক্ষা অল্প উদ্বিগ্ন নহি। তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, আর কখনও তোমার রাজকার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইব না। অথবা তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী হইব না।" কৈকুবাদ পিতার পত্র পাঠ করিয়া, অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু দুষ্ট মন্ত্রী নিজাম উদ্দিন জানিতেন যে, এই সাক্ষাতের ফলে তাহার আশা সমূলে নির্মূল হইবে। সেইজন্য তিনি কৈকুবাদকে বুঝাইলেন যে, তিনি স্বয়ং যাইয়া দেখা করিলে সম্রাটের মর্য্যাদার হানি হইবে। সুতরাং বন্দোবস্ত হইল যে, কৈকুবাদ রাজসৈন্য ও অন্যান্য গৌরবসূচক চিহ্ন সহ ঘর্ঘরা নদীর তীর পরিত্যাগপূর্ব্বক শোন নদীর তীরে উপস্থিত হইবেন। নাসির উদ্দিন শোন নদী উত্তীর্ণ হইয়া পুত্রের শিবিরে গমনপূর্ব্বক দরবারের নিয়ম অনুসারে সম্মান প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার সম্মুখীন হইবেন। কৈকুবাদ পিতাকে দর্শন করিয়াও সিংহাসন হইতে অবতরণ করিবেন না। মন্দমতি মন্ত্রী নিজাম উদ্দিন মনে করিয়াছিলেন এই উপায়ে পিতাপুত্রের মিলনের ব্যাঘাত জন্মিবে। কিন্তু বঙ্গাধিপ নাসির উদ্দিন এই হীন প্রস্তাবেও স্বীকৃত হইয়া পুত্রের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। কৈকুবাদ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে পিতার চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং অতি সমাদরে পিতাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন নিজেও অতি বিনীতভাবে তাঁহার সম্মুখে আসন পরিগ্রহ করিলেন তার পর আনন্দসূচক ও আমোদজনক বহু কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। তৎপরে কয়েকদিন ধরিয়া আনন্দ উৎসব চলিয়াছিল। কিছুদিন পরে নাসির উদ্দিন স্বীয় শিবিরে গমন করিলেন। উভয়পক্ষ হইতে যথাযোগ্য উপঢৌকনাদি প্রেরিত হইতে লাগিল। উপর্য্যুপরি নাসির উদ্দিন পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বিদায়ের দিন সমাগত হইলে, তিনি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া কয়েকটী উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচনে শিবিরে প্রতিগমন করিলেন। অতঃপর নাসির উদ্দিন বাঙ্গালা দেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সম্রাট কৈকুবাদ পিতার সদুপদেশ অনুসারে আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। ইহাতে

মন্ত্রী নিজাম উদ্দিন অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। কারণ সম্রাটের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির অনুকূল ছিল। এইজন্য তিনি পুনরায় তাঁহাকে পাপ পথে প্রলুব্ধ করিতে যত্নশীল হইলেন এবং এই কার্য্যে তিনি কৃতকার্য্য হইলেন। সম্রাট কৈকুবাদ আবার পাপাচারে লিপ্ত হইলেন ও অচির কাল মধ্যে পীড়াগ্রস্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। এই সময় পিতার উপদেশাবলী তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে নিজাম উদ্দিনই যে তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। সেই জন্য তিনি নিজাম উদ্দিনকে মুলতানের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু নিজাম উদ্দিন সম্রাটের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া নানা ছলে রাজধানীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরা পূর্ব্ব হইতেই নিজাম উদ্দিনের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। এখন তাঁহারা এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া বিষ প্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিলেন। সামনার শাসনকর্ত্তা জালাল উদ্দিন খিলিজি প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিলেন। এই সময়ে সম্রাটকে মরণাপন্ন দেখিয়া কতিপয় রাজপুরুষ সুলতানের দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্রকে রাজপদ প্রদান পূর্ব্বক নিজেরাই সমস্ত ক্ষমতা গ্রাস করিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই জালাল উদ্দিন রুগ্ন সম্রাটকে হত্যা করিয়া দিল্লীর রাজপদ অধিকার করিলেন। নামে মাত্র শিশু সম্রাট ইতি পূর্ব্বেই বন্দী হইয়াছিলেন। তিনিও পিতার ন্যায় নিহত হইলেন (১২৯০ খ্রীঃ অঃ)।

কৈখুসরু — দিল্লীর সম্রাট বলবন সাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ খাঁ মুলতান নগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার পুত্র কৈখুসরু পিতার মৃত্যুর পর মুলতানের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। পিতামহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পিতৃব্য বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নাসির উদ্দিন বগরা খাঁর পুত্র কৈকুবাদ দিল্লীর সম্রাট হইয়াছিলেন। ১২৮৬ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট কৈকুবাদের মন্ত্রী নিজাম উদ্দিন কর্তৃক কৈখুসরু নিহত হন।

কৈখুসরু নওরোজি কবরাজি — বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত একজন পারশীক সাংবাদিক। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। স্কুল ও কলেজে কিছু শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে মাত্র ষোল বৎসর বয়সে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। প্রথমে 'পারশী মিত্র' নামক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিয়া কিছুকাল 'রস্ত গফ্তর' নামক পত্রিকার সহঃ সম্পাদকরূপে কাজ করেন। পরে ঐ পত্রিকারই সম্পাদক নিযুক্ত হন। সামাজিক বিষয়ে তিনি সংস্কারপন্থী ছিলেন এবং ঐ পত্রিকাকে তিনি স্বীয় উদার মত

প্রচারের অনুকূলে ব্যবহার করেন। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (Fellow) হন। স্ত্রীশিক্ষায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং নানাভাবে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক পরিশ্রম করেন। তিনি দীর্ঘকাল বোম্বাই পুরতন্ত্রের (Municipality) সভ্য থাকিয়া অনেক জনহিতকর কাজ করেন। ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকার পঞ্চাশৎবর্ষ সম্পূর্ত্তি (Jubilee) উপলক্ষে তিনি নানাস্থান হইতে অভিনন্দন প্রাপ্ত হন। তৎপূর্ব্ব বৎসর তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় ব্রিটিশ ইনষ্টিটিউট অব্ জর্ণালিষ্টস (British Institute of Journalists) নামক সংবাদপত্র সেবীদের সঙ্ঘের সদস্য মনোনীত হন। রাজনীতি বিষয়ে তিনি মধ্যপন্থী ছিলেন এবং ভারতে ইংরাজ শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। সংবাদপত্র পরিচালনা দ্বারা তিনি উক্ত বিষয়ে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০২ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কৈয়ট -- তিনি পতঞ্জলির একজন ভাষ্যকার। ৬০০ খ্রীঃ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পিতামহ বজ্রট ও পিতা উবট, অগ্রজ মম্মট। তিনি দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষ কৈয়ট ও মম্মটের ভাগিনেয়।

কৈয়ম সিংহ — যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহের পুত্র অজিৎ সিংহের তিনি মন্ত্রী ও বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। ১৬৭৯ খ্রীঃ অব্দে যশোবন্ত সিংহের সুদূর প্রবাসে মৃত্যু হইলে, তাঁহার বালক পুত্র জগৎ সিংহ রাজা হন। আওরঙ্গজীবের মৃত্যুর পরে বাহাদুর শাহ রাজা হন। এই কৈয়ম সিংহের বিশেষ চেষ্টায় রাজস্থান হইতে গোহত্যা ও জিজিয়াকর (অমুসলমানদের উপর স্থাপিত মুণ্ডকর) উঠিয়া যায়।

কৈলাসচন্দ্র ঘোষ—বাঙ্গালী গ্রন্থকার। তাঁহার নিবাস বর্দ্ধমান জিলার রায়না গ্রামে ছিল। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি "বঙ্গ সাহিত্য ও বঙ্গ ভাষা" নামে একখানি বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনা প্রকাশ করেন।

কৈলাসচন্দ্র নন্দী—ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহাকুমার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে ১২২৫ সনের ভাদ্র মাসে কৈলাসচন্দ্র নন্দী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নন্দদুলাল নন্দী ও মাতার নাম করুণাময়ী। শৈশবকালে তিনি বাড়ীতে থাকিয়াই গৃহ শিক্ষকের নিকট লিখা পড়া শিক্ষা করেন। ১২৬৯ সালে তিনি কুমিল্লা জিলা স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং ১২৭২ সালে মাসিক দশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি ঢাকা কলেজে

অধ্যয়ন করেন। গণিত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। দার্শনিক প্রসন্ন কুমার রায়, (Dr. P. K. Roy), সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ও রায় বাহাদুর ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে ২২শে অগ্রহায়ণ 'পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ' ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ঢাকা নগরে আগমন ও বক্তৃতাদিদ্বারা পূর্ব্ববঙ্গে এক প্রবল ধর্ম্মোৎসাহের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। সেই সময় কৈলাসচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা আনন্দচন্দ্র এবং অন্যান্য সর্ব্বসমেত চল্লিশ জন কেশবচন্দ্রের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দের আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসবের সময় তিনি ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বঙ্গচন্দ্ররায় ও সাধু অঘোর নাথ গুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধু সহ কালীকচ্ছ গ্রামে আসিয়া তাঁহাদের পৈতৃক দুর্গামন্দিরে ব্রহ্মোৎসব করিয়াছিলেন। সেই দুর্গামন্দির এখন ব্রহ্মমন্দিরে পরিণত। প্রতি বৎসর শারদীয় উৎসবের সময় ব্রাহ্ম প্রচারকগণ এখানে আসিয়া ব্রহ্মোৎসব করিতেন। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, প্রচারক গিরীশচন্দ্র সেন, বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ কালীকচ্ছ আসিয়া ব্রহ্মোৎসব সম্ভোগ করিতেন। এই সকল কার্য্যে কৈলাস চন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল সময় সময় স্বগ্রামে থাকিয়া সন্নিকটস্থ হাটবাজারে ও স্কুল গৃহে বক্তৃতাদির দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তাঁহার চেষ্টায় গ্রামে একটী সার্ব্বজনীন ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে ঢাকাতে 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকা এবং ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে 'ইষ্ট' (East) পত্রিকা (কালীনারায়ণ রায় মহাশয়ের সঙ্গে একযোগে) বাহির করেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই নভেম্বর তারিখে সোহাগ দল পরিবার নামে খ্যাত কুলীন ব্রাহ্মণ গাঙ্গুলী পরিবারের কনিষ্ঠা কুমারী কন্যা কালাসুন্দরীকে ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে বিবাহ করেন। তিনি ঢাকাতে ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে 'ইষ্ট বেঙ্গল প্রেস' ও ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে 'নিউ প্রেস' স্থাপন করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'পিলগ্রিম্‌স জারনেল' (Pilgrim's Journal) নামে এক পত্রিকা বাহির করেন।

তাঁহার স্বদেশপ্রীতি অতি প্রবল ছিল। 'ইষ্ট' পত্রিকা সম্পাদন কালে সম্পাদকরূপে ঢাকাতে বড় লাটের দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়া ধুতি চাদর পরিধান করিয়া অন্যান্য দরবারী পোষাক পরিহিত ব্যক্তিদের সঙ্গে একমাত্র তিনিই যোগদান করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে (১২৯১ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ) তিনি স্বগ্রামে পরলোক গমন করেন।

কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — ফরাসী চন্দননগরের অধিবাসী। তিনি ১২৯১ সালে 'কুমুদ্বতী' ও 'সুপর্ণা' নামে দুইখানি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কৈলাসচন্দ্র বসু—১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হরলাল বসু। তাঁহার প্রপিতামহ দেওয়ান ভবানীচরণ বসু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম করিয়া প্রচুর অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা বহু অংশে বিভক্ত হইয়া তাঁহার পিতার সময় উহার অতি সামান্যই ছিল। সেজন্য তাঁহার পিতার অকাল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে হয়। তিনি প্রথমে একটী সামান্য স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া পরে ওরিয়েণ্টেল সেমিনারীতে ও তৎপরে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। এই সময়ে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ককারেল কোম্পানীর আফিসে সামান্য কেরাণীর কাজে নিযুক্ত হন। পরে মিলিটারি একাউনটেণ্ট আফিসে একটী কাজে নিযুক্ত হন। এই সময়ে রেভাঃ ডাঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিক কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করেন। কৈলাস বাবু তাঁহার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে অনেক স্থলে তাহার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া, বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'লিটেরেরী ক্রনিকল' (Literary Chronicle) নামে একখানি ইংরেজী মাসিকপত্রিকা বাহির করেন। তৎকালে ইহা বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। তৎপরে একবার টাউনহলে এক সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করিয়া, সুবক্তা বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হন। মহাত্মা বেথুন সাহেবের (Bethune Society) স্মরণার্থ স্থাপিত বেথুন সভায়ও কয়েকটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার ফলে তদানীন্তন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী তাঁহার প্রতি প্রীতিপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে একটী উচ্চতর কর্ম্মে নিযুক্ত করেন।

তিনি এদেশের স্ত্রীজাতির উন্নতি কল্পে সর্ব্বত্র সচেষ্ট ছিলেন। রেভাঃ ডাঃ ডাফ তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে ডাঃ ডাফ বেথুন সভার সভাপতি ছিলেন, সেই সময়ে তিনি কৈলাসচন্দ্রকে উক্ত সভার অবৈতনিক সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন। উক্ত পদে তিনি অতিশয় যোগ্যতার সহিত সুদীর্ঘকাল অবস্থিত থাকিয়া কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সিভিল ফাইনেন্স কমিশনের (Civil Finance Commission) সভাপতি সার রিচার্ড টেম্পল (Sir Richard Temple) কৈলাসচন্দ্রের প্রতি অতিশয় প্রীতি

সম্পন্ন ছিলেন। তিনি কৈলাসচন্দ্রকে তাঁহার সহকর্ম্মীরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। 'বেঙ্গলী', 'হিন্দুপেট্রিয়ট' প্রভৃতি পত্রিকায় লিখিত তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী দেশের সুধীমণ্ডলী মধ্যে ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার যশ দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে এই উদীয়মান মনস্বী পরলোক গমন করেন।

কৈলাসচন্দ্র বসু, সার — তিনি কলিকাতা নগরীর বিশিষ্ট নাগরিক ও খ্যাতনামা চিকিৎসক। (জন্ম ১৮৫০ খ্রীঃ)। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে শিক্ষা সমাপন করিয়া কিছুকাল সরকারী চাকুরী করেন। পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে থাকেন। জনহিতকর বহু পৌর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি কলিকাতা পুরতন্ত্র (Municipality) বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সদস্য ছিলেন। তদ্ভিন্ন চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। নানারূপ সৎকার্য্যেও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। কলিকাতাস্থ মাড়বাড়ী ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাঁহার প্রতিপত্তি খুব বেশী ছিল। জন কল্যাণকর কার্য্যে সহানুভূতি ও উৎসাহের জন্য তিনি ক্রমান্বয়ে রায়বাহাদুর, সি-আই-ই (C.I.E.) ও বি-ঈ (O. B. E.) এবং সার (Knight) উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ — ১২৬৬ বঙ্গাব্দের ২৫শে অগ্রহায়ণ হাওড়া জিলার অন্তর্গত সাঁতারাগাছি গ্রামে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নন্দলাল বিদ্যারত্ন। তাঁহার পিতামহ দেশবিশ্রুত নৈয়ায়িক পণ্ডিত হলধর ন্যায়রত্ন মহাশয়ের টোলে কেবল বঙ্গদেশ নহে দ্রাবিড়, উড্র, মধ্যভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থান হইতেও পাঠার্থী সমাগত হইত। কৈলাসচন্দ্র পিতার মধ্যম পুত্র। তিনি কলিকাতা শিবনারায়ণ দাসের লেনস্থ স্বীয় মাতামহ কাশীনাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের আলয়ে অবস্থান পূর্ব্বক সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন এবং তথা হইতে এম-এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ডাফ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। প্রসিদ্ধ 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরলোক গমন করিলে, কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার পুত্রদের নিকট হইতে সোমপ্রকাশ পত্রিকার সত্ত্ব ক্রয় করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সম্পাদক

হইয়া উৎকৃষ্টরূপে ইহার প্রচার কার্য্য করিয়াছিলেন।

সংগীত শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। তিনি একজন বিখ্যাত মার্দ্দঙ্গিকও ছিলেন। এই নানা বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ২৭শে ফাল্গুন পরলোক গমন করেন; তাঁহার দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য ও কমলাকান্ত স্মৃতিরত্ন নামে দুই পুত্র বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারপুত্র স্মৃতিরত্ন মহাশয় স্বীয় আলয়ে একটী টোল স্থাপন করিয়া পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি রক্ষা করিতেছেন।

কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—নদীয়া জিলার হরিপুর তাঁহার জন্মস্থান। 'চপলা' ও 'কবিতা প্রসূন' নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি — প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী দার্শনিক পণ্ডিত। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত ধাত্রী গ্রামের এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বংশে তাঁহার জন্ম হয়। পিতামহ ভবনাথ তর্কপঞ্চানন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। কৈলাস চন্দ্রের পিতার নাম ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম। তিনিও একজন খ্যাতনামা স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। শিরোমণি মহাশয় প্রথমতঃ স্বীয় খুল্লতাত জনার্দ্দন তর্কবাগীশ ও তৎপরে যথাক্রমে হরচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন ও তৎপরে গোলোকনাথের পুত্র প্রসন্নকুমার তর্ক-রত্নের নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন সমাপনান্তে তিনি স্বগ্রামে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। পরে নানাপ্রকার সাংসারিক বিপদ ও দৈবদুর্য্যোগে আর্থিক কষ্ট উপস্থিত হইলে তিনি ভাগ্যান্বেষণে বিদেশ যাত্রা করেন। প্রথমে পাটনা ও পরে তথা হইতে কাশীতে উপস্থিত হন। তথায় কিছুকাল অবস্থানের পর প্রথমে অস্থায়ী ভাবে কাশীর রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনার ভার প্রাপ্ত হন। পরে স্থায়ীভাবে উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে অন্যান্য অনেক বিষয়ে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। কিছুকাল পরে তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছানুসারে নিজগৃহে আবশ্যকীয় অধ্যাপনার কার্য্য চলিতে থাকে। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু সম্পূর্ণ ভাবে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। অধ্যাপনা কার্য্য তাঁহার এরূপ প্রিয় ছিল যে চিকিৎসকের বিশেষ নিষেধ সত্ত্বেও পাঠার্থী অথবা জিজ্ঞাসুকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না।

১৩১৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে ত্রিপুরার মহারাজার কাশী গমন উপ-লক্ষে অভিনন্দন দান করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি তথায় গমন করেন এবং সভা মধ্যেই অতিশয় পীড়িত হইয়া গৃহে

প্রত্যাগমন করেন। শিরোমণি মহাশয়, শান্ত প্রকৃতি, নির্ব্বিরোধী, স্বল্প সন্তুষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। গভীর শোকের মধ্যেও তিনি শান্ত ও অটল থাকিতেন। নিজের ছাত্রাবস্থায় দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতে হইয়াছিল বলিয়া আজীবন তিনি সংযত চরিত্র ও মিতব্যয়ী ছিলেন। বাঙ্গালার বাহিরে যেসকল পণ্ডিত পাণ্ডিত্য ও চরিত্রগুণে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জল করেন, কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি তাঁহাদের অন্যতম। ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ৩রা চৈত্র কাশীধামে দেহত্যাগ করেন।

কৈলাসচন্দ্র সরকার—তিনি পাবনা জেলার অন্তর্গত বনগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমেই তিনি পাবনায় শিক্ষকতা কার্য্য আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে সাংবাদিক হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অন্তরে জাগরিত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কোনও শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত দ্রুত লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করেন এবং কিছুদিন পরেই তিনি কলিকাতার কয়েকটা সংবাদ পত্রের সংবাদদাতা নিযুক্ত হন। অবশেষে তিনি পঁচিশ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আগমন করিয়া 'টেলিগ্রাফ পত্রের' রিপোর্টার নিযুক্ত হন। তৎপর তিনি সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' নামক সংবাদ পত্রের রিপোর্টার হন। উহার পর তিনি ১২ বৎসরকাল 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার রিপোর্টার ছিলেন; তিনি কিছুদিন 'ষ্টেট্স ম্যান' পত্রিকারও রিপোর্টার ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অমৃতবাজার' পত্রিকা ও 'আত্মশক্তি'র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি এক সময়ে ইংরাজী 'বসুমতীর' সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন। ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি মিঃ এইচ সি ভাদুড়ীর সহিত সরকারস' কমার্শিয়াল ক্লাস প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২২ খ্রীঃ অব্দে উহা কাশিম বাজার পলিটেক্‌নিক ইনষ্টিটিউটের সহিত মিলিত হয় এবং তিনি উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টার ছিলেন। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছাত্রদের দ্রুত লিখন পদ্ধতির শিক্ষক ছিলেন এবং বঙ্গবাসী কলেজের জার্ম্মেন ও ফরাসী ভাষা এবং দ্রুত লিখন পদ্ধতির শিক্ষক ছিলেন। তিনি বহু ব্যক্তিকে দ্রুত লিখন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে অনেকে 'লিবার্টি' 'অমৃতবাজার পত্রিকা' 'ফ্রী প্রেস,' 'ষ্টেটস্‌ম্যান' ও অন্যান্য সংবাদ পত্রে কাজ করিতেছেন। তিনি একজন সুগায়ক ছিলেন। ১৩৪০ সালের ৯ই বৈশাখ (১৯৩৩ খ্রীঃ অব্দে) ৬০ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

কৈলাসচন্দ্র সিংহ বিদ্যাভূষণ — ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে ১২৫৮ বঙ্গাব্দের ১৮ই আষাঢ় রথযাত্রার দিনে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গোলোকচন্দ্র সিংহ ত্রিপুরার মহারাজের সচীব ছিলেন। প্রথমে স্বীয় গ্রামে সাধক আনন্দচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে, পরে কুমিল্লা জিলা স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ১২৭৩ সালে পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহার পাঠ বন্ধ হয়। ১৩ বৎসর বয়সেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেও তাঁহার অধ্যয়ন স্পৃহা নিবৃত্ত হয় নাই। তিনি সর্ব্বদাই নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। এই সময়ে ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'হিন্দু হিতৈষী' পত্রিকায় তিনি লিখিতেন। আগরতলায় রাজপরিবারে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইলে, তিনি উক্ত ঘটনার সহিত জড়িত হইয়া পড়েন। এই সময়ে তিনি 'ত্রিপুর ইতিবৃত্ত' নামে এক খানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইহার পরেই ফরাসী বীরাঙ্গনা জোয়ানের জীবন চরিত প্রকাশিত হয়। এই সময়ে ইতিহাস পাঠে তিনি মনোনিবেশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গ দর্শনে' তাঁহার 'মণিপুর বিবরণ,' 'ভারতী' পত্রিকায় 'হিয়োন সাঙ্গের বাঙ্গালা ভ্রমণ' প্রকাশিত হইয়াছিল।

তিনি 'বান্ধব' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের সহিত পরিচিত হইয়া, বান্ধব পত্রিকায় 'দিনাজপুর স্তম্ভ লিপি' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেন। এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে কলিকাতায় আহ্বান করেন এবং তাঁহাদের উড়িষ্যা-স্থিত জমিদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। তিনি এই সময়ে ভারতীতে 'উড়িষ্যা যাত্রা' ও 'উড়িষ্যার ইতিহাস' নামে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। দেড় বৎসর পরে কলিকাতা আসিয়া আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহকারী সম্পাদক হন। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদক ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শঙ্কর, আনন্দ-গিরি, শ্রীধর স্বামীর টীকা এবং বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হয়। 'শ্রীদারু ব্রহ্ম' নামে উড়িষ্যার জগন্নাথ দেবের ইতিহাস, সেন রাজগণ, মোহমুদ্‌গর, হস্তামলক, সাধক সঙ্গীত ১ম ও ২য় ভাগ ক্রমে তৎপরে প্রকাশিত হয়। এইরূপে প্রায় দশ বৎসর কার্য্য করিয়া চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি দেশে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন। তিনি ভারতী, বান্ধব, নব্যভারত, তত্ত্ববোধিনী, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় বহু ঐতিহাসিক ও নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার বঙ্গভাণ্ডারের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান 'রাজমালা' বা ত্রিপুরার ইতিহাস। ত্রিপুরা রাজ্যের ধারাবাহিক কোন ইতি-হাস ছিল না। তিনি রাজমালা প্রণয়ন করিয়া সে অভাব পূরণ করেন। এক

সময়ে সমস্ত বঙ্গের একখানা ইতিহাস রচনা করিবার বাসনাও তিনি করিয়াছিলেন এবং বান্ধব পত্রিকায় তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধও সে সম্বন্ধে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু সে সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় নাই। প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। তৎপরে কিছুদিন বৌদ্ধ মতের প্রতিও তাঁহার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। এক সময়ে বেদান্ত চর্চ্চায়ও যোগ দিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি কালীর উপাসক হইয়াছিলেন। তাঁহার শেষ দান 'কাঙ্গালের গীত' ও 'কাঙ্গাল গীতা'। তাঁহার রচিত সঙ্গীত গুলি উদার ভাবে পরিপূর্ণ। শেষ জীবনে তিনি বঙ্গীয় সাধকদের জীবন চরিত রচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পন্ন করিবার পূর্ব্বেই তিনি ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২৪শে পৌষ পরলোক গমন করেন।

কৈলাস জ্যোতিষার্ণব — জন্মস্থান, তারণদিয়া, এই জ্যোতিষী পণ্ডিত 'জ্যোতিষ প্রভাকর' ও 'জ্যোতিষ প্রদীপ' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়ছেন। তিনি একজন পত্রিকাকারও ছিলেন।

কৈলাসবর্ম্মা — তিনি 'ব্যবহারদীপ' নামক গ্রন্থ প্রণেতা।

কৈলাস বারুই — একজন বাঙ্গালী কবি। তিনি গোপালচন্দ্র দাস উড়ের শিষ্যরূপে বিশেষ যশ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কবিতায় চুট্‌কি রাগিনী মিশাইয়া সুন্দররূপে স্বভাব বর্ণনা করিতে পারিতেন।

কৈলূন—(১) রাজপুত নৃপতি। তিনি যশল্মীর নগরের স্থাপন কর্ত্তা প্রসিদ্ধ যশলের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি পাহু মন্ত্রীর অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া রাজ্য হইতে দূরীভূত হন। সুতরাং ১১৬৮ খ্রীঃ অব্দে যশলের মৃত্যুর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শালিবাহন রাজা হইয়াছিলেন। শিরোহীর অধিপতি মানসিংহের নিকট হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিলে শালিবাহন জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজিলের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, পরিণয় কার্য্যে গমন করিলেন। কিন্তু বিজিল মন্দপ্রকৃতি ধাত্রী ভ্রাতার পরামর্শে, 'পিতা ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন' বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়া, স্বয়ং রাজা হইলেন। শালিবাহন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও পিতৃদ্রোহী বিজিল সিংহাসন ত্যাগ করিলেন না। শালিবাহন মর্ম্মপীড়িত হইয়া খাড়াল রাজ্যে গমন করিলেন এবং তথায় বেলুচদের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন। এদিকে বিজিলও বেশীদিন রাজ্যভোগ করিতে পারিলেন না। একদা বিজিল ক্রোধান্ধ হইয়া ধাত্রী ভ্রাতাকে প্রহার করেন। তিনিও বিজিলকে প্রতিপ্রহার করেন। বিজিল এই অপমানে আত্মহত্যা করেন। বিজিল নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং যশলের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৈলুন আহূত হইয়া

১২০০ খ্রীঃ অব্দে যশল্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই সময়ে বলোচ জাতীয় খিজির খাঁ, পঞ্চ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া, খাড়াল রাজ্য আক্রমণ করেন। ইহা তাঁহার দ্বিতীয় অভিযান। ইতিপূর্ব্বে তিনি একবার খাড়াল রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কৈলূন খিজির খাঁকে সেই যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। কৈলূন ১২১৬ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার ছয় পুত্র — চাচিকদেব, পহ্লন, জয়চাঁদ, পিতম সিংহ, পিতম চাঁদ ও উশ রাও। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজা হইয়াছিলেন। কৈলূনের দ্বিতীয় পুত্র পহ্লন ও তৃতীয় পুত্র জয়চাঁদ হইতে বহু সন্তান সন্ততি প্রসূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা জয়শির ও শিহান রাজপুত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

কৈলূন—(২) যশল্মীরপতি তৃতীয় মূলরাজের পুত্র দেবরাজ, দেবরাজের পুত্র কেহুড়। কেহুড়ের আট পুত্রের মধ্যে কৈলূন তৃতীয় ছিলেন। কৈলূন স্বীয় জ্যেষ্ঠাগ্রজ সোমজীর জায়গীর বিকমপুর বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি সদলে গিরাপ নামক স্থানে যাইয়া বাস করেন। এতদ্ব্যতীত দেবরাওল রাজ্যও অধিকার করিয়াছিল। বিপাসা নদীর তীরে কৈলূন স্বীয় পিতার নামে কেরোর নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাতে ভট্টিকুলের চিরশত্রু জোহর ও লাঙ্গাহদের সহিত বিরোধ হয়। লাঙ্গাহদিগের সেনাপতি ওমর খাঁ কোরাই, কৈলূনের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তৎপরে তৎপ্রদেশস্থ চাহিল মোহিল, জোহর, লাঙ্গাহ, কুলের প্রভৃতি জাতি ভঞ্জবীর কৈলূনের ভয়ে অতিশয় হীনবীর্য্য হইয়াছিল। তিনি জাম রাজ্যের প্রসিদ্ধ শ্যামবংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যসীমা পাঞ্জাব প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে জামরাজ্যের রাজা সুজোহিত নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলেন। কৈলূন বিনা বাধায় তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া সিন্ধু নদীর তীর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিলেন। এই ভঞ্জবীর বাহাত্তর বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তৎপরে চাচিকদেব রাজা হইয়াছিলেন।

কোকরেল হোরেস এবেল — (Horace Abel Cockerele) ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ইটন হেলীবেড়িতে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৫৩ সালে বাঙ্গালা দেশে সিবিলিয়ান হইয়া আগমন করেন। ১৮৬৯ সালে কিছুদিন কলিকাতা কর্পোরেশনের সভাপতি এবং ১৮৭২ সালে পুলিশ কমিশনার ছিলেন। ১৮৭৭—৮২ পর্য্যন্ত বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটেরীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮২—৮৭ সাল পর্য্যন্ত রেভিনিউ বোর্ডের সভ্য ছিলেন। ১৮৮৫ সালের ১১ই আগষ্ট হইতে ১৭ই সেপ্টম্বর পর্য্যন্ত অস্থায়ী লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ছিলেন। তৎপরে অবসর গ্রহণ করেন।

কোকিল নাথ — নাথ পন্থীদের 'সুধাকর চন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থে ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষের নাম পাওয়া যায়, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। অপান নাথ দেখ।

কোক্কল্লদেব, প্রথম—হৈহয়বংশীয়দের এক শাখা কলচারি চেদী নামে খ্যাত ছিল। তাঁহারা ত্রিপুর রাজ্যে (বর্ত্তমান জব্বলপুর) বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ৮৫০ খ্রীঃ অব্দে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম কোক্কল্লদেব বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি উত্তরে কনৌজের মিহির ভোজ ও দক্ষিণে রাষ্ট্রকূটবংশীয় দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজকে পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু ইহাও সত্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ এই উভয় নরপতিই অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। বিশেষতঃ কোক্কল্ল দেবের এক কন্যাকে রাষ্ট্রকূটপতি দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজ বিবাহ করিয়াছিলেন। কনৌজের মিহিরভোজের কন্যা নাট্টদেবীকে কোক্কল্লদেব বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুগ্ধতুঙ্গ (অন্যনাম প্রসিদ্ধধবল বা ধবল) রাজা হন।

কোক্কল্লদেব, দ্বিতীয়—কলচারি চেদী-বংশীয় নরপতি যুবরাজদেবের পুত্র। (৯৮০ খ্রীঃ অব্দ)। তাঁহার পুত্র প্রসিদ্ধ গাঙ্গেয় দেব।

বংশাবলী

কোক্কল্ল দেব (১)—৮৫০ খ্রীঃ অঃ
|
মুগ্ধতুঙ্গ বা প্রসিদ্ধধবল—৯০০ খ্রীঃ
|
বালহর্ষ — কেয়ূরবর্ষ যুবরাজ—৯২৫ খ্রীঃ
মহিষী—নোহলা দেবী
|
লক্ষ্মণ দেব—৯৫০ খ্রীঃ
|
শঙ্করগণ—৯৭০ খ্রীঃ — যুবরাজ দেব—৯৮০ খ্রীঃ
|
কোক্কল্ল দেব (দ্বিতীয়)—১০০০ খ্রীঃ
|
গাঙ্গেয় দেব—১০২০ খ্রীঃ

কোক্কিলি—তিনি বেঙ্গীর চালুক্য-বংশীয় নরপতি যুবরাজের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি ৭০৯ খ্রীঃ অব্দে মাত্র ছয় মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা বিষ্ণুবর্দ্ধন (৩য়) রাজা হইয়াছিলেন। কুব্জবিষ্ণুবর্দ্ধন দেখ।

কোটা, রাণী—তিনি কাশ্মীরের রাজা রামচন্দ্রের মহিষী ছিলেন। রাজার মৃত্যুর পরে তাঁহার শিশু পুত্র হৈদর রাজা হন। কিন্তু রাণীই প্রকৃত পক্ষে

রাজ্য শাসন করিতেন। সেই সময়ে শাহমেরা (সামস্ উদ্দিন) নামে একজন মুসলমান কর্ম্মচারী নাবালক রাজ পুত্রের অভিভাবক ছিলেন। এই সুযোগে রিঞ্চন নামে এক সামন্ত রাজা রাজ্য অধিকার করেন। তিনি কয়েক বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া পরলোক গত হইলে উদয়ন দেব রাজা হন। উদয়নের মৃত্যুর পরে রাণী কোটা প্রাধান্য লাভ করেন। ইতিমধ্যে শাহমেরা (সামস্ উদ্দিন) রাজ্যের অরাজক অবস্থার মধ্যে ক্রমে বল সঞ্চয় করিয়া ১৩৩৯ খ্রীঃ অব্দে কাশ্মীর সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময় হইতেই কাশ্মীরে মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হইল।

কোট্টভঞ্জ—তিনি উড়িষ্যার ভঞ্জবংশীয় নরপতি বীরভদ্রের তনয়। কোট্টভঞ্জের পুত্র দ্বিতীয় দিগ্‌ভঞ্জ, পৌত্র দ্বিতীয় রণভঞ্জ, প্রপৌত্র রাজভঞ্জ ও পৃথ্বীভঞ্জ। পৃথ্বীভঞ্জের পুত্র নরেন্দ্রভঞ্জ পর্য্যন্ত এই বংশের বিবরণ পাওয়া যায়। তৎপরে অন্য ভঞ্জ নরপতিদের সহিত তাঁহাদের সংযোগ স্থাপন করা যায় না। এই বংশের দ্বিতীয় রণভঞ্জের ১০৬৬ খ্রীঃ অব্দের বামনঘাটিতে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা সামান্য রাজা মাত্র ছিলেন। পৃথ্বীভঞ্জ, দ্বিতীয় রণভঞ্জ রাজার প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন না। বোধ হয় রাজভঞ্জ অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। সেই জন্য পৃথ্বীভঞ্জ রাজ্যের অধিকারী হন। তাঁহাদের সময়ে খিজিঙ্গকোট্ট নামক স্থানে রাজধানী ছিল।

কৌণা দেবী—গৌড়ের গুপ্তবংশীয় নরপতি আদিত্য সেনের মহিষী। তাঁহাদের পুত্র দেবগুপ্ত। আদিত্য সেন দেখ।

কোতেরিয়ো—তিনি মিবারের একজন প্রধান সামন্ত নরপতি। মিবারের রাণা উদয়সিংহ একবার শহিদাস নামক সর্দ্দারের আলয়ে গোপনে অবস্থান করিয়া পরে যখন উদয়সিংহ নিজ পরিচয় প্রদান করেন, তখন এই সামন্ত নরপতি কোতেরিয়ো তাঁহার সঙ্গে একত্র ভোজন করিয়া সকলের সন্দেহ দূর করিয়াছিলেন। তিনি রাণার পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক বনবীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করিয়াছিলেন। উদয়সিংহ দেখ।

কোনেরী—তিনি একজন জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত। ১৬৩২ শকের (১৭১০ খ্রীঃ) পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। 'খেট বোধ' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

কোবাদ খাঁ গক্ষ—তিনি মুঘল সম্রাট আকবরের একজন সেনাপতি। পাণিপথের যুদ্ধের পূর্ব্বে আগ্রা নগরে মোহাম্মদ আদিলশাহ শূরের সেনাপতি হিমু তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

কোরণ্ডক নাথ — গোরক্ষ নাথ প্রবর্ত্তিত একজন শৈব সন্ন্যাসী। তিনি হঠযোগসিদ্ধ একজন প্রসিদ্ধ যোগী ছিলেন।

কোলব্রুক, হেনরী টমাস — (Henry Thomas, Cole Brooke) ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক সমিতির সভাপতি স্যার জর্জ্জ কোলব্রুক তাঁহার পিতা। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর চাকুরী গ্রহণ করিয়া তিনি ভারতে আগমন করেন। প্রথমে তিনি পূর্ণিয়া ও ত্রিহুতের সহকারী কালেক্টররূপে কর্ম্ম করেন। কার্য্যব্যপদেশে তিনি সংস্কৃত ভাষা এবং উক্ত ভাষায় হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৭৯৯—১৮০১ খ্রীঃ অব্দে তিনি নাগপুরের অন্তর্গত বেরারের রাজার দরবারের দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ১৮০১ খ্রীঃ অব্দে তিনি সদর দেওয়ানী আদালতের একজন বিচারক নিযুক্ত হন। চারি বৎসর পর উক্ত আদালতের প্রধান বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত ও হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রের অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮০৭ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮১২ পর্য্যন্ত তিনি সুপ্রীম কৌন্সিলের সদস্য ছিলেন। অতঃপর প্রায় দুই বৎসরের জন্য তিনি রেভিনিউ বোর্ডের সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮০৭—১৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গলের সভাপতি ছিলেন। অতঃপর তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত হন। ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী স্থাপনে সহায়তা করেন এবং উহার প্রথম সভাপতি হন। ইহার পর তিনি সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিশক্তি হীন হন ও ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

তিনি সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, বেদ, হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র, জ্যোতিষ, গণিত, দর্শন, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা সমিতিকে বহু মৌলিক প্রবন্ধাদি দান করেন; ভারত ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এবং বিদেশের বহু অনুশীলন সমিতির তিনি সদস্য ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রের এক সারসংগ্রহ সঙ্কলন করিয়া ইংরাজিতে প্রকাশ করেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারী হইলেও তিনি তাঁহার প্রথম প্রবন্ধে কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায় নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

কোলা সিংহ — যশল্মীরপতি কেহুড়ের পৌত্র জয়তুঙ্গ, জয়তুঙ্গের পুত্র চোহির, তৎপুত্র কোলা। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন। তিনি স্বীয় নামে কোলাসহর নামক নগর স্থাপন করেন।

কোলাহল—তিনি দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনকালের একজন রাজা। তিনি স্বীয় নামে মহীশূর প্রদেশে কোলাহল নামে একটী নগর স্থাপন করেন। এই স্থানে তাঁহার বংশের একাশিজন নরপতি রাজত্ব করিবার পরে বীরসিংহ নামক একজন নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম কামার্ণব, প্রথম দানার্ণব, প্রথম গুণার্ণব, নরসিংহ ও প্রথম বজ্রহস্ত নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কামার্ণব কলিঙ্গের রাজা বালাদিত্যকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন এবং জন্তবুরে (দন্তপুরে) ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন।

কোলিসামন্ত সিংহ রায়—তিনি উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ হরিশ্চন্দ্রের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। সুলেমান কররাণীর পুত্র বায়জিদ কটক আক্রমণ করিলে, তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া (১৫৬৮ খ্রীঃ অব্দে) নিহত হন।

কোল্লভীগণ্ড বিজয়াদিত্য - তিনি বেঙ্গীর চালুক্যবংশীয় নরপতি চালুক্য-ভীমদ্রোহার্জ্জুনের পুত্র। তিনি মাত্র ছয়মাস রাজত্ব করেন (৯১৪ খ্রীঃ)। তৎপরে তাঁহার পুত্র অম্ম বিষ্ণুবর্দ্ধন রাজা হন।

কৌটিল্য—প্রাচীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও অর্থশাস্ত্রকার। তিনি চাণক্য, বিষ্ণুগুপ্ত প্রভৃতি নামেও পরিচিত ছিলেন। চাণক্য দ্রষ্টব্য।

কৌণ্ডভণ্ড— একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। তাঁহার পিতামহের নাম লক্ষ্মীধর। তিনি ভট্টোজি দীক্ষিতের ভ্রাতুষ্পুত্র। 'বৈয়াকরণ ভূষণসার' 'তর্কপ্রদীপ' 'ন্যায়পদার্থ দীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার প্রণীত।

কৌতুক—কান্যকুব্জ দেশীয় ব্রাহ্মণ। স্বাধীন ত্রিপুরার অধিপতি ধর্ম্মমাণিক্য, তাঁহাকে নিজ রাজ্যে আনিয়া পৌরহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন। কুমিল্লা নগরের ধর্ম্মসাগর নামক জলাশয় প্রতিষ্ঠাকালে মহারাজ যে আট জন ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে তিনি একজন ছিলেন।

কৌরুবকী—মৌর্য্যনরপতি অশোকের অন্যতমা মহিষী। তাঁহার গর্ভে তিবর (তিভল বা তিতিভর) জন্মগ্রহণ করেন।

ক্যানিং, লর্ড— (Earl Canning) তাঁহার সম্পূর্ণ নাম চার্লস্ জন ক্যানিং (Charles John Canning)। তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম ভাইস্‌রয় (Viceroy) বা রাজপ্রতিনিধি। ১৮১২ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম জর্জ ক্যানিং (Georgo Canning)। তিনি অক্‌সফোর্ড (Oxford) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য পদ লাভ করেন। ১৮৪১—৪৬ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র বিভাগে এক উচ্চ পদে

(Under Secretary) নিযুক্ত ছিলেন। কিছুকাল পোষ্টমাষ্টার জেনেরেলের কাজও করেন। ১৮৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী ভারতের বড়লাট হইয়া তিনি এদেশে আগমন করেন। এখানে আসিয়াই তিনি পারস্য যুদ্ধে লিপ্ত হন। সেনাপতি সার জেমস্ উট্রাম (Sir James Outram) যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরেজদের গৌরব বর্দ্ধন করেন। এই সময়ে চীন দেশের যুদ্ধেও ইংরেজদের জয়লাভ হইয়াছিল।

তাঁহার সময়ের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা সিপাহী বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের বহু কারণের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর পর রাজ্যগ্রাসিনী নীতি অন্যতম বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। লর্ড ডালহৌসী এদেশের বহু সংস্কার সাধনের অগ্রবর্ত্তী হইলেও একমাত্র এই নীতির জন্য পরবর্ত্তী লোকেরা তাঁহার সেই কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই সময়ে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি। ইহা জানা থাকিলে সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃত কারণটী বুঝা যাইবে। লর্ড ডালহৌসী ৮ বৎসর এদেশ শাসন করিয়া ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের ৬ই মার্চ্চ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার শাসনকালে সাম্রাজ্যের বিস্তার পূর্ব্বাপেক্ষায় পঞ্চমাংশ এবং প্রজার সংখ্যা চতুর্থাংশ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু রাজ্যের আয় তদনুপাতে বর্দ্ধিত না হইয়া বরং ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তখন আয় ২১ কোটী ও ব্যয় ২৩ কোটী ছিল। রাজ্যের ঋণও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঋণ ১৮৩৭ সালে ছিল ২৭॥ কোটী আর সেই ঋণ ১৮৫৬ সালে দাঁড়াইয়াছিল ৬২ কোটী। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের আয় পূর্ব্বেরই ন্যায় বেশী ছিল ব্যয় কম ছিল। আয় ছিল ৯ কোটী ব্যয় ৪ কোটীর ন্যূন ছিল। ভারতের আয় ব্যয়ের সমতা ছিল না বলিয়া, তাহার একটা কুফল এই হইয়াছিল যে, সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীর সংখ্যা, ব্যয় বৃদ্ধির আশঙ্কায়, উপযুক্তরূপ বৃদ্ধি করা অসম্ভব হইয়াছিল। সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীর স্থানে অল্প বেতনে সৈনিক পুরুষদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। পাঞ্জাব, পেগু, আসাম, সিন্ধু প্রভৃতি নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের শাসনকার্য্য এই সৈনিক পুরুষদিগের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইত। তাঁহাদের দ্বারা প্রজাপালন যেরূপই হউক না কেন, তাঁহাদের পরিত্যক্ত স্থানে অল্প বয়স্ক সৈনিক নিযুক্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য ভালরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতে ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। লর্ড ডালহৌসী ব্যয় বৃদ্ধির আশঙ্কায় নিয়মিত (Regular) সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু অনিয়মিত (Irregular) সৈন্য ত্রিশ সহস্রেরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই কারণে

ইউরোপীয় সেনাপতির সংখ্যা দল প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষায় ন্যূন হইয়াছিল। সুতরাং সৈনিকগণ সুযোগ্য ও যথা সংখ্যক অধিনায়ক হীন হইয়াছিল। এই সব কারণে রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছিল না। ইহার প্রমাণ সাঁওতাল বিদ্রোহ। বোদের রাজা ছোকরা বিশি নামক এক ডাকাত সর্দ্দারকে প্রতিপালন করিতেন এবং তাহাদ্বারা চতুর্দ্দিকে লুণ্ঠন করিতেন। লর্ড ক্যানিং রাজ্যের এই অবস্থায় শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু এই বিশৃঙ্খলতা বাহিরে কিছুমাত্র প্রকাশিত হয় নাই। এই সময়ে রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ডের বিবাদ সংঘটিত হওয়ায়, ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়া সাড়ে পাঁচ কোটী টাকা আয় বৃদ্ধি পাইয়া ছিল। এই সময়েই ভারতবর্ষে সুবর্ণমুদ্রা চালাইবার প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত হয়। বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ের কার্য্যও দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

তাঁহারই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয় আইন প্রবর্ত্তন, রেল, তাড়িতবার্ত্তার আবির্ভাব ও নরবলি রহিত হইয়াছিল। এই সময়ে ব্যবস্থাপক সভার আর একটী অভিনব আইন বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেব উপস্থিত করিলেন ইহার মর্ম্ম এই যে—সরকারী নিলামে জমিদারী বিক্রয় হইলে, পত্তনি স্বত্ব বজায় থাকিবে। জমিদারেরা ইহার অতিশয় বিরোধী হইলেন। কিন্তু মিশনারী ও নীলকর সাহেবগণ এই আইনের সমর্থক হইলেন। তাঁহারই সময়ে নীলকর সাহেবগণ প্রজার প্রতি অত্যাচার করে বলিয়া, মিশনারীগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। গ্রাণ্ট সাহেবের আইন পাশ হইল না।

এই সময়ে ভারতবর্ষীয় কোন কোন রাজা তিরস্কৃত, অপহৃতসর্ব্বস্ব, হইয়া লণ্ডন নগরে প্রতীকার প্রার্থী হইয়া গমন করেন। কুর্গের অধিপতি, খয়েরপুরের নবাব, কর্ণাটের নবাব, সুরাটের নবাব, নাগপুরের রাজ রাণী, বাজীরাও-এর উত্তরাধিকারীগণ, অযোধ্যার রাজ মাতা প্রভৃতি স্বয়ং বা প্রতিনিধিদ্বারা প্রতীকার প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু ইংরেজ জাতি তাঁহাদের প্রার্থনায় মনোযোগ দিলেন না। এদিকে সিপাহীরা জানিতে পারিল যে, ভারতবর্ষে একটীও স্বাধীন রাজা নাই। ইংরেজেরা বিদেশ অধিকারের চেষ্টায় আছে। বিদেশে যাইতে হইলেই সমুদ্র পার হইয়া যাইতে হইবে সুতরাং জাতি নষ্ট হইবে। এই সময়ে বর্ম্মা যুদ্ধে যাইতে অস্বীকার করিয়া একদল সিপাহী কর্ম্মচ্যুত হইল। ইহাও অসন্তোষ অগ্নির ইন্ধন যোগাইল। এই সমস্ত কারণে লোকের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, প্রাচ্য সভ্যতা বিনষ্ট করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা স্থাপনের জন্য

একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ইংরেজদের সিপাহী শ্রেণীর মধ্যে অযোধ্যা প্রদেশের উচ্চশ্রেণীর অনেক হিন্দু ছিল। তাহারা অতিশয় রক্ষণশীল ও সংস্কার বিরোধী। তাহারা ইংরেজদের এই সংস্কার মূলক নীতিকে হিন্দুদের জাতিনাশের প্রচেষ্টা বলিয়া মনে করিল। তাহাদের মনে মনে এই বিশ্বাসও ছিল যে, তাহাদেরই বাহুবলে অযোধ্যা, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশ বিজিত ও সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরেজদের করতলগত হইয়াছে। এই অসন্তোষের বিষয় দেশীয় রাজ্যচ্যুত রাজন্য বর্গ ও তাঁহাদের আত্মীয়েরা জানিতে পারিয়া, এই সুযোগে স্বীয় পূর্ব্বগৌরব লাভে প্রয়াসী হইলেন। এদিকে কোম্পানীর শাসন প্রণালীতেও ত্রুটী ছিল। দেশীয়েরা যত কেন বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও চরিত্রবান্ হউন না, তাঁহাদের উচ্চপদ লাভের অধিকার ছিল না। সার জন লরেনস্ (Sir John Lawrence) স্পষ্টই বলিয়া ছিলেন যে, সৈন্যবিভাগে সিপাহীদের শত গুণ থাকিলেও উচ্চপদ লাভের সম্ভাবনা নাই। এই সময়ে আর একটী জনরব প্রচারিত হইল যে, বঙ্গীয় সৈন্যদিগকে যে সমস্ত টোটা ব্যবহার করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু মুসলমান সকলেরই অস্পৃশ্য গরু ও শূকরের চর্ব্বি মিশ্রিত আছে। কোনও প্রবোধ বাক্যে সিপাহীরা সান্ত্বনা লাভ করিল না। ক্রমে তাহারা বিদ্রোহী হইল। বিদ্রোহ প্রথমে বাঙ্গালা দেশের বারাকপুর ছাউনীতেই আরম্ভ হয়। মঙ্গল সিংহ তাহাদের নেতা হইল এবং তাঁহার আদেশে ইংরেজ সেনাপতি নিহত হইলেন। তৎপরে মুরশিদাবাদ ছাউনীর সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া তাহাদের অধিনায়ককে হত্যা করিল। বিদ্রোহ ক্রমে রাণীগঞ্জ হইতে সুদূর অম্বালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। ১৮৫৭ খ্রীঃ ১০ই মে মিরাটের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া তথাকার বহু শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীকে হত্যা করিয়া বারুদখানায় আগুন ধরাইয়া দিল। তৎপরে দিল্লী অভিমুখে গমন করিয়া দিল্লীর পদচ্যুত শেষ সম্রাট বাহাদুর.শাহকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। ১৮৫৬ সালের জুন ও জুলাই মাসে কাণপুরে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইল। এই স্থানে পেশোয়া বংশের শেষ নরপতি বাজীরাওয়ের পোষ্য পুত্র ধুন্দু পন্থ নানাসাহেব অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বিদ্রোহীদিগকে হস্তগত করিয়া হিন্দুস্থানে পুন হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী হইলেন। বিদ্রোহী সিপাহীগণ ইতিপূর্ব্বেই অনেক সাহেবকে হত্যা করিয়া ছিল। অবশিষ্ট সাহেবেরা তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়া পরে নানাসাহেবের শরণাপন্ন হইলেন। নানাসাহেব তাঁহাদের ৪৫০ জনকে

নৌকাযোগে এলাহাবাদে প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহারা বিদ্রোহী সিপাহীগণকর্ত্তৃক নিহত হইলেন ; তৎকালে সার হেনরী হেবলক নামক একজন ইংরেজ সেনাপতি নানাসাহেবের অনুগত বিদ্রোহী সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া নানাসাহেব কানপুরে অবস্থিত অবশিষ্ট দুইশত শ্বেতাঙ্গকে হত্যা করিয়া একটী কূপে নিক্ষেপপূর্ব্বক সপরিবারে পলায়ন করিলেন। তিনি যে কোথায় আত্মগোপন করিলেন, তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

পূর্ব্বেই বিদ্রোহীদের বিষয় অবগত হইয়া অযোধ্যার চীফ কমিশনার সার হেনরী লরেন্স ইংরেজগণসহ সুরক্ষিত লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ৪ঠা জুলাই বিদ্রোহীদের গোলার আঘাতে তিনি নিহত হন। ব্রিগেডিয়ার ইংলিশ সাহেব প্রায় তিন মাস কাল ইহা রক্ষা করিবার পর সেনাপতি হেবলক ও আউট্রাম তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন।

জুনমাসে সেনাপতি বার্ণার্ড দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া, কতিপয় বিদ্রোহী সিপাহীকে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু আট হাজার সৈন্য লইয়া তিনি বিদ্রোহী ত্রিশ হাজার সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন না। পরবর্ত্তী আগষ্ট মাসে সেনাপতি জন নিকল্সন্ ও হাডসন্ পাঞ্জাব হইতে আগমন করিলে, দিল্লীর বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। কিন্তু সেনাপতি জন নিকলসন নিহত হইলেন। দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহকে বৃত্তি দিয়া রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত করা হইল।

এই সময়ে মধ্যভারতবর্ষেও বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল। ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাই ঘোরতর যুদ্ধে সমর শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁতিয়া তোপী, অন্যতম বিদ্রোহী নায়ক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। কিন্তু পরে ধৃত হইয়া ফাঁসী কাষ্ঠে বিলম্বিত হন। গোয়ালিয়র ও ইন্দোরের সিপাহীগণও বিদ্রোহী হইয়াছিল, কিন্তু তাহা অল্পেই প্রশমিত হয়। বিহারের আরা জিলার অন্তর্গত জগদীশপুরের জমিদার কুমার সিংহও বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। যুদ্ধে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হওয়ায় তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

এই সময়ে স্থিরবুদ্ধি, কর্ত্তব্যপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ লর্ড ক্যানিং অসাধারণ কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই চীনদেশে গমনোন্মুখ একখানি যুদ্ধজাহাজকে যাইতে নিষেধ করিলেন। পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে তখনও বিদ্রোহ বিস্তার করিতে পারে নাই। এই সময়ে নেপালের প্রধান সেনাপতি জঙ্গ বাহাদুর তাঁহার গুর্খা সৈন্য লইয়া স্বয়ং ইংরেজদের সাহায্যার্থ

উপস্থিত হইলেন। লর্ড ক্যানিংএর কর্ম্মকুশলতায় ধীরে ধীরে বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। এই সময়ে তিনি যেরূপ স্থিরবুদ্ধির ও শান্তচিত্তের পরিচয় দিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালে জিঘাংসা-পরায়ণ ইংরেজগণ বিদ্রূপ করিয়া সেই জন্য তাঁহার নাম 'দয়ালু ক্যানিং' দিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলীর অনেকে তাঁহাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ হইতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কাহারও পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইতেন।

কেবল এদেশে নহে ইংলণ্ডেও একদল লোক অতিশয় প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া এদেশের লোকদিগকে কঠোর শাস্তি দিবার জন্য প্ররোচনা দিতেছিলেন। কিন্তু সে দেশের যাঁহারা জ্ঞানী ও স্থিরবুদ্ধি সম্পন্ন লোক তাঁহারা বিচলিত না হইয়া কারণ অনুসন্ধানে ও ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ ঘটনা সংঘটিত না হয় তৎপ্রতি বিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ সাধারণ ইংরেজেরা প্রতিশোধ পরায়ণ হইলেও তিনি কিছুমাত্র প্রতিহিংসা পরায়ণ হন নাই।

বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে কোম্পানী হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের ১লা নবেম্বর এলাহাবাদ নগরে এক বৃহৎ দরবার হইল। এই দরবারে লর্ড ক্যানিং মহারাণীর ঘোষণা পত্র পাঠ করিলেন। তদ্দ্বারা মহারাণী কর্তৃক স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ বিজ্ঞাপিত হইল। এই ঘোষণাফলে এদেশীয়েরা উচ্চ রাজপদের অধিকারী হইলেন। দেশীয় রাজন্যবর্গ পোষ্য গ্রহণের অধিকারী হইলেন। আরও অনেক বিষয়ে দেশীয়দের প্রতি ন্যায় বিচারের পথ উন্মুক্ত হইল। মহারাণীর এই ঘোষণা পত্র পাঠ করিলে তাঁহার হৃদয়ের উদারতা ও ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতে হয়। মহারাণী স্বীয় হস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া শাসনপ্রণালীরও পরিবর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে বোর্ড অব কন্ট্রোল (Board of control) ও কোর্ট অব ডাইরেকটার্স (Court of Directors) ছিল, তাহা উঠিয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া ষ্টেট সেক্রেটারী অব ইণ্ডিয়া (State Secretary of India) উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য বার জন মন্ত্রী লইয়া এক মন্ত্রণা সভা গঠিত হইল। লর্ড ষ্টানলী প্রথম ষ্টেট সেক্রেটারী হইলেন।

১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে লর্ড ক্যানিং সম্মান জনক আর্ল (Earl) উপাধি প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি শাসন সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। সিপাহী বিদ্রোহে প্রায় চারি কোটী টাকা ঋণ হইয়াছিল। এই ঋণ

পরিশোধার্থ আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক, আয়কর, প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হয়। এই সময়েই রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্ত্তে নোট (Currency Notes) প্রচলিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে মেকলে দণ্ডবিধি আইন (Indian Penal Code) বিধিবদ্ধ করেন, কিন্তু ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে ইহা প্রচলিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সমস্ত উৎপাত তিনি অম্লান-বদনে বহন করিয়াছিলেন। বিদ্রোহ দমনের পরেই সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া তিনি সুশৃঙ্খলা স্থাপন করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে কলিকাতা নগরে তাঁহার পত্নী পরলোক গমন করেন। পত্নী বিয়োগ-শোকে ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভগ্ন হইলে ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি এদেশ ত্যাগ করেন এবং পরবর্ত্তী জুন মাসে পরলোক গমন করেন। লর্ড ডালহৌসী এদেশে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলেও প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষা গ্রহণ ও উপাধি প্রদান ক্যানিং এর সময়েই প্রথম আরম্ভ হয়।

ক্যানিং হাম, সার আলেকজাণ্ডার —(Sir Alexander Cunningham) তাঁহার পিতার নাম এলান ক্যানিংহাম (Allan Cunningham) ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দের ২৩শে জানুয়ারী তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৩৩ সালে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতে আগমন করেন। ১৮৩৬ সালে বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ডের শরীর রক্ষক সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৪০ সালে অযোধ্যার নবাবের প্রধান ইঞ্জি-নিয়ারের কাজ গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি বুন্দেলখণ্ডের বিদ্রোহ দমন করেন। ১৮৪৪—৪৫ সালে গোয়া-লিয়ার রাজ্যে প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ১৮৪৬ সালে প্রথম শিখ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং কাঙ্গড়া ও কলু অধিকার করেন। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে ১৮৪৮—৪৯ সালে তিনি গুজরাট, চিলিনওয়ালার যুদ্ধে ছিলেন। তৎপরে কিছুদিন বর্ম্মাদেশে প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ১৮৫৮—৬১ সাল পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ছিলেন। তৎপরে মেজর জেনেরেল হইয়া ১৮৬১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আর্কিওলজিকেল সার্ভেয়ার (১৮৬১—৬৫) (Archæo logical Surveyor) নিযুক্ত করেন। ১৮৬৫ সালে উক্ত পদ উঠিয়া যায়। কিন্তু ১৮৭০ সালে উহা পুন স্থাপিত হইলে তিনি তাহার ডাইরেক্‌টার জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। উক্ত পদে তিনি ১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত ছিলেন। এই সব কাজের জন্য তিনি বিখ্যাত নন। তাঁহার রচিত অমূল্য গ্রন্থরাশি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। রাজ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় ভারতবর্ষের নানা

বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ Ladak, The Bhilsa Stope, The Ancient Geography of India, The Buddhist Central Carpus Inscriptionum Indicarum, The Stope of Bharhat, The Book of Indian Earas, Mahabodhi. এতদ্ব্যতীত তিনি বহু পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে ২৮শে নবেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

ক্যানিংহাম, জোসেফ ডেবী—(Joseph Davey Cunningham) তিনি এলান ক্যানিংহামের পুত্র ও সার আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহামের জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। ১৮১২ খ্রীঃ অব্দের ১২ই জুন তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৩৪ সালে তিনি ভারতবর্ষে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া আগমন করেন। ১৮৩৭ সালে তিনি কর্ণেল ওয়েডের সহকারী পদ প্রাপ্ত হন এবং সেই সময়ে ফিরোজপুর দুর্গের সংস্কার সাধন করেন। কর্ণেল ওয়েড (Colonel Claud Wade) শিখ রাজ্যের সীমায় লুধিয়ানা নগরের এজেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং ক্যানিংহামের, রাজকীয় কাগজ পত্রাদি দেখিবার খুব সুবিধা হয়। ১৮৩৮ সালে বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ডের সহিত রণজিৎ সিংহের সাক্ষাতের সময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১৮৩৯ সালে শাহজাদা তাইমুর ও কর্ণেল ওয়েডের সঙ্গে তিনি পেশোয়ারে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন বলপূর্ব্বক খাইবার গিরি সঙ্কটে প্রবেশ করেন, তখনও ক্যানিংহাম তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। ১৮৪০ সালে ক্যানিংহাম লুধিয়ানার শাসনভার প্রাপ্ত হন। ১৮৪১ সালে তিনি ফিরোজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট হন। তৎপরে তিনি তিব্বতে গমন করেন। জম্মুর রাজা তিব্বত রাজ্যের রাজধানী লাশা আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতীকার ও ব্রিটিশ বাণিজ্যের প্রসারবর্দ্ধনই এই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল। এক বৎসর পরেই ১৮৪২ সালে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৪৩ সালে তিনি আম্বালায় বিচারক হন। প্রথম শিখযুদ্ধে তিনি সার চার্লস নেপিয়ারের সৈন্য দলে ছিলেন। কোন কোন যুদ্ধেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১৮৪৬ সালে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভূপাল ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের এজেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই সময়েই তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ শিখ ইতিহাস সঙ্কলন করেন। এই ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া তিনি অনেক অপ্রিয় সত্যঘটনা প্রকাশ করিয়া দেন। লর্ড ডালহৌসীর এক কলমের খোঁচায় তাঁহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। বলা বাহুল্য তিনি স্বীয়

কর্ম্ম হইতেও বহিষ্কৃত হন। ইহাতে ভগ্ন মনোরথ হইয়া তিনি ১৮৫১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পরলোক গমন করেন। ভারতবাসী চিরকাল এই সত্যানুরাগী নির্ভীক মহাত্মার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে।

ক্রকচ—তিনি কর্ণাট দেশীয় কাপালিক সম্প্রদায়ের রাজা এবং কাপালিক সম্প্রদায়ের নেতা ও গুরু উগ্রভৈরবের গুরু ছিলেন। জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য যখন শ্রীশৈলে যাইয়া তথাকার নানা ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং দেশীয় রাজন্যবর্গও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে লাগিল। তাহাতে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মাচারী ভোগ প্রধান সম্প্রদায়ের বিশেষ ক্ষতি হইতে লাগিল। কাপালিক সম্প্রদায়ের নেতা উগ্রভৈরব শঙ্করাচার্য্যের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া, কাপালিক রাজ ক্রকচকে সংবাদ দেন। ক্রকচ আচার্য্যের আগমন শুনিয়া কয়েকজন অনুচরসহ আচার্য্য সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শ্মশানের ভস্মদ্বারা পরিলিপ্ত, এক হস্তে নরকপাল এবং অপর হস্তে পরশুযুক্ত শূল, পরিধানে কৌপীন ও রক্তবর্ণ বহির্বাস দেখিলে সহজেই ভীতির সঞ্চার হয়। আচার্য্য সমীপে উপস্থিত হইয়া ক্রকচ তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার কটূক্তি করিতে লাগিলেন। ইহাতে সুধন্বারাজ কুপিত হইয়া ক্রকচকে এস্থান হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য তাঁহার অনুচরবর্গকে আদেশ দিলেন। সুধন্বারাজের অনুচরবর্গ ও ক্রকচের অনুচরবর্গের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশেষে ক্রকচ তাঁহার সৈন্যগণকে নিরস্ত করিলেন এবং আচার্য্যের নিকট আসিয়া—'রে দুষ্ট! তুমি আমার ক্ষমতা দেখ, এখনই তোমাকে সমুচিত শাস্তি দিতেছি।' এই বলিয়া ক্রকচ করতলে নৃকপাল রাখিয়া নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়া ক্ষণকাল ধ্যান করিলেন। দেখিতে দেখিতে নৃকপালটী মদিরাপূর্ণ হইয়া গেল। ক্রকচ তখন অর্দ্ধেক মদিরা পান করিয়া নৃকপালটী রাখিয়া সংহার ভৈরবকে স্মরণ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সংহার ভৈরব আবির্ভূত হইলেন। তিনি সংহার ভৈরবকে প্রণাম করিয়া আচার্য্যকে দেখাইয়া বলিলেন—'ভগবন্! এই ব্যক্তি আপনার ভক্তের উপর হিংসা করিতেছে, আপনি তাঁহাকে বধ করুন।' আচার্য্যও ভৈরবকে দেখিয়া তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এক্ষণে স্তব শেষে প্রণাম করিয়া আমূল বৃত্তান্ত ভৈরব সমীপে নিবেদন করিলেন। আচার্য্যের কথা শুনিয়া সংহার ভৈরব ক্রকচকে বলিলেন—'স্বয়ং শঙ্কর দুষ্ট ব্রাহ্মণগণকে দণ্ড দিবার জন্য জগতে আগমন করিয়াছেন। তোমরা সকলে তাহার পূজা কর।' এইভাবে পরাস্ত

হইয়া ক্রকচ অবশেষে আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনার পর হইতেই ভারতে কাপালিক প্রাধান্য অন্তর্হিত হইল।

ক্রকুচ্ছন্দ (বা করকেতুচন্দ্র) – কথিত আছে মহাত্মা বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বে আরও পঞ্চান্ন (৫৫) জন বুদ্ধ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু শম্ভুপুরাণ পাঠে মাত্র শেষ ছয়জন বুদ্ধের নাম পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ক্রকুচ্ছন্দ অন্যতম। তিনি ক্ষমাবতী নগর হইতে নেপালে সমাগত হন। পরে ক্ষমাবতী নগরেই প্রতি প্রস্থান করেন।

ক্রমদীশ্বর— 'সংক্ষিপ্তসার'. ব্যাকরণ রচয়িতা। তিনি মুগ্ধবোধকার ও সুপদ্মকারের পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি ব্রাহ্মণেতর ছিলেন বলিয়া, প্রসিদ্ধি আছে। সম্ভবতঃ তিনি একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

ক্রমদীশ্বর — একজন সংস্কৃত বৈয়াকরণিক। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'সংক্ষিপ্ত সার'। উহা খুব সম্ভব খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয়। উহার প্রথম সাত অধ্যায় সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং শেষের এক অধ্যায় প্রাকৃত ব্যাকরণ। বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশে এই ব্যাকরণ অধিক পরিচিত ছিল। জুমর নন্দী কর্ত্তৃক উহার একখানি টীকা রচিত হয়। কিন্তু তাঁহার সময় অনির্ণীত।

ক্রিঞ্জিয়া, সৈয়দ— শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরফের শাসনকর্ত্তা মিনা খাঁর অন্যতম পুত্র। তাঁহারা তরফের সাত আনির মালিক ছিলেন। মিনা খাঁর অপর পুত্র ইউনসের মৃত্যুর পরে ক্রিঞ্জিয়া সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি অতি ধীর প্রকৃতি ও পরোপকারী ছিলেন। মিষ্ট ও ন্যায়ানুগত ব্যবহারে সকলেই তাঁহার বশীভূত হইত। তিনি মোহাম্মদ কুদ্দুস নামে এক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

ক্লাইব রবার্ট (Robert Clive) — প্রসিদ্ধ ইংরেজ সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা। ১৭২৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইংলণ্ডের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি অতিশয় দুরন্ত প্রকৃতি ও পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী ছিলেন। কিন্তু ঐ সময়েই সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুকের সময়ে, তাঁহার চরিত্রে নেতৃজন সুলভ কয়েকটি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। বয়োবৃদ্ধির সহিত ঐ সকল গুণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে (East India Company) কেরাণীর কাজ লইয়া ভারতে উপস্থিত হন। প্রথমে তিনি মাদ্রাজে কাজ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে ভারতে রাজনীতিক অবস্থা নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। মুঘল রাজশক্তি দুর্ব্বল

হইয়া পড়াতে, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। ঐ সকল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগীতা এবং বিরুদ্ধ ভাব প্রবল ছিল। ইয়োরোপেও তখন ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে ঘোরতর অসদ্ভাব ছিল; এমন কি তজ্জন্য যুদ্ধ বিগ্রহেরও অন্ত ছিল না। সেই অসদ্ভাবের জের ভারত-প্রবাসী ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হইত। দাক্ষিণ ভারতের যে সকল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব ছিল, তাঁহারা কেহ ইংরেজ, কেহ বা ফরাসী-দের সাহায্য-প্রাপ্ত হইতেন। তজ্জন্য কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনে-কেই কিছু কিছু সমর শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। ক্লাইব ১৭৪৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ মাদ্রাজেই ছিলেন। মধ্যে অল্পকালের জন্য একবার বাঙ্গালায় আগমন করিয়াছিলেন।

ভারতে আসিয়া প্রথম কিছুকাল তাঁহার স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। তদ্ভিন্ন অপরিচিত স্থান, নিজেরও উদ্ধত স্বভাব, তৎকারণে সহকর্ম্মীদের সহিত বিবাদ ও অন্যান্য অনেক কারণে তিনি বিশেষ মানসিক অশান্তি ভোগ করেন। এমন কি একবার জীবনের উপর বীতরাগ হইয়া আত্মহত্যা করিতেও সংকল্প করেন।

দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিক অশান্তির জন্য ক্লাইব কিছুকাল সৈনিক বিভাগে বদলী হন। ঐ সময়ে আর্কটের নবাব মোহাম্মদ আলির সহিত তাঁহার প্রতিযোগী চান্দা সাহেবের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ইংরেজ কোম্পানী মোহাম্মদ আলিকে সাহায্য করিতেছিলেন এবং চান্দা সাহেব ফরাসীদের সাহায্যপুষ্ট ছিলেন। ঐ বিবাদ সংস্রবে ক্লাইব আর্কট অবরোধ করিয়া অধিকার করেন (১৭৫৮ খ্রীঃ)। ১৭৫৪ খ্রীঃ অব্দে কার্ণাটিক সন্ধির বলে মোহাম্মদ আলিই প্রকৃত নবাব রূপে স্বীকৃত হইলেন। ঐ উপলক্ষে ইংলণ্ডেও ক্লাইবের কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা হয়। তৎপূর্ব্বেই ১৭৫৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি স্বদেশে গমন করিয়াছিলেন। তিন বৎসর পরে তিনি মাদ্রাজ প্রদেশস্থ ইংরেজ কোম্পানীর অধিকৃত স্থানসমূহের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়া পুনরায় ভারতে আগমন করেন। ঐ সঙ্গে তাঁহাকে দক্ষিণ ভারতস্থ ইংরেজ সেনাবাহিনীর অধিনায়কের পদও দেওয়া হয়। এই বার ভারতে আসিয়া তিনি বোম্বাই উপকূলের ঘেরিয়া নামক স্থান ইংরেজ অধিকারে আনয়ন করেন।

ঐ সময়ে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লা বাঙ্গালার সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সহিত বাঙ্গালা দেশস্থিত কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের বিরোধ উপস্থিত হয় এবং তিনি কলিকাতা নগরী

অধিকার করিয়া কোম্পানীকে বাঙ্গালা দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করেন। এই সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে ক্লাইব ও ওয়াটসন প্রতিশোধ লইবার জন্য কলিকাতা আগমন করেন (জানুয়ারী ১৭৫৭খ্রীঃ); ক্লাইব নবাবের সৈন্য পরাস্ত করিয়া নবাবকে কোম্পানীর পক্ষে সুবিধাজনক সর্ত্তে সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। ঐ সন্ধির ফলে কলিকাতায় ইংরেজদের একটি টাঁকশাল স্থাপিত হয়।

ইউরোপে তখনও ইংরেজ ও ফরাসীতে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। তজ্জন্য ক্লাইভ, বাঙ্গলাদেশে ফরাসী অধিকৃত স্থান চন্দননগর অধিকার করেন। ফরাসীরা, কলিকাতা আক্রমণ কালে নবাবকে সাহায্য করিয়াছিল। সেজন্যও ফরাসীদের উপর ক্লাইব ক্রুদ্ধ ছিলেন। এই সময় হইতেই নবাব সিরাজ-উদ্‌দৌল্লার বিরুদ্ধে ইংরেজেরা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। ক্লাইব, কলিকাতার তদানীন্তন গবর্ণর ড্রেক, ওয়াট্‌স (Drake, Watts) প্রভৃতি এবিষয়ে তাঁহার সহযোগী হইয়াছিলেন। উমিচাঁদ নামক একজন শিখ ব্যবসায়ী এবিষয়ে নবাবের সেনাপতি মীরজাফর ও ইংরেজ পক্ষীয়দের মধ্যবর্ত্তী ছিলেন। দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তিনি ক্লাইবকে বলেন যে নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করা হইলে, তাঁহাকেও কাজের পুরস্কার স্বরূপ বহু অর্থ দিতে হইবে, নতুবা তিনি ষড়যন্ত্রের কথা নবাবকে বলিয়া দিবেন। বিপদাশঙ্কা করিয়া চতুর ক্লাইব উমিচাঁদকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং উমিচাঁদের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য একখানি জাল দলিল প্রদর্শন করিলেন। ক্লাইবের অন্যতম সহকর্ম্মী ওয়াট্‌সন সেই জাল দলিলে স্বাক্ষর করিতে সম্মত না হওয়াতে, ক্লাইব ওয়াট্‌সের স্বাক্ষর জাল করেন। পরবর্ত্তী কালে ইংলণ্ডে যখন এই অন্যায় আচরণের জন্য ক্লাইবকে অভিযুক্ত করা হয়, তখন তিনি 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' এই রাজনীতির বাক্য দ্বারা নিজ কার্য্য সমর্থন করেন।

সমুদয় ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ হইলে ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২১শে জুন ক্লাইব, কোম্পানীর সৈন্যদল সহ পলাশী প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে এগার শত ইয়োরোপীয় সৈন্য, একুশ শত দেশীয় সৈন্য ও মাত্র নয়টী কামান ছিল। পক্ষান্তরে নবাবের পক্ষে আঠার হাজার অশ্বারোহী, পঞ্চাশ হাজার পদাতিক ও তিপ্পান্নটি কামান ছিল। নবাবের বিরুদ্ধে অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী সেনাপতি মীরজাফর ক্লাইবকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যকে আক্রমণের আদেশ দিবেন না। তথাপি রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ক্লাইব, যথেষ্ট আশঙ্কান্বিত হইয়াছিলেন। অন্যান্য সহ-

কর্ম্মীদের সহিত তিনি এবিষয়ে মন্ত্রণ করেন। তাঁহারা মীরজাফরের আশ্বাস বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ক্লাইবের মন তখনও দ্বিধাসঙ্কুল ছিল। অবশেষে পুনরায় যখন মীরজাফরের নিকট হইতে পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিশ্রুতি আসিল, তখন সকলে একমত হইয়া আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। পরদিবস সৈন্যদল সহ ক্লাইব নদী অতিক্রম করিলেন। তাঁহার পরদিন ২৩শে জুন পলাশী ক্ষেত্রে ইতিহাস প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। (সিরাজ-উদ্ দৌল্লা দেখ)।

যুদ্ধান্তে সসৈন্যে ক্লাইব মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মীরজাফরকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব-নাজিম বলিয়া অভিনন্দন করিলেন। মীরজাফর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ ক্লাইবকে নিজের ইচ্ছামত পুরস্কার গ্রহণ করিতে বলিলেন। ক্লাইব এক্ষেত্রে যথেষ্ট সংযম ও নির্লোভের পরিচয় দিয়াছিলেন। নিজের জন্য কিছু অর্থ গ্রহণ করিয়া, তিনি বহু অর্থ কোম্পানীর সৈন্যদল ও কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করিবার অনুরোধ করিলেন।

ঐ প্রসিদ্ধ ঘটনার পর ক্লাইবের প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদা বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ইহার তিন বৎসর পর বিশ্রাম লাভের জন্য তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন (১৭৬০ খ্রীঃ) এবং তিন বৎসর তথায় বাস করেন। সেখানে তিনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় রাজনীতি বিষয়ে পরামর্শদাতার কাজ করেন। প্রথম পরিচালনা সমিতি (Board of Directors) তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। তজ্জন্য কাহারও কাহারও সহিত ক্লাইবের বিবাদ উপস্থিত হয়। তৎপরে পরিচালনা সমিতি তাঁহার অভিজ্ঞতাকে আর উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই এবং প্রধানতঃ তাঁহার পরামর্শ মতই সব ব্যবস্থা করিতেন।

ক্লাইব যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন এদেশে কোম্পানীর কাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। মীর জাফরের অক্ষমতায় বিরক্ত হইয়া পুনরায় কতিপয় দেশীয় ও ইংরেজ ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন এবং তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীর কাশিমকে নবাব করেন। এই গোলোযোগের সময়ে নানাভাবে কোম্পানীর কাজে বিশৃঙ্খলা এবং ঘোরতর আর্থিক দুরবস্থাও উপস্থিত হয়। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্লাইবকে পুনরায় প্রায় সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া ভারতে প্রেরণ করা হয়।

তৃতীয়বার ভারতে আসিয়া ক্লাইব ভারতে ইংরেজশাসন আরও দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইবারে তাঁহার

প্রধান কীর্ত্তি দিল্লীর তদানীন্তন মুঘল বাদশাহ শাহ আলমের নিকট হইতে, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ (১৭৬৫ সালে আগষ্ট)। তদ্ভিন্ন ঐ সময়ে সুজা-উদ্দৌল্লাকে অযোধ্যা প্রদেশ প্রত্যর্পিত হয়।

১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি কোম্পানীর কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বকালে নানা ভাবে ও নানা বিভাগে শৃঙ্খলা সাধিত হয়। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে অসাধু উপায়ে অর্থ লাভের পথ অনেকটা রুদ্ধ হওয়ায় তিনি অতিশয় অপ্রীতিভাজন হন। শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য যে সকল সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন, তাহার জন্য অনেক স্থলে তাঁহাকে বিরুদ্ধবাদীদের সহিত বিবাদ করিতে হইয়াছিল। তিনি নিজে মিতব্যয়ী ও নির্লোভী ছিলেন বলিয়া উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি, স্বৈরাচার পরায়ণ ইংরেজ কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে একেবারেই পছন্দ করিতেন না। কিন্তু দৃঢ়চিত্ততা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, দূরদৃষ্টি, প্রভৃতি গুণের জন্য তিনি নানারূপ বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যেও অবিচলিত থাকিয়া নিজ অভীষ্ট সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৭৬২ খ্রীঃ অব্দে, ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপনের সফলতার জন্য তিনি লর্ড (Baron Clive of Plassey) উপাধি ভূষিত হন। তৎপরে K. C. B. উপাধিও প্রাপ্ত হন। অবসর গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার শত্রু পক্ষ নানা ভাবে তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা করে। তৎফলে অতিশয় মানসিক অশান্তিতে পীড়িত হইয়া এই কর্ম্মবীর ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে আত্মহত্যা করিয়া জীবন শেষ করেন।

ক্ষপণক — (১) মধ্যযুগের একজন বৈয়াকরণিক। তিনি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম ছিলেন। তিনি একখানি অভিধান রচনা করেন বলিয়া কথিত হয়।

ক্ষপণক —(২) সিদ্ধসেন দিবাকর দেখ। (ক্ষপণক কাহারও নাম নহে। জৈন সন্ন্যাসীদিগকে সাধারণতঃ ক্ষপণক নামে অভিহিত করা হইত)।

"ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোঽমরাসিংহঃ শঙ্কু
র্বেতালভট্ট ঘটখর্পর কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতে সভারাং
রত্নানি বৈ বররুচির্ণব বিক্রমস্য" ॥

জ্যোতির্ব্বিদাভরণের এই শ্লোক দ্বারা অনেকে ক্ষপণক নামে কোন লোক বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক তাহা ঠিক কিনা সন্দেহ।

ক্ষমানন্দ দাস—অনুমান ১৪১৭ শকে ইংরাজী ১৪৯৫ খ্রীঃ অব্দে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত ইষ্টকাপুর গ্রামে কায়স্থবংশে ক্ষমানন্দ দাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রঘুনন্দন

দাস। তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'ন্যায়রত্নাকর' ও 'তত্ত্বসমাস ব্যাখ্যা' সংস্কৃত গ্রন্থ এবং 'মনসার ভাসান' বাঙ্গালা কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, কাব্যজগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তিনি গ্রন্থ রচনায় কেতকা দাসের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ক্ষারপাণি — একজন চিকিৎসা শাস্ত্রকার। তিনি একখানা সংহিতা রচনা করিয়াছেন এবং খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

ক্ষিতি পাল—বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি রাজ্যপালের সমকালে (৯২৫—৯৫০ খ্রীঃ অব্দ) কনৌজে ক্ষিতিপাল নামে এক রাজা ছিলেন। চন্দ্রাত্রেয় রাজহর্ষ দেব কর্ত্তৃক তিনি পরাজিত হন। কিন্তু পরে এই হর্ষদেবেরই সাহায্যে ক্ষিতিপাল অপহৃত কনৌজ রাজ্য উদ্ধার করেন। রাজ্য লাভ করিয়া বেশী দিন তিনি ভোগ করিতে পারেন নাই। প্রতীহার বংশীয় মহীপাল ইহা আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন।

ক্ষিতিশূর—বঙ্গের স্বাধীন নরপতি আদিশূরের পৌত্র ও ভূশূরের পুত্র। তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে ছাপ্পান্নখানি গ্রাম এবং সপ্তশতি ব্রাহ্মণদিগকে আটাশখানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সাহিত্যিক ও ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য। তিনি কলিকাতা যোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র ও হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে তিনি বি-এ উপাধি লাভ করেন। তাহার পর হইতে মৃত্যুকালাবধি তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের পরিচালনা, 'তত্ত্ব-বোধিনী' পত্রিকা সম্পাদন প্রভৃতি কার্য্যে জীবনের অধিকাংশকাল ক্ষেপণ করেন। তিনি কলিকাতা চীৎপুরস্থ আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের একজন অছি (Trustee) ছিলেন।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ সাহিত্যসেবীও ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন ভিন্ন একাধিক মাসিক পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন। 'আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ', 'আর্য্য নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা', 'রাজা হরিশ্চন্দ্র', 'জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি', 'শিক্ষা সমস্যা ও কৃষ্টি', 'কলিকাতায় চলা ফিরা', 'ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রকৃতি' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। সংস্কৃতে পারদর্শিতার জন্য পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক তিনি 'তত্ত্বনিধি' উপাধিভূষিত হন।

১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে (কার্ত্তিক ১৩৪৪) কলিকাতাস্থ নিজ

বাসভবনে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

ক্ষিতীশ—আদিশূর কর্ত্তৃক আনিত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম।

ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, মহারাজা বাহাদুর— কৃষ্ণনগরের মহারাজা সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তাঁহার মহিষী ভুবনেশ্বরী দেবী, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ক্ষিতীশচন্দ্র ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দের ১১ই মে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি অতি নির্ম্মল চরিত্র বিদ্যানুরাগী রাজা ছিলেন। সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে তাঁহার অনুরাগ ছিল। ১৯১০ সালের ১৮ই আগষ্ট মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে তিনি ক্ষৌণীশচন্দ্র নামে এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

ক্ষীর পণ্ডিত— তিনি কাশ্মীরপতি জয়াপীড়ের রাজত্বকালে (৭৪৮—৭৮০ খ্রীঃ অব্দ) শিক্ষক ছিলেন।

ক্ষীরপাণি—প্রাচীন ভারতের একজন আয়ুর্ব্বেদবেত্তা। মধ্য এসিয়ার কাস্‌গড় নামক স্থানের একখানি চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থে ক্ষীরপাণি এবং আরও কয়েকজন চিকিৎসকের নাম পাওয়া গিয়াছে। উহাতে তাঁহাদের সকলেই পুনর্ব্বসু আত্রেয়ের পুত্র (শিষ্য?) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ক্ষীরভূপ—তিনি কাশ্মীরপতি অনন্তদেবের (১০২৮—১০৮১ খ্রীঃ) একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন।

ক্ষীরসাগর—তিনি 'হিল্লাজ তাজকের টীকা রচনা করিয়াছেন।

ক্ষীরস্বামী— একজন বৈয়াকরণিক। তিনি প্রসিদ্ধ কোষগ্রন্থ 'অমর কোষের' একখানি টীকা রচনা করেন। তিনি খুব সম্ভব খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

ক্ষীরোদ গোপাল মিত্র — তিনি কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজেন্দ্র নাথ মিত্র। ক্ষীরোদ গোপাল বাল্যকাল হইতেই বুদ্ধিমান ও নিয়মানুরক্ত ছিলেন। তরুণ বয়সেই তিনি এক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন. তিনি কয়েকটী জাহাজ কোম্পানীর বেনিয়ান এবং বৃটিশ নৌবহরের কলিকাতাস্থ এজেন্ট ছিলেন। গোপনে ও প্রকাশ্যে তিনি বহু দান করিতেন। কলিকাতা কালীঘাটে স্নানার্থীদের জন্য তিনি একটী স্নানের ঘাট বাঁধাইয়া এবং গঙ্গাযাত্রীদের জন্য একটী বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কালিখার বাগানে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় দরিদ্রদিগকে আহার প্রদান করা হয়। তিনি কলিকাতা অনাথ আশ্রমের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং বহু জনহিত-

কর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। ১৩৪২ সালের শ্রাবণ মাসে (১৯৩৫ খ্রীঃ জুলাই) তিনি পরলোক গমন করেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ — খ্যাতনামা বাঙ্গালী নাট্যকার। ১২৭০ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে খড়দহের গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। তৎপরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। ঐ পরীক্ষার কিছুকাল পরেই তিনি এক কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল কষ্ট পান। অবশেষে এক অলৌকিক উপায়ে তিনি রোগ মুক্ত হন। তদবধি অলৌকিক ঘটনায় তাঁহার বিশেষ আস্থা জন্মে। তজ্জন্য তাঁহার উপন্যাস গুলিতে অলৌকিক ঘটনায় তিনি অনেক সমাবেশ করেন। কিছুকাল "অলৌকিক রহস্য" নামে এক খানি পত্রিকাও তিনি সম্পাদন করেন। বারাকপুরের ইংরেজি বিদ্যালয় হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলিকাতা মেট্রপলিট্যান ইনষ্টিটিউশন (Metropolitan Institution—বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) হইতে রসায়ন শাস্ত্রে সম্মানের (Honours) সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে রসায়ন শাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শিক্ষা সমাপনান্তে কিন্তু কিছুকাল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে (Oriental Seminary) গণিতের প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। তৎপরে ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৯০৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা জেনারেল অ্যাসেম্ব্রী (General Assembly) কলেজে (বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ্চ—Scottish Church College) রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে তিনি নাট্যকাররূপেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রতাপাদিত্য, আলিবাবা, আলমগীর, ভীষ্ম, রঘুবীর, নর-নারায়ণ প্রভৃতি নাটকগুলি বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। তিনি আরও কয়েক খানি নাটক ও প্রহসন এবং কয়েক খানি উপন্যাসও রচনা করেন। তাঁহার নাটকগুলি নাট্যামোদী ব্যক্তিদের বিশেষ প্রিয়। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে বাকুড়া সহরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ক্ষুদীরাম বসু — এই বাঙ্গালী মনীষী ও শিক্ষাব্রতীর তাঁহার পিতার নাম গোরাচাঁদ বসু। তাঁহার পৈতৃক নিবাস বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত সাদিপুর গ্রাম। গ্রামের বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। ক্রমে তমলুক, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। বর্দ্ধমান ব্রাহ্ম ইউনিয়ন স্কুল (Brahmo Union School) হইতে পাঁচ টাকা বৃত্তি পাইয়া মধ্য ইংরাজি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলিকাতায় আসিয়া ফ্রি চার্চ্চ

ইন্‌ষ্টিটিউশন (Free Church Institution ; উহার নাম পরে Duff College হয়) নামক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। তিনি তমলুকে তাঁহার মাতুলের নিকট থাকিয়া যখন অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার মাতুলের মৃত্যু হয়। কলিকাতায় আসিয়া তিনি তাঁহার খুল্লতাতের আশ্রয়ে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করিতে থাকেন। এখানেও অল্পকাল পরেই তাঁহার খুল্লতাতের মৃত্যু হয়। ইহাতে অন্যান্য আত্মীয়েরা বালক ক্ষুদিরামের উপর বিরূপ হন এবং তাহাকে অপয়া বলিয়া মনে করেন। এই ধারণার ফলে কলিকাতায় কোথাও আশ্রয় লাভ তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। অবশেষে এক দূর আত্মীয়ের বাসায় স্থান লাভ করেন। তথা হইতে প্রায় দুই মাইল হাটিয়া প্রত্যহ বিদ্যালয়ে গমন করিতেন।

অতি বাল্যকাল হইতেই পড়াশুনা করিবার জন্য তাঁহাকে কঠোর দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিতে হইত। অনেক সময়েই ছাত্র পড়াইয়া ব্যয় সংকুলন করিতে হইত। কখনও কখনও অর্থাভাবে প্রদীপের তৈল কিনিতে না পারিয়া পথ পার্শ্বে গ্যাসের আলোকে পাঠ শিক্ষা করিতেন। এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যেও বরাবরই বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সমুদয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎফলে অনেকবার বৃত্তি পাইয়াছিলেন। কলেজে পড়িবার সময়ে তিনি প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টিয় নেতা কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে পুত্র তুল্য স্নেহ করিতেন এবং ক্ষুদিরামও তাঁহার চরিত্রের মহৎ প্রভাব লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন ও বি-এ উপাধি লাভ করিয়া তিনি ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুদৃষ্টিতে পতিত হন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে নিজ বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত করেন। পরে তিনি মেট্রপলিট্যান (বর্ত্তমান—বিদ্যাসাগর) কলেজে তর্কশাস্ত্রে (Logic) পড়াইবার ভার প্রাপ্ত হন। তিনি অসাধারণ অধ্যাপনা নৈপুণ্যে ছাত্রসমাজের বিশেষ প্রীতি অর্জ্জন করেন। একাধিক বার ঐ কলেজ হইতে ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে। পরে তিনি বি-এ শ্রেণীতে দর্শন শাস্ত্র পড়াইবারও ভার প্রাপ্ত হন এবং উহাতেও পূর্ব্বের ন্যায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অথচ তিনি নিজে এম্-এ উপাধি লাভ করেন নাই।

১৮৯১ সালে ক্ষুদিরাম নিজে সেণ্ট্রাল ইন্‌ষ্টিটিউশন (Central Institution) নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উহা ধীরে ধীরে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়। ক্ষুদিরাম বসু

মহাশয় উহার অধ্যক্ষ হন। তাঁহার সুপরিচালনা ও অধ্যাপনার কৃতিত্বে প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে এবং এককালে বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ কলেজগুলির অন্যতম হয়।

পূর্ব্বোক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মে অনুরাগী হন। তখন অনেকে মনে করিতেন যে, তিনি হয়ত খ্রীষ্ট ধর্ম্মই গ্রহণ করিবেন। কিছুকাল পরে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বক্তৃতা ও উপাসনা শ্রবণে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। তদবধি আজীবন কেশব চন্দ্রের একজন পরম অনুরাগী ছিলেন। ভগবানে অটল বিশ্বাস ও ভক্তি তাঁহার জীবনের প্রধান গুণ ছিল এবং নিয়মিত ভাবে ব্রাহ্ম সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দিতেন।

নিজেকে কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি আজীবন দরিদ্র ছাত্রদের পরম হিতৈষী ছিলেন এবং নানাভাবে শত শত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রকে সাহায্য করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রের প্রভাবও তাঁহার জীবনে বিশেষ লক্ষিত হইত। সত্যনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, বিলাসিতাশূন্য, অমায়িক ও সরলপ্রাণ ক্ষুদিরাম বসু মহাশয় সকল পরিচিত লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন।

দেশের সকল প্রকার সৎকাজে তাঁহার উৎসাহ ও যোগ ছিল। ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে রাখীবন্ধনের দিন, কলিকাতার সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী উদ্যান সমূহে সভাবন্ধ সূচক নিষেধাজ্ঞা প্রচলিত হইলে, তিনি নিজ কলেজের বিস্তীর্ণ অঙ্গন সভা করিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়া তেজস্বীতার পরিচয় প্রদান করেন। সরকারী সাহায্য লইয়া কলেজ পরিচালনা করা তিনি অতিশয় আপত্তির কাজ মনে করিতেন।

আজীবন কর্ম্মব্যস্ত থাকিয়া তিনি যুবকগণের সম্মুখে কর্ম্মশীলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গাব্দের (১৯২৬ খ্রীঃ অব্দ) এই ধর্ম্মপ্রাণ অক্লান্ত কর্ম্মী, ছাত্রবৎসল, তেজস্বী পুরুষ মহাপ্রয়াণ করেন।

ক্ষেত্রকৃষ্ণ মিত্র, রাজা—তিনি হাওড়া জিলার আন্দুলের রাজা কাশীনাথ রায়ের দৌহিত্র। রাজা কাশীনাথ রায়ের পৌত্র বিজয় কেশব রায় অপুত্রক পরলোক গমন করিলে ক্ষেত্রকৃষ্ণ বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে রাজা উপাধি না পাইলেও, প্রচলিত প্রথানুসারে এবং রাজোচিত বদান্যতায় সকলেরই নিকট রাজা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। এই বদান্য রাজার অর্থ সাহায্যে রাজগঞ্জের রাজপথ, উলুবেড়িয়ার বিসূচিকা হাস্পাতাল ও ইংরেজি বিদ্যালয়, খুলনা

জিলার আমাদি গ্রামের বঙ্গ বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছিল। এখনও আন্দুল রাজষ্টেটের সাহায্যে এই সকল পরিচালিত হইতেছে। খুলনা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনেও তিনি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। হুগলী ডাফরিণ হাসপাতালে পাঁচশত, আন্দুলের নিকটবর্ত্তী সরস্বতী নদীর সেতু নির্ম্মাণে পাঁচ হাজার, রাজগঞ্জ রাস্তা পাকা করিবার ব্যয় আট হাজার টাকার মধ্যে অধিকাংশ, তিনিই প্রদান করেন। মাসিক তিনশত টাকা ব্যয় করিয়া, স্বীয় গ্রামে জুবিলী হাইস্কুল স্থাপন করিয়া পাঁচ বৎসর চালাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আন্দুল রাজবংশের স্থাপিত অন্যান্য সৎকীর্ত্তিও তিনি সংস্কারাদিদ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন। এই বিদ্যোৎসাহী বদান্য রাজা ক্ষেত্রকৃষ্ণ ১৯০৭ খ্রীঃ ৪ঠা নবেম্বর উপেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ নামে তিন পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

ক্ষেত্রদাস—তিনি প্রসিদ্ধ সাধক দাদুর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। ভক্ত ক্ষেত্রদাস গভীর সাধক ছিলেন। দাদুর সাম্যভাবের বিশেষ পরিচয় তাঁহার লেখা হইতে পাওয়া যায়। দাদুর বিশ্বমৈত্রী ও সর্ব্বজনীনত্বের পরিচয় তাঁহার লেখায় যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, অন্য কোথায়ও তেমন হয় নাই।

ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য — ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত দণ্ডীরহাটী গ্রামে ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালে তিনি মাতুলালয় রাজপুরে থাকিয়া তথাকার একটী ইংরাজী বিদ্যালয়ে সামান্যরূপ ইংরাজী শিক্ষা করেন। তৎপরে হাওড়া সরকারী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তথাকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি ক্ষেত্রমোহনকে মেধাবী ছাত্র বলিয়া যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। ১৮৫৪ খ্রীঃ হাওড়া স্কুল হইতে জুনিয়ার স্কলারশিপ পাইয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে শিবপুরের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করেন এবং সেই কলেজে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে অল্পকাল মধ্যে হিজলী ও কাঁথির অ্যাসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গণিতের অধ্যাপক হন। পরে আরও কয়েক স্থানে কার্য্য করিয়া ১৮৬৯ সালে বরিশালে অ্যাসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদ প্রাপ্ত হন। তথায় সিভিল সার্জ্জনের সহিত মতান্তর হওয়ায় চারিশত টাকা মাহিনার চাকরী ইস্তফা দিয়া কলিকাতা

চলিয়া আসেন। ১৮৭০ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে এডুকেশন গেজেটের সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন, তাঁহার সহকারীতায় তৎকালে 'এডুকেশন' গেজেট বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া ছিল। ক্ষেত্রনাথ এডুকেশন গেজেটে সাহিত্য সমালোচনা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সেই সময় হইতেই তাঁহার সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সুযোগ হয়। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে 'জরিপ ও পরিমিতি'; ১৮৭৪ সালে 'নব্য শিশু-বোধ', ১৮৭৬ সালে 'কবিতা সংগ্রহ' ও ১৮৭৮ সালে 'শুভঙ্করী', 'লঘু-পরিমিতি' গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার সমুদয় পুস্তকই বহুদিন বিদ্যালয় সমূহে পঠিত হইত। ১৮৭৩।৭৪ খ্রীঃ অব্দে ক্ষেত্রনাথ কুমিল্লা জিলার পূর্ত্তবিভাগের প্রধান কর্ত্তার (District Engineer) পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়া, কয়েকজন এটর্ণীর সাহায্যে পার্টিসনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এই কার্য্যে তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়া ছিলেন। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

ক্ষেত্রলাল চক্রবর্ত্তী— তিনি একজন গ্রন্থকার। ১৩০০ বঙ্গাব্দে তিনি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটীতে (কলিকাতা ২।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট) The Bengal Academy of Literature নামে এক সভা স্থাপন করেন। প্রথমে ইহার কার্য্যাদি ইংরেজিতে হইত। পরে ১৩০১ সালে ইহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' রাখা হয়। তিনি 'চন্দ্রনাথ,' 'সরলা,' 'কৃষ্ণা,' 'হিঙ্গলা' প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়াও যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। তাঁহার কোন কোন উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদও হইয়াছিল। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, সঙ্গীত-নায়ক—মেদিনীপুরে ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রাধাকান্ত গোস্বামী। বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিকট তিনি সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করেন। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা আসিয়া মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের সভার গায়ক পদে বৃত হন। এই কাজেই আমরণ নিযুক্ত ছিলেন। রাজা সার সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর তাঁহারই নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া পরবর্ত্তীকালে সঙ্গীত শাস্ত্রের উন্নতি কল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় সংস্কৃত, হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় অনেক সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। মহারাজা সার যতীন্দ্র

মোহনের বেলগাছিয়া নাট্যশালার ঐক্যতান বাদন সম্প্রদায়ের জন্য তিনি অনেক গৎ রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। পাথুরিয়াঘাটাস্থিত মহারাজের বঙ্গ নাট্যালয়ে অভিনীত নাটকের তিনি গানের স্বর যোজনা করিয়া দিতেন। তাঁহার রচিত 'কণ্ঠ কৌমুদী' ও 'সঙ্গীত সার' পাঠে সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ পুস্তক খানি সর্ব্বত্র খুব আদরণীয়ও হইয়াছিল। তাঁহার আর একটী বিশেষ কার্য্য জয়দেবের সংগীতের স্বর যোজনা। জয়দেবের অনেকগুলি সংগীতে স্বয়ং স্বর যোজনা ও সেইগুলি স্বরলিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকাকারে তিনি প্রকাশ করেন। বেঙ্গল একাডেমী অব মিউজিক (The Bengal Academy of Music) তাঁহাকে 'সঙ্গীতনায়ক' উপাধি ও স্বর্ণ-কেয়ূর উপহার প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ সালে ৮০ বৎসর বয়সে তিনি অপুত্রক পরলোক গমন করেন।

ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, বিদ্যারত্ন — ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে হুগলি জিলার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পীতাম্বর সেনগুপ্ত। বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ শেষ করিয়া ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হন এবং ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। অবশেষে এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে যাইয়া ভর্ত্তি হন। কলেজ ত্যাগ করিয়া ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে ক্ষেত্রমোহন মেদিনীপুরে ডেপুটী ইনস্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে সরকারী কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি 'আর্য্য দর্শন' নামে মাসিক পত্রের সহকারী সম্পাদক হন। তৎপরে 'প্রভাত সমীর' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হন। প্রভাত-সমীর অর্থাভাবে বন্ধ হইলে, তিনি 'নববিভাকর' ও 'সহচরের' সম্পাদক হন। অবশেষে তিনি 'দৈনিক বঙ্গবাসীর' সম্পাদক হন। সংবাদপত্র বিভাগে ক্ষেত্রমোহন একজন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। রাজনীতি ও অর্থনীতি আলোচনায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁহার রচিত বিবিধ প্রবন্ধ 'শিক্ষা ও উপদেশ,' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'মদনমোহন' নামে একখানি উপন্যাস তিনি রচনা করেন।

ক্ষেত্রসিংহ — চিতোরের রাণা হামিরের পুত্র ও মালবদেবের দৌহিত্র। চিতোরের রাণা হামিরের মৃত্যুর পরে ১৩৬৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি স্বীয় পিতার ন্যায়ই রণনিপুণ ও তেজস্বী ছিলেন। তিনি আজমীর, জিহাজপুর,

মণ্ডলগড়, দশূরি ও চম্পন নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। বাকরোল নামক স্থানে দিল্লীর সম্রাট নাসিরউদ্দিন তোগলকের পুত্র হুমায়ুন তোগলককে হামির সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। মিবারের অন্তর্ভূক্ত বুনাওদা নামক জনপদের হারবংশীয় সামন্ত রাজের দুহিতার সহিত রাণা ক্ষেত্রসিংহের বিবাহ হয়। কি কারণে জানা যায় না দুরাশয় হার সর্দ্দার রাণাকে গুপ্ত হত্যা করেন। তৎপরে ১৩৮৩ খ্রীঃ অব্দে রাণা লাক্ষ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ক্ষেমগুপ্ত—তিনি কাশ্মীরপতি পর্ব্বগুপ্তের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি রাজ্যলাভ করেন। তাঁহার মত লম্পট রাজা কাশ্মীরের সিংহাসন অতি অল্পই কলঙ্কিত করিয়াছে। তাঁহার সভায় মন্দ স্বভাবের লোকদেরই আদর ছিল। তিনি বৃদ্ধ জ্ঞানী মন্ত্রীদিগকে অপমান করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। তিনি লোহার প্রভৃতি দুর্গের স্বামী সিংহরাজের কন্যা দিদ্দাকে এবং ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ফল্গুনের কন্যা চন্দ্রলেখাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি আট বৎসর ছয়মাস রাজত্ব করিয়া (৯৫১—৯৫৯ খ্রীঃ) পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র অভিমন্যু রাজা হন।

ক্ষেমঙ্কর — একজন অসাধারণ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। ধনঞ্জয় দৈবজ্ঞ কৃত 'জাতক চন্দ্রোদয়' গ্রন্থে তাঁহার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার রচিত একখানা গ্রন্থের নাম 'বিবাহরত্ন সংক্ষেপ'।

ক্ষেমঙ্কর দেব— উড়িষ্যার করবংশীয় একজন নরপতি। তাঁহার পুত্র শিবকর (প্রথম), তৎপুত্র শোভাকর (প্রথম) ও শোভাকরের পুত্র শিবকর (দ্বিতীয়)। তাঁহারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। প্রথম শোভাকর নরপতি ৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে চীন সম্রাট তি-সোংএর নিকট প্রজ্ঞা নামক একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে 'গণ্ডব্যূহ' নামক একখানা মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ গ্রন্থ স্বহস্তে লিখিয়া প্রেরণ করেন।

কর-বংশাবলী।

- ক্ষেমঙ্কর দেব (নৃগাতপ)
  - শিবকর প্রথম = জয়াবলী দেবী
    - প্রথম শোভাকর (লালহার) — মাধবী দেবী
      - শিবকর (দ্বিতীয়) (কুসুমহার)
      - শান্তিকর = ত্রিভুবন মহাদেবী
        - শোভাকর (দ্বিতীয়)
        - দণ্ডী মহাদেবী (কন্যা)

ক্ষেমঙ্কর মিশ্র—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত ও চিকিৎসক। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'চিকিৎসা সার' বা 'চিকিৎসা সার সংগ্রহ'।

ক্ষেমচন্দ্র— বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের অন্যতম সেনাপতি। কবি ভারতচন্দ্রের পিতা ভূরসুটের রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় একবার ভূমি সংক্রান্ত সীমা নির্দ্ধারণ উপলক্ষে মহা-রাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতা মহারাণী বিষ্ণু কুমারীর প্রতি কটূবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই অপরাধে কীর্ত্তি-চন্দ্রের সেনাপতি আলমচন্দ্র ও ক্ষেমচন্দ্র রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়কে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। কবি ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় লয়েন।

ক্ষেমদাস—তিনি সৎকবীর সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ সাধক ভানজীর পুত্র। গুজ-রাতের অন্তর্গত কঠিয়াওয়ারে তাঁহাদের আস্তানা আছে। তিনিও পিতার ন্যায় একজন সাধক ছিলেন। তিনি খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

ক্ষেমপাল — কাবুলের শাহীবংশীয় নরপতি ত্রিলোচনপাল তুরস্ক দেশীয় কর্ত্তৃক স্বরাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া কাশ্মীরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার রুদ্রপাল, দিদ্দাপাল, ক্ষেমপাল ও অনঙ্গপাল নামে চারি পুত্র কাশ্মীরপতি অনন্তদেবের (১০২৮—১০৮১ খ্রীঃ) প্রধান অমাত্য ছিলেন। তাঁহাদেরই সাহায্যে অনন্তদেব তুর্কদিগকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন।

ক্ষেমরাজ—(১)একজন শৈব আচার্য্য। তিনি বসুগুপ্ত রচিত 'শিব সূত্র' নামক গ্রন্থের একখানি টীকা রচনা করেন। ক্ষেমরাজ খুব সম্ভব খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

ক্ষেমরাজ—(২)তিনি অনহিলবাদ পত্তনের চাবদবংশীয় নরপতি বৈরীসিংহের পুত্র। ৮৫৬—৮৮১ খ্রীঃঅব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র মুণ্ডরাজ (অন্যনাম ভূয়দ) রাজা হন।

অনহিলবাদ পত্তনের চাবদবংশ।

বাণরাজ—৭৪৬—৮০৫ খ্রীঃ
|
যোগরাজ (অন্য নাম জগরাজ)—৮০৫—৮৪১ খ্রীঃ
|
রত্নাবাদিত্য—৮৪১—৮৫৬ খ্রীঃ
|
বৈরীসিংহ—৮৫৬ খ্রীঃ
|
ক্ষেমরাজ—৮৫৬—৮৮১ খ্রীঃ
|
মুণ্ডরাজ(অন্যনাম ভূয়দ)—৮৮১—৯০৮ খ্রীঃ
|
ঘঘদ (অন্যনাম রাহপ)— ৯০৮—৯৩৭ খ্রীঃ
|
(নাম অজ্ঞাত)—৯৩৭—৯৬১ খ্রীঃ
(ভূয়গদ দেব ?)

ক্ষেমশর্ম্মা—তিনি একজন জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি 'ক্ষেমকুতূহল' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের প্রণেতা।

ক্ষেম সাবন্ত, ভোঁসলে, রাজা বাহাদুর—তিনি দাক্ষিণাত্যের সাবন্ত

বাড়ী নামক স্থানের রাজা ছিলেন। এই নামে এই বংশে কয়েকজন রাজা ছিলেন। সাবন্ত বাড়ী একটী দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা সহ্যাদ্রি পর্ব্বতমালা, দক্ষিণ সীমা পর্টুগীজ গোয়ারাজ্য, পশ্চিম ও উত্তর সীমা ব্রিটিশ রাজ্য। পরিমাণ ফল ৯২৬ বর্গ মাইল, এবং লোক সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ, অধিকাংশ হিন্দু। রাজস্ব পাঁচ লক্ষের উপর।

প্রাচীন ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে খ্রীঃ ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত সাবন্ত বাড়ী চালুক্য-বংশীয়দের অধিকারে ছিল। দশম শতাব্দীতে ইহা যাদববংশীয়দের অধিকারে আসে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইহা পুন চালুক্যবংশীয়দের অধিকারে আসে (১২৬১ খ্রীঃ)। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৩৯১ খ্রীঃ) বিজয়নগরের রাজার একজন কর্ম্মচারীর অধীনে সাবন্ত বাড়ী ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহা এক পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশের অধীন হয়। কিন্তু উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে বিজাপুরের মুসলমান রাজ্যের উদ্ভব হইলে, ইহা বিজাপুরের নবাবের অধীন হয়। ১৫৫৪ খ্রীঃ অব্দে, বিজাপুরের (প্রথম) ইব্রাহিম আদিল শাহের রাজত্বকালে, মং সাবন্ত নামক ভোঁসলে বংশীয় এক সেনাপতি, বিজাপুরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। বিজাপুরের নবাব তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে দমন করিতে ত পারিলেনই না, পরন্তু পরাজয়ের অপমান বহন করিতে হইল। কিন্তু মং সাবন্তের মৃত্যুর পরে, তাঁহার অযোগ্য উত্তরাধিকারী বিজাপুরের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

১৬২৭ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৬৪০ পর্য্যন্ত মং সাবন্তের পৌত্র প্রথম ক্ষেম সাবন্ত রাজত্ব করেন। তিনি বিজাপুরের নবাব মোহাম্মদ আদিল শাহের সময়ে (১৬২৬—১৬৬০ খ্রীঃ অব্দ) আবার স্বাধীন হইলেন। ইহার সময় হইতে তাঁহারা আর মুসলমানদের অধীন হন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র সোম সাবন্ত রাজা হইয়াছিলেন। তিনি মাত্র দেড় বৎসর রাজত্ব করিয়া গতায়ু হন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ সাবন্ত ১৬৬৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ছত্রপতি শিবাজীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া সমস্ত দক্ষিণ কোঙ্কন প্রদেশের আধিপত্য লাভ করেন। লক্ষ্মণের মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা ফণ্ড সামন্ত ১৬৬৫—১৬৭৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র ক্ষেম সাবন্ত (দ্বিতীয়) ১৬৭৫—১৭০৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি শিবাজীর পৌত্র শাহুর রাজত্বকালে

বর্ত্তমান ছিলেন এবং শাহু তাঁহাকে বহু ভূসম্পত্তি দিয়া সম্মানিত করেন। তাঁহারই উত্তরাধিকারী (১৭০৯—১৭৩৭ খ্রীঃ) ইংরেজদের সহিত কোলাবার কান্হুজি আঙ্গ্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। তৃতীয় ক্ষেম সাবন্ত ১৭৫৫—১৮০৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ভূপতি ছিলেন। তিনি ইন্দোরের মহারাজা জয়াজী সিন্ধিয়ার ভগিনী লক্ষ্মীবাইকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেজন্য দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮০৩ সালে তিনি নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার মহিষী লক্ষ্মীবাই রামচন্দ্র সাবন্ত নামক একটী বালককে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। এই বালক তিন বৎসর পরেই গতায়ু হইলে ফণ্ড সাবন্ত (২য়) নামক আর একটী বালক পোষ্য পুত্ররূপে গৃহীত হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার আট বৎসর বয়স্ক পুত্র ক্ষেম সাবন্ত (৪র্থ) রাজা হইয়াছিলেন। তিনি ১৮১২ হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র রঘুনাথ সাবন্ত ভেঁাস্‌লে রাজা হন ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। ১৯১৩ সালে তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র ক্ষেম সাবন্ত ভোঁসলে (পঞ্চম) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৯৭ সালে ২০শে আগষ্ট তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৯২৪ সালে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ক্ষেমা — মগধের রাজা বিম্বিসারের মহিষী। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য ও ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করিয়া, মহাত্মা বুদ্ধদেবের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

ক্ষেমানন্দ — তাঁহার রচিত ‘মনসা মঙ্গল’ ক্ষুদ্র হইলেও অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। কেতকাদাস বোধ হয় তাঁহার উপাধি। কারণ মনসা দেবীরই এক নাম কেতকা, মনসা মঙ্গল গ্রন্থের প্রথম অংশ কেতকাদাস এবং শেষ অংশ ক্ষেমানন্দ ভণিতাযুক্ত। ইহাতে আরও সন্দেহ হয় যে উভয়ই একইব্যক্তি ছিলেন। ক্ষেমানন্দ জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার রাজীব ও অভীরাম নামে দুই পুত্র ছিল।

ক্ষেমারাম — এই স্মৃতির পণ্ডিতের পিতার নাম— ভবমণ্ডন ও মাতার নাম পদ্মিনী। তিনি রাম পদ্ধতি নামে একখানা স্মৃতির গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাব কাল অজ্ঞাত।

ক্ষেমীশ্বর—সংস্কৃত নাট্যকার। পালবংশীয় রাজা মহীপালদেবের রাজত্বকালে, তাঁহারই বিজয়োৎসব উপলক্ষে ‘চণ্ডকৌশিক নাটক’ তৎকর্ত্তৃক রচিত হইয়া অভিনীত হয়।

ক্ষেমেন্দ্র— (১) একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান নামক পন্থার প্রবর্ত্তক।

ক্ষেমেন্দ্র— (২) তিনি 'মদন মহার্ণব' নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

ক্ষেমেন্দ্র ব্যাসদেব—তিনি কাশ্মীরের অধিপতি অনন্তদেবের (১০২৮—১০৮১ খ্রীঃ) সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পিতামহের নাম সিন্ধু ও পিতার নাম প্রকাশেন্দ্র ছিল। তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত অভিনব গুপ্ত ও ভাগবতাচার্য্য সোমপাদ তাঁহার গুরু ছিলেন। তিনি বুদ্ধকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাঁহার রচিত 'ঔচিত্যবিচার-চর্চ্চা,' 'কবিকণ্ঠাভরণ,' 'কলাবিলাস.' 'দশাবতার চরিত,' 'ভারত মঞ্জরী,' 'রামায়ণ মঞ্জরী,' 'বৃহৎকথা মঞ্জরী,' 'অমৃত তরঙ্গ,' 'নীতিকল্প তরু,' 'মুনি মত মীমাংসা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রহিয়াছে। তাঁহার বৌদ্ধ বন্ধু ন্যক্কের অনুরোধে তিনি 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা একখানি বৌদ্ধ কথাগ্রন্থ। উহাতে শতাধিক আখ্যান সংকলিত হইয়াছে। ক্ষেমেন্দ্রের পুত্র জীমূতবাহন উহার পূর্ব্বাভাগ রচনা করিয়া উহাতে আরও একটি আখ্যান সন্নিবেশ করেন। তৎরচিত শিবসূত্রের টীকা দেখিলে মনে হয়, তিনি শৈব ছিলেন। তিনি খ্রীঃ একাদশ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন।

ক্ষেমেন্দ্র ভদ্র—বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস প্রণেতা লামা তারানাথ অনেকগুলি প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে মগধবাসী পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্রভদ্রের বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তিনি একখানি গ্রন্থে রামপালের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সমস্ত ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় (মহারাজা)—নদীয়া কৃষ্ণনগরের রাজবংশীয় মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র রায়ের পুত্র। ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৯১১ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীর দরবার উপলক্ষে তিনি মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ধর্ম্মভীরু, ন্যায়নিষ্ঠ, সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন। প্রজার সুখ-স্বচ্ছন্দ বিধানের জন্য তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। নদীয়া জিলা বোর্ডের তিনিই প্রথম বেসরকারী সভাপতি ছিলেন। নদীয়া জিলাবাসীদের প্রতিনিধি স্বরূপে তিনি কিছুকাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যও ছিলেন। তৎপরে তিনি বঙ্গীয় সরকারের শাসন পরিষদের (Executive Council) অন্যতম সদস্যপদ লাভ করেন। এত অল্প বয়সে আর কেহ ঐরূপ দায়ীত্বপূর্ণ উচ্চপদ লাভ করেন নাই। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৯২৮ খ্রীঃ অব্দের জুন) মাত্র সাঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

খগরাট বা ক্ষহরাট — তিনি উজ্জয়িনীর একজন শকবংশীয় নরপতি। তাঁহারই বংশধর বিক্রমাদিত্যকে উত্তরকালে অন্ধ্রবংশীয় গৌতমীপুত্র পরাস্ত করিয়া স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করেন।

খঞ্জননাথ—নাথ পন্থীদের সুধাকর চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে চৌরাশিজন সিদ্ধ পুরুষের নাম পাওয়া যায়, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। অপান নাথ দেখ।

খড়্গতুঙ্গ—তিনি উড়িষ্যার তুঙ্গবংশীয় নরপতি প্রথম বিনীততুঙ্গের পুত্র। জয়তুঙ্গ দেখ।

খড়্গরাজ—মেঘনা নদের পূর্ব্বতীরস্থ ভূমিকে সমতট বলিত। সেই প্রদেশে খড়্গোদ্যম নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র, জাতখড়্গ তৎপুত্র শ্রীদেব খড়্গ, তৎপুত্র বীরশ্রেষ্ঠ খড়্গরাজ, তাঁহার মহিষী প্রভাবতী দেবী। তিনি প্রীতিপূর্ব্বক সর্ব্বাণী দেবীকে সুবর্ণ ভূষিতা করিয়াছিলেন।

খড়্গ রায়—তিনি স্বাধীন ত্রিপুরার অধিপতি ধন্যমাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। হৈতন খাঁ প্রভৃতি পাঠান সেনাপতিগণ ত্রিপুরা রাজ্যের জামির খাঁ নামক স্থানের গড় আক্রমণ করিলে, তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন এবং ছয়ঘরিয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

খড়্গসিংহ—তিনি পাঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যুর পরে তিনি রাজা হন। অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পঞ্চমবর্ষীয় ভ্রাতা দলিপসিংহ রাজা হইয়াছিলেন।

খড়্গোদম—বঙ্গের পালবংশীয় নরপতিদের অবনতির সময়ে বঙ্গে একটী স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ দেবপালের রাজত্বের শেষ ভাগে খড়্গোদ্যম এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র জাতখড়্গ ও পৌত্র দেখখড়্গ রাজা হইয়াছিলেন। খড়্গবংশের পতনের পর চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই খড়্গগোদম বংশের বিশেষ কোন বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

খণ্ড নাথ—'হঠযোগ প্রদীপিকা' গ্রন্থে লিখিত আছে যে চৌদ্দজন নাথ পন্থী গুরু ছিলেন। তন্মধ্যে খণ্ডনাথ অন্যতম। তাঁহাদের নাম যথা—

শ্রীআদিনাথ মৎসন্দ্রেন্দ্র শাবরানন্দ ভৈরবাঃ। চৌরঙ্গী মীন গোরক্ষ

বিরূপাক্ষ বিলেসয়াঃ ॥ মন্থানো ভৈরবো যোগী সিদ্ধি র্বদ্ধশ্চ কন্থড়িঃ। কোরণ্টকঃ সুরানন্দঃ সিদ্ধপাদশ্চ চর্পটিঃ॥ কানেরী পূজ্য পাদশ্চ নিত্যনাথো নিরঞ্জনঃ। কপালী বিন্দুনাথশ্চ কাক-চণ্ডী শ্বরা হয়ঃ॥ অল্লাম প্রভুদেবশ্চ ঘোড়াচোলীর টিন্টিণিঃ। ভানুকী নরদেবশ্চ খণ্ডঃ কাপালিক স্তথা॥ ইত্যাদয়ো মহাসিদ্ধা হঠযোগ প্রভা-বতঃ। খণ্ডয়িত্বা কালদণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডে বিচরিষ্যন্তিতে॥

খণ্ডেরাও হোলকার — ইন্দোরের হোলকার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহ্লার রাও হোলকারের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম গৌতমাবাঈ। তাঁহারই স্ত্রী প্রসিদ্ধা অহল্যাবাঈ। তাঁহার পুত্রের নাম মালে রাও। পিতার জীবিত কালেই মালেরাও ১৭৫৩ খ্রীঃ অব্দে ভরতপুরের নিকটবর্ত্তী কুম্ভেরী নামক দুর্গ অবরোধ করিতে যাইয়া শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হন। মুক্তাবাঈ নামে খণ্ডেরাওয়ের এক কন্যাও ছিল। অহল্যাবাঈ দেখ।

খণ্ডোজী—তিনি সামান্য পশুপালক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র মহ্লার-রাও হোলকার ইন্দোরের হোলকার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মহ্লার রাও হোলকার দেখ।

খত্তিগ — তিনি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্র-কূট বংশীয় নরপতি বদ্দিগের (অমোঘবর্ষ তৃতীয়) পুত্র। তিনি ৯৭১—৯৭৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। (দন্তীবর্ম্মা দেখ।

খনা—এই বিদুষী মহিলা যে বঙ্গমহিলা ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য গল্প অসম্ভব ও বিশ্বাসের অযোগ্য। দুঃখের বিষয় তাঁহার রচিত প্রবচন ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে বিশ্বাস যোগ্য আর কোন বিবরণ এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

খয়েরউদ্দিন মোহাম্মদ, মৌলানা —একজন বিখ্যাত মৌলবী। হিঃ ১১৬৫ সালে (১৭৫২ খ্রীঃ) এলাহাবাদ নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জৌনপুরে মৌলানা মোহাম্মদ আস্কারির নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া পুনরায় এলাহাবাদে গমন করেন। কিছুদিন দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের রাজসভায় ছিলেন এবং তৎপরে কিছুদিন লক্ষ্ণৌর নবাব আসফ উদ্-দৌলার দরবারে ছিলেন। এই সময়ে তিনি অনেক ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারীর সহিত পরি-চিত হন। ১৭৯৬ খ্রীঃ অব্দে মিঃ এব্রাহাম উইল্যাণ্ড (Mr. Abraham Willand) সাহেব জৌনপুরে জিলা জজ হইয়া আসেন। এই সদাশয় জজ সাহেবের পরামর্শেই খয়েরউদ্-দিন 'তজ কিরাত-উল-আউলিয়া' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল মার্কুইস অব ওয়েলেস্লীকে

(Marquiss of Wellesly ; ১৭৯৮—১৮০৫ খ্রীঃ) উপহার প্রদান করেন। মৌলানা সাহেব একখানা আবেদন পত্রে জৌনপুরে একটী সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন উৎকৃষ্ট মাদ্রাসা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদনপূর্ব্বক স্বয়ং বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার এই সাক্ষাতের ফলে কাশীর সংস্কৃত চর্চ্চার ন্যায় জৌনপুর আরবী ফারশী শিক্ষার কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। জৌনপুর নগর দিল্লীর পাঠান সম্রাট ফিরোজ শাহ তোঘলক কর্ত্তৃক স্থাপিত হয় (হিঃ ৭৭২ ১৩৭২ খ্রীঃ)। তাঁহার পরবর্ত্তী দিল্লীর সম্রাটেরা জৌনপুরের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। শারকিবংশের রাজত্বকালে জৌনপুর তাঁহাদের রাজধানী ছিল (১৩৯৪-১৫০০ খ্রীঃ)। সুতরাং তাঁহারাও জৌনপুরের উন্নতির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বহু বিদ্যামন্দির ও ভজনালয় তাঁহাদের অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী মুঘল সম্রাটেরাও তাহার উন্নতির জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে উহারও অবনতি হয়। মৌলানা খয়ের উদ্-দিনের ঐকান্তিক যত্নে উহার উন্নতির সূচনা পুনঃ আরম্ভ হয়। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা, বিদ্বান ও ধর্ম্মানুরাগী লোক ছিলেন।

খরগ্রহ (প্রথম)—তিনি বল্লভীবংশীয় নরপতি দ্বিতীয় ধরাসেনের পুত্র। তিনি ৬১০—৬১৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র তৃতীয় ধরাসেন রাজা হন। গুহসেন দেখ।

খরগ্রহ (দ্বিতীয়)—তিনি বল্লভীবংশীয় ধীরভট্টের পুত্র। ৬৫৬ — ৬৬৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র তৃতীয় শিলাদিত্য রাজা হন। গুহসেন দেখ।

খলভোজ—তিনি চিতোরের রাণা বাপ্পারাওয়ের পৌত্র ও অপরাজিতের পুত্র। তিনি পরলোক গমন করিলে তদীয় পুত্র খোমান চিতোর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময়ে মুসলমান কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণ আরম্ভ হয়।

খলিল উল্লা খাঁ— তাহার উপাধি উমদাদ-উল-মুল্ক। শাহ-জানের রাজত্বকালে তিনি দিল্লীর শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজীব তাঁহাকে ছয় হাজার সৈন্যের অধিনায়কের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

খলিল খাঁ—তিনি সম্রাট শা-জাহানের সময়ে একজন পাঁচ হাজারী সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় উগ্র ছিল। তাঁহারই প্ররোচনায় সম্রাট আওরঙ্গজীব স্বীয় পিতা শাহ-জাহানকে বন্দী করিয়াছিলেন। আগ্রার যমুনা তীরে তাঁহার নির্ম্মিত একটী সুন্দর

প্রাসাদের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

খল্লাটক—মগধের মৌর্য্যবংশীয় নরপতি বিন্দুসারের অন্যতম মন্ত্রী। তিনি বিন্দু-সারের অন্যতম পুত্র সুসীমের অতি বিরোধী ও অশোকের পক্ষভুক্ত ছিলেন তাঁহারই পরামর্শে অশোক কৃতকার্য্য হইয়া, সিংহাসন লাভ করেন এবং সুসীম নিহত হন।

খাওয়াস খাঁ—১৫১৩ খ্রীঃ অব্দে সুবর্ণ গ্রামের মুসলমান শাসনকর্ত্তার উজির (মন্ত্রী) খওয়াস খাঁর অধীনে ত্রিপুরা রাজ্যের সমতল ক্ষেত্রের কতক অংশ ছিল। সেই সময়ে হোশেন শাহ বাঙ্গালার নবাব (১৪৯৯—১৫২৯ খ্রীঃ) ছিলেন। কিন্তু এই সকল বিজিত অংশ অল্পকাল পরেই ত্রিপুরাধিপতি পুনর্ব্বার অধিকার করিয়া লয়েন।

খাজা জাহান—জৌনপুরের সর্কি বংশের স্থাপয়িতা মালিক সরওয়ারের সম্মানিত নাম। দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলকের পুত্র সুলতান মোহাম্মদ শাহ মালিক সওয়ার নামক একজন খাজাকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী করিয় খাঁজা জাহান উপাধি প্রদান করিয়া-ছিলেন। ১৩৯৪ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ-৭৯৬) মোহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার দশ বৎসর বয়স্ক পুত্র সুলতা মামুদ শাহ তোগলক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া খাজা জাহানকে কনোজ, অযোধ্যা, কারা ও জৌনপুরের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। খাজা জাহান জৌনপুরেই তাঁহার বাসস্থান স্থাপন করেন। তিনি সুলতান মামুদের রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা গ্রহণপূর্ব্বক জৌনপুরে স্বাধীনতা অবলম্বন করি-লেন। ১৪০০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৮০২) তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পোষ্য পুত্র মালিক ওয়াসিল (করণফল) মোবারিক শাহ সর্কি উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক জৌন-পুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ১৪০২ খ্রীঃ অব্দেই (হিঃ ৮০৪) তিনি পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার ভ্রাতা ইব্রাহিম শাহ সর্কি সিংহাসন লাভ করেন। ১৪৪১ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৮৮৫) প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি পরলোক গমন করিলে সুলতান মামুদ শাহ সকি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৪৫২ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৮৫৬) তিনি পরলোক গমন করিলেন এবং তাঁহার পুত্র মোহাম্মদ শাহ তৎপদে অভিষিক্ত হই-লেন। মোহাম্মদ শাহ ১৪৫৮ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৮৬২) যুদ্ধে নিহত হইলে তাঁহার ভ্রাতা হোশেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। দিল্লীর সম্রাট বহলুল লোদীর সঙ্গে তাঁহার কয়েকটী যুদ্ধ হয় এবং অবশেষে তিনি পরাজিত হইয়া বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা সুলতান আলাউদ্দিনের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এই স্থানেই ১৪৯৯ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯০৫) তিনি পরলোক গমন করেন। জোন-পুরে এখনও এই বংশের অনেক কীর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

খাজা মনসুর সিরাজী—অন্যনাম শাহ মনসুর। তিনি দিল্লীর সম্রাট আকবরের একজন কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। পরে তিনি মন্ত্রী হইয়াছিলেন। অন্যান্য সচীব কর্ত্তৃক তিনি রাজকোষ হইতে টাকা অপহরণের অভিযোগে অপরাধী হন। ১৫৮১ খ্রীঃ অব্দে বিচারে তিনি দূষী প্রমাণিত হইয়া নিহত হন।

খাজা মোয়াজ্জম — তিনি হামিদা-বানু বেগমের ভ্রাতা। সম্রাট হুমায়ুনের ভগিনী ফাতেমা বেগমকে বিবাহ করেন। তিনি অতিশয় মন্দ স্বভাবের লোক ছিলেন। অন্যায় কার্য্যের জন্য তিনি কয়েকবার রাজ্য হইতে বহিস্কৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতেন। পরে আপন স্ত্রীকে বধ করিয়া সম্রাট আকবরের আদেশে ১৫৬৫ খ্রীঃ অব্দে নিহত হন।

খাজা মোহাম্মদ ইসা—তিনি জোন-পুরের হজরত শেখ ইসা সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র। আট বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি দিল্লী হইতে পিতার সঙ্গে জোনপুরে গমন করেন। পণ্ডিত খাজা কাজী শিহাবউদ্-দিনের নিকট তিনি শিক্ষা প্রাপ্ত হন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সেই তিনি বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী হন এবং কঠিন কঠিন বিষয়ে সদুত্তর প্রদান করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর, তিনি পিতার স্থান অধিকার করিয়া, ধর্ম্মগুরু হন এবং সেই সময় হইতে পার্থিব মান সম্ভ্রম সকল বিষয়ে একেবারে নির্লিপ্ত হইলেন। তিনি নির্জ্জনেই বাস করিতেন কথনও কোন সময় কদাচিৎ বাহিরে আসিতেন। কিন্তু প্রতি শুক্রবারে নমাজ পড়িবার জন্য বাহিরে আসিতেন। এই প্রকারে চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত করেন। ধনী লোকদিগের তাঁহার দর্শন লাভ অতি দুর্ঘট ছিল। কথিত আছে একদিন নিজ বাসস্থান কর্দ্দম দ্বারা লেপিতে ছিলেন, এমন সময়ে সুলতান হুশেন শাহ শারকি তাঁহাকে অভিবাদন করি-বার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। খাজা সাহেব তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিবার জন্য, হস্ত প্রক্ষালন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সুলতান হুশেন নিবারণ করায়, সেই কর্দ্দম লিপ্ত হস্তেই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সুলতান সেই কর্দ্দমাক্ত অঙ্গাভরণ, অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত পরিধান করি-তেন। একবার দিল্লীর সম্রাট বহলুল লোদী জোনপুর আক্রমণ করিতে অভিলাষী হন। জোনপুরপতি সুলতান হুশেন খাজা সাহেবকে অবস্থা জ্ঞাপন করিলে, তিনি বলিলেন 'শত্রু পরাজিত

হইয়া পলায়ন করিবে।' বহলুল লোদী খাজা সাহেবের বাণী শ্রবণে সত্যই চলিয়া গেলেন। এদিকে জৌনপুরপতি বহলুল লোদীকে প্রতিআক্রমণ করিয়া পরাজিত হইলেন। খাজা সাহেবকে সুলতান হুশেন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—'তোমাকে আক্রমণ করিলে শত্রু পরাজিত হইবে ইহাই আমি বলিয়াছিলাম। তুমি কেন বিপরীত আক্রমণ করিতে গেলে? ইহার অন্যথা হইবে না।' তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার অনেক গল্প আছে। তিনি ৭৯ বৎসর বয়সে হিঃ ৮৬৯ সালে (১৪৬৬ খ্রীঃ) পরলোক গমন করেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ আছে।

খাদেম হোশেন খাঁ—একজন বিখ্যাত গায়ক। ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ ছোটে খাঁ তাঁহায় পিতা ও শ্রীজনে বাই তাঁহার মাতা ছিলেন। খাদেম হোশেন খাঁ পিতার নিকট হইতেই মৃদঙ্গ বাজনায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। 'কুদেওসিংজী বাজ' বলিয়া মৃদঙ্গের যে বিশিষ্ট রীতি প্রচলিত আছে, বাঙ্গালা দেশে একমাত্র খাদেম হোশেন খাঁই তাঁহার প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি স্বনামধন্য গুণী উজীর খাঁ সাহেবের নিকট 'হোরীধামারে' বাদ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৩৪২ সালের ২৯শে শ্রাবণ (১৯৩৫ খ্রীঃ) এই বিখ্যাত বাদকের মৃত্যু হয়।

খাঁন আলম—(১) মির্জা বারক হুরদারের কবিজন সুলভ উপাধি। তিনি মির্জা আবদুল রহমান লোদীর পুত্র। সম্রাট শা-জাহানের রাজত্বকালে পাঁচ হাজার সৈন্যের সেনানায়ক ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের তিনি প্রিয় পাত্র ছিলেন এবং বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বৃত্তি গ্রহণে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু সম্রাট তাঁহাকে ছয় হাজার সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া বিহারের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। আগ্রার যমুনা-তটে তাঁহার লোহিত প্রস্তরের নির্ম্মিত একটী প্রাসাদ ছিল।

খাঁন আলম—(২) ইকলাস খাঁর উপাধি। খাঁন জমান শেখ নিজামীর পুত্র। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরকর্ত্তৃক পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হন এবং খাঁন আলম উপাধি প্রাপ্ত হন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরে আজিম শাহের পক্ষাবলম্বন করিয়া তিনি বাহাদুর শাহের সহিত যুদ্ধ করেন এবং ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ-১১১৯) যুদ্ধেই তিনি নিহত হন।

খান আলম চালমা বেগ—তিনি দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মিরজা কামরানের ধাত্রী ভাই হামদের পুত্র ও সম্রাট হুমায়ুনের সফরচি (Table Attendant) ছিলেন। কামরাণকে অন্ধ করিয়া, হুমায়ুন যখন তাঁহাকে মক্কায় প্রেরণ করেন, তখন চালমা বেগ

তাঁহার সঙ্গে মক্কায় গিয়াছিলেন। কামরাণের মৃত্যুর পরে, তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলে পর, সম্রাট আকবর তাঁহাকে তিন হাজারী সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সম্রাট আকবর যখন গুজরাতের বিদ্রোহী নবাব ইব্রাহিম হোশেন মিরজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন, তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। সারনালের যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট তাঁহার বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে খান আলম উপাধি প্রদান করেন। সম্রাটের অন্যতম সেনাপতি মনিম খাঁর সঙ্গে তিনি বঙ্গের পাঠান সর্দ্দার দায়ুদ খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু দায়ুদ খাঁর অন্যতম প্রধান সেনাপতি গুজর খাঁর সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। তিনি একজন কবিও ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা মজাফরও সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম করিতেন।

খান খানান মির্জা আবদর রহিম—সম্রাট আকবরের সমসাময়িক একজন সম্ভ্রান্ত অমাত্য। আকবরের অন্যতম মন্ত্রী বৈরাম খাঁ তাঁহার পিতা। বৈরাম খাঁ নিহত হইলে, আবদর রহিম শৈশবেই অন্যান্য শুভানুধ্যায়ী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সম্রাট সমীপে নীত হন এবং সম্রাটের তত্ত্বাবধানে বাস করিতে থাকেন।

যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি সম্রাটের সহিত নানা অভিযানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নানাগুণে মুগ্ধ হইয়া সম্রাট তাঁহাকে মীর-আর্জ উপাধি প্রদান করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র পঁচিশ বৎসর। কিছুকাল পরে তিনি গুজরাতের বিদ্রোহী পাঠান সেনাপতি মজফ্‌ফরকে দুইবার বিশেষ কৃতীত্বের সহিত পরাস্ত করেন এবং পুরস্কার স্বরূপ সম্রাট কর্ত্তৃক খান খানান উপাধি ভূষিত হন। তদ্ভিন্ন তিনি পাঁচ হাজার সৈন্যের মনসবদারের পদও প্রাপ্ত হন। সম্রাট তনয় মুরাদ যখন দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেন, তখন আবদর রহিম তাঁহার সাহায্যের জন্য প্রেরিত হন। কিন্তু মুরাদের সহিত মনোমালিন্যবশতঃ, তিনি কোনও যুদ্ধে যোগদান করেন নাই। মুরাদ দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করিবার পর, তিনি তাঁহার অসমাপ্ত কাজ সমাপন করেন। এই উপলক্ষে তিনি সুহিল খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া অসামান্য শৌর্য্যবীর্য্য ও রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করেন (১৫৯৭ খ্রীঃ অব্দে)। আকবরের অপর পুত্র রাজপুত্র দানিয়েলের সহিতও, তিনি দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অংশ বিজয়ে গমন করেন এবং বিশেষ সংগ্রামের পর আহাম্মদনগর অধিকার করেন। তৎপরে সম্রাটের আদেশে তিনি কিছুকাল নব-বিজিত রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনাদি কার্য্যের জন্য, তথায় অবস্থান করেন। আকবরের মৃত্যুর পরও আবদর রহিম কিছুকাল

দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করেন। কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষীয় লোকদের চক্রান্তে, তিনি গুজরাতের বিদ্রোহীদের সহিত, সন্ধি করিতে বাধ্য হন। তজ্জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রতি বিরূপ হন এবং তাঁহাকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দেন। কতিপয় বর্ষ পরে তিনি কনৌজ অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করিতে গমন করেন এবং তৎপরে পুনরায় দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেন। এই স্থানে রাজকুমার খুরম তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় আদিল শাহ ও কুতব-উল-মুল্ক বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে আহম্মদনগরের পূর্ব্ব অধিপতি মালিক অম্বর পুনরায় বিদ্রোহী হওয়ায়, সম্রাট আবার তাঁহাকে বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষভাগে, যখন যুবরাজ খুরম বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, তখন কিছুকাল আবদর রহিম তাঁহারই সঙ্গে ছিলেন। পরে যুবরাজ তাঁহার বিশ্বস্ততায় সন্দিহান হইয়া, তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে বন্দী করেন। অল্পকাল পরেই যুবরাজ তাঁহাদের মুক্তি প্রদান করিয়া, নিজপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন, কিন্তু খান খানান সেই প্রতিশ্রুতি মত কাজ করেন নাই।

কিছুকাল পরে সম্রাটের নির্দ্দেশে আবদর রহিম দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন এবং অল্পদিন পরেই অন্যতম বিদ্রোহী সেনাপতি মহাবত খাঁকে দমন করিবার ভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু অসুস্থ হইয়া পরাতে সেই অভিযান সম্ভব হয় নাই। ১৬৫১ খ্রীঃ অব্দে বাহাত্তর বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

আবদর রহিম ফারসী, আরবী, তুর্কি ও হিন্দি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার জীবনকাল প্রধানতঃ যুদ্ধ বিগ্রহে কাটিলেও তিনি সাহিত্য চর্চ্চাও করিতেন। তাঁহার কবিজন সুলভ নাম ছিল রহিম। মৃত্যুকালে তাঁহার চারি পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন।

খান জমান—(১) আলি কুলি খাঁর উপাধি। তাঁহার ভ্রাতার নাম বাহদুর খাঁ, পিতার নাম হায়দর সুলতান উজবেগ। তাঁহার পিতা সম্রাট হুমায়ুনের একজন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। সম্রাট আকবর তাঁহাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে উচ্চ সম্মান ও জৌনপুর প্রদেশ প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা মিরজা হাকিমের পক্ষাবলম্বন করিয়া বিদ্রোহী হন। আকবর একদল সৈন্য লইয়া তাঁহাদিগকে দমন করিতে গমন করেন। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দের ৯ই জুন সোমবার (হিঃ ৯৭৪ ১লা জিলহিজ্জ) যুদ্ধে উভয় ভ্রাতা সমর ক্ষেত্রে শয়ন করেন।

খান জমান—(২) আসফ খাঁ জাফর-বেগের ভ্রাতা আজিম খাঁর দ্বিতীয় পুত্র মির খলিলের উপাধি। তিনি ইমিন উদ্দৌল্লা আসফ খাঁর জামাতা। তিনি কয়েক বৎসর সম্রাট শাহজাহানের অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন, পরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে পাঁচ হাজারী সেনা-পতি হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি মালব দেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং তথায় ১৬৮৪ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৯৫) তাঁহার মৃত্যু হয়।

খান জমান-ই-শৈবানী—পারস্য দেশবাসী উজবেক জাতীয় ভারতপ্রবাসী ভাগ্যান্বেষী বীর। তাঁহার পিতার নাম হাইদর সুলতান উজবক-ই-শৈবানী। তিনি মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সহিত কান্দাহার অভিযানে উপস্থিত ছিলেন। খান জমানও (নামান্তর আলি কুলি খাঁ) হুমায়ুনকে ভারতবর্ষে মুঘল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে বিশেষ সাহায্য করেন এবং কয়েকটি স্থানে যুদ্ধ জয় করিয়া শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তিনি তৎপুত্র আকবরের অধীনে সেনাধ্যক্ষের কাজ করেন। তিনি শাদি খাঁ, হিমু নামক প্রসিদ্ধ পাঠান সেনাপতিদিগকে পরাস্ত করিয়া মুঘল প্রাধান্য দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করেন। ঐ বিজয় উপলক্ষে তিনি খান জমান উপাধি প্রাপ্ত হন। আকবর তাঁহাকে বিস্তীর্ণ জায়গীর প্রদান করেন। তাহার পরেও উত্তর ভারতের নানাস্থানে আকবরের প্রতি-দ্বন্দী পাঠান সেনাপতিদিগকে পরাস্ত করিয়া মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের সাহায্য করেন।

একবার খান জমানের কোনও কোনও ব্যবহারে সম্রাট আকবর তাঁহার প্রতি বিরূপ হন এবং সম্রাটের আদেশে তাঁহার ভূসম্পত্তির অনেকাংশ বাজেয়াপ্ত হয়। তখন খান জমান বিদ্রোহী হন এবং কোনও কোনও স্থানে আফগান-দিগকে পরাস্ত করিয়া নিজে স্বাধীন ভূপতি হইবার চেষ্টা করেন। তাঁহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সম্রাট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। প্রথমে খান জমান ও তাঁহার ভ্রাতা বাহাদুর বশ্যতা স্বীকার করিয়া, লুণ্ঠনলব্ধ বহু মূল্যবান দ্রব্য প্রত্যর্পণ করাতে, সম্রাট তাঁহা-দিগকে ক্ষমা করিয়া জৌনপুরের শাসন-কর্ত্তার পদে নিয়োগ করেন।

কয়েক বৎসর পরে দুর্বুদ্ধিবশতঃ খান জমান আবার বিদ্রোহী হন। সম্রাট পুনরায় তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং প্রথমে মুনিম খাঁকে প্রেরণ করেন। মুনিম খাঁর পরামর্শে খান জমান প্রথমে বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত হন। কিন্তু পরে আবার মত পরিবর্ত্তন করেন। কিছুকাল বল পরীক্ষার পর খান জমান বশ্যতা স্বীকার করাতে, আকবর তাঁহাকে

ক্ষমা করেন ও সমস্ত জায়গীর প্রত্যর্পণ করেন। কিন্তু খান জমানের দুর্ব্বুদ্ধি পুনরায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এবং ৯৭৪ হিজরিতে তিনি পুনরায় বিদ্রোহী হন। বারংবার এই ভাবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাতে, সম্রাট আকবর বিরক্ত হইয়া, বিপুলভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তদ্ভিন্ন একাধিক সেনাপতি তাঁহার সহযোগীদের বিরুদ্ধেও প্রেরিত হন। এই সকল সমবেত প্রচেষ্টায় খান জমান ও তাঁহার ভ্রাতা যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হন।

খান জমান ফতেজঙ্গ—শেখ নিজাম হায়দরাবাদীর উপাধি। তিনি প্রথমে হায়দরাবাদের শাসনকর্ত্তা আবুল হাসনের অধীনে এবং পরে দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের অধীনে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্র ভূপতি শম্ভুজীকে সপরিবারে বন্দী করেন। এই কার্য্যের জন্য তিনি সাত হাজারী সেনাপতি পদ ও খান জমান ফতেজঙ্গ উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৬৯৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১০৮) তাঁহার মৃত্যু হয়।

খান জমান বাহাদুর—তাঁহার পূর্ব্ব উপাধি খানজাদ খাঁ এবং প্রকৃত নাম মির্জা আমান উল্লা। তিনি মহাবত খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৬২৫ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৩৩) তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম ভাগেই তিনি পাঁচ হাজারী সেনাপতির পদ ও খান জমান বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি 'মজমোয়া' নামক একখানা পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তৎপূর্ব্বকালবর্ত্তী পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৬৩৭ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৪৭) দৌলতাবাদে তাঁহার মৃত্যু হয়।

খান-জা-খাঁ—ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ভাগে তিনি হুগলীর একজন ফৌজদার ছিলেন। তিনি অতিশয় বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রাসাদ, উদ্যানবাটী, অশ্বশালা প্রভৃতি ক্ষমতাশালী নবাব প্রভৃতির সদৃশ ছিল। হুগলী জিলার অন্তর্গত চন্দননগরের নিকটবর্ত্তী গোঁদল পাড়ায় তাঁহার বিস্তৃত ভূসম্পত্তি ছিল। ঐ স্থানে প্রথমে দিনেমারগণ ও পরে ফরাসীরা তাঁহার নিকট হইতে ভূমি পত্তনি গ্রহণ করে। ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে হুগলীর ফৌজদারের পদ বিলুপ্ত হইলে খান-জা-খাঁর ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটে এবং তাঁহার অর্থ কষ্ট উপস্থিত হয়। শেষ জীবনে তিনি মাসিক মাত্র আড়াই শত টাকা বৃত্তি পাইতেন। ১৮০১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

খানজাদ খাঁ— সরবলন্দ খাঁর পুত্র। ১৭২৩ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১৩৫) তিনি পেশোয়ারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সম্রাট মোহাম্মদ শাহ ১৭২৩ খ্রীঃ অব্দে

(হিঃ ১১৪৫) তাঁহার পিতাকে এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন, সেই সময়ে তিনি তৎপরিবর্ত্তে উক্ত পদ গ্রহণ করেন।

খান জাদ খাঁ—(২য়) তিনি দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের অন্যতম সেনাপতি মহবৎ খাঁর পুত্র। মহবৎ খাঁকে সম্রাট আদেশ করিলেন যে, খানজাদ খাঁকে বাঙ্গালার সুবাদারী পদে নিযুক্ত করিয়া তিনি যেন স্বয়ং বিদ্রোহী পুত্র শাহজাহানের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। খানজাদ খাঁ অতি অল্পকাল মাত্র বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন (১৬২৬ খ্রীঃ)। তিনি বাঙ্গালাদেশের উদ্বৃত্ত রাজস্ব বাইস লক্ষ টাকা দিল্লীতে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহা শত্রুর হস্তগত হওয়ায় পদচ্যুত হইবার ভয়ে কার্য্যে ইস্তফা দেন। পদত্যাগের পর তিনি সম্রাট দরবারের যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর মুকরাম খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

খানজাদ বেগম — সম্রাট বাবরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। তিনি বাবরের পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বাবরের কনিষ্ঠা মেহেরবানু, ইদ্‌গার সুলতান বেগম ও রুকিয়া সুলতান বেগম নামে আরও তিন ভগিনী ছিলেন।

খান জাহান কোকলতাস—তাঁহার প্রকৃত নাম মীর মালিক হোশেন এবং পিতার নাম মির আবুল মোয়ালী খোয়াফি। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের ধাত্রীভাই ছিলেন বলিয়া বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। তিনি ১৬৭০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৮১) দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী প্রাপ্ত হন। ১৬৭৪ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ১০৮৫) তিনি সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি পদ ও খান জাহান বাহাদুর কোকলতাস জাফরজঙ্গ উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৬৯৭ খ্রীঃ অব্দের ২৪ শে নবেম্বর (হিঃ ১১০৯, প্রথম জমাদার ১৯ শে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

খান জাহান কোকলতাস খান জাফর জঙ্গ—সম্রাট জহন্দর শাহের ধাত্রী ভাই আলি মুরাদের উপাধি। বাহাদুর শাহ তাঁহাকে কোকলতাস উপাধি প্রদান করেন। জহন্দর শাহ সিংহাসন লাভ করিয়া তাঁহাকে নয় হাজার সৈন্যের সেনাপতিপদ ও খান জাহান জাফর জঙ্গ উপাধি প্রদান করেন। ১৭১৩ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১২৫) ফরুক শিয়ারের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

খান জাহান মকবুল মালিক—তিনি হিন্দু ছিলেন এবং তাহার নাম কত্তু ছিল। যৌবনকালে তিনি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। সুলতান মোহাম্মদ তাঁহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া মকবুল রাখেন এবং তাঁহাকে মুলতানের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত

করেন। পরে তিনি সুলতান ফিরোজ শাহ বারবকের প্রধান মন্ত্রী হন। ১৭৩৪ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১৪৫) তাঁহার মৃত্যু হয়।

খান জাহান লোদী — একজন আফগান। কাহারও কাহারও মতে তিনি সুলতান বহলুল লোদীর বংশধর আবার কাহারও কাহারও মতে দৌলত খাঁ লোদী শাহ খৈল তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহাকে পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিপতি করেন। যুবরাজ পরবেজের সঙ্গে তিনি কিছুকাল দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে চেষ্টা করাতে, শাহজাহানের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ১৬৩১ খ্রীঃ অব্দে ২৮শে জানুয়ারী (হিঃ ১০৪০, ১লা রজব) তিনি ও তাঁহার পুত্র নিহত হন।

খান জাহান হোশেন কুলী খাঁ—মুঘল সেনাপতি মৈনাম খাঁ ১৫৭৩ খ্রীঃ অব্দে মৃত্যু মুখে পতিত হইলে, দিল্লীর সম্রাট আকবর, তুর্কিবংশ সম্ভূত হোশেন কুলী খাঁকে খান জাহান উপাধি প্রদান পূর্ব্বক বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। নব নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা বাঙ্গালার সীমানায় পদার্পন করিলে, বিহারের শাসনকর্ত্তা সসৈন্যে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। বিদ্রোহী আফগান সর্দ্দার দায়ুদ খাঁ তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। গড়্‌ডি ও তাণ্ডার মধ্যবর্ত্তী আকমহল নামক স্থানে উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ হইল। খান জাহান দায়ুদ খাঁকে পরাস্ত করিয়া গড়্‌ডি অধিকার করিলেন। সার্দ্ধ এক সহস্র পাঠান সৈন্যকে শমন সদনে প্রেরণ পূর্ব্বক খান জাহান আবার দায়ুদ খাঁর সম্মুখীন হইলেন। ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। দায়ুদ খাঁ পরাজিত ও বন্দী হইলেন। খান জাহানের আদেশে তাঁহার ছিন্ন মস্তক দিল্লীতে প্রেরিত হইল। তবু পাঠান সৈন্য নিরুৎসাহিত না হইয়া প্রবল বেগে মুঘল সৈন্য আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে কালা-পাহাড় নিহত হইলেন। এই যুদ্ধের ফলে উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা মুঘল রাজ্য ভুক্ত হইল। খান জাহান ১৪৭৯ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

খান দৌরাণ (প্রথম)—তাঁহার প্রকৃত নাম শাহ বেগ খাঁ কাবুলি। তিনি সম্রাট আকবরের সময়ের একজন আমির। ১৬০৭ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ-১০১৬) সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে তিনি খাঁন দৌরাণ উপাধি এবং কাবুলের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন। ৯০ বৎসর বয়সে ১৬২০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০২৯) লাহোর নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

খান দৌরাণ (দ্বিতীয়)—নসরত জঙ্গ খাজা হিসারী নক্‌সবন্দীর পুত্র খাজা অবিরের উপাধি। তিনি সম্রাট

শাহ জাহানের সমকালবর্ত্তী একজন সাত হাজারী সেনাপতি। তিনি একজন কাশ্মিরী ব্রাহ্মণকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করেন। সেই ব্রাহ্মণ একদিন রাত্রিতে তাঁহাকে ভয়ানক আঘাত করে এবং আঘাতের ফলেই কিছুদিন পরে ১৬৪৫ অব্দের ১২ই জুলাই (হিঃ ১০৫৫ প্রথম জমাদা মাসের ২৭ শে) লাহোর নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। গোয়ালিয়র নগরে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

খান দৌরাণ (তৃতীয়)—তিনি দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীবের অধীনে ১৬৬০—১৬৬৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন। আওরঙ্গজীবের রাজত্বের কয়েক বৎসরপূর্ব্বে উড়িষ্যায় ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময় খান দৌরাণ উড়িষ্যায় উপস্থিত হইয়া, প্রথমেই বিদ্রোহী সামন্ত নরপতি ও জমিদার-দিগকে দমনে প্রয়াসী হইলেন। জমিদার-গণ অনেকে তাঁহার আগমনেই বশ্যতা জ্ঞাপক লিপি প্রেরণ করিলেন। খান দৌরাণ তাঁহাদিগকে নির্ভয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়া উপস্থিত হইলেন, কেহ হইলেন না। ময়ূরভঞ্জের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার আহ্বানে উপস্থিত হইয়া সভা-স্থলেই এমন অপমানিত হইলেন যে, তিনি অসি নিষ্কোষিত করিয়া খান দৌরাণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন; কিন্তু স্বয়ং নিহত হইলেন। ময়ূরভঞ্জের রাজা কৃষ্ণ-চন্দ্রের পরিণাম দর্শনে নরসিংহপুরের রাজা উদ্দণ্ড, ঘাটশীলার রাজা ছত্রেশ্বর ঢোল, নীলগিরির রাজা হরিচন্দন প্রভৃতি বশ্যতা স্বীকার করিলেন। খান দৌরাণ ময়ূরভঞ্জ সহজে অধিকার করিতে পারিলেন না। তিনি কৃষ্ণচন্দ্র, ভঞ্জের পুত্রকে ময়ূরভঞ্জের রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। তৎপরে তিনি কেওঞ্জর, হিজলী, কণিকা, কোয়েলা মধুপুর, কুলরা ও কলি প্রভৃতি স্থানের রাজা ও জমিদার-দিগকে স্ববশে আনয়ন করেন। তিনি দিল্লীর দরবারে পনর লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রেরণ করিয়া লিখিলেন যে, সমস্ত দেশ তিনি বশীভূত করিয়াছেন এবং দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাহার উত্তরে জানাইলেন যে, তাঁহার কোন প্রার্থনাই অপূর্ণ থাকিবে না এবং তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গৃহীত হইবে না। ইতি-মধ্যে রাজস্ব আদায়কারী দেওয়ান মোহম্মদ হাশিমের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই বিবাদে তিনি জয়ী হইলেন এবং মোহাম্মদ হাশিম দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদিষ্ট হইলেন। ১৬৬৭ খ্রীঃ অব্দে খান দৌরাণ চলিয়া গেলেন এবং তরবিয়ত খাঁ সুবাদার হইলেন

খাফি খাঁ — মুঘল সাম্রাজ্যের পূর্ণ বিকাশ কালে বহু সংখ্যক ঐতিহাসিক তাঁহার গৌরব মণ্ডিত শাসন বিবরণ কীর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে খাফি খাঁ অন্যতম। খাফি খাঁ তাঁহার প্রকৃত নাম নহে উপাধি মাত্র। তাঁহার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ কাশিম। তাঁহার পিতার নাম খাজে মীর। তিনি প্রথমে রাজকুমার মুরাদ বক্সের অধীনে কাজ করিতেন, তৎপরে সম্রাট আওরঙ্গজীবের অধীনে কাজ করিতেন। সেই সময়ে খাফি খাঁ পিতার অধীনে থাকিয়া শিক্ষা নবিশী করিতেন। সম্রাট খাফি খাঁর কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সৈন্য ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহার পিতাও ইতিহাস প্রিয় ছিলেন। পিতার গুণ পুত্রে সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তিয়া ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজীব তাঁহার রাজত্বকালীন ইতিহাস লিখিবার বিরোধী ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও খাফি খাঁ, মুস্তাইদ খাঁ ও বৃন্দাবন প্রভৃতি সুযোগ্য ব্যক্তিরা নিরস্ত না হইয়া আওরঙ্গজীবের রাজত্বকালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। খাফি খাঁর রচিত গ্রন্থের নাম —'মুন্তাখাব-উল-লুবাব' খাফি শব্দের অর্থ গুপ্ত। তিনি গোপনে বই লিখিয়া ছিলেন বলিয়া খাফি খাঁ উপাধি পাইয়া ছিলেন। ইহাতে সম্রাট মোহাম্মদশাহের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে।

খারঙ্গ ফা—তাঁহার অন্য নাম রামচন্দ্র ফা বা কুরুঙ্গ ফা। তাঁহার পিতা মহারাজ কিরীট (নামান্তর দান কুরুফা, হরিরায় বা আদিধর্ম্ম ফা) একটী যজ্ঞ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। স্বাধীন ত্রিপুরার অধিপতি খারঙ্গ ফা, চন্দ্র হইতে অধস্তন ১২৩ তম এবং ত্রিপুর হইতে অধস্তন ৭৮ তম নরপতি ছিলেন। তিনি পরলোকগত হইলে ছেংফনাই (নামান্তর সিংহফণী বা নৃসিংহ) রাজ্য লাভ করেন। ত্রিপুর দেখ।

খারবেল—কলিঙ্গ প্রদেশের একজন প্রাচীন কালের নরপতি। খ্রীঃ পূঃ ২০৭ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার পিতা মাতার নাম কোথাও উল্লেখ নাই। এমন কি কোন্ রাজার পরে তিনি রাজা হন তাহারও কোন উল্লেখ নাই। খ্রীঃ পূঃ ১৯২ অব্দে তিনি যুবরাজ এবং ১৮৩ অব্দে রাজা হন। মগধের মৌর্য্যবংশীয় নরপতি পুষ্পমিত্র খারবেলের সমসাময়িক ছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ১৭১ অব্দে তিনি পুষ্পমিত্রকে পরাজিত করিয়া পাটলীপুত্র অধিকার করেন এবং পরে কনৌজ পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তরভারতবর্ষ অধিকার করেন। তিনি সমস্ত দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া খ্রীঃ পূঃ ১৭৫ অব্দে প্রথম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি তৎকালে ভারতবর্ষে কেহ ছিল না।

তিনি জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। জৈন উপাসনা পদ্ধতির কিছু কিছু সংস্কার সাধনও তিনি করেন। কলিঙ্গ জাতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অর্থাৎ সুমাত্রা, যাবা, বালি, বোর্ণিও, ফিলিপাইন, মলাক্কাস, নিউগিনি প্রভৃতি দ্বীপে এবং বর্ম্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। খারবেলের রাজ্য এই সমস্ত দেশেও বিস্তৃত ছিল।

খাহাম—নামান্তর হরিরাজ। স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ তরহামের পুত্র খাহাম চন্দ্র হইতে অধস্তন ৮৩তম এবং ত্রিপুর হইতে অধস্তন ৩৮শ নরপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র কতর ফা (অন্য নাম কাশীরাজ) রাজ্য লাভ করেন। ত্রিপুর দেখ।

খিচুংফা—নামান্তর মোহন। স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি আচোঙ্গ ফার পুত্র। খিচুংফা চন্দ্র হইতে অধস্তন ১৪২তম এবং ত্রিপুর হইতে অধস্তন ৯৭তম নরপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে ডাঙ্গর ফা (হরিহর) পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। খিচুংফার মহিষী খিচুংমা অতিশয় শিল্পানুরাগী ও বিদুষী রাণী ছিলেন। তাঁহার প্রযত্নে রাজপরিবারে ও রাজ্য মধ্যে নানাবিধ শিল্প কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। রাজপরিবারের শিক্ষাভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়া, বিশেষ ফল লাভও করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ত্রিপুর দেখ

খিজির খাঁ—(১) তিনি দিল্লীর খিলিজী-বংশীয় সম্রাট আলাউদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি নানা সদগুণে ভূষিত হইয়াও নিতান্ত হতভাগ্য ছিলেন। তিনি রাজপুত রাজা করণ রায়ের যুদ্ধে বন্দিনী কন্যা দেবলা দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের প্রণয় কাহিনী বড়ই বিষাদপূর্ণ। আলাউদ্দিনের ধূর্ত্ত মন্ত্রী মালিক কাফুরের ষড়যন্ত্রে খিজির খাঁ গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী হইয়া অন্ধ হন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা কুতবউদ্দিন খাঁ রাজা হইয়া খিজির খাঁকে নিধন করেন। স্বামীকে রক্ষা করিতে যাইয়া দেবলা দেবীও নিহত হন।

খিজির খাঁ—(২) তিনি দিল্লীর সৈয়দ বংশীয় প্রথম সম্রাট। তাঁহার পিতা মালিক সুলেমান লাহোর, দিবালপুর ও মুলতানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মামুদ তোগলক দিল্লীর সম্রাট ছিলেন (১৩৯২—১৪১৪ খ্রীঃ)। তাঁহারই রাজত্বকালে ১৩৯৮ খ্রীঃ অব্দে তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। দিল্লীর সম্রাট মামুদ-তোগলক গুজরাটে পলায়ন করেন। তৈমুর নরহত্যা ও লুণ্ঠনাদি করিয়া চলিয়া গেলে, দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রাদুর্ভূত হইল। দেশের এই শোচনীয় অবস্থার সময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন।

দৌলত খাঁ লোদী নামক এক ব্যক্তি দিল্লীর শাসনভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া ১৪১৪ খ্রীঃ অব্দে মুলতানের শাসনকর্ত্তা খিজির খাঁ সৈয়দ দিল্লী অধিকার করেন। তিনি স্বয়ং স্বাধীন সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন নাই। কারণ তৈমুরলঙ্গ খিজির খাঁকে মুলতান ও সিন্ধু প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে তৈমুরের কর্ম্মচারী বলিয়া মনে করিতেন। তিনি ১৪১৪—১৪২১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া দুরন্ত রোগে কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র মবারক শাহ সম্রাট হইয়াছিলেন।

খিজির খাঁ—(৩) বাঙ্গালার একজন পাঠান সুবেদার এবং বার ভূঞার অন্যতম। শের শাহ চৌসার যুদ্ধে বাঙ্গালা ও বিহারের অধিকার লাভ করিয়া, খিজির খাঁকে বাঙ্গালার শাসন ভার অর্পন করেন এবং স্বয়ং হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধে গমন করেন কিন্তু অল্পকাল পরেই শের শাহ জানিতে পারেন যে, খিজির খাঁ স্বাধীন ভাবে চলিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া শের শাহ অপ্রত্যাশিত ভাবে এবং অতর্কিতে রাজমহলের নিকটবর্ত্তী তেলিয়া ঘরিতে উপস্থিত হন। খিজির খাঁ তাঁহাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেও, শের শাহ কণ্টকোদ্ধারের জন্য খিজির খাঁকে কারারুদ্ধ করেন (১৫৪১ খ্রীঃ)। শের শাহ দেখ।

খিজির খাস্তদবির, শেখ—তিনি শ্রীহট্টের বিখ্যাত দরবেশ হজরত শাহ জালাল এমনির অনুগত অন্যতম অনুসঙ্গী শিষ্য ছিলেন। শ্রীহট্ট সহরে 'মহল খাস্ত দবির' নামক স্থানে তিনি বাস করিতেন এবং তথায় তাঁহার সমাধি আছে।

খিজির খাঁ খোয়াজ—তিনি কাশগড়ের অধিপতির বংশধর। দিল্লীর মুঘল সম্রাট হুমায়ুন বাদশার ভগিনী গোলবদন বেগমকে তিনি বিবাহ করেন। সেজন্য তিনি সম্রাট কর্তৃক প্রথমে লাহোরের পরে বিহারের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৫৫৯ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৬৬) তিনি বিহারেই পরলোক গমন করেন

খিল্পুর নাথ—তিনি নাথ পন্থী সম্প্রদায়ের একজন গুরু। তিনি সাম্যবাদ প্রচার করিতেন এবং 'শব্দ বিচার' উপদেশ দিতেন।

খীচি—চিতোরের মহারাণা খোমানের আহ্বানে যে সকল স্বদেশ প্রেমিক বীর মুসলমান আক্রমন প্রতিরোধ করিবার জন্য খোমানের পতাকাতলে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, গগরৌণের অধিপতি খীচি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। খোমান দেখ।

খুদাবন্দ খাঁ দক্ষিণী—তিনি দাক্ষিণাত্যের নিজাম শাহী বংশের মূর্ত্তজা

নিজাম শাহের রাজত্বকালের (১৫৬৫—১৫৮৭ খ্রীঃ) একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। বেরার প্রদেশে তাঁহার জায়গীর ছিল। পরে তিনি সম্রাট আকবরের অধীনে এক হাজারী সেনাপতি পদ গ্রহণ করিয়া, গুজরাটের অন্তর্গত পাটনে জায়গীর প্রাপ্ত হন। তিনি সম্রাটের প্রিয় মন্ত্রী আবুল ফজলের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৫৯০ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

খুদাবক্স (খান বাহাদুর)— বিহার প্রদেশবাসী প্রসিদ্ধ শিক্ষানুরাগী দানবীর। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মোহাম্মদ বক্স পাটনায় আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানানুরাগ অসীম ছিল এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব থাকিলেও তিনি আরবী ও ফারসী হস্ত লিখিত পুঁথি সংগ্রহে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যেও অনেক জ্ঞানী ও গুণী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ঐতিহাসিক কাজী হৈবৎ-উল্লা সমধিক বিখ্যাত ছিলেন।

মোহাম্মদ বক্স মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্রকে নির্দ্দেশ করিয়া যান যে পুঁথি সংগ্রহের কাজ যেন স্থগিত না হয় এবং সম্ভব হইলে সংগৃহীত পুঁথি রক্ষার জন্য ভবন নির্ম্মাণ করিয়া তাহা সাধারণকে দান করিয়া যাইতে হইবে। পিতৃভক্ত খুদাবক্স এই আদেশ যে কি ভাবে পালন করিয়াছিলেন, তাহা, পাটনার প্রসিদ্ধ "খুদাবক্স লাইব্রেরী" যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন।

প্রথম জীবনে পাটনায় ও কিছুকাল কলিকাতায় শিক্ষালাভ করিয়া অর্থাভাবে তিনি চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছুকাল এক জজের পেস্‌কার ও তৎপরে বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি, আইন অধ্যয়ন সমাপনান্তে ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে পাটনায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। স্বভাব সুলভ প্রতিভার বলে তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই পাটনার একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সেই সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কাজের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনিই পাটনা মিউনিসিপ্যালিটি ও জিলা বোর্ডের প্রথম সহকারী অধ্যক্ষ (Vice Chairman) নিযুক্ত হন। শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং সেসম্বন্ধে তাঁহার পরিশ্রমের ফল স্বরূপ তিনি সরকারী প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রধান বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করেন। চারি বৎসরকাল অতি যোগ্যতার সহিত ঐ পদ অলঙ্কৃত করিয়া ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি পুনরায় পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন

করেন। পূর্ব্বেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার মতিভ্রম হইয়াছিল। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে (১৩১৫ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ) তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

পাটনার প্রসিদ্ধ খুদাবক্স লাই-ব্রেরীর কথা উল্লেখ না করিলে এই মনীষির জীবন চরিত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ঐ পুস্তাকাগারের জন্য পুস্তক পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহ করা তাঁহার জীবনের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ ব্রত ছিল। তাঁহার নিজের অমূল্য সংগ্রহ ভিন্ন বহু শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির প্রদত্ত বহু পুঁথি ইত্যাদি ঐ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আছে। এই সকলের জন্য তাঁহার বাস্তবিক প্রাণের আকর্ষণ ছিল। উহাদের সংগ্রহ, সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয় তাঁহার দিবসের চিন্তা, নিশীথের স্বপ্ন ছিল। এই খুদাবক্স লাইব্রেরীতে পুঁথি প্রভৃতির যে সংগ্রহ আছে তাহা ভারতে বাস্তবিকই অতুলনীয়। এমন অনেক বস্তু উহাতে সংরক্ষিত আছে যাহাদের মূল্য অর্থদ্বারা নিরূপণ করা যায় না। পাঠান ও মুঘল রাজত্বের শত শত একান্ত দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদির সংগ্রহে এই পুস্তকাগারটি জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থালয়দিগের অন্যতম হইয়াছে। খাঁ বাহাদুর খুদাবক্স এই অমূল্য সম্পদ দেশবাসীকে দান করিয়া সমগ্র জগতের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

খুনখারা—তিনি আসামের কাছারী নাগাদিগের রাজা ছিলেন। ১৫৩১ খ্রীঃ অব্দে আসামের আহমবংশীয় নরপতি সুহুংমুংফা (স্বর্গনারায়ণ) মরঙ্গি নামক স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে খুনখারা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার ভ্রাতা দেৎচাকে আহমদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং দেৎচা যুদ্ধে নিহত হন। আহম-পতি ইহাতে নিরস্ত না হইয়া কাছারি-দের রাজধানী ডিমাপুর পর্য্যন্ত আক্রমণ করেন। খুনখারা তাঁহার পুত্রসহ পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। তাঁহার আত্মীয় দেৎসাং রাজপদ লাভ করেন।

খুনতাই—তিনি আসামের তিপাং জাতীয় রাজা ছিলেন। তাঁহারই কন্যাকে আসামের আহমবংশীয় নরপতি সুডাংফা বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। সুডাংফা দেখ।

খুবউল্লা শেখ—তাঁহার অন্য নাম শেখ মোহাম্মদ এহিয়া। তিনি এলাহা-বাদের লোক এবং তথাকার শেখ আফজলের জামাতা। তিনি স্বীয় শ্বশুরের মৃত্যুর পরে তাঁহার গুরুগিরি পদ লাভ করেন। ১৭৩১ খ্রীঃ অব্দের ১লা নবেম্বর সোমবার (হিঃ ১১৪৪) তিনি পরলোক গমন করেন এবং তৎপদে তাঁহার পুত্র মোহাম্মদ নাসির অভিষিক্ত হন। খুবউল্লা অনেক গুলি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

খুয়াস খাঁ (১)—তিনি প্রসিদ্ধ শের খাঁর সেনাপতি ছিলেন। শের খাঁ তাঁহার পুত্র জালাল খাঁ, বিশ্বস্ত সেনাপতি খুয়াস খাঁ ও অন্যান্য আফগান সর্দ্দারগণকে গৌড় রাজ্য জয় করিতে প্রেরণ করেন। বাঙ্গালার নবাব দ্বিতীয় মামুদ শাহ পরাজিত হইয়া গৌড়দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫৩৭ খ্রীঃ অব্দে খুয়াস খাঁ গৌড় নগরের পরিখায় জল মগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

খুয়াস খাঁ (২)—তিনি প্রসিদ্ধ শের খাঁর ভ্রাতা ছিলেন। প্রথম খুয়াস খাঁ জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে, শের খাঁ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোসাহেব খাঁকে খুয়াস খাঁ উপাধি দিয়া স্বীয় সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারই যত্নে গৌড়নগর অধিকৃত হইয়াছিল। মামুদ শাহ দক্ষিণ বঙ্গে পলায়ন করিলেন কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ বন্দী হইলেন এবং পরে তাঁহারা নিহত হইয়াছিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে মর্ম্ম পীড়িত হইয়া মামুদ শাহ কিছুকাল পরে পরলোক গমন করেন।

খুরম — তিনি দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র। সম্রাট তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য বিজয় কালে শাহজাহান উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। শাহজাহান অর্থ পৃথিবী পতি। শাহজাহান দেখ।

খুরম আলি, মীর—তিনি একজন বঙ্গীয় মুসলমান কবি। 'সাপের মন্তর' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

খুলেদি খাঁ — বাঙ্গালার সুবেদার মজফর খাঁ তির্ব্বতীর সময়ে দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহ নূতন রাজস্ব প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাতে জলেশ্বরের সামন্ত খুলেদি খাঁ ও ঘোরাঘাটের, বাবা খাঁ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সম্রাট বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া স্বীয় আদেশ প্রত্যাহার করেন।

খুসবক্ত রায়—১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত ইংরেজদিগের সন্ধি হইলে পর, তিনি ইংরেজ তরফে অনেককাল অমৃত সহরে এজেণ্ট স্বরূপ ছিলেন।

খুসরু (প্রথম)—তিনি গজনীর সুলতান মামুদের বংশধর বহরামের পুত্র। বহরাম ঘোর রাজ্যের অধিপতি আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, ভারতবর্ষের অভিমুখে পলায়ন করেন। কিন্তু পথিমধ্যেই তিনি গতায়ু হন। তাঁহার পুত্র খুসরু তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে পঁহুছিয়া লাহোর নগরে ১১৫৭ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। গজনী সাম্রাজ্যের ভারতবর্ষের অন্তর্গত লাহোর প্রদেশ মাত্র অধীনে ছিল। খুসরু ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তিনি ন্যায়ানুসারে সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া গতায়ু

হইলে, তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় খুসরু ১১৬৪ খ্রীঃ অব্দে রাজা হন।

খুসরু (দ্বিতীয়)—তিনি প্রথম খুসরুর পুত্র এবং খুসরু মালিক নামে খ্যাত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি ১১৬৪ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সাতাইশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে গিয়াসউদ্দিন ঘোরীর ভ্রাতা মোহাম্মদ ঘোরী গজনীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ জয় করিতে অভিলাষী হইয়া ১১৭৯ খ্রীঃ অব্দে পেশোয়ার অধিকার করেন। খুসরু উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় পুত্রকে মোহাম্মদ ঘোরীর নিকট প্রতিভূ স্বরূপ রাখিলেন। ইহার পরে ১১৮৪ খ্রীঃ অব্দে মোহাম্মদ ঘোরী দ্বিতীয়বার পাঞ্জাবে আগমন করিয়া সমস্ত দেশ লুণ্ঠণ করেন। শিয়ালকোটে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, হোশেন খরমিলাক নামক স্বীয় সেনাপতিকে বিজিত রাজ্যের শাসনকর্ত্তার পদে স্থাপন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। খুসরু তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণপূর্ব্বক গোক্কুর জাতির সহিত মিলিত হইয়া, বিদ্রোহী হইলেন। মোহাম্মদঘোরী এই সংবাদ শুনিয়া খুসরুর পুত্র সহ ভারতবর্ষে পুনরাগত হইলেন। তিনি খুসরুর পুত্রকে মুক্তি প্রার্থনা করিয়া পিতার সন্নিধানে যাইতে বলিলেন। খুসরু স্বীয় পুত্রকে প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য সামান্য কতিপয় অনুচর মাত্র লইয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। মোহাম্মদঘোরী একদল সৈন্য সহ গোপনে খুসরুর পুত্রের পশ্চাদগামী হইতে ছিলেন। খুসরু অগ্রসর হইবা মাত্র বন্দী হইলেন। মোহাম্মদঘোরী তাঁহাকে সপরিবারে বন্দী করিয়া ১১৯১ খ্রীঃ অব্দে গজনীতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই সুলতান মামুদের বংশ বিলুপ্ত হইল।

খুসরু আমির—হিন্দুস্থানের একজন বিখ্যাত কবি। তিনি নিরানব্বইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার পিতা আমির মামুদ সফিউদ্দিন তাতারের লাচিন বংশীয় ছিলেন। তিনি বল্ক হইতে হিন্দুস্থানে আগমন করিয়া পাতিয়ালা নগরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। এই স্থানেই তাঁহার ভুবন বিখ্যাত পুত্র খুসরু ১২৫৩ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৬৫১) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য ছিলেন। ১৩২৫ খ্রীঃ অব্দের (হিঃ ৭২৫) সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার গুরুর মৃত্যুর ছয় মাস পরে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার গুরুর সমাধির পার্শ্বেই তাঁহাকেও সমাহিত করা হয়। খুসরুর সমকালবর্ত্তী রাজারা প্রায় সকলেই অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন। কেবল তাঁহার শেষ জীবনে ন্যায়বান

গিয়াস উদ্দিন তোগলক সিংহাসনে আরোহণ করেন। খুসরুর মূল্যবান গ্রন্থ অতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল।

খুসরু মালিক—খিলজী বংশীয় শেষ নরপতি কুতব উদ্দিন অতিশয় অকর্ম্মণ্য সম্রাট ছিলেন। হাসন নামক একজন হীন জাতীয় ক্রীতদাস তাঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিল। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে পরোয়ারী (মুচী) জাতীয় নীচ শ্রেণীর হিন্দু ছিল। মুসলমান নামে মাত্র হইয়া কুতব উদ্দিনের সমুদয় দুষ্কার্য্যের সহায় হইয়াছিল। কুতব উদ্দিন তাহাকে মালিক খুসরু উপাধি দিয়া প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। খুসরু উন্নতি লাভ করিয়া, বিপুল সৈন্য শ্রেণীর অধিনায়ক হইলেন। তাহাদের সাহায্যে তিনি মালব দেশ লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধন লাভ করেন। সর্ব্বোচ্চ প্রভুত্বের সঙ্গে অপরিমিত ধনরাশির সংযোগ হওয়ায়, তাঁহার রাজ্যের দিকে দৃষ্টি পতিত হইল। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে উদ্যোগী হইয়া, প্রথমেই তিনি কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোকের বিরুদ্ধে কুতব উদ্দিনের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল এবং তাঁহারা রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন। অপর অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহাদের দুর্দ্দশা দর্শনে রাজদরবার পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরদেশে প্রস্থান করিলেন। খুসরু তাঁহার আত্মীয় স্বজন দ্বারা রাজ দরবার পূর্ণ করিলেন। যাঁহারা খুসরুর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারাও সম্রাট কুতব উদ্দিনকে খুসরুর ভয়ে কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না। কাজী জিয়াউদ্দিন বলিতে গিয়াও নিহত হইলেন। ইহার কয়েক দিন পরেই সম্রাট স্বীয় কক্ষেই নিহত হইলেন। খুসরু সম্রাটের বংশধর সকলকেই হত্যা করিলেন। অন্তঃপুর মহিলাদের মধ্যেও কেহ কেহ নিহত হইলেন এবং অনেকে তাঁহার অন্তঃপুরে স্থান লাভ করিলেন। হিন্দুদের অনুকূলে অনেক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। মসজিদের স্থানে দেব মন্দির স্থাপিত হইতে লাগিল। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁহাকে বিতাড়িত করিবার জন্য, লাহোরের শাসনকর্ত্তা গাজীবেগ তোগলককে আহ্বান করিলেন। তিনি যুদ্ধে মালিক খুসরুকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন। খুসরুর রাজত্বকাল মাত্র পাঁচ মাস ছিল।

খুসি বিশ্বাস—নদীয়া জেলার দেবগ্রামের নিকটবর্ত্তী ভাগা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি একটী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। উহার নাম 'খুশি বিশ্বাসী' সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের মতে খুশি বিশ্বাস চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার। তাঁহারা ভোজনাদির সময়ে স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণভেদ বিচার

করে না। খুশি বিশ্বাস জাতিতে মুসলমান ছিলেন।

খেলজী বা খেলকর্ণজী—ছত্রপতি শিবাজীর বৃদ্ধ প্রপিতামহ মেলজী বা মেলকর্ণজীর জ্যেষ্ঠ সহোদর খেলজী বা খেলকর্ণজী ছিলেন। তিনি আহাম্মদ নগরের নবাবের অধীনে সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিতেন। কোনও এক যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

খেলাতচন্দ্র ঘোষ — কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটার বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী। তাঁহার পিতামহ রামলোচন ঘোষ লর্ড হেষ্টিংসের আমলে গুরুতর দায়ীত্বপূর্ণ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। খেলাতচন্দ্রের পিতার নাম নারায়ণ ঘোষ। খেলাত চন্দ্র দাতা, স্বধর্ম্মনিষ্ট জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল কলিকাতার অন্যতম অবৈতনিক বিচারক (Honorary Magistrate) ও জাষ্টিস্ অব্ দি পিস (Justice of tho peace) ছিলেন। সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। অপুত্রক খেলাতচন্দ্র নিজ জ্ঞাতি পুত্র রমানাথ ঘোষকে দত্তক গ্রহণ করেন। কলিকাতা ধর্ম্মতলা অঞ্চলে খেলাত চন্দ্রের নামে এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে (১৯৩০ খ্রীঃ) তিনি পরলোক গমন করেন।

খেলারাম—একজন কবি। তিনি ১৫২৭ খ্রীঃ অব্দে 'ধর্ম্মমঙ্গল' নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

খেলারাম মুখোপাধ্যায় —গোবরডাঙ্গার (২৪ পরগণা) জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি স্বীয় পিতার ন্যায়ই কৃতী পুরুষ ছিলেন। তাঁহারই সময়ে গোবরডাঙ্গার প্রাসাদ তুল্য বাটী নির্ম্মিত হয়। তিনি জমিদারীর আয় খুব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তাঁহারাই তদঞ্চলের সর্ব্বেসর্ব্বা ও সমাজপতি ছিলেন। তিনি বাল্যকালে অতিশয় দুরন্ত ছিলেন। একদিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া তিনি মাতুলালয়ে চলিয়া যান, তথায় মাতুলানী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া যশোহরে যাইয়া একজন সেরেস্তাদারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেরেস্তাদার গৃহে অতি প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহারই সাহায্যে লেখাপড়া শিক্ষা করেন এবং পরে কালেক্টরীতে একটী চাকরী প্রাপ্ত হন। তৎপরে সেরেস্তাদারের মৃত্যু হইলে, তিনি তাঁহার পদেই নিযুক্ত হইয়া সাহেবের অতিশয় প্রিয়পাত্র হন। সাহেব কৃষ্ণনগরে বদ্‌লি হইলে, তিনি তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণনগরে গমন করেন এবং এই সময়েই সাহেবের সাহায্যে গোবরডাঙ্গার জমিদারী ক্রয় করেন। ইতিপূর্ব্বে মাতামহ খাঁটুরার জমিদার তাঁহার জন্মের পরে খাঁটুরা জমিদারীর দুই আনা অংশ

দৌহিত্রকে দিয়াছিলেন। ক্রমে খেলারাম অপর অংশেরও মালিক হন। এইরূপে প্রচুর সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি কালীপ্রসন্ন ও বৈদ্যনাথ নামে দুই পুত্র রাখিয়া পরলোকগত হন। শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় দেখ।

খোমান — তিনি চিতোরের রাণা খলভোজের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে (৮১২—৮৩৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত) মহম্মদ নামক একজন মুসলমান বীর চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু খোমানের নিকট মহম্মদ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। খুব সম্ভব খলিফা আলমামুন মোহাম্মদকে খোমানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কারণ খলিফা আলমামুন ৮১৩—৮৩৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। রাণা খোমানকে সাহায্য করিবার জন্য যে সমস্ত উত্তর ভারতের রাজন্যবর্গ সসৈন্যে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নামের একটী তালিকা এই স্থানে প্রদত্ত হইল। গজনী হইতে গিহ্লোট, আশীর হইতে তক্ষক, নদালয় হইতে চৌহান, বাহিরগড় হইতে চালুক, সেটবন্দর হইতে জিরকের, মুন্দর হইতে খেরবি, মঙ্গরোল হইতে মাক্‌বাহন, জিতগড় হইতে জোরিয়া, তারাগড় হইতে রেবর, নরাবার হইতে কুশাবহ, শনবর হইতে কালুম, যোয়েনগড় হইতে দশালো, আজমীর হইতে গড়, লোহাদুর্গর হইতে চন্দনাও, কাসুন্দি হইতে দর, দিল্লী হইতে তুয়ার, পত্তন হইতে রাজধর সৌর, ঝালোর হইতে শনিগুরু, শিরোহী হইতে দেবর, গাগরৌণ হইতে খীচি, যুনাগড় হইতে যদু, পত্রি হইতে ঝালা, কণৌজ হইতে রাঠোর, চুটিয়ালা হইতে বল্ল, পরাণগড় হইতে গোহিল, যশলগড় হইতে ভট্টি, লাহোর হইতে বুসা, রোণিজা হইতে শঙ্কল, খেরলিগড় হইতে শিহুত, মণ্ডলগড় হইতে নকুল, রাজোর হইতে বীরগুজর, কর্ণগড় হইতে চাঁদৈল, শিকর হইতে শিকরবল, অমরগড় হইতে জৈত্ব, পল্লী হইতে বীরগোট, খনতুবগড় হইতে জারিজা, জীরগা হইতে ক্ষীরবর এবং কাশ্মীর হইতে পুরীহর আসিয়া মহারাণা খোমানের সঙ্গে বিদেশী শত্রুকে দমন করিতে উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। স্বাধীনতার লীলা নিকেতন চিতোর পুরীকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা যে প্রচণ্ড বীরত্ব, অনুপম রণকৌশল, বিস্ময়কর আত্মোৎসর্গের প্রদীপ্ত উদাহরণ স্থাপন করিয়াছিলেন, ভারতীয় ইতিহাসে তাহা জলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। মহারাজ খোমান চতুর্ব্বিংশতিবার শত্রুর বিরুদ্ধে সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার

গুণগ্রামে স্বদেশী রাজপুতবর্গ এমনই মোহিত হইয়াছিলেন যে, অদ্যাবধি তাঁহারা প্রাতঃস্মরণ্য অন্যান্য রাজপুত নৃপতিগণের পবিত্র নামমালার সহিত খোমানের জপ করিয়া থাকেন। আজও উদয়পুরে কেহ ক্ষুৎ ত্যাগ করিলে অথবা কাহারও পদস্খলন হইলে অমনি পার্শ্বস্থ ব্যক্তি এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন—'খোমান তোমায় রক্ষা করুন'। খোমান প্রথমে ব্রাহ্মণগণের পরামর্শে আপনার কনিষ্ঠ পুত্র জগরাজের হস্তে রাজ্যভার সমর্পন করেন। কিন্তু পরে কোন কারণে বিরক্ত হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং পরামর্শ দাতা ব্রাহ্মণদিগকে হত্যা করিয়া সমস্ত ব্রাহ্মণকুলকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। খোমান ব্রাহ্মণদের উপর কেন এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহার কারণ অজ্ঞাত। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার অন্যতম পুত্র তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। মিবারের সর্দ্দারগণ এই পিতৃঘাতী নরাধমকে সিংহাসন হইতে বিদূরিত করিয়া দিয়াছিলেন। খোমানের অন্যতম পুত্র ভর্ত্তৃভাট সিংহাসন অধিকার করেন (৮৩৮ খ্রীঃ অব্দ)।

খোয়াজ ওস্‌মান খাঁ— আফগান জাতীয় খোয়াজ ওস্‌মান খাঁ প্রথমে রাজ্য পরিদর্শক ছিলেন। বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ হুশেন শাহ পূর্ব্ব দেশ জয় করিয়া এই খোয়াজ ওস্‌মান খাঁকে তাহার শাসনকর্ত্তৃত্ব পদ প্রদান করেন। তিনি শ্রীহট্ট জিলার ইটা পরগণায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি ইটার রাজা সুবিদ নারায়ণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি বল সঞ্চয় করিয়া একদল আফগান অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে তরফ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী যদুরাম অতি বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি শ্রীহট্টের (গৌড়ের) শাসনকর্ত্তা ইউসফ খাঁকে পরাস্ত করিয়া শ্রীহট্ট অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বহুদিন ইহা তাঁহার অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। ইউসফ খাঁর ভ্রাতা লোদী খাঁ তদানীন্তন দিল্লীর সম্রাট শের শাহের (১৫৪০—১৫৪৫ খ্রীঃ অব্দ) সাহায্যে খোয়াজ ওস্‌মানকে পরাস্ত করিয়া শ্রীহট্ট পুনঃ অধিকার করেন এবং সম্রাট কর্ত্তৃক শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। খোয়াজ ওস্‌মান খাঁ ১৫৪৮ খ্রীঃ অব্দে নিহত হন।

খোসালচন্দ্র দাস—তিনি 'চৈতন্য চরিত' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। প্রসিদ্ধ মধুকানের 'ঢপ' সঙ্গীতের অনুকরণে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সেরপুর তাঁহার জন্মস্থান, তিনি লাল-চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এই খোসাল দাসের নাম প্রাচীন অনেক গ্রন্থে লিপিকার রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

খোসালচাঁদ, জগৎশেঠ— তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা রাজপুতানা হইতে বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হন। অনেকের ধারণা 'জগৎশেঠ' কোন একজন ব্যক্তির নাম; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে—ইহা রাজদত্ত একটী উপাধি মাত্র। জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও মহারাজ স্বরূপ চাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র খোসালচাঁদ ও উদয়চাঁদ তাঁহাদের উত্তরাধিকারী হন। ১৭৬৬ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে খোসালচাঁদ 'জগৎশেঠ' ও উদয়চাঁদ 'মহারাজা' উপাধি লাভ করেন। তাঁহারা মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদের ন্যায় এক সঙ্গে কারবার চালাইতেন; কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহাদের ব্যবসায় মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হয়। ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তিন প্রদেশের দেওয়ানী গ্রহণ করেন। অতঃপর লর্ড ক্লাইব খোসালচাঁদকে কোম্পানীর 'সফর' পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতেই শেঠদিগের দুর্দ্দশা আরম্ভ হয়। খোসালচাঁদ অত্যন্ত অপরিমিতব্যয়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ অর্থ সদ্ব্যয় হইত। তিনি তাঁহার পত্নীর ধর্ম্মার্থে ১০৮টী পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। জগৎশেঠদিগের ভবনের সন্নিকট একটী সুন্দর উদ্যান আছে, ইহা খোসালচাঁদের নির্ম্মিত বলিয়া খোসালবাগ নামে পরিচিত। তিনি পরেশনাথ পর্ব্বতে অনেকগুলি জৈন মন্দির নির্ম্মাণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অপুত্রক হওয়ায় তদীয় মধ্যম ভ্রাতা গুমরচাঁদের পুত্র হরকচাঁদকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, খোসালচাঁদের সমস্ত অর্থ ভূগর্ভে প্রোথিত ছিল এবং সহসা তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, তিনি উহা প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণ দুরবস্থাপন্ন হন।

গ

গগন—নামান্তর কাকুথ। স্বাধীন ত্রিপুরার অধিপতি মারিচীর (মিছাল, মালছি বা, মরুসোম) পুত্র গগন, চন্দ্র হইতে অধস্তন ১১৬তম এবং নরপতি ত্রিপুর হইতে অধস্তন ৭১ তম নরপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র কীর্ত্তি (নওরাঙ্গ বা নবরাজ) রাজা হন। ত্রিপুর দেখ।

গগন খাঁ— তিনি স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজ ধন্যমাণিক্য ও ধর্ম্মমাণিক্য উভয়ের রাজত্বকালে সেনাপতি ছিলেন। পাঠান সেনাপতি হৈতন খাঁ ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া ছয় ঘরিয়া দুর্গ জয় করেন। এই সময় গগন খাঁ প্রবল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াও দুর্গ রক্ষায় কৃতকার্য্য হন নাই।

গগনচন্দ্র বিশ্বাস — তিনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত মাধবপুর গ্রামে ১২৫৬ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীমন্ত বিশ্বাস। গগনচন্দ্র পিতার একমাত্র পুত্র। গগনচন্দ্র বাঙ্গালার অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশজাত। বাঙ্গালার পুরাতন কালের নবাব সরকার কর্ত্তৃক উপাধিপ্রাপ্ত বংশের মধ্যে তাঁহার বংশ অন্যতম। এই 'বিশ্বাস' উপাধিও নবাব সরকার-প্রদত্ত। তিনি বাল্যকাল হইতে মেধাবী ছিলেন। শৈশবে গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও বৃত্তি লাভ করেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে তৎকালীন এফ-এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া ঐ কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁহার সহপাঠীদিগের মধ্যে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি স্যার রাজেন্দ্রনাথের সহপাঠী ও যৌবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পরে যদিও তিনি স্যার রাজেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত মার্টিন কোম্পানীর আফিসে প্রধান ইঞ্জিনিয়ার রূপে কাজ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের আবাল্য সখ্য কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। গগনচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম কারণ তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক স্যাটক্লিফ সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর সরকারী নিয়ম অনুযায়ী দুই বৎসর শিক্ষানবীশ থাকিয়া পরে

রংপুর কাউনিয়া রেলওয়েতে এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রূপে তথায় প্রেরিত হন। তারপর তিনি একসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ডের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও রাজসাহী বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াররূপে কাজ করেন। গগনচন্দ্র স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন, এজন্য অনেক সময় তাঁহার সরকারের সহিত মনোমালিন্য ঘটিত। কিছুদিন পরে তিনি সরকারী কাজ ছাড়িয়া দেন। গগনচন্দ্র বাঙ্গলার তথা সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্মদাতাদিগের অন্যতম ছিলেন। স্যার সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জি, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অম্বিকা চরণ মজুমদার, যাত্রামোহন সেন প্রভৃতির সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি একাদিক্রমে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির সহিত ৩০বৎসর সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার স্বজাতিপ্রীতি ও স্বদেশ-বাৎসল্যই তাঁহার সরকারী চাকুরী পরিত্যাগের অন্যতম কারণ। ব্যবসায় পরাঙ্মুখ বাঙ্গালী জাতিকে পুনরায় ব্যবসায় ক্ষেত্রে টানিয়া আনিবার জন্য যে সমস্ত বাঙ্গালী পথ-প্রদর্শকরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। চায়ের ব্যবসায় যে ভিন্ন দেশবাসী ব্যতী বাঙ্গালী দ্বারাও সম্ভব তিনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনিই বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম চা-বাগান প্রতিষ্ঠা করেন তিনিই বর্ত্তমান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। ডাক্তারী ব্যবসায়ের মত ইঞ্জিনিয়ারিংও যে একটা ব্যবসায় হিসাবে চলিতে পারে তাহার পথপ্রদর্শকদিগের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কারণ তৎকালে বড় চাকুরী পাওয়ার উদ্দেশ্যেই লোকেরা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িত।

গগনচন্দ্র নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ছিলেন। তিনি তিনজন কৃতীপুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত ললিত-মোহন বিশ্বাস কলিকাতা কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার, দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্পোরেশনের অন্যতম কাউন্সিলার এবং তৃতীয় পুত্র শ্রীযুত ভগবান বিশ্বাস নিজের জমিদারী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার একটী বিধবা কন্যাও বর্ত্তমান আছে।

গগনচন্দ্র স্বীয় সমাজের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে মাহিষ্য শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৪২ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়স ৮৬ বৎসর হইয়াছিল।

গগনচন্দ্র হোম--বাঙ্গালী সংবাদিক ও রাজকর্ম্মচারী। তিনি ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উক্ত ধর্ম্ম

গ্রহণ করেন। তৎফলে তাঁহাকে নিদারুণ অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার ভগবদ্ভক্তি ও নিষ্ঠা অবিচলিত ছিল। প্রসিদ্ধ জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক "সঞ্জীবনী"র প্রতিষ্ঠাতাগণের তিনি অন্যতম ছিলেন। দীর্ঘকাল কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্-এর (Court of Wards) দায়ীত্ব পূর্ণ কাজে প্রতিষ্টিত থাকিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে বাহাত্তর বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

গগন পা—একজন সিদ্ধাচার্য্য। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মিথিলাধিপতি হরি-সিংহ দেবের রাজত্ব কালে কবি শেখরা-চার্য্য জ্যোতিরীশ্বর রচিত 'বর্ণ রত্নাকর' গ্রন্থে ছিয়াত্তর জন সিদ্ধ পুরুষের নাম উল্লেখ আছে, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহারা সকলেই অসাধ্য সাধন করিতে পারিতেন বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল এবং গ্রন্থও সকলে রচনা করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে সিদ্ধগণের নাম দেওয়া গেল—অঘোমাধব, অচিত, অচিতি, উন্মন, কঙ্গারি, কনখল, কপালী, কমল, কমারী, করবৎ, কামরী, কাগুলি, কাহ্ন, কুমারী, কেদারিপা, গগনপা, গমার, গিরিবর, গোবিন্দ, গোরক্ষনাথ, চম্পক, চর্পটী, চাকরীনাথ, চাটল, চান্দন, চিপিল, চোরঙ্গীনাথ, জালন্দর, জীবন, টোঙ্গরী, ঢেণ্টস, তন্তিপা, তুজজী, দারিপা, দৌলী, ধর্ম্মপা, ধোঙ্গপা, ধোবী, নাগবাকী, নাগার্জ্জুন, নাচন, নির্দ্দয়, নেচক, পতঙ্গ-ভদ্র, পলিহিহ, পাতলিভদ্র. পাসল, পাহিল, বাকলি, বিচিত, বিবেকিধ্বজ, বিভবৎ, বিরূপা, ভটী, ভদ্র, ভমরী, ভর্ত্তৃহরি, ভাদে, ভানু, ভিষাল, ভীম, ভীলা, ভীষণ, ভুম্বরী, ভুরুকুটী, ভৈরব, মগরধ্বজ, মবহ, মীন, মীননাথ, মেখল, মেনুয়া, শবর, শান্তি, সারঙ্গ, সিয়ারি, হাড়িপা।

গগ্‌গ—কাশ্মীর পতি হর্ষদেবের সময়ে সূর্য্যবর্ম্ম চন্দ্র নামে একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। জনকচন্দ্র, গগ্‌গ ও সড্ড তাঁহারই পুত্র। জনকচন্দ্র ভীমাদেব ডামরের হস্তে নিহত হইলে, রাজা উচ্চল, গগ্‌গের প্রতি সমধিক স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ক্ষতারোগ্যের জন্য তাঁহাকে লাহোর প্রদেশে প্রেরণ করেন। একবার রাজার ভ্রাতা সুস্‌সল বিদ্রোহী হইলে গগ্‌গে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বিদূরীত করেন। উচ্চল, ভীমসেন প্রভৃতির বিদ্রোহে নিহত হইলে, গগ্‌গ বিদ্রোহী অনেককে নিধন করিয়া রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করেন। তৎপরে তিনি সহ্লনকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। সুস্‌সল সিংহাসন লাভে উদ্যোগী হইলে, তিনি সহ্লনের পক্ষে প্রথমে যুদ্ধ করেন। পরে পরাজিত

হইয়া সুস্সলকেই রাজা বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যা রাজলক্ষ্মীর বিবাহ দেন। অপরা কন্যা গুণলেখাকে রাজা সুস্সল স্বীয় স্নুষা-স্বরূপে প্রতিগ্রহ করিলেন। এই ভাবে রাজার সহিত কিছুদিন গগ্গের ভাল ভাবেই চলিয়াছিল। অবশেষে পুনরায় রাজা দুষ্ট লোকের পরামর্শে গগ্গের প্রতি বিরূপ হন। গগ্গ বিদ্রোহী হইলে, উভয়ে কিছুকাল যুদ্ধ চলে এবং রাজপক্ষীয় অনেকে নিহত হয়। তৎপরে পুনরায় উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়। কিন্তু রাজা তাঁহার মনের ক্রুদ্ধভাব কাহাকেও জানিতে দেন নাই। একদিন রাজার অনুপস্থিতির সুযোগে, রাজার কর্ম্মচারীরা গগ্গকে তাঁহার তিন পুত্রের সহিত গলে রজ্জু বন্ধন করিয়া নিহত করেন।

গগ্গা দেবী—কাশ্মীরের শৌণ্ডিক-বংশীয় নৃপতি অবন্তীবর্ম্মার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শূরবর্ম্মা। শূরবর্ম্মার পুত্র সুখ-বর্ম্মা এবং সুখবর্ম্মার পত্নী গগ্গা দেবী। এই গগ্গা দেবীর গর্ভেই নির্জ্জিতবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। নির্জ্জিতবর্ম্মা কিছু-কাল কাশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন।

গঙ্গ—(১) একজন প্রখ্যাতনামা হিন্দি কবি। তিনি আকবর বাদশাহের সমসাময়িক ছিলেন। দেশের বিশিষ্ট ধনীরা গঙ্গ কবির কাব্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পুরস্কার দিয়াছিলেন। আকবর বাদশাহের অন্যতম সভাসদ্ হিন্দী কবির সহিতও গঙ্গের বিশেষ প্রীতি ছিল।

গঙ্গ—(২) সম্রাট আওরঙ্গজীবের রাজত্ব-কালেও গঙ্গ নামে একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি ছিলেন। অনেক স্থলে উভয়কে এক ব্যক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সম্ভব হইতে পারে না।

গঙ্গদেব — মিথিলার কর্ণটকবংশীয় রাজা নান্যদেবের পুত্র। বঙ্গাধিপতি বিজয় সেন কর্ত্তৃক নান্যদেব পরাজিত হন এবং মিথিলা বিজয়সেনের অধি-কারে আইসে। গঙ্গদেব পরে আবার বিজয় সেনকে পরাস্ত করিয়া পিতৃরাজ্য অধিকার করেন। ১১২৫ খ্রীঃ অব্দে নান্যদেবের মৃত্যু হইলে গঙ্গদেব রাজ্য লাভ করেন। তাহার পর তৎপুত্র নৃসিংহদেব রাজা হন।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য— ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগের সাংবাদিক ও পুস্তক প্রকাশক। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন এবং রাজা রামমোহন রায়ের সম-সাময়িক ছিলেন। তিনিই খুব সম্ভব প্রথম বাঙ্গালী সাংবাদিক। তৎসম্পাদিত 'বাঙ্গালা গেজেট' নামক বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত সাপ্তাহিক পত্রিকাখানিই প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র বলিয়া অনুমিত হয়। উহা ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই কাজে হরচন্দ্র রায় নামে আর একজন ব্যক্তি

তাঁহার সহযোগী ছিলেন। গঙ্গাকিশোর বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিত করিয়া পুস্তক ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তৎসম্পাদিত প্রথম বাঙ্গালা পুস্তকের নাম 'অন্নদামঙ্গল' ইহা ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রিত হয়। তদ্ভিন্ন তিনি বাঙ্গালা ভাষায় একখানি ইংরেজি ব্যাকরণ, ব্যাখ্যা ও টীকাসহ মূল ভগবদ্গীতা, চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক প্রভৃতি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন এবং পুস্তক ব্যবসায়ে বিশেষ অর্থলাভ করেন।

গঙ্গাকিশোর হুগলী জিলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসী ছিলেন। শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান পাদ্রীদের পরিচালিত মুদ্রালয়ে তিনি ছাপাখানার কাজ শিক্ষা করেন। কিছুকাল পরে তিনি কলিকাতায় গমন করিয়া স্বাধীন ভাবে পুস্তক প্রকাশ কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি নিজের কাজের সুবিধার জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র ও স্থাপন করেন। উহা 'বাঙ্গালী প্রেস' নামে পরিচিত ছিল। তৎকালীন অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের পুস্তক ঐ মুদ্রা যন্ত্রে মুদ্রিত হইত।

গঙ্গাপ্রসাদের 'বাঙ্গালা গেজেট' অধিককাল প্রকাশিত হয় নাই। উহার প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেলে গঙ্গাকিশোর তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রটি নিজ গ্রামে লইয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পরেও উহা বর্ত্তমান ছিল এবং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির পুস্তক উহাতে মুদ্রিত হইয়াছিল। গঙ্গাকিশোর খুব সম্ভব ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে দেহ ত্যাগ করেন।

গঙ্গাগিরি—দশ নামী সন্ন্যাসীদের মধ্যে এক একটী সন্ন্যাসী বিশেষ ক্ষমতাপন্ন হইয়া এক একটী সন্ন্যাসীদল প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাকে মড়ী বলে। এই মড়ী বিভাগ ছাড়াও চুলা চক্কি প্রভৃতি নামে আরও কতকগুলি বিভাগ আছে। এই সমুদয় বিভাগও এক একটী তেজিয়ান ব্যক্তিকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গঙ্গাগিরি গঙ্গা চক্কি নামক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ—তিনি ছোটনাগপুরের অন্তর্গত বরাহভূমের শেষ স্বাধীন রাজা বিবেকনারায়ণ সিংহের পৌত্র ও রঘুনাথনারায়ণ সিংহের পুত্র। ১৭৯৮ খ্রীঃ অব্দে রঘুনাথনারায়ণ সিংহের পরলোক গমন করিবার পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধো সিংহ বড় রাণীর গর্ভজাত, সুতরাং রাজ্যের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বড় রাণীর গর্ভজাত সন্তানই রাজ্যের অধিকারী। অচিরেই উভয় ভ্রাতার বিরোধ সংঘটিত হইল। সদাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট মাধো সিংহের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সহায় হইলেন। বিবাদ প্রশমিত হইল। উভয় ভ্রাতার সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইল।

মাধো সিংহ জ্যেষ্ঠের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিলেন। বিবাদের পর এ মিলন অতি বিরল হইলেও বড়ই প্রীতিপ্রদ। জ্যেষ্ঠ গঙ্গাগোবিন্দও কনিষ্ঠের উপর রাজ্যের সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান— কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠস্থ পাইকপাড়ার জমিদার বংশ একটী প্রাচীন উত্তর রাঢ়ী সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশ। তাঁহাদের আদি নিবাস মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কান্দি। এখনও তথায় তাঁহাদের দেবালয়, অট্টালিকা প্রভৃতি কীর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। গঙ্গাগোবিন্দের পিতামহ হরকৃষ্ণ সিংহ মুসলমান রাজ সরকারে উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র গৌরগোবিন্দ, গৌরগোবিন্দের তনয় রাধাগোবিন্দ ও গঙ্গাগোবিন্দ। ১৭৪৯ খ্রীঃ অব্দে গঙ্গাগোবিন্দের কান্দিতেই জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ রাধাগোবিন্দ নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ ও সিরাজ উদ্দৌলার সময়ে রাজস্ব কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৭৬৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্থলে বঙ্গের নায়েব সুবাদার মোহাম্মদ রেজাখাঁর অধীনে কাননগুর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজারস্থ রেশম কুটির রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার সহিত গঙ্গাগোবিন্দের খুব সদ্ভাব জন্মে। মোহাম্মদ রেজা খাঁ কর্ম্মচ্যুত হইলে, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দেরও কর্ম্ম চলিয়া যায়। তিনি এই সময়ে কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক ওয়ারেন হেষ্টিংসের সুনজরে পতিত হন। হেষ্টিংস তাঁহাকে রাজা রাজবল্লভের অধীনে সহকারী দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। পরে তাঁহার হস্তে রাজস্ব বিভাগের সমস্ত কার্য্য ভার অর্পিত হয়। এতদ্ব্যতীত হেষ্টিংসের অনুগ্রহে তাঁহার অন্য উপার্জ্জনের উপায় প্রশস্ত ছিল। ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দে হেষ্টিংস সাহেব তাঁহাকে কলিকাতার রাজস্ব কাউনসিলের দেওয়ানের পদ প্রদান করেন। কিন্তু পর বৎসরই হেষ্টিংসের বিপক্ষ দল, উৎকোচ গ্রহণের অপরাধে, তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। ১৭৭৬ খ্রীঃ অব্দে হেষ্টিংসের বিরোধী দলের সদস্য মন্‌সন সাহেব, পরলোক গমন করেন। সুতরাং হেষ্টিংস গঙ্গাগোবিন্দকে পুনরায় দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। তৎকালে জমিদারী পাঁচ বৎসরের জন্য মেয়াদি বন্দোবস্ত হইত। পাঁচ বৎসর অন্তে যে বেশী রাজস্ব দিতে সম্মত হইতেন, তাঁহার সহিতই বন্দোবস্ত হইত। ইহার ফলে সকল জমিদারই দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের অনুগত ছিলেন। নাটোর রাজবংশের পতনের সময়ে, যখন মহারাজা রামকৃষ্ণ

রায়, জমিদারী রক্ষা অপেক্ষা যোগে নিমগ্ন থাকাই শ্রেয় মনে করিতেন, এবং ক্রমে ক্রমে জমিদারী রাজস্ব দায়ে নিলামে চড়িতে লাগিল, তখন গঙ্গা-গোবিন্দ নিলাম হইতে মহিমশাহী, নগরতসাহী, নলধি প্রভৃতি পরগণা ক্রয় করিয়া ছিলেন। দিনাজপুরের সেই সময়ের কালেক্টার গুডল্যাক সাহেব ও তাঁহার দেওয়ান দেবীসিংহ দিনাজ-পুরের নাবালক রাজাকে বাধ্য করিয়া তাঁহার জমিদারীর কতক অংশ গঙ্গাগোবিন্দকে দেওয়াইয়া ছিলেন। ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দে হেষ্টিংস স্বদেশে প্রতি-গত হন। যাইবার পূর্ব্বে নাটোর রাজের শালবারি পরগণার কিয়দংশ গঙ্গাগোবিন্দকে দেওয়াইয়া যান। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে ইহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন। যশোহর মহম্মদ-পুরের স্বাধীন রাজা সীতারাম রায়ের বংশধরদের অসচ্ছল অবস্থার কথা শুনিয়া গঙ্গাগোবিন্দ বার্ষিক বারশত টাকা বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত (লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসন-কাল) দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ রাজস্ব বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। অবশেষে তাঁহার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইলে, তিনি পদচ্যুত হন। কথিত আছে মাতৃ শ্রাদ্ধে গঙ্গাগোবিন্দ বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই সময়ে হেষ্টিংস সাহেব প্রত্যেক জেলার কালেক্টারকে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন। বঙ্গদেশের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ জমিদার এই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া ছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে, ঘোড়ার ডাক বসাইয়া পুরী হইতে জগন্নাথ দেবের টাট্‌কা প্রসাদ আনয়নপূর্ব্বক প্রদান করিয়াছিলেন। ১৭৯৩ সালে গঙ্গাগোবিন্দ প্রাণকৃষ্ণ সিংহ নামক একমাত্র পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। প্রাণকৃষ্ণ সিংহের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালা বাবু), কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শ্রীনারায়ণ। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নী তারাসুন্দরী প্রতাপ চন্দ্র সিংহকে ও কনিষ্ঠা পত্নী করুণাময়ী ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন। প্রতাপ সিংহ ৩৯ বৎসর বয়সে গিরিশ চন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, কান্তিচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র নামে চারি পুত্র রাখিয়া ১৮৬৬ সালে পরলোক গমন করেন। গিরিশচন্দ্রের পোষ্য পুত্র—শ্রীশচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্রের পুত্র মণীন্দ্রচন্দ্র ও ফণীন্দ্রচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্রের পুত্র শ্রীশচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের পুত্র বীরেন্দ্র চন্দ্র সিংহ। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের পুত্র—ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ, ইন্দ্রচন্দ্রের পোষ্য পুত্র কুমার অরুণ চন্দ্র সিংহ।

গঙ্গাচরণ সরকার, রায়বাহাদুর— বাঙ্গালা ১২৩০ সালের আশ্বিন মাসে

(১৮২৩ খ্রীঃ অব্দ) চুঁচুড়া জিলার অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্ত্তী কাঁ্যাকলিয়ালী গ্রামে গঙ্গা চরণ সরকার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামবল্লভ সরকার। গঙ্গা চরণের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার সঙ্গে তাঁহার মাতাও সহমৃতা হন। ফলে গঙ্গাচরণ পিতামাতা হারাইয়া পিতামহ বৃদ্ধ মদনমোহন সরকারের তত্ত্বাবধানে রহিলেন। অল্পদিন পর গঙ্গাচরণ পাঠ-শালায় ভর্ত্তি হন এবং যথারীতি পাঠশালার পড়া সমাপন করিয়া ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে চুঁচুঁড়ার College of Mahammad Mohasin এ ভর্ত্তি হন। শিক্ষার জন্য গঙ্গাচরণকে কিছু ব্যয় করিতে হয় নাই। এই সময়ে মদনমোহন, গঙ্গাচরণের সহিত কদম-তলার এক বিধবার কন্যার বিবাহ দেন। বিধবার সমস্ত সম্পত্তি দেখা শুনার ভার গঙ্গাচরণের উপর পড়িল। ইহার কিছুকাল পরে পিতামহ মদন মোহনের মৃত্যু হয়। ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় বৃত্তি পান ও ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে সিনিয়ার স্কলারসিপ মাসে ৪০৲ টাকা পাইয়া হুগলী ও কলিকাতাতে আইন পড়িতে লাগিলেন। তখন হুগলীতে আইনের সকল বিষয় অধ্যাপনা হইত না, কলিকাতা যাইয়া কোন কোন বিষয়ের শিক্ষা করিতে হইত ও পরীক্ষা দিতে হইত। এই সময়ে নদীয়ার কালেক্টরীর সেরেস্তাদারের পদ শূন্য হইলে, কালেক্টর আলেম জোমনি সাহেব গঙ্গাচরণকে নিয়োগ পত্র প্রদান করিয়া সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সুতরাং স্কলারসিপ ভোগ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। ১৮৪৬—১৮৮২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৩৬ বৎসরেরও কিছু অধিক কাল তিনি সরকারী চাকুরী করেন। মাসিক ৭৫৲ টাকা হইতে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাহিনা তিনি পাইয়াছিলেন। সামান্য সেরেস্তাদার হইতে তিনি জজ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। গঙ্গাচরণ উলাগ্রামে তিনটি পাঠশালা ও একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি সাহিত্য চর্চ্চাও করিতেন। ঠাকুর দাস এবং আরও অনেক পাঁচালীকারকে তিনি পাঁচালী লিখিয়া দিতেন। বাল্যকালে তাঁহাকে সকলে গদাধর বলিয়া ডাকিত। সেই জন্য তাঁহার রচিত সকল কবিতায় গদাধর ভণিতা যুক্ত থাকিত। বাংলা ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি 'ঋতুবর্ণন' নামে একখানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় পুত্র অক্ষয়কুমারের নামে উৎসর্গ করেন। তিনি ১২৮৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ঢাকায় 'হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী' সভায় এক বক্তৃতা দেন। তাহা ছাপাইয়া বত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরই আষাঢ়

মাসে 'বঙ্গ সাহিত্য ও বঙ্গভাষা' বিষয়ে এক প্রবন্ধ রচনা করেন। তাহা ৭৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া তিনি বহু গ্রন্থ ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ২২শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার (১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে) তিনি পরলোক গমন করেন।

গঙ্গাজী মঙ্গাজী—যে সমস্ত ব্রাহ্মণ যুবক শিবাজী ছত্রপতির বীরত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

গঙ্গাদাস—ছন্দঃশাস্ত্র সম্বন্ধে বৈদ্য গোপাল দাসের পুত্র গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। জটাধরের পুত্র জগন্নাথ সেন কবিরাজ, এই ছন্দোমঞ্জরীর এক অতি উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। 'অচ্যুত চরিত' ও গোপাল শতক' নামক গ্রন্থদ্বয়ও এই গঙ্গাদাসেরই রচিত।

গঙ্গাদাস গুপ্ত— তিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন। রাজবল্লভের প্রথম পুত্র রামদাস ও চতুর্থ পুত্র রতনকৃষ্ণ পিতার জীবিতকালেই পরলোক গমন করেন। রাজবল্লভের মৃত্যুর পরে তাঁহার তৃতীয় পুত্র গঙ্গাদাস কিছুদিন রাজত্ব করেন। গঙ্গাদাসের মৃত্যুর পরে রাজবল্লভের পঞ্চম পুত্র গোপালকৃষ্ণ জমিদারী পরিচালনা করিয়াছিলেন। রাজবল্লভ দেখ।

গঙ্গাদাস, পণ্ডিত—(১) এই কবির রচিত একটী মনসার ভাসান পাওয়া গিয়াছে।

গঙ্গাদাস, পণ্ডিত—(২) মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তাঁহারই টোলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

গঙ্গাদাস সেন—(১) একজন বাঙ্গালী কবি। তিনি মহাভারতের অন্তর্গত অশ্বমেধ পর্ব্ব পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

গঙ্গাদাস সেন—(২) তিনি কৃত্তিবাসের ন্যায় একজন রামায়ণ রচয়িতা। তাঁহার পিতার নাম যষ্ঠীবর সেন। তাঁহাদের বাসস্থান ঢাকা জিলার অন্তর্গত মহেশ্বরদী পরগণার দীনারদ্বীপে (বর্ত্তমান ঝিনারদী) ছিল। তাঁহারা পিতা পুত্র উভয়েই কবি ছিলেন এবং পদ্মপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সকল বিষয়েই কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

গঙ্গাদাস সেন—(৩) একজন বাঙ্গালী কবি। তাঁহার রচিত একখানা মনসার ভাসান পাওয়া গিয়াছে।

গঙ্গাদেবী—(১) একজন স্ত্রী কবি। আনন্দময়ী দেখ।

গঙ্গাদেবী—(২) তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর অন্যতমা পত্নী জাহ্নবী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সহোদরের নাম

বীরভদ্র। মাধব আচার্য্যের পুত্র ঘনশ্যামের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মাধবাচার্য্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের শিষ্য ছিলেন। গঙ্গাদেবী প্রসিদ্ধ নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা, সুতরাং রাঢ়ী শ্রেণী। ঘনশ্যাম আচার্য্য প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যের ভাগিনেয় ও মাধবাচার্য্যের পুত্র। তাঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এই বারেন্দ্র ঘনশ্যাম, রাঢ়ী নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বোধ হয় দেশ প্রথানুসারে ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ হইবার পরে ইহাই রাঢ়ী বারেন্দ্র সমন্বয়ের প্রথম বিবাহ।

গঙ্গাধর—(১) বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণদিকে সগর নামে একটী নগর আছে। উক্ত নগরবাসী জ্যোতিষী চন্দ্রভট্টের পুত্র গঙ্গাধর, ১৩৬৫ শকে (১৪৩৪ খ্রীঃ) প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতানুসারে 'চান্দ্রমান' নামক তন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ কঠিন চান্দ্রমান তন্ত্রকে সুবোধ পদ্যে রচনা করিয়াছিলেন।

গঙ্গাধর—(২) দেবগিরির (বর্ত্তমান দৌলতাবাদ) উত্তর দিকে টাপর নামক একটী গ্রাম আছে। তথায় বিখ্যাত অনন্ত দৈবজ্ঞের পৌত্র, নারায়ণ দৈবজ্ঞের পুত্র গঙ্গাধর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা ও পিতামহের ন্যায় বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কৌশিক গোত্রীয় বাজসনেয়ী ছিলেন। ১৫০৮ শকে (১৫৮৬ খ্রীঃ) তিনি 'গ্রহলাঘবের' উপর 'মনোরমা' নাম্নী টীকা রচনা করিয়াছিলেন। অনন্ত দৈবজ্ঞ দেখ।

গঙ্গাধর—(৩) এই গঙ্গাধর 'তাজক রত্ন' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন।

গঙ্গাধর—(৪) তিনি 'পঞ্চপক্ষী প্রকাশ' নামে শিবোক্ত 'পঞ্চপক্ষী' নামক শাকুন গ্রন্থের এক টীকা রচনা করেন।

গঙ্গাধর—(৫) পরাশর কৃত 'হোরা' গ্রন্থের তিনি এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

গঙ্গাধর—(৬) ভৈরবের পুত্র গঙ্গাধর 'প্রশ্ন প্রকাশ', 'মূহূর্ত্ত ভৈরব' ও 'মূহূর্ত্তালঙ্কার' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের প্রণেতা।

গঙ্গাধর—(৭) তিনি ১৬০৭ শকে (১৬৮৫ খ্রীঃ) 'ভাস্বতী ব্যাখ্যা' নামক করণ গ্রন্থ রচনা করেন।

গঙ্গাধর—(৮) গোবর্দ্ধন পুত্র গঙ্গাধর ১৩৪২ শকে (১৪২০ খ্রীঃ) 'অঙ্কামৃত বা গণিতামৃত সাগরী' নামে ভাস্করকৃত 'লীলাবতীর' এক টীকা রচনা করেন।

গঙ্গাধর—(৯) তিনি 'বর্ষফল পদ্ধতি' নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

গঙ্গাধর—(১০) কুমারহট্টবাসী শিব প্রসাদ তর্ক-পঞ্চাননের পুত্র গঙ্গাধর ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে (১৭৫৮ শকে) 'সেতু সংগ্রহ' নামে মুগ্ধ বোধের এক

টীকা রচনা করেন। তাঁহার মতে বোপদেব মাহেশাদি ব্যাকরণ হইতে মত সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার মুগ্ধবোধ রচনা করিয়াছিলেন।

গঙ্গাধর আচার্য্য—নদীয়া জিলার অন্তর্গত লোহাসা গ্রামে ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দের ১লা অক্টোবর তাঁহার জন্ম হয়। কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, নানাস্থানে কার্য্য করার পর, মেদিনাপুর কলেজের অধ্যক্ষ (Principal) হন। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি সঞ্চিত অর্থের প্রায় অর্দ্ধাংশ পনর হাজার টাকা গরীব দুঃখীর জন্য দান করিয়া যান। তাঁহার সুদদ্বারা গরীব দুঃস্থ ছাত্র ও বিধবাদিগকে প্রতি মাসে সাহায্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই মহাপ্রাণ উদার চরিত্র মহানুভব ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

গঙ্গাধর, কবি—তাঁহার রচিত মানবংশীয় উড়িষ্যার রাজাদের একখানা প্রস্তর লিপি গোবিন্দপুর নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এই শিলালিপি ১০৫৯ শকাব্দে (১১৩৭ খ্রীঃ) লিখি হইয়াছিল।

গঙ্গাধর দাস—বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটোয়া মহাকুমার অধীন সিঙ্গি গ্রামে গঙ্গাধর দাস জন্মগ্রহণ করেন তিনি প্রসিদ্ধ মহাভারতকার কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ সহোদর। তাঁহার পিতার নাম কমলাকান্ত দাস। গঙ্গাধর দাস বাল্যকালে পিতার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি তাঁহার পিতার সহিত নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া পুরীধামে যাইয়া বাস করেন এবং তথায় সমস্ত জীবন যাপন করেন। পুরীধামে অবস্থানকালে তিনি 'জগৎমঙ্গল' নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। ইহাতে কেবল মাত্র জগন্নাথদেবের মহিমা কীর্ত্তন বর্ণনা আছে। বাঙ্গালা ১০৫০ সালে অর্থাৎ মহাভারত রচনার ৫০ বৎসর পর এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুকাল এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

গঙ্গাধরদেব গজপতি — তিনি উড়িষ্যার অন্তর্গত খুর্দ্দার নরপতি নরসিংহ দেবের ভ্রাতুষ্পুত্র। নরসিংহ দেব যুদ্ধে নিহত হইলে, তিনি ১৬৫৩—১৬৫৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। তৎপরে নরসিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলভদ্র দেব তাঁহাকে বধ করিয়া রাজপদ লাভ করেন। পুরুষোত্তম দেব গজপতি দেখ।

গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালী অধ্যাপক ও সাহিত্যিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি কিছুকাল কলিকাতার দক্ষিণাংশে ভবানীপুরস্থিত লণ্ডন মিশন কলেজে

(অধুনা লুপ্ত) অধ্যাপনা করেন। কলিকাতাস্থিত নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল (The New Indian School) তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া দীর্ঘকাল তাহা যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করেন। তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা শম্ভুচন্দ্র ন্যায়রত্নও একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন।

ইংরেজি অনুবাদ ও রচনা শিক্ষা করিবার বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকের গ্রন্থকাররূপে গঙ্গাধর বাবু ছাত্র ও শিক্ষক সমাজে সমধিক পরিচিত ছিলেন।

এককালে সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত 'নব-বিভাকর' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতাদিগের তিনি অন্যতম ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি ঐ পত্রিকার উন্নতির জন্য পরিশ্রম করেন। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে বিরাশী বৎসর বয়সে তিনি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

গঙ্গাধর ভট্ট—(১) মধ্যযুগের একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তিনি অন্নংভট্ট রচিত 'তর্কসংগ্রহ' নামক ন্যায় শাস্ত্রের টীকা রচনা করেন। (২) শালিবাহনবংশীয় রাজা হালের রচিত 'গাথা সপ্তশতী' নামক প্রসিদ্ধ গাথা-কোষ গ্রন্থের টীকাকার গঙ্গাধর ভট্ট নামক একজন পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়।

গঙ্গাধর মাণিক্য—১৭৩৭ খ্রীঃ অব্দ হইতে প্রায় বিশ বৎসর ত্রিপুরা রাজ্যে বড় অন্তর্বিপ্লব চলিয়া ছিল। এই সময়ে মহারাজ ধর্ম্ম মাণিক্যের পুত্র যুবরাজ গঙ্গাধর উদয় মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক অতি অল্পকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

গঙ্গাধর যশোবন্ত—তিনি ইন্দোরের মহারাজ মহ্লার রাও হুলকারের মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। তিনি অতিশয়, কূটনীতি পরায়ণ ও স্বার্থপর লোক ছিলেন। মহ্লার রাও হোলকারের মৃত্যুর পরে তিনি মাধব রাও পেশোয়ার পিতৃব্য কুলাঙ্গার রঘুনাথ রাওয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মহ্লার রাও হোলকারের পুত্রবধূ অহল্যাবাঈএর হস্ত হইতে রাজ্যভার স্বীয় হস্তে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অহল্যা বাঈয়ের কর্ম্মকুশলতায় তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। ক্ষমাশীলা অহল্যাবাঈ এই স্বার্থপর প্রভুদ্রোহীকে ক্ষমা করিয়া পুনঃ স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অহল্যার এই সদয় ব্যবহারে তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপের উদয় হয়। তিনি অবশেষে সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। অহল্যা-বাঈ দেখ।

গঙ্গাধর রাও—১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার অগ্রজ দ্বিতীয় রঘুনাথ রাও পরলোক গমন করিলে তিনি ঝাঁনসীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে গঙ্গাধর রাওয়ের পত্নী লক্ষ্মী

বাঈ একটী পুত্র প্রসব করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিন মাস পধ্যেই তাঁহার পরমায়ু শেষ হয়। বহুকাল পরে পুত্র মুখ দর্শন করিয়া তিনি যেমন সুখী হইয়াছিলেন পুত্রের মৃত্যুতে তেমনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। দিনে দিনে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে লাগিল, অবশেষে ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহারই বংশীয় আনন্দ রাও (দামোদর রাও) নামক এক পঞ্চম বর্ষীয় বালককে মেজর এলিস ও কাপ্তেন মার্টিন প্রভৃতির সম্মুখে দত্তকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন বড়লাট এই দত্তক গ্রহণ বাতিল করিয়া ঝাঁনসী রাজ্য ইংরেজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। মহারাণী বৃত্তিলাভ করিয়া রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

গঙ্গাধর শাস্ত্রী—একজন জ্যোতির্ষী পণ্ডিত। তিনি ১৮০৫ শকে (১৮৮৩ খ্রীঃ) 'মুহূর্ত্তসিন্ধু' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রিত করেন।

গঙ্গাধর শাস্ত্রী পট্টবর্দ্ধন—তিনি বরোদা নিবাসী একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। উত্তরভারত-জয়ী মহারাষ্ট্রীয়গণ মথুরাতে রাজধানী স্থাপন করিলে, শাস্ত্রী মহাশয় সেই সময় মথুরাতে বাস করিতেন। সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁহার একটী চতুষ্পাঠি ছিল এবং আগত তীর্থ যাত্রীদের থাকিবার বন্দোবস্তও তিনি করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় মহারাজা সিন্ধিয়া এই ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাঁহাকে পাঁচ খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই গ্রামগুলি ইংরেজ অধীনে আসিলেও অতি সামান্য মাত্র কর দানে শাস্ত্রী মহাশয় তাহা ভোগ করিতেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। তাঁহার কয়েকজন ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কার্য্যভার গ্রহণে তাহারা অনুপযুক্ত ছিল। সেইজন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে উইল করিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি কল্পে এবং মথুরা যাত্রীদের সুবিধার জন্য গ্রামগুলি দান করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ স্থির করেন যে, ঐ গ্রামগুলির মধ্যে তিনটি গ্রামের আয় হইতে আগ্রা কলেজের কতক ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে এবং অপর দুইটী গ্রাম হইতে মথুরার যাত্রীর হাসপাতালের খরচ চলিবে। তদনুসারে ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দে যখন আগ্রা কলেজ সংস্থাপিত হয়, সেই অবধি ঐ তিন খানি গ্রামের উপসত্ব আগ্রা কলেজে আসিতেছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যুর পর এবং আগ্রা কলেজ সংস্থাপনের পূর্ব্বে ঐ গ্রামগুলির উপসত্ব কোম্পানীর হস্তে জমা ছিল। তাহাতে ১৭৮০০০ টাকা হয় এবং ঐ টাকাতে কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করা হইয়া-

ছিল। ঐ কাগজের আয়ও আগ্রা কলেজ পাইতেছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের দান হইতে আগ্রা কলেজ কর্তৃপক্ষ বৎসরে ২২০০০ টাকা পান।

গঙ্গাধর সেন রায়, কবিরাজ—ভারত বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাব্রতী। তাঁহার পিতার নাম ভবানীপ্রসাদ রায়। যশোহর জিলার মাগুরা গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশে ১২০৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (১৭৯৮ খ্রীঃ জুলাই) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে কুলপুরোহিত মহাশয়ের নিকট তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয় তৎপরে বিভিন্ন চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি পাঠ সমাপন করিয়া অষ্টাদশবর্ষ বয়সে সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ রামকান্ত সেনের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পাঠে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল এবং তিনি অতিশয় অ্যধবসায়ী ছিলেন। প্রত্যহ পাঠ্য পুঁথির দশ পৃষ্ঠা স্বহস্তে লিখিয়া অধ্যয়ন করিতেন।

পাঠ সমাপন করিয়া প্রথমে তিনি পিতৃ সমীপে গমন করেন। ভবানীপ্রসাদ তখন নাটোরের রাজচিকিৎসক ছিলেন। কিছুকাল পরে পিতার পরামর্শে কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু স্বাস্থ্য অনুকুল না হওয়াতে মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে সৈদাবাদ নামক স্থানে গমন করেন। সেই সময়ে মুর্শিদাবাদে সুচিকিৎসকের অভাব না থাকিলেও গঙ্গাধর স্বীয় প্রতিভাবলে অল্পকালের মধ্যেই যশের অধিকারী হন। তথায় তিনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর জমিদারীর তত্ত্বধায়ক রাজীবলোচন রায়ের সহিত পরিচিত হন। রাজীবলোচন গঙ্গাধরের পাণ্ডিত্যে প্রীত হইয়া একবার মহারাণী স্বর্ণময়ীর গুরুতর পীড়ার চিকিৎসার ভার তাঁহার উপরই প্রদান করেন। স্বর্ণময়ী আরোগ্য লাভ করিলে, গঙ্গাধর রাজসরকার হইতে বৃত্তি পাইতে আরম্ভ করেন। পরে আরও নানাস্থানে এমনকি একবার মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের চিকিৎসা করিয়া প্রভূত যশের অধিকারী হন। তিনি একাধারে কায়চিকিৎসক (Physician) ও শল্য চিকিৎসক (Surgeon) ছিলেন। কিন্তু সহজে শল্য চিকিৎসা করিতে রাজী হইতেন না। একাধিকবার পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র ব্যবসায়ীগণ গঙ্গাধরের অসামান্য শারীরতত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

প্রধানতঃ চিকিৎসাব্যবসায়ী হইলেও তিনি বিভিন্ন সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ, তন্ত্র, জ্যোতিষ, স্মৃতি, ষড়দর্শন, ব্যাকরণ, নাটক ও কাব্য, উপনিষদাদির ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারে প্রায় অশীতিখানি পুস্তক তিনি রচনা করেন।

তন্মধ্যে "জল্প কল্পতরু" নামক চরক সংহিতার এক টীকাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

গঙ্গাধর নিষ্ঠাবান শৈব ছিলেন। অনাড়ম্বর দেশীয় প্রথায় তিনি জীবন যাপন করিতেন। কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়া আমরণ বহু দরিদ্র ছাত্রকে তিনি আশ্রয় ও অন্নদানে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন। প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয়। তৎপরে আর দারপরিগ্রহ করেন নাই।

অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনার ফলে তাঁহার মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উপস্থিত হয় এবং ঐ পীড়াতেই ছিয়াশী বৎসর বয়সে ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি সজ্ঞানে পরলোক গমন করেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও প্রতিভাবান্ আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক ভারতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরীর ন্যায় তিনি সকল শ্রেণীর লোকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী—তিনি নরোত্তম দাসের একজন শিষ্য। সংস্কৃতে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি পক্কপল্লীর রাজা নৃসিংহের সভার পণ্ডিত মণ্ডলীকে বিচারে পরাজিত করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন। ঐ সকল সভা পণ্ডিতেরা কিছুতেই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে না পারিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অবশেষে পক্কপল্লীর রাজাও সদলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গঙ্গানারায়ণ রায়— মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত কাশীজোড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এক ক্ষত্রিয় সেনাপতি; তিনি সিরন্দ দেশ হইতে জগন্নাথ দর্শনার্থ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আগমন করেন, এবং স্বীয় ক্ষমতা বলে পুরীর রাজা দেবরাজের সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৫৭৫ খ্রীঃ অব্দে দাউদ খাঁর সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যায় অভিযান করেন। সেই সময়ে দেবরাজ গঙ্গানারায়ণকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। গঙ্গানারায়ণ কালাপাহাড়কে দমন করিতে সমর্থ হওয়ায়, দেবরাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কাশীজোড়া পরগণা জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন। গঙ্গানারায়ণ স্বদেশ হইতে আত্মীয় পরিজন আনয়ন করিয়া তথায় বাসস্থান স্থাপন করেন। ১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র যামিনীভানু রায়ের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক গঙ্গানারায়ণ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করেন এবং তথায় পরলোক গমন করেন।

গঙ্গানারায়ণ সিংহ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানীর সনন্দ লাভের সমকালে (১৭৬৫ খ্রীঃ) রাজা বিবেকনারায়ণ বরাহভূমের রাজা ছিলেন। তিনি বিশেষ শক্তিশালী ও যুদ্ধ বিশারদ ধীর ছিলেন। ইংরেজ সরকার জঙ্গল

মহলের রাজাদিগকে স্বীয় বশে আনয়ন করিতে উদ্যোগী হইলে, তিনি বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া পরাস্ত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনাথনারায়ণ সিংহ ৮২৯৲ টাকা বার্ষিক রাজস্ব প্রদান করিতে সম্মত হইয়া বরাহভূমের রাজা হইলেন এবং বিবেকনারায়ণ মনোদুঃখে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। রঘুনাথের ভ্রাতা লছমন সিংহ বড়রাণীর গর্ভজাত ছিলেন। সুতরাং রাজ্যের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী, রাজ্যের অধিকারী তিনিই এই দাবী করিয়া তিনি জ্যেষ্ঠ রঘুনাথের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইংরেজ সরকার রঘুনাথের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। লছমন পরাজিত, ধৃত ও কারারুদ্ধ হইলেন এবং কারাগারেই পরলোক গমন করিলেন। এই লছমনের পুত্র গঙ্গানারায়ণ সিংহ। তিনি গঙ্গাগোবিন্দ ও মাধোসিংহের বিরোধে মাধোসিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। পরে ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দের বিদ্রোহে তিনি এই মাধো সিংহকেই স্বহস্তে নিধন করেন। ইংরেজ সরকার তাঁহার উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হন।

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়— কলিকাতা ভবানীপুর নিবাসী খ্যাতনাম চিকিৎসক। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁহারা কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্য শ্রীহর্ষের বংশধর। গঙ্গাপ্রসাদ পিতার তৃতীয় পুত্র ছিলেন। তাঁহার অতি শৈশবেই পিতৃবিয়োগ হওয়াতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন এবং দারিদ্র্যের সহিত নানাভাবে সংগ্রাম করিয়া শিক্ষা সমাপন করেন।

চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী থাকার সময়ে গঙ্গাপ্রসাদ সহৃদয়তা, দরিদ্রের প্রতি সদয় ব্যবহার, অমায়িক প্রকৃতি প্রভৃতি মহৎ গুণের জন্য জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য গণনার মধ্যে না আনিয়া তিনি চিকিৎসাধীন রোগীর সেবা শুশ্রূষাই অধিকতর কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

গঙ্গাপ্রসাদেরই পুত্র দেশবিখ্যাত সার আশুতোষ। আশুতোষ পরবর্ত্তী জীবনে যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন, তাহার জন্য গঙ্গাপ্রসাদের কৃতিত্বও কম ছিল না। বাল্যকাল হইতেই তিনি পুত্রকে সর্ব্বপ্রকারে "মানুষ" করিয়া তুলিবার জন্য নানারূপ প্রচেষ্টা করেন এবং তাঁহার সর্ব্ববিধ প্রয়াস যে কতদূর সফল হইয়াছিল, দেশবাসী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

১২৯৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৮৯ খ্রীঃ ডিসেম্বর) তিনি পরলোক গমন করেন।

গঙ্গাপ্রসাদ সেন, কবিরাজ—তাঁহার পিতার নাম কবিরাজ নীলাম্বর সেন। তাঁহাদের আদি বাসস্থান ঢাকা জিলার

বিক্রমপুরের অন্তঃপাতি উত্তরপাড় কোমরপুর গ্রাম। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে (১২৪৭ বাং) কবিরাজ নীলাম্বর সেন কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্যের পরিচয় 'নীলাম্বরের বড়ী, গণিমিয়ার ঘড়ি' এই প্রবাদ বাক্যেই প্রমাণিত হয়। নীলাম্বর যখন ঢাকা নগরে ছিলেন, তখন এই প্রবাদটী প্রচলিত হয়। ইহার অর্থ গণিমিয়ার ঘড়ি যেমন ঠিক সময় দেয়, কবিরাজশ্রেষ্ঠ নীলাম্বরের বড়ীও তেমনি অব্যর্থ। এই নীলাম্বরের পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ পিতার নিকটেই আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁহার সময়ে ডাক্তারি চিকিৎসার প্রতিই সাধারণতঃ লোকের অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাঁহার চিকিৎসাগুণে অচিরেই লোকের আয়ুর্ব্বেদে বিশ্বাস জন্মিতে আরম্ভ করে। পঞ্চাশ বৎসরেরও উপর তিনি গৌরবের সহিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতে চিকিৎসা করিয়া নষ্ট-গৌরব আয়ুর্ব্বেদের যশ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৩০২ বঙ্গাব্দে তিনি ভগবতীপ্রসন্ন, হরিপ্রসন্ন ও গুরুপ্রসন্ন নামে তিন কৃতি পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

গঙ্গাবাই—কবীরের কয়েকজন নারী শিষ্যা ছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। কবীরের কন্যা কমালীর ন্যায় তিনিও উচ্চাঙ্গের সাধিকা ছিলেন।

গঙ্গা ভাস্কর—'শকুনাবলী' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

গঙ্গামণি দেবী—বিদুষী বাঙ্গালী মহিলা কবি। তিনি কবি জয়নারায়ণের ভাগিনেয়ী ও কবি আনন্দময়ী দেবীর পিসতাত ভগিনী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম লালা রামপ্রসাদ রায় ও স্বামীর নাম প্রাণকৃষ্ণ সেন। তিনি কতকগুলি সংগীত রচনা করিয়াছিলেন।

গঙ্গারাম—(১) একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী পণ্ডিত তিনি 'ভাবফল' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

গঙ্গারাম—(২) 'যুদ্ধ জয়োৎসব' নামক গ্রন্থ পণ্ডিত গঙ্গারাম বিরচিত।

গঙ্গারাম—(৩) 'রত্নস্তোত' নামক গ্রন্থ গঙ্গারাম বিরচিত।

গঙ্গারাম ঘোষ (বঞ্চিত ঘোষ)—শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ পদকর্ত্তা বাসুঘোষের বংশে পরম ধার্ম্মিক কৃষ্ণ ঘোষের উদ্ভব হয়। ইহার পত্নী পরম সাধিকা রেবতীর গর্ভে গঙ্গারামের জন্ম হয়। গঙ্গারাম অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হন। তিনি শৈশবেই কবিত্ব শক্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। প্রবল ধর্ম্মানুরাগ থাকায় তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করেন, এবং কিছুকাল অরণ্যে বাস করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইলে বহু লোক আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল।

দেশের জমিদার ইটার রাজবংশীয় ইস্রাইল খাঁ তাঁহাকে দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহার তপস্যার জন্য কিয়ৎ পরিমাণ ভূমি তাঁহাকে দান করিলেন। ইহাই মোহন্তালয় (অপভ্রংশ মহলাল) নামে খ্যাত ছিল। তিনি একবার দিল্লীর সম্রাটের আহ্বানে তথায় গমন করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার ধর্ম্মভাব দর্শনে অতিশয় পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গারাম তীর্থাদি পরিদর্শন করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন এবং তৎপরে দারপরিগ্রহ করেন। বালিশিরার জনৈক মুসলমানকে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মাশ্রিত করিয়াছিলেন। তাঁহার উদার মতের নিকটে জাতিভেদের সঙ্কীর্ণতা স্থান পাইত না। হরিশ্চন্দ্র নামে কোনও ধনী ব্যক্তি এইজন্য তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু গঙ্গারামের ভক্তি দর্শনে সেই দুষ্কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। গঙ্গারামের পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তিনি দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে সমাধিতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

গঙ্গারাম দেব চৌধুরী, কবি—ময়মনসিংহ জিলা বাসী বাঙ্গালী কবি। গঙ্গারামের পূর্ব্বপুরুষ হরিদাস দেব, ষোড়শ শতাব্দীতে কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ধরীশ্বর গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করেন। গঙ্গারাম খুব সম্ভব খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দুর্লভনারায়ণ। বঙ্গাব্দ দ্বাদশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে গঙ্গারাম ময়মনসিংহ জঙ্গল বাড়ীর দেওয়ান বাড়ীতে সেরেস্তার কর্ম্মচারী ছিলেন। ঐ কার্য্য উপলক্ষেই তিনি ১১৬৭ বঙ্গাব্দে মুর্শিদাবাদ গমন করেন। দেওয়ান বাড়ীর কার্য্যে তিনি উন্নতি লাভ করিতে করিতে ক্রমে নায়েবীপদ ও চৌধুরী উপাধি লাভ করেন।

মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিবার সময়ে তিনি লোক মুখে বর্গীর হাঙ্গামার বিবরণ শ্রবণ করিয়া 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে 'শুক সংবাদ' নামে পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ক একখানি গ্রন্থ এবং 'লবকুশ চরিত্র' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রথমোক্ত পুস্তক খানিতে বর্গীর হাঙ্গামার বিশদ বিবরণ ভিন্ন গঙ্গারামের কবিত্ব ও কল্পনা শক্তির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

গঙ্গারাম মৈত্র—একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব। তিনি আবদুল নামক একজন মুসলমান ও তাহার ভগিনীকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি আবদুলের নাম রূপদয়াল ও তাহার ভগিনীর নাম

ভূষণা রাখিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে তিনি ভূষণাকে সেবাদাসী করিয়াছিলেন। তাহাদের পক্ক অন্ন তিনি গ্রহণ করিতেন না, কেবল জল গ্রহণ করিতেন। তাহারা তাঁহার গৃহেই অবস্থান করিত। কাজী ইহা শুনিতে পাইয়া আবদুলকে হরিমন্ত্র পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু সে বলিল—'মনুষ্যের ভাষা বিভিন্ন কিন্তু ঈশ্বর এক। আল্লা ও হরি একই। আমি আরবী ফারসী জানি না, আমার মাতৃ ভাষা বাঙ্গালা সুতরাং আমি হরি বলি। যাদের মাতৃভাষা আরবী তাহারা আল্লা বলিবে।' কাজী বিচারে হারিয়াও তাহার প্রাণ দণ্ড করিলেন। তাহার ভগিনী ভ্রাতৃ শোকে জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই ঘটনায় ব্যথিত হইয়া গঙ্গারাম বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। আট বৎসর পরে গঙ্গারাম দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয় দারপরিগ্রহ করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে কোনও ব্রাহ্মণ সমাজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে গঙ্গারাম সিন্দুরীর জমিদার রাজীব রায়ের শরণাপন্ন হইলেন। রাজীব রায় একজন ক্ষমতাশালী জমিদার ছিলেন। তিনি বহু ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া এক সভা করিলেন। তিনি সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— গঙ্গারাম, রূপদয়াল ও ভূষণার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসের সহিত ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই করিয়াছিলেন। হরিদাস ও রূপদয়াল উভয়েই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। যখন অদ্বৈত প্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর সন্তানেরা সুব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে প্রচলিত, তখন গঙ্গারামকেও সমাজে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সমাজের জীবনী শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। জন্ম দ্বারাই জাতি হয়, কর্ম্মদ্বারা কেবল পাপ পুণ্য হয় মাত্র। কর্ম্মজপাপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই খণ্ডন হয়। প্রায়শ্চিত্তান্তে গঙ্গারামকে আপনারা সমাজে গ্রহণ করুন। এই বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে দুইদল হইল। শাক্তেরা বলিলেন—

কেন ভাই গঙ্গারাম,
আগে কল্লি হেন কাম,
কেন খালি ভূষণার পানি।
ঘরে দিলি আবদুলে ভাত,
হাড়ীতে না ছোঁয় পাত,
তোরে কিসে ফিরে কোলে আনি।

শাক্তেরা বিরোধী হইলেও, বৈষ্ণবেরা প্রায়শ্চিত্তান্তে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। পরে গঙ্গারাম ছাতিয়ান গ্রাম নিবাসী কবি ভূষণ চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে তাঁহার সঙ্গে সংস্রব বিশিষ্ট কুলীনেরা অতঃপর 'ভূষণা পঠী'র কুলীন নামে খ্যাত হইলেন।

গঙ্গারায়—অন্যনাম রাজগঙ্গা। তিনি স্বাধীন ত্রিপুরার অধিপতি বঙ্গের (নবাঙ্গ) তনয়। গঙ্গারাম, চন্দ্র হইতে অধস্তন ১১২ তম এবং ত্রিপুর হইতে অধস্তন ৬৭ তম নরপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র চিত্রসেন (শুক্র রায় বা ছাক্রুরায়) রাজপদ লাভ করেন। ত্রিপুর দেখ।

গঙ্গেশ উপাধ্যায়—খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগে তিনি মিথিলার অন্তর্গত মঙ্গলবনী গ্রামে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই অসাধারণ পণ্ডিত ন্যায়শাস্ত্র মন্থন করিয়া চারিটী প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া চারিখানি চিন্তামণি গ্রন্থ রচনা করেন। সমগ্র গ্রন্থকে 'তত্ত্বচিন্তা মণি' ও বলে। বৌদ্ধদিগের প্রচণ্ড মত খণ্ডন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য (প্রচণ্ড পাষণ্ডতমস্তিতীর্ষয়া)। এই গ্রন্থের বহু টীকা, টীপ্পনী রচিত হইয়াছে। ইহার ফলে বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র এদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ মূলতঃ গৌতমের ন্যায়শাস্ত্রের টীকা হইলেও প্রকৃতপক্ষে মূল গ্রন্থ রূপেই গৃহীত হয়। তাঁহার পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ও একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন।

গজং—তিনি আসামের একজন রাজা। নরশঙ্কর দেখ।

গজ—রাজপুতানার অন্তর্গত জশল্মীরের অধিপতি রিঝের পুত্র। তাঁহার মাতা সভগা সুন্দরী মালবরাজ বীর সিংহের দুহিতা। গজ পূর্ব্বদেশীয় নরপতি যাদভানের কন্যা হংসবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কোনও সময়ে খুরাসানের ফরিদ খাঁর অধিনায়কত্বে তুর্কিরা জশল্মীর আক্রমণ করে। প্রথম বার তুর্কিরা পরাস্ত হয় কিন্তু দ্বিতীয় বারে রাণা রিঝ স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিতে যাইয়া সমর ক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। এই সমরের পরে রাণা গজ ভীষণরূপে শত্রু সেনাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। তিনিই স্বীয় নামে গজনী নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং খ্রীঃ পূঃ ৯৩ অব্দে গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কাশ্মীরপতি কন্দর্পকেলকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহারই গর্ভে প্রসিদ্ধ শালিবাহন নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। শালিবাহনের ষোড়শবর্ষ বয়ক্রমকালে খোরাশানপতি আবার গজনী নগর আক্রমণ করিলেন। ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইল। এই যুদ্ধে রাণা গজ ও খোরাশানপতি উভয়েই নিহত হইলেন। কিন্তু পরিণামে খোরাশানীরাই জয় লাভ করাতে শালিবাহন স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাঞ্জাবে আগমন করিয়া ১৬ খ্রীঃ অব্দে শালিবাহনপুর নামক নগর স্থাপনপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

গজনারায়ণ—তিনি আসাম প্রদেশের

অন্তর্গত দরঙ্গের রাজা বলিতনারায়ণের ভ্রাতা। তিনি স্বীয় ভ্রাতা কর্তৃক বেলতলা রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বেলতলার বর্ত্তমান রাজগণ তাঁহারই বংশধর। বলিতনারায়ণ দেখ।

গজপতি—(১) তিনি বিহারের অন্তর্গত হাজীপুরের পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন। সম্রাট আকবর তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইয়া অকৃতকার্য্য হন। পরে গজপতি ও তাঁহার পুত্র শ্রীরাম পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। দাউদ খাঁর বিদ্রোহের সময়ে গজপতি সম্রাট আকবরকে (১৫৭৪ খ্রীঃ) সৈন্য দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য করেন।

গজপতি—(২) বিহার প্রদেশের সাহাবাদ জিলার একজন ভূম্যধিকারী। এই জমীদার রাজবংশ মধ্যভারতের উজ্জয়িনীর কোনও রাজবংশের শাখা বলিয়া কথিত হইত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালা ও বিহারের পাঠান ভৌমিকদের সহিত মুঘলের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে তিনি পাঠান সেনাপতি দায়ুদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করেন। একাধিক মুঘল সেনাপতি তাঁহার হস্তে নিহত অথবা বন্দী হন। পরিশেষে গজপতি সম্রাট আকবর প্রেরিত শাহবাজ খাঁ নামক সেনাপতির নিকট পরাজিত হইয়া দেশান্তরিত হন। (১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দে)।

গজপতি সিংহ—তিনি যোধপুরপতি রাঠোর শূরসিংহের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে ১৬২০ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজা হন। সেই সময়ে দিল্লীতে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫—১৬২৭ খ্রীঃ) রাজত্ব করিতেছিলেন। এই গজ সিংহের এক ভগ্নীকে জাহাঙ্গীর বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারই গর্ভে শাহ-জাহানের জন্ম হয়। স্বীয় ভাগীনেয়েরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শাহ-জাহান, পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। সেই সময়ে গজসিংহের বীরত্বেই তিনি পরাজিত হন। গজসিংহ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কারকিগড়, গোলকুণ্ড, কেনেল, পারনাল, গুজনগড়, আশের ও সাতারা জয় করিয়া মুঘল সম্রাজ্য ভুক্ত করেন। তিনি অষ্টাদশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬৩৮ খ্রীঃ অব্দে গুর্জ্জরের একটী যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহ অতিশয় ক্রোধী, উদ্ধত ও উৎকট প্রকৃতির লোক এবং রাজোচিত অনেক গুণেই তিনি বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে প্রজাকুল সন্ত্রাসিত হইয়া ছিল। ১৬৩৪ খ্রীঃ অব্দে বিচারে অমর সিংহ নির্ব্বাসিত হইলেন। গজ সিংহ, দ্বিতীয় পুত্র, যশোবন্তের ললাটে রাজটীকা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকেই ভাবী রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

গজপৎ সিংহ—তিনি ঝিন্দের ভাঙ্গী

শিখ সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। তাঁহারই দৌহিত্র পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ।

গজভীম—তিনি স্বাধীন ত্রিপুরার প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি বিজয় মাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। বিশেষ পারদর্শিতার সহিত হস্তী খেদার বহু-সংখ্যক হস্তী এক সঙ্গে ধৃত করিয়া তিনি এই অনন্য সাধারণ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুঘল সেনাপতি মবারক খাঁ চট্টগ্রাম প্রদেশ আক্রমণ করিলে, মহারাজ বিজয় মাণিক্য, গজভীম, কালা নাজির, গগন খাঁ প্রভৃতি সেনা-পতির অধীনে এক প্রবল সৈন্যবাহিনী তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। প্রথম যুদ্ধে কালা নাজির নিহত হন। তৎপর মুঘল সৈন্যগণ যখন শিবিরে রাত্রিকালে নিশ্চিন্ত মনে রন্ধনাদি করিতেছিল, সেই সময় ত্রিপুর সৈন্যগণ এক সুড়ঙ্গ খনন পূর্ব্বক সহসা মুঘল শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে মুঘলেরা সম্পূর্ণ-রূপে পরাজিত এবং তাঁহাদের সেনাপতি ধৃত ও বন্দী হইলেন। সেনাপতি মবারক খাঁকে লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া দরবারে উপস্থিত করা হয় এবং পরে চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট বলি দেওয়া হয়।

গজসিংহ—(১) তিনি বিকানীরের অধিপতি জোরাবর সিংহের মৃত্যুর পরে ১৭৪৬ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া একচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহ ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে মহারাজ উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ রাজ্য-কাল ভট্টিদিগের ও ভাওয়ালপুরের খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে ব্যয়িত হইয়া-ছিল। তিনি ভট্টিদিগকে পরাজিত করিয়া রাজসৈর, কৈলা, রণৈর, সত্যসর, বুন্নিপুর, মুটাৈল ও কতিপয় গ্রাম অধি-কার করেন। ভাওয়ালপুরের নবাব তাঁহার হস্তে অনুপগড় প্রদান করিয়া তাঁহার ক্রোধের শান্তি করেন। কথিত আছে রাজা গজসিংহ সর্ব্বসমেত একষট্টি পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরে রাজসিংহ সিংহাসন লাভ করিয়া-ছিলেন।

গজসিংহ—(২) নরবার নামক স্থানের তিনি অধিপতি ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহের (১৭১৯—৪৮ খ্রীঃ) মন্ত্রী অম্বরের রাজা জয়সিংহের আদেশে কোটার রাজা ভীমসিংহ ও নরবারপতি গজসিংহ, নিজাম-উল-মুল্ককে দক্ষিণা-পথে পলায়নের কালে অবরোধ করিতে গমন করেন কিন্তু তাঁহারা পরাজিত ও নিহত হন (১৭২০ খ্রীঃ)।

গজাঙ্ক—আসামের কমতাবংশীয় রাজা অরিমত্তের নামান্তর বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। অরিমত্ত দেখ।

গজালী, মৌলানা—তিনি মশাদ

দেশের অধিবাসী ছিলেন। ভারতে আসিয়া প্রথমে কিছুকাল তিনি দাক্ষিণাত্যে বাস করেন। জৌনপুরের সুলতান আলী কুলী খাঁ পরে তাঁহাকে জৌনপুরে গমন করিতে সাদরে আহ্বান করেন। তিনি সুলতানের আহ্বানে জৌনপুরে গমন করিলে, সুলতান পুরবাসীর সহিত তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। সুলতানের ভজনালয়ই তাঁহার শিক্ষাদান ও উপদেশের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি সুলতানের প্রশংসাসূচক 'মথনবিনক্স-ই বদি' নামক একখানা কবিতা গ্রন্থ লিখিয়া সুলতানকে উপহার দিলেন এবং পুরস্কার স্বরূপ প্রত্যেক কবিতার জন্য একটী করিয়া স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। সম্রাট আকবর, খাঁ জামান খাঁর মৃত্যুর পরে মৌলানা গজালীকে জৌনপুর হইতে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিলেন। তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হইলে, রাজোচিত সম্মানে পরিগৃহীত হইলেন; তাঁহার উপর 'শাহ-নামা' গ্রন্থ কাব্যাকারে লিখিবার ভার অর্পিত হয়। কিন্তু গ্রন্থ রচনা সমাপন হইবার পূর্ব্বেই তিনি পরলোক গমন করেন।

গজেশ্বর—স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি চন্দ্ররাজের (চন্দ্রফা) তনয় গজেশ্বর চন্দ্র হইতে অধস্তন ৮৭ তম এবং ত্রিপুর হইতে অধস্তন ৪২শ রাজা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র বীররাজ (দ্বিতীয়) রাজপদ লাভ করেন। ত্রিপুর দেখ।

গঞ্জালে সিবাষ্টিয়ান—(Gangales Sibestian) পর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরের অল্প দূরে সেণ্টএণ্টুনিভেল নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে গঞ্জালের জন্ম হয়। এই অজ্ঞাত কুলশীল পর্ত্তুগালবাসী ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দে এদেশে আসেন। এই উচ্চাভিলাষী ও শ্রমপটু যুবক প্রথমে সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু ধন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক লবণের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কিছু অর্থ সঞ্চিত হইলে তদ্দ্বারা 'পেলিয়' নামক একটী জাহাজ ক্রয় করিয়া সন্দীপ হইতে লবণ চট্টগ্রাম ও ডায়েঙ্গা বন্দরে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আরাকানপতি মেংরাজগির (শেলিম শা) অধীনে অনেক পর্ত্তুগিজ সৈনিক ছিল। তাহারা ক্রমে প্রবল হইতেছে সন্দেহ করিয়া ডায়েঙ্গা বন্দরস্থ প্রায় ছয়শত পর্ত্তুগিজকে আরাকানরাজ হত্যা করেন। অবশিষ্টেরা পর্ব্বতে, অরণ্যে ও ৯।১০ দশখানা জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রে পলায়ন করেন। তন্মধ্যে গঞ্জালেও তাঁহার জাহাজে ছিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহারা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেন। তাঁহাদের অত্যাচারে বঙ্গের উপকূল ভাগ, সুন্দরবন প্রভৃতি জনশূন্য অরণ্যে

পরিণত হয়। এদিকে সন্দ্বীপের মুঘল শাসনকর্ত্তা ফতে খাঁ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া স্বয়ং হত হইলেন। পর্ত্তুগিজেরা গঙ্গালেকে সেনাপতি করিয়া সন্দ্বীপের শাসনকর্ত্তা ফতে খাঁর ভ্রাতাকে পালটা আক্রমণ করিয়া দুর্গ অধিকার করিলেন। সন্দ্বীপস্থ সমুদয় মুসলমানকে তরবারি মুখে অর্পণ করিলেন। এই যুদ্ধে বাকলার রাজা রামচন্দ্র রায় তাঁহাকে সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। কথা ছিল সন্দ্বীপের অর্দ্ধাংশ তাঁহার হইবে। কিন্তু যুদ্ধ জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গালে তাহা অস্বীকার করিয়া বাকলা আক্রমণপূর্ব্বক সাহাবাজপুর পাতলেডাঙ্গা অধিকার করিলেন। তাঁহার বীরত্বের কাহিনী চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। ১৬১০ খ্রীঃ অব্দে তিনি এক হাজার পর্ত্তুগিজ সৈন্য, দুই হাজার বাঙ্গালী সৈন্য, দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য এবং আশীখানি কামান সজ্জিত জাহাজের অধিপতি হইয়া সন্দ্বীপের স্বাধীন রাজা হইলেন। ইতিপূর্ব্বে আরাকান রাজের ভ্রাতা অনুপরাম স্বীয় ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়া গঙ্গালের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ধন সম্পত্তি ও স্ত্রী পুত্রাদি উদ্ধার করিবার জন্য গঙ্গালের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। উপকারের বিনিময়ে তাঁহাকে প্রভূত ধন এবং বিবাহার্থ স্বীয় ভগিনী অরুন্ধতীকে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহার ফলে গঙ্গালে আরাকানে এক অভিযান প্রেরণ করিয়া তাঁহার ধনরত্ন ও পরিবারবর্গ উদ্ধার করিলেন বটে কিন্তু পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পরেই অনুপরাম মৃত্যুমুখে পতিত হন। গঙ্গালে তাঁহার সমস্ত ধন রত্ন অধিকার করিলেন। পূর্ব্বেই অরুন্ধতীকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। গঙ্গালে পুনরায় আরাকানে এক অভিযান প্রেরণ করেন। এবারে আরাকানরাজ পরাজিত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। এই সময়ে মুঘলেরা চট্টগ্রাম আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে জানিতে পারিয়া আরাকান পতি গঙ্গালের সহিত এই সূত্রে সন্ধি করিলেন যে, যুদ্ধে গঙ্গালে আরাকানপতিকে রণতরী দ্বারা সাহায্য করিবেন। আরাকান সৈন্য স্থলপথে অগ্রসর হইবে! আরাকানের রণতরি গঙ্গালের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হইবে। এই সকল রণতরি নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতিভূস্বরূপ গঙ্গালের ভ্রাতা আবাকান রাজদরবারে অবস্থান করিবেন। মুঘলদিগের সহিত যুদ্ধে আরাকানরাজ পরাজিত হইলেন। গঙ্গালে রণতরিদ্বারা সাহায্য করা ত দূরের কথা, আরাকান রাজের রণতরির অধ্যক্ষদিগকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক হত্যা করিয়া সেই সমুদয় রণতরি অধিকার করিয়া সন্দ্বীপে

পলায়ন করিলেন। মগরাজ এই কার্য্যের জন্য তাঁহার ভ্রাতাকে শূলে চড়াইয়া এক বন্দরে রাখিলেন। ১৬১২ খ্রীঃ অব্দে আরাকানরাজ সেলিম সার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র মেংখা মৌং রাজা হইলেন। গঞ্জালে তাঁহার বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশলে ভীত হইয়া গোয়ার পর্ত্তুগিজ শাসনকর্ত্তার সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তিনি ডন ফ্রান্সিস ডিমিনিসেস নামক এক বিচক্ষণ সেনাপতিকে গঞ্জালের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। আরাকানরাজের সহিত যুদ্ধে ডন ফ্রান্সিস নিহত হন। পর্ত্তুগিজ রণতরি গুলি গোয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। গঞ্জালে পরাজিত হইয়া সন্দ্বীপে আগমন করিলেন। তাঁহার অত্যাচারে ও দুর্ব্যবহারে তাঁহার সৈন্য ও কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। এই সময়ে আরাকানরাজ সন্দ্বীপ আক্রমণ করিয়া গঞ্জালেকে সন্দ্বীপ হইতে বিতাড়িত করিলেন এবং সন্দ্বীপ পর্ত্তুগিজশূন্য করিলেন।

গডউইন-অষ্টেন, হেনরী হেভারশাম—(Henry Haversham Godwin-Austen) ভারতবর্ষের ভূতত্ব বিভাগের একজন খ্যাতনামা উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী। প্রথম জীবনে সৈনিক বিভাগে কাজ লইয়া তিনি ভারতে আগমন করেন (১৮৫২ খ্রীঃ) এবং ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে ভারতীয় জরিপ বিভাগে (Trigonometrical Survey of India) প্রবেশ করেন। তৎপূর্ব্বে সৈন্য বিভাগে থাকিবার সময়ে দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। জরিপ বিভাগে কাজ করিবার সময়ে হিমালয়ে অনেক স্থান জরিপ করিয়া মানচিত্র প্রস্তুত করেন। এই কাজের জন্য বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। ইংলণ্ডেও তাঁহার কার্য্য সুধীজন সমাদৃত হয়। একাধিক বৈজ্ঞানিক পত্রিকায়, ভূতত্ব নৃতত্ব উদ্ভিদ ও পক্ষীতত্ব বিষয়ে তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে গমন করেন এবং কতিপয় বর্ষ পরে দেহত্যাগ করেন। হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গগুলির একটী তাঁহার নামে পরিচিত হইয়া থাকে।

গণ—তাঁহার পিতার নাম দুর্লভ। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'অশ্বায়ুর্ব্বেদ বা সিদ্ধযোগ সংগ্রহ'।

গণকুমার—তিনি 'হরিদ্রা গণপতি' উপাসক সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার মত অবলম্বন করেন।

গণদেব—তিনি উড়িষ্যার সূর্য্য বংশীয় নরপতি কপিলেন্দ্র দেবের একজন সামন্ত নরপতি ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি কপিলেন্দ্র দেবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম গোহিদেব ও পিতামহের নাম চন্দ্রদেব। গণদেবের উপাধি রাউৎ রায় ছিল। উড়িষ্যার

দেশীয় রাজ্যে এখনও রাজার তৃতীয় পুত্র এই উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি কোণ্ডবিভু নামক স্থানের অধিপতি ছিলেন।

গণপতি—(১) তিনি গুর্জর প্রদেশের হরিশঙ্কর জ্যোতিষীর পুত্র ছিলেন। ১৬০৭ শকে (১৬৮৫ খ্রীঃ) তিনি 'মুহূর্ত্ত গণপতি' নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গণপতি—(২) গোপাল শিষ্য গণপতি 'রত্নদীপক বা প্রদীপ' নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

গণপতি ঠাকুর—মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির পিতা। 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী' নামক গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম জয়দত্ত। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ছিলেন বলিয়া যোগীশ্বর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গণপতি নাগ—খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর ভারতের এই নরপতি সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত দেখ।

গণপতি বর্ম্মা—আসাম কামরূপের পুষ্যবর্ম্মার বংশীয় কল্যাণবর্ম্মার পুত্র। তিনি খুব সম্ভব ৪৬০—৪৮০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র বর্ম্মা।

গণপতি রায়, রাজা—তিনি ভুলুয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বম্ভর রায়ের পুত্র। বিশ্বম্ভর রায় ১২০৩ খ্রীঃ অব্দে ভুলুয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার ত্রিপুরার রাজার সামন্ত নরপতি ছিলেন। বিশ্বম্ভর রায় (রাজা) দেখ।

গণপতি শাস্ত্রী—দক্ষিণ ভারতের একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, মহাকবি ভাসের নাটকাবলী সম্পর্কে তাঁহার গবেষণা প্রসূত মীমাংসা পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং তৎকর্ত্তৃক সংস্কৃত নাট্য শাস্ত্রের ইতিহাসচর্চ্চায় নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় দীর্ঘকাল ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং ত্রিবাঙ্কুর সংস্কৃত গ্রন্থমালার (Travancore Sanskrit Series) প্রধান সম্পাদকরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের এক উন্নত সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তার খ্যাতি সুদূর পাশ্চাত্য দেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৯২৭ খ্রীঃ এপ্রিল) তাঁহার মৃত্যু হয়।

গণপত্ রাও মহারাষ্ট্র—ঝাঁনসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। রাণীর মৃত্যুর পরে তাঁহাদের প্রভুভক্তির ফলে অষ্টম বর্ষীয় বালক শত্রু হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। দামোদর রাও ও লক্ষ্মীবাঈ দেখ।

গণি—মির্জা মোহাম্মদ তাহিরের কবিজন সুলভ নাম। কাশ্মীরের অধিবাসী বলিয়া তিনি গণি কাশ্মীরী

নামেও কথিত হইয়া থাকেন। তিনি মহশীন ফানির একজন ছাত্র। ১৬৬৮ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৭৯) যৌবনকালেই তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে এই প্রকার শুনা যায় যে, সম্রাট আওরঙ্গজীব তৎকালের কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা সয়েফ খাঁকে, গণিকে তাঁহার নিকট পাঠাইতে অনুরোধ করেন। সয়েফ খাঁ গণির নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, তিনি বলিলেন—আমি পাগল বলিয়া সম্রাটের নিকট যাইতে অসমর্থ। এই সংবাদ প্রেরণ করুণ। তদুত্তরে সয়েফ খাঁ বলিলেন—আপনার ন্যায় ব্যক্তিকে আমি কি করিয়া পাগল বলিব। এই কথা শুনিয়াই তিনি তাঁহার গাত্র বস্ত্র ছিন্ন করিতে লাগিলেন এবং উন্মাদগ্রস্ত হইয়া তিন দিন পরেই মানব লীলা সংবরণ করেন।

গণেশ (রাজা)—পাঠান আমলের বাঙ্গালার একজন ভৌমিক। তিনি সাধারণতঃ রাজা গণেশ নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁহারা উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ, কাশ্যপ গোত্রীয় দত্ত পদবীধারী। তাঁহারা সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন ও ইলিয়াস সাহী সুলতানদের অধীনে কাজ করিয়া মান, প্রতিপত্তি ও বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি লাভ করেন। ইলিয়াস সাহী সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ও সইফুদ্দিনের সময়ে গণেশ বিশেষ ক্ষমতাশালী হন এবং সুলতানদিগকে শিখণ্ডীরূপে রাখিয়া নিজেই প্রকৃত পক্ষে উত্তর বঙ্গে ক্ষমতা বিস্তার করেন। ক্রমে তিনি স্বাধীন রাজার ন্যায় দেশ শাসন করিতে আরম্ভ করায় মুসলমানেরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। তাঁহাদের অনুরোধে জৈনপুরের শরকী সুলতান ইব্রাহিম বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করেন। ইব্রাহিম বাঙ্গালায় আসিবার পূর্ব্বেই গণেশ বাঙ্গালার মুসলমানদের প্রতিনিধি স্থানীয় নুর উল্ কুতব উল আলমের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন এবং চতুর গণেশের পরামর্শে তাঁহার পুত্র যদু, মুসলমান হইয়া জালালউদ্দিন নাম গ্রহণ করেন। গণেশ তাঁহাকেই গৌড়ের সুলতান বলিয়া প্রচার করেন। ইব্রাহিম তখন, অনাবশ্যক বোধে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গণেশ অতঃপর পুত্রকে হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ঐসময়ে তিনি 'দনুজমর্দ্দন' নামে মুদ্রাপ্রচলন করেন। (কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে গণেশ ও দনুজমর্দ্দন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। তাঁহারা সমসাময়িক ছিলেন কিনা তদ্বিষয়েও মতভেদ আছে)।

গণেশচন্দ্র চন্দ্র—কলিকাতার প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী (Attorney)। ১৮৪৪ খ্রী অব্দে মে মাসে কলিকাতা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কাশীনাথ

চন্দ্র। তাঁহার পিতা প্রথমে এক ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের আপিসে অতি অল্প বেতনে কর্ম্ম করিতেন। কিন্তু কার্য্য-দক্ষতা ও সাধুতা বলে ক্রমে তিনি সেই আপিসেরই মুৎসুদ্দিপদ প্রাপ্ত হন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। গণেশচন্দ্র প্রথমে কলিকাতার বর্ত্তমান কলেজ স্কোয়ারের সন্নিকটে স্থাপিত তদানীন্তন সরকারী পাঠশালায় বিদ্যালাভ করেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউট' নামক শিক্ষায়তনে এবং তৎপরে 'বেঙ্গল একাডেমী' (The Bengal Academy) নামক বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই শেষোক্ত বিদ্যালয়টি তৎকালে চার্ল'স ডিক্রুজ (Charles D'cruz) নামক একজন ইয়োরোপীয় কর্ত্তৃক এতদ্দেশীয় ধনী ব্যক্তিদের সন্তানগণের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল ডাফটন (Doveton) কলেজে পড়েন। কিন্তু অল্পকাল পরেই কলেজ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে কিছুকাল রমানাথ লাহার নিকট শিক্ষানবীশি করিয়া ১৮৬৮ খ্রী॰ অব্দে ডবলু, এফ, গিলাণ্ডার্স (W, O F Gillanders) নামক এক সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া 'গিলাণ্ডার্স ও চন্দ্র' নামে এক আপিস স্থাপন করেন। তাহার চারি বৎসর পরে হাইকোর্টের ভকীল (Vakil) হইয়া স্বাধীন ভাবে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে গণেশচন্দ্র কলিকাতার অন্যতম অবৈতনিক বিচারপতি (Honorary Presidency Magistrate) নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুকালাবধি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এদেশবাসীদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম ডেপুটি শেরিফের পদ (Deputy Sheriff) প্রাপ্ত হন এবং ছয়বার পুনঃ নির্ব্বাচিত হন। ১৮৭৬ হইতে ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দ অবধি তিনি কলিকাতার অন্যতম মিউনিসিপ্যাল কমিশনার (Municipal Commissioner) ছিলেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এটর্নী পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত সদস্যের পদে নিযুক্ত থাকিয়া পরে উহার সম্মানিত সদস্য (Honorary Fellow) হন। দুই বৎসর তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (Bengal Legislative Council) সভ্য ছিলেন।

কলিকাতার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের (British Indian Association) তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য এবং কিছুকাল উহার সহঃ সভাপতি ছিলেন। কিছুকাল তিনি জাতীয় মহাসমিতির সহিতও যুক্ত ছিলেন। তদ্ভিন্ন 'পশু ক্লেশ নিবারণী সভা' (Society for the Prevention of

Cruelty to Animals); ভারতীয় বিজ্ঞানোৎকর্ষ বিধায়িনী সভা (Indian Association of the Cultivation of Science), বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা প্রভৃতি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। 'সম্মতি আইন' (Consent Act) ও ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের সময়ে তিনি সুবক্তা নামে খ্যাতি লাভ করেন। সাধুতা, সত্যবাদিতা, প্রভৃতি গুণের জন্য সমব্যবসায়ীদিগের মধ্যে সম্মানিত ছিলেন। তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, পরোপকারী ও সাহিত্যানুরাগী পুরুষ ছিলেন। গণেশচন্দ্রের পুত্র রাজচন্দ্র মিত্র মাত্র সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দের ৩রা জুলাই (১৩০৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ়) গণেশচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

গণেশ দৈবজ্ঞ—একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ পণ্ডিত। তিনি খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন তাঁহার পিতা কেশব দৈবজ্ঞও একজন খ্যাতনামা জ্যোতিষ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অঙ্ক লিখনের বামগতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি 'বুদ্ধি বিলাসিনী' নামে ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতীর একখানা টীকা প্রণয়ন করেন। গণেশের অপর কয়েকখানি পুস্তকের নাম 'বৃহত্তিথি চিন্তামণি,' 'গ্রহলাঘব,' অথবা 'তিথ্যাদি-পাত্র'। তিনি কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, তদ্বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়।

গতিগোবিন্দ—(১) মালিহাটী নিবাসী বৈষ্ণবাচার্য্য গোবিন্দ আচার্য্য 'গতি-গোবিন্দ' নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি 'গীত রত্নাবলী' নামে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করেন।

গতিগোবিন্দ—(২) নামে একজন পদকর্ত্তাও ছিলেন। তাঁহার রচিত একখানি পদ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। অন্য পরিচয় দুষ্প্রাপ্য।

গদাধর—তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাল্য সুহৃদ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া নীলাচল পথে ছত্রভোগাবিমুখে চলিয়া যান, সেই সময় তিনি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন।

গদাধর ঠাকুর—তিনি ত্রিপুরার অধি-পতি মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের পুত্র। এই গদাধরের পুত্র লবঙ্গঠাকুরকে লক্ষ্মণমাণিক্য উপাধি প্রদানপূর্ব্বক সমসের গাজী উদয়পুরের (ত্রিপুরার রাজধানী) সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন। সমসের গাজী দেখ।

গদাধর দাস—বাঙ্গালা মহাভারতের লেখক প্রসিদ্ধ কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ সহোদর। কৃষ্ণদাস, কাশীদাস ও গদাধর তাঁহারা এই তিন সহোদরই কবি ছিলেন। গদাধর দাস 'জগন্নাথ মঙ্গল' নামক গ্রন্থ রচনা করেন

(১৬৪২ খ্রীঃ)। কাশীরাম দাস দেখ।

গদাধর ন্যায়সিদ্ধান্তবাগীশ—এই অসাধারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিতের জন্মস্থান শ্রীহট্ট জিলা। তিনি নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির নিকট অধ্যয়ন সমাপন করিয়া নবদ্বীপেই চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার প্রণীত 'চিন্তামণি আলোক' ও 'দীধির টীকা' অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

গদাধর ভট্টাচার্য্য—তিনি খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীতে পাবনা জেলার লক্ষ্মীচাপড়া গ্রামের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জীবাচার্য্য। তিনি হরিরাম তর্কবাগীশের শিষ্য, জয়রামের গুরু, বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চাননের পরম গুরু ছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে—

হরির গদা, গদার জয়,
জয়ার শিশ্ব, লোকে কয়।

অর্থাৎ হরিরাম তর্কবাগীশের শিষ্য গদাধর ভট্টাচার্য্য, গদাধরের শিষ্য জয়রাম তর্কপঞ্চান, দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। গদাধর দেশে অধ্যয়ন শেষ করিয়া দেশ প্রচলিত নিয়মানুসারে মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ গমন করেন। তথায় অধ্যয়ন সমাপনান্তে দেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মৈথিল পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকে গ্রন্থাদি আনিতে দিতেন না। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন গদাধর অধীত সমস্ত গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে গ্রন্থ আনয়ন করিতে আর বাধা দিলেন না। এই প্রকারে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার কথা অচিরেই দেশময় ব্যাপ্ত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে বিদ্যার্থীরা তাঁহার নিকট অধ্যয়নার্থে আগমন করিতে লাগিল। তদবধি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য মিথিলা গমন প্রতিরোধ হইল। তিনি দ্বৈতবাদী ছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মনির্ণয় গ্রন্থে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

গদাধর ভট্টাচার্য্যকৃত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির নাম এযাবৎ পাওয়া গিয়াছে—(১) তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি প্রকাশিকা। (২) তত্ত্বচিন্তামণি ব্যাখ্যা। (৩) তত্ত্বচিন্তামণ্যাবোধ টীকা। (৪) মুক্তাবলী টীকা। (৫) রত্নকোষবাদ রহস্য। (৬) অনুমান চিন্তামণি দীধিতি টীকা (৭) আখ্যাত বাদ। (৮) কারকবাদ। (৯) নঞ্‌বাদ। (১০) প্রামাণ্যবাদ দীধিতি টীকা। (১১) বুদ্ধিবাদ। (১২) মুক্তিবাদ। (১৩) বিধিবাদ। (১৪) বিশ্-অয়তা বাদ। (১৫) ব্যুৎপত্তিবাদ। (১৬) শক্তিবাদ। (১৭) স্মৃতি সংস্কার বাদ। (১৮) শব্দ প্রামাণ্যবাদ রহস্য।

গদাধরী নামেই সাধারণতঃ খ্যাত তাঁহার গ্রন্থাবলী ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত। অন্যান্য প্রদেশের অনেক পণ্ডিত গদাধরকে 'গৌড়দেশীয় নৈয়ায়িক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গদাধর সিংহ — তিনি আসামের আহমবংশীয় নরপতি। তাঁহারা হিন্দুর আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে ইন্দ্রের বংশধর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই রাজার জীবন কাহিনী অতি বিচিত্র ঘটনার পরিপূর্ণ। খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আহম রাজপরিবারে ভীষণ অন্তর্বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। মন্ত্রী অর্থাৎ সেনাপতিগণ দলবদ্ধ হইয়া রাজশক্তির ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব অভিরুচী অনুসারে একজনকে সিংহাসন প্রদান করিতেন। অতি অল্পকাল মধ্যে ছয় জন রাজা সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তন্মধ্যে চারিজন নিহত হইলেন, একজন দুঃখে আত্মহত্যা করিলেন। ঐ সময়ে লরা নামে এক রাজা সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি রাজ্যস্থ ভাবী সিংহাসনাকাঙ্খী ব্যক্তি মাত্রেরই শরীরে ক্ষত চিহ্ন করিতে লাগিলেন। রাজ্যের সংস্কার অনুসারে ক্ষত যুক্ত ব্যক্তি রাজা হইতে পারেনা। গদাধরসিংহ রাজসিংহাসনের অধিকারী হইলেও লরা রাজার ভয়ে নাগা পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী জয়মতীর উপর স্বামীর সংবাদ জানিবার জন্য লরা রাজা অকথ্য অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু জয়মতী অম্লানবদনে অত্যাচার সহ্য করিয়াও স্বামীর কোন সংবাদ প্রদান করিলেন না। গদাধর ইহা শুনিয়া গোপনে জয়মতীর সহিত দেখা করিয়া তাঁহার সংবাদ বলিয়া নির্য্যাতন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জয়মতীকে অনুরোধ করিলেন। জয়মতী ঘৃণার সহিত স্বামীর এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া লরা রাজার অত্যাচারে প্রাণত্যাগ করিলেন। গদাধর আবার পলায়ন করিয়া এক গারো জাতিয়া স্ত্রীলোকের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার ভগিনীপতি কামরূপের রাজা তাহাকে স্বীয় আবাসে আনয়ন করেন। গদাধর তাঁহারই সাহায্যে লরা রাজাকে পরাস্ত করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। পলাতক অবস্থায় নানাস্থানে গুপ্ত ভাবে অবস্থান করিয়া প্রজাদের অবস্থা ভালরূপেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেজন্য রাজা হইয়াই তিনি, প্রজাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন। পলায়ন কালে তাঁহাকে যাহারা সাহায্য করিয়াছিলেন রাজা হইয়া তিনি তাঁহাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। রাজ্যের জমি জরিপ করিবার জন্য তিনি বঙ্গদেশ হইতে অভিজ্ঞ লোক আনয়ন

পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। হিন্দু ধর্ম্মের উন্নতির জন্য দেবালয় নির্ম্মাণ, দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর প্রদান প্রভৃতি কার্য্যে তিনি যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। প্রায় পনর বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি ১৬১৭ শকের ১৩ই ফাল্গুন (১৬৯৫ খ্রীঃ) পরলোক গমন করেন।

গদাহোশেন খন্দকার—এই বিখ্যাত দরবেশ সৈয়দ সুলতান নামক শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তার পুত্র। আরাকানরাজ একখানা উৎকৃষ্ট তরবারি সৈয়দ সুলতানকে উপহার দিয়াছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে গদাহোশেন তাহা পাইয়াছিলেন। এই ধার্ম্মিক ফকিরের শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি এই তরবারি সমসের গাজীকে উপহার দিয়াছিলেন। কথিত আছে তাঁহারই আশীর্ব্বাদে সমসের গাজী ত্রিপুরাধিপতি কৃষ্ণমাণিক্যকে পরাস্ত করেন। সমসের গাজী দেখ।

গন্ধরাদিত্য—চোলরাজ রাজাদিত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রাজাদিত্যের পরাজয় ও নিধনের পরে, চোলরাজ্যকে তিনিই রক্ষা করেন। রাষ্ট্রকোটপতি তৃতীয় কৃষ্ণ ৯৪৭ খ্রীঃ অব্দে চোলরাজ্য আক্রমণ করেন। এই সময়েই ভীষণ সমরে রাজাদিত্য পরাজিত ও নিহত হন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা গন্ধরাদিত্যের বীরত্বে সেবার রাজ্য রক্ষা পায়। কৃষ্ণ (৭) দেখ।

গন্ধর্ব্ব ভুঞা—বঙ্গদেশ হইতে যে সমস্ত কায়স্থ কামরূপে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

গন্ধর্ব্ব শ্রীচন্দন পাল, রাজা—তিনি নারায়ণগড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতিদের সামন্ত নরপতি ছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত গড় অমরাবতীর নিকটবর্ত্তী দিকনগর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়া উড়িষ্যায় গমন করেন। তৎকালে তথাকার গঙ্গাবংশীয় নরপতির মহিষী প্রসব বেদনায় কষ্ট পাইতে ছিলেন। গন্ধর্ব্ব সংবাদ শ্রবণে মহিষীকে একটী ঔষধ প্রদান করিলেন। তাহার ঔষধ প্রয়োগে মহিষী নির্ব্বিঘ্নে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করেন। তাহার প্রতিদানে রাজা তাঁহাকে মেদিনীপুর অঞ্চলে রাজ্য প্রদান করেন। খুরদার রাজা তাঁহাকে শ্রীচন্দন উপাধি প্রদান করেন। তিনি বহু জঙ্গলপূর্ণ ভূমি বাসের উপযুক্ত করিয়া প্রজা বসাইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম মধুমঞ্জরা ছিল। তিনি একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। ১২৬৪—১২৯৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৩২ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র

নারায়ণ বল্লভ শ্রীচন্দন পাল রাজা হন। কনিষ্ঠ পুত্র সদানন্দ বৃত্তিভোগী হন। তাঁহাদের বংশাবলী—(১) গন্ধর্ব শ্রীচন্দন পাল—১২৬৪—১২৯৬ খ্রীঃ (২) নারায়ণ বল্লভ শ্রীচন্দন পাল,—১২৯৬—১৩১৩। (৩) দেবী বল্লভ—১৩১৩—১৩২৯। (৪) হৃদয় বল্লভ—১৩২৯—১৩৪৮। (৫) ভবানী বল্লভ—১৩৪৮—১৩৭২। (৬) ভৃগুরাম—১৩৭২—১৩৯৫। (৭) শোভারাম—১৩৯৫—১৪০৩। (৮) কিশোর বল্লভ—১৪০৩—১৪৬৫। (৯) জগন্নাথ—১৪৬৫—১৪৯৬। (১০) গোবিন্দ বল্লভ—১৪৯৬—১৫১৮। (১১) শেখর বল্লভ—১৫১৮—১৫৮০। (১২) গোপী বল্লভ—১৫৮০—১৬১৩। (১৩) শ্যামবল্লভ—১৬১৩—১৬৭৯। (১৪) বলভদ্র—১৬৭৯—১৬৮৮। (১৫) রঘুনাথ—১৬৮৮—১৬৯৬। (১৬) লালমণি—১৬৯৬—১৭০৬। (১৭) ছাড়োরাম—১৭০৬—১৭০৮। (১৮) বংশীবল্লভ—১৭০৮—১৭১২। (১৯) বলরাম—১৭১২—১৭২৯। (২০) মধুসূদন—১৭২৯—১৭৪৪। (২১) পরমানন্দ—১৭৪৪—১৭৬০। (২২) পরীক্ষিৎ—১৭৬০—১৭৬৭। (২৩) রাজবল্লভ—১৭৬৭—১৭৮২। (২৪) কৃষ্ণবল্লভ—১৭৮২—১৮১২। (২৫) জগৎ বল্লভ—১৮১২—১৮৪৪। (২৬) পৃথ্বি বল্লভ—১৮৪৪—১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত।

গন্ধর্ব্ব সিংহ—তিনি বাঙ্গালার নবাব সরফরাজ খাঁর অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। আলীবর্দ্দী খাঁর সহিত, সরফরাজ খাঁর যুদ্ধে, তিনি স্বীয় প্রভুর পক্ষে সমরে যোগদান না করিয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থান করিতেছিলেন। সরফরাজ খাঁ যুদ্ধে নিহত হইলে তিনি আলীবর্দ্দী খাঁর পক্ষ অবলম্বন করেন।

গন্না বেগম—তিনি নবাব আলী কুলী-খাঁর কন্যা। অযোধ্যার উজির ইমাদ-উল-মুল্কের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি অতিশয় বিদুষী মহিলা ছিলেন। তাঁহার রচিত উৎকৃষ্ট কবিতা লোকেরা আগ্রহ সহকারে পাঠ করিত। তিনি ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১৮৯) পরলোক গত হন।

গফ হিউ (Viscount Gough)—ভারত প্রবাসী খ্যাতনামা ইংরেজ সেনাপতি। (জন্ম ১৭৭৯ খ্রীঃ)। শিক্ষা সমাপনান্তে মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সে তিনি সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, ও আরও অন্যান্য স্থানের যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া যশ ও সম্মান লাভ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের কিছু পূর্ব্বে ভারতে আগমন করেন এবং সৈন্য বিভাগে উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভারতের জঙ্গীলাট (Commander-in-Chief) হন, প্রথম শিখ যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনার

ভার লইয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক মুদকি, ফিরোজশহর, সোবরওন প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন (১৮৪৫ খ্রীঃ ডিসেম্বর হইতে ১৮৪৬ ফেব্রুয়ারী) তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিং (Lord Hardinge) ঐসকল যুদ্ধে তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতি ছিলেন। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধেও (১৮৪৮—৪৯ খ্রীঃ) তিনি সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। যুদ্ধ জয়ান্তে ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আরও নানারূপ সম্মান লাভ করেন এবং আজীবন বৃত্তির অধিকারী হন। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়

গবচন্দ্র—বর্ত্তমান জলপাইগুড়ীর প্রায় ছয় ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে ভিতরগড় নামক স্থানে ভবচন্দ্র রাজার বংশধরেরা রাজত্ব করিতেন। তিনি রাজবংশী জাতীয় ছিলেন। এই উন্মাদ ভবচন্দ্র রাজার মন্ত্রী গবচন্দ্রও জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে বহু অদ্ভুত গল্প বঙ্গ দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত আছে।

গবরীবাই—এই সাধ্বী রমণী নাগর ব্রাহ্মণবংশে গুজরাট প্রদেশে ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন তিনি বেদান্ত মতাবলম্বিনা ছিলেন। তাঁহার মধুর কবিতা বৈরাগ্যভাবে পূর্ণ এবং গুজরাত প্রদেশে খুব প্রচলিত।

গভনায়ক—তিনি কোচবিহারপতি নরনারায়ণের একজন সামন্ত নরপতি ছিলেন। সেনাপতি শুক্লধ্বজের মৃত্যুর পরে তিনি বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা নরনারায়ণ তাঁহাকে পরাজিত ও দেশবহিস্কৃত করেন। গভনায়ক চৌদ্দহাজার সৈন্যসহ আসামপতির শরণাপন্ন হন। গজল নামক স্থানে তাঁহার বাসস্থান স্থাপিত হয়।

গমার—তিনি নাথ পন্থী সম্প্রদায়ভুক্ত একজন সিদ্ধাচার্য্য। গোরক্ষনাথ ও অপাননাথ দেখ।

গম্ভীর—হারকুলের প্রতিষ্ঠাতা ইষ্টপাল ১০২৫ খ্রীঃ অব্দে অশির নগরের অধিপতি ছিলেন। তিনি আজমীরপতির সামন্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র চাঁদকর্ণ, চাঁদকর্ণের পুত্র হামির ও গম্ভীর। তাঁহারা আজমীরপতি পৃথ্বীরাজের সমস্ত যুদ্ধেই তাঁহার সহায় ছিলেন। রাজার আদেশে এই ভ্রাতৃযুগল জয়চাঁদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া সমর শয্যায় শয়ন করেন।

গম্ভীরনাথ—তিনি নাথপন্থী সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধাচার্য্য। শেষ জীবনে গোরক্ষপুরে গোরক্ষনাথের মন্দিরেই তিনি অবস্থান করিতেন।

গম্ভীর সিংহ—(১) তিনি মণিপুর রাজা মারজিতের ভ্রাতা। কাছাড়ের রাজা গোবিন্দচন্দ্র তাঁহাকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে মণিপুরপতি মারজিৎ কাছাড় আক্রমণ

করেন। সেই সময়ে গম্ভীর সিংহ স্বীয় প্রভু গোবিন্দচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ভ্রাতা মারজিতের পক্ষ অবলম্বন করেন। গোবিন্দচন্দ্র নিরুপায় হইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হন। এবং তাঁহাদের সহায়তায় পুনঃ রাজ্য লাভ করেন। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সময়ে গম্ভীর সিংহ ইংরেজ পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করেন এবং মণিপুর সংলগ্ন ব্রহ্মদেশের কাইবো প্রদেশ স্বীয় রাজ্য-ভুক্ত করিয়া লন। তিনি একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের পর তিনি মণিপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার শিশুপুত্র চন্দ্রকীর্ত্তি রাজা হইয়াছিলেন। (১০৭৩—৮৯ খ্রীঃ)।

গম্ভীর সিংহ—(২) তিনি কাশ্মীর-পতি কলসরাজের একজন সামন্ত নরপতি। তিনি কাণ্ডেশ প্রদেশের নরপতি ছিলেন। এই প্রদেশের অব-স্থান এখনও স্থির হয় নাই।

গয়াকর্ণ--তিনি জব্বলপুরের অন্তর্গত কুলস্থরীবংশীয় একজন রাজা। তাঁহার পিতার নাম যশকর্ণ দেব। তিনি ১১৫১—১১৫৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই বংশীয় পঞ্চদশজন ভূপতি ৮৭৫—১১৮০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

গয়পাল—তিনি একজন কাশ্মীরের সামন্ত নরপতি। নরপতি সুস্সলের সময়ে (১১১২—১১২৮ খ্রীঃ) বল্লাপুরের ঠাকুর গয়পাল, অন্যান্য সামন্ত ভূপালের সহিত মিলিত হইয়া, হর্ষদেবের পৌত্র ভিক্ষাচরকে কাশ্মীরের সিংহাসনে প্রতি-ষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু পরাক্রান্ত গয়পাল জ্ঞাতিদের ষড়যন্ত্রে অচিরে নিহত হন।

গয়াকশ্যপ—বৌদ্ধ মতে গয়াকশ্যপ নামে একজন অগ্নি উপাসক ছিলেন। শাক্যসিংহ তাহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বীয় মতে আনয়ন করেন, তখন তাহার নাম গয় হয়। হিন্দু মতে গয় নামক অসুরকে বিষ্ণু পরাজয় করেন।

গয়াড়—উড়িষ্যার করবংশীয় একজন নরপতি। তাহার পরে লোণভার রাজা হইয়াছিলেন।

গয়াড় তুঙ্গ—তিনি উড়িষ্যার তুঙ্গ-বংশীয় নরপতি। তাহার পিতার নাম শালতুঙ্গ। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীঃ একাদশ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ছিলেন এবং রোহিত-গিরিতে তাঁহারা বাস করিতেন।

গয়াধর—তিব্বত প্রবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি বৈশালীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি খুব সম্ভব খ্রীঃ একাদশ শতকে জীবিত ছিলেন। আহুত হইয়া তিনি তিব্বত গমন করেন এবং কয়েক বর্ষ তথায় অবস্থানপূর্ব্বক বহু বৌদ্ধ শাস্ত্র-

গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ তিনি বহু পরিমাণে স্বর্ণ প্রাপ্ত হন। কৃতজ্ঞ তিব্বতবাসীগণ তাঁহার প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া এখনও রক্ষা করিতেছেন। বর্ত্তমানে যে মূর্ত্তিটি তিব্বতের এক বৌদ্ধ মঠে রক্ষিত আছে, তাহা খুব সম্ভব খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়।

গয়াপাণি—আসাম প্রদেশের অন্যতম ধর্ম্মসংস্কারক শঙ্কর দেবের তিনি একজন অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকখান গ্রন্থও রহিয়াছে।

গয়াশ্রী—তাঁহার জন্মস্থান নেপালে ছিল। যে সমস্ত পণ্ডিত সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। শান্তরক্ষিত দেখ।

গরধন—তিনি যোধপুরের একজন নরপতি। তাঁহার জন্ম খীচিকুলে ছিল। তিনি একজন বিশ্বস্ত ও সাহসিক বীর ছিলেন। যোধপুরপতি রাণা অজিত-সিংহের পৌত্র ও ভক্তসিংহের পুত্র বিজয় সিংহের তিনি ধাত্রী ভাই ছিলেন। এই বিজয় সিংহ বলিতে গেলে একমাত্র তাঁহারই বুদ্ধি কৌশলে ও অর্থ সাহায্যে সমস্ত অন্তর্বিপ্লব হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। বিজয় সিংহ দেখ।

গরসিংহ—বিকানীরের স্থাপনকর্ত্তা মহারাজ বিকার নূনকর্ণ ও গরসিংহ নামে দুই পুত্র ছিল। বিকা ১৪৯৫ খ্রীঃ অব্দে জ্যেষ্ঠ নূনকর্ণের হস্তে রাজ্য-ভার সমর্পণ পূর্ব্বক পরলোক যাত্রা করেন। কনিষ্ঠ গরসিংহ, গরসিংহসর ও অরসিংহসর নামে দুইটী নগর স্থাপন পূর্ব্বক অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। গরসিংহের বংশ অতি বিস্তৃত লাভ করিয়া 'গরসেট বিক' নামে খ্যাত হইয়াছে। গরসিংহসর ও গরিদেসর নামক নগরদ্বয় তাহাদের ভূমি বৃত্তি। ইহাদের প্রত্যেকটার অন্তর্গত চতুর্ব্বিংশতি পল্লী রহিয়াছে

গরীবদাস—(১) মধ্যযুগে গরীবদাস নামে একাধিক সাধক উত্তর ভারতের নানাস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তি 'প্রেম ধর্ম্ম' প্রচার করেন। সাধক দাদূর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল গরীবদাস। মতান্তরে গরীবদাস দাদূর পালিত পুত্র। সে যাহাই হউক, তিনি দাদূরই মত সাধক ও কবি ছিলেন। তাঁহার চরিত গাথার সংখ্যা বত্রিশ হাজার বলিয়া কথিত হয়। তৎকালীন প্রসিদ্ধ হিন্দি কবি রহিমের সহিত শেষ জীবনে গরীব দাসের বিশেষ প্রণয় জন্মে। উভয়ে ভগবদ্ভক্ত, প্রেমিক ও সাধক ছিলেন।

গরীবদাস—(২) অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পঞ্জাবে গরীবদাস নামে একজন সাধক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাঠ কৃষকবংশীয় ছিলেন। তিনি

স্বনামীয় একটী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সম্প্রদায়ের গুরুরা গৃহস্থ জীবন যাপন করেন। তাহারা নারীকেও ধর্ম্মসাধন শিক্ষা দিতেন। আনুমানিক ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তিনি হিন্দু ও মুসলমানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। গুরুবাদ তিনি স্বীকার করিতেন না। তাঁহার রচিত বহু বাণী আছে। ঐসকল বাণীর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ভাবের পদ আছে।

গরীব নাথ—নাথ সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধযোগী। অপান নাথ দেখ।

গরুড়ধ্বজ—(১) মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকে ক্রমে তিনটী স্বাধীন রাজবংশ রাজত্ব করে। প্রথমতঃ ময়ূর ধ্বজ, তাম্রধ্বজ, হংসধ্বজ ও গরুর ধ্বজ নামে চারিজন ময়ূর বংশীয় রাজা এই স্থানে রাজত্ব করেন। তাঁহারা খুব প্রাচীন কালের। এই চারিজন ব্যতীত এই বংশের আর কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। তৎপরে কৈবর্ত্ত বংশ ও গঙ্গা বংশ এই স্থানে রাজত্ব করেন।

গরুড়ধ্বজ (২)—তিনি স্বাধীন ত্রিপুরার নরপতি উদয় মাণিক্যের সেনাপতি অরিভীমের পুত্র। অরিভীমের মৃত্যুর পরে তিনিই প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। গরুড়ধ্বজ তাঁহার নাম নহে, উপাধি মাত্র। গৌড়ের মুঘল সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া তিনি এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে এই নামেই তিনি অভিহিত হইতেন। তাঁহার প্রকৃত নাম এখনও অজ্ঞাত।

গরুড়ধ্বজ পাল—তিনি আসামের ছুটিয়াবংশীয় একজন রাজা। রত্নধ্বজ দেখ।

গরুড়নাথ—তিনি নাথপন্থী সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধপুরুষ। অপান নাথ দেখ।

গরুড়নারায়ণ সিংহ—ছোটনাগপুর প্রদেশের সিংহভূম জিলার পঞ্চকূট রাজ্য অবস্থিত ছিল। ইংরেজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে ধলভূম ও জঙ্গলমহলের রাজারা স্বাধীন ছিলেন। কোনও রাজার মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হইতেন। ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে জঙ্গলমহলের প্রধানতম রাজা পঞ্চকোটের রাজা গুরুড় নারায়ণ সিংহ পারিবারিক বিবাদে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিখনলাল পিতার বর্ত্তমানেই পরলোক গমন করেন। তৎপরে গরুড়নারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র মোহনলাল রাজা হন। কিন্তু ভিখনলালের পুত্র মুনিলালও দাবিদার ছিলেন। মুনিলাল দেখ।

গর্গ—(১) একজন জ্যোতির্ব্বিদ ঋষি। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের নাম গর্গ সংহিতা।

গর্গদেব—বঙ্গের অধিপতি ধর্ম্মপাল দেবের রাজ্যকালে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় গর্গদেব তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

ধর্ম্মপাল দেবের রাজত্বের শেষ ভাগে গর্গ দেবের পুত্র দর্ভপাণি তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালের সময়েও (৮৩৪—৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে) তিনি তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন।

গর্গ্য— পানিনীর পূর্ব্ববর্ত্তী একজন বৈয়াকরণিক পণ্ডিত।

গর্ভনাথ—তিনি নাথপন্থী সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ পুরুষ। অপাননাথ দেখ।

গাগাভট্ট— তিনি খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম দিনকর ভট্ট ও পিতামহের নাম রামকৃষ্ণভট্ট। তাঁহার পিতৃব্য কমলাকর ভট্টও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের প্রতিষ্ঠান নগরে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। গাগাভট্ট ১৬৭৪ খ্রীঃ অব্দে ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেকে পৌরহিত্যের কার্য্য করেন। তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কায়স্থ ধর্ম্মদীপ, জয়দেব প্রণীত চন্দ্রালোক গ্রন্থের 'রাকাগম' নামক টীকা তাঁহারই রচিত। চন্দ্রালোক একখানা অলঙ্কার শাস্ত্রের গ্রন্থ।

গাঙ্গ—মারবারপতি যোধপুরের প্রতিষ্ঠাতা রাণা যোধের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাণা শূরজমল্ল পিতার মৃত্যুর পরে রাজা হইয়াছিলেন। তিনি ১৫১৬ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গত হইলে, তাঁহার পৌত্র গাঙ্গ (শূরজমল্লের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাগের তনয়) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাতে গাঙ্গের পিতৃব্য শাগ তাঁহার ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। শাগই প্রকৃত উত্তরাধিকারী, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি একটী উপযুক্ত সহায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। স্বার্থে মানুষকে অন্ধ করে। দৌলত খাঁ লোদী নামক যে ব্যক্তি, দিল্লীর সম্রাট ইব্রাহিম লোদীর সর্ব্বনাশ সাধন করিবার, জন্য, মুঘল সম্রাট বাবরকে ভারতবর্ষে আসিতে আহ্বান করিয়াছিলেন, শাগ তাঁহারই সহায়তায় ভ্রাতুষ্পুত্র গাঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। দৌলত খাঁ রাজ্যটী দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে সমান অংশ দিতে চাহিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ইহাতে উভয়েই হীনবল হইয়া, পরিণামে তাঁহার পদানত হইবেন। গাঙ্গ ইহা বুঝিতে পারিয়া ঘৃণার সহিত দৌলত খাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। অচিরে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। শাগ সমর ক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। তাঁহার সাহায্যকারী দৌলত খাঁ পরাজিত ও অপমানিত হইয়া প্রস্থান করিলেন কিন্তু বীরবর বাবর এই সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাণা গাঙ্গ বীরবর রাণা সংগ্রাম সিংহের পতাকামূলে স্বদেশ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য মিলিত হইলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার পুত্র রায়মল্ল সমরে শয়ন করেন। এই পুত্রশোকেই তাঁহার

স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল। ১৫৩২ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে, মালবদেব সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

গাঙ্গু—পঞ্জাবের অন্তর্গত শালিবাহন-পুরের রাজা শান্তিবাহনের পঞ্চদশ পুত্রের অন্যতম। তাঁহারা সকলেই এক একটী স্বাধীন রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহারা খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

গাঙ্গেয় দেব—তিনি হৈহয় বংশীয় নরপতি দ্বিতীয় কোক্কল্যদেবের পুত্র। তাঁহাদের রাজ্য বর্ত্তমান জব্বলপুর অঞ্চলে ছিল। তিনি ১০২০ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। কীর (বর্ত্তমান কাঙ্গারা বা জ্বালামুখী), অঙ্গ (বর্ত্তমান ভাগলপুর), কুন্তল, উৎকল প্রভৃতি দেশ তিনি জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কর্ণদেব সপ্ততি বৎসর রাজত্ব করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। গাঙ্গেয়দেব ১০৪০ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

গাঙ্গেয় বিদ্যাধর—তিনি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। ১৫৬৫ শকে (১৬৪৩ খ্রীঃ) তিনি পঞ্চাঙ্গ বিদ্যাধরী, নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন।

গাজি উদ্দিন খাঁ—(১ম) তাঁহার পূর্ব্ব নাম মির সহাবউদ্দিন। তিনি কুলিশ খাঁ সদর উস সুদুরের পুত্র। ১৬৮৭ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৯৮) তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে সম্রাট আওরঙ্গজীব তাঁহাকে ফিরোজ জঙ্গ উপাধি প্রদান পূর্ব্বক আমির শ্রেণীতে উন্নিত করেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র নিজাম-উল-মুল্ক আসফ-জা দাক্ষিণাত্যের নিজাম রাজবংশের স্থাপয়িতা। বাহাদুর শাহের রাজত্ব-কালে তিনি গুজরাতের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৭১০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১২২) তিনি আহম্মদাবাদে পরলোক গমন করেন, কিন্তু দিল্লীর আজমীরী দরওয়াজার বাহিরে সমাহিত হন।

গাজিউদ্দিন খাঁ—(২য়) বিখ্যাত নিজাম উল-মুল্ক আসফ জার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সম্রাট মোহাম্মদ শাহ, নাদির শাহের ভারত ত্যাগের পরে তাঁহাকে আমির উল-ওমরার পদে নিযুক্ত করেন। কিছুকাল পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা নাসির জঙ্গ দাক্ষিণাত্যের রাজপদ লাভ করেন, কিন্তু তিনিও অচিরকাল মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইলে গাজিউদ্দিন স্বীয় রাজ্য অধিকার করিতে দিল্লী হইতে যাত্রা করেন। কিন্তু পথেই ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই অক্টোবর (হিঃ ১১৬৫, ৭ই জেলহিজ্জা) তিনি পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার পুত্র সাহাব্-উদ্দিন (পরে ইমাদ-উল-মুল্ক গাজিউদ্দিন খাঁ) রাজপদ লাভ করেন।

গাজিউদ্দিন খাঁ—(৩য়) তিনি গাজি

উদ্দিন খাঁ ফিরোজ জঙ্গের পুত্র এবং নিজাম-উল-মুল্ক আসফ জার পৌত্র। ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১৬৫) তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে নবাব সফদর জঙ্গের অনুরোধে সম্রাট আহাম্মদ শাহ তাঁহাকে ইমাদ-উল-মুল্ক গাজিউদ্দিন খাঁ উপাধি প্রধান পূর্ব্বক আমির শ্রেণীতে উন্নিত করেন। তিনি পরে উজির হইয়া স্বীয় প্রভু আহম্মদ শাহকে বন্দী ও অন্ধ করেন। তাঁহারই স্ত্রী প্রসিদ্ধ গন্নাবেগম। তাঁহার মৃত্যুকাল অবধারিত হয় নাই, কেহ কেহ বলেন ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে কাল্পিতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গাজিউদ্দিন হায়দর—অযোধ্যার নবাব সাদত আলি খাঁর দশ পুত্রের মধ্যে তিনিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দের ১১ই জুলাই (হিঃ ১২২৯, ২২শে রজব) তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসন লাভ করেন এবং পাঁচ বৎসর পরে ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দের ৯ই অক্টোবর শনিবার (হিঃ ১২৩৪, ১৮ই জিলহিজ্জা) তাঁহার অভিষেক হয়। অভিষেককালে যখন তিনি মণিমুক্তা খচিত মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া সিংহাসনে পদবিক্ষেপ করেন তখন চতুর্দ্দিকে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার স্বর্ণ রৌপ্য ও মণি মুক্তা দর্শকদের মস্তকে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল; অনেক ইউরোপীয় মহিলাও তাহা কুড়াইয়াছিলেন। তের বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই অক্টোবর (হিঃ ১২৪৩, প্রথম রবির ২৭শে) তিনি পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার পুত্র সুলেমান-জা-নাসিরউদ্দিন হায়দর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গাজি খাঁ তন্নরি—সম্রাট আকবরের রাজত্বকালীন একজন আফগান জাতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি একবার হিন্দু জমিদারদের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হন। সম্রাট বিদ্রোহীদের দমন করিয়া গাজি খাঁকে বধ করেন।

গাজি খাঁ বদক্ষি—সম্রাট আকবরের রাজ সভার একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ মৌলবী। মখডুম উল-মুল্ক, শেখ আবুল নবি, কাজি জালালউদ্দিন মুলতানি ও শেখ মবারক এবং গাজি খাঁ বদক্ষি এই কয়জন মৌলবী সম্রাট আকবরের ব্যবস্থাপিত নূতন ধর্ম্ম মতের ঘোষণা পত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। নিম্নে ঘোষণা পত্রখানি দেওয়া গেল। "আমরা এক মতাবলম্বী হইয়া মীমাংসা করিতেছি যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মুজ-তাহিদগণের পদ অপেক্ষা একজন সুলতান ই-আদিলের (ন্যায়পরায়ণ সম্রাটের) পদ শ্রেষ্ঠ। আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, ইসলামের, মনুষ্য জাতির আশ্রয়স্থল, বিশ্বাসিগণের নেতা ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া আবুল ফতে জালালউদ্দিন মোহাম্মদ

আকবর পাদশাহ গাজি (ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী করুন একজন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানী ও ঈশ্বরভীরু রাজা। অতএব মুজতাহিদগণের মধ্যে কোনও মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে যদি পাদশাহ স্বীয় তীক্ষ্ণ ধারণায় ও অভ্রান্ত বিচারে কোন এক পথ অবলম্বন করেন এবং মানবজাতির মঙ্গলবিধান ও পৃথিবীর উপযুক্ত পরিচালনার নিমিত্ত নিজে মীমাংসা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেই মীমাংসা সমস্ত জাতির ও আমাদের গ্রহণীয় বলিয়া আমরা এতদ্বারা স্বীকার করিতেছি। আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, পাদশাহ স্বীয় অভ্রান্ত বিচারে যদি কোরাণের অবিরোধী ও জাতির মঙ্গল বিধায়ক কোন আদেশ প্রচার করেন, তাহা হইলে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য গ্রহণীয় ও পালনীয়। এই আদেশের প্রতিকূলাচরণ পরলোকে অনন্ত নরক বিধান করিবে এবং ইহলোকে ধর্ম্ম ও উন্নতির ক্ষতিকারক হইবে। ঈশ্বরের গৌরব ও ইসলাম ধর্ম্মের বিস্তারের জন্য সাধু উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা পত্র লিখিত ও হিজিরা ৯৮৭ অব্দের রজব মাসে প্রধান প্রধান উলমা ও শাস্ত্রজ্ঞ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল।”

গাজিবেগ, তুরকান মির্জা—তাঁহার পিতা মোহাম্মদ জানিবেগ সিন্ধুদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পিতার মৃত্যুকালে তিনি সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক যুবক ছিলেন, তবু সম্রাট আকবর তাঁহাকে উক্তপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তিনি মুলতান প্রদেশও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গাগ্য—পানিনির পূর্ব্ববর্ত্তী একজন বৈয়াকরণিক পণ্ডিত।

গার্সিয়া দা ওর্টা—(Garcia da Orta) একজন পর্তুগীজ চিকিৎসক। ভারতে পর্তুগীজ প্রাধান্য লাভের প্রথমযুগে তিনি বোম্বাই নগরীতে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। প্রত্নতত্ত্ব ও উদ্ভিদ বিদ্যায় ও তাঁহার অধিকার ছিল। বোম্বাইর নিকটবর্ত্তী এলিফান্টা ও অন্যান্য গুহার বিবরণী সংবলিত একখানি পুস্তক তিনি রচনা করেন। তদ্ভিন্ন এদেশীয় বনৌষধি এবং নানা প্রকার বৃক্ষলতাদি বিষয়েও তিনি বিশেষ গবেষণা করেন।

গালব—পানিনির পূর্ব্ববর্ত্তী একজন বৈয়াকরণিক পণ্ডিত।

গালিব—তাঁহার প্রকৃত নাম মির্জা আসাদ উল্লা। তাঁহার কবিজন সুলভ নাম গালিব। তিনি ফিরোজপুরের ও লোহারের নবাব আহাম্মদ বকস খাঁর ভ্রাতা আলি বকস খাঁর পুত্র। তিনি একখানা কবিতা গ্রন্থ ও একখানা মুঘল রাজত্বের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১২৮৫) দিল্লী নগরে তিনি পরলোক গমন করেন।

গালিব আলী খাঁ—তিনি পারস্যের রাজকুমার। বাঙ্গালার নবাব মুরশিদ কুলি খাঁ উড়িষ্যার সুবাদার হইলে, তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ ঢাকার সুবাদার (শাসনকর্ত্তা) হন। কিন্তু তিনি ঢাকায় না যাইয়া প্রতিনিধি গালিব আলী খাঁকে তথায় প্রেরণ করেন। তিনি একজন ন্যায়বান শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সময়ে যশোবন্ত সিংহ দেওয়ান ছিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশী দিন চলিল না। সরফরাজের জামাতা অতি অকর্মণ্য মুরাদ আলী খাঁ গালিব আলী খাঁর স্থানে নিযুক্ত হইলেন। যশোবন্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুরশিদাবাদে চলিয়া গেলেন।

গিয়াসউদ্দিন (প্রথম)—তিনি ১২১২ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১২২৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার স্বাধীন নরপতি ছিলেন। তিনি পারস্যের অন্তর্গত ঘোরনগরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় অবস্থার উন্নতি বিধানার্থ প্রথমে মধ্য এসিয়ার অন্তর্গত তাতার প্রদেশে গমন করেন। তৎপরে ভারতবর্ষে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার দেশবাসী বক্তিয়ার খিলিজীর অধীনে একটী কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত বঙ্গদেশে আগমন করেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি গঙ্গোত্তরীর শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বক্তিয়ার খিলিজীর মৃত্যুর পরে মোহাম্মদ আজাউদ্দিন ও আলীমর্দ্দন খিলিজী ক্রমে বাঙ্গালার নবাব হইয়াছিলেন। আলীমর্দ্দন অতি অকর্ম্মণ্য নরপতি ছিলেন বলিয়া খিলজী সর্দ্দারগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া গিয়াসউদ্দিনকে সিংহাসন প্রদান করেন। গিয়াসউদ্দিনের পূর্ব্ব নাম হিসামউদ্দিন আর্ত্তজ ছিল। তিনি সুলতান হইয়া গিয়াসউদ্দিন উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার উন্নতি কল্পে যত্নবান হইলেন। তিনি একদিকে গৌড়নগর হইতে বীরভূমের অন্তর্গত নগর ও অপরদিকে দেবকোট পর্য্যন্ত একটী উচ্চ রাজপথ নির্ম্মাণ করাইলেন। ইহাদ্বারা জলপ্লাবন হইতেও দেশ রক্ষা পাইল। গৌড়নগরে একটী উৎকৃষ্ট মসজিদ, উচ্চ শিক্ষার্থ একটী সুরম্য বিদ্যা মন্দির ও একটী পান্থনিবাসও নির্ম্মাণ করিয়া তিনি নগরের সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সাহিত্য ও শিল্পের তিনি উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি শিক্ষিত ও ধার্ম্মিক লোকদিগকে প্রচুর মাসিক বৃত্তি দান করিতেন। প্রজারা তাঁহার ন্যায় বিচারে পরম সুখে কালযাপন করিত। তাঁহার নিকট ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী সকলে ন্যায় বিচার প্রাপ্ত হইত। তিনি দিল্লীর সম্রাটের

বশ্যতা স্বীকার না করায়, সম্রাট শামসউদ্দিন ইলতিমাস তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বিহারে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। গিয়াসউদ্দিন ৩৮টী হস্তী ও ৮৮সহস্র মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক সম্রাটের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন ; কিন্তু সম্রাট চলিয়া যাওয়া মাত্র, গিয়াসউদ্দিন সম্রাটের নবনিয়োজিত বিহারের শাসনকর্ত্তা মালীক আলাউদ্দিনকে পরাজিত করিয়া বিহার হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সম্রাট ইহাতে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র নাশিরউদ্দিনকে বহু সৈন্যসহ বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। গিয়াসউদ্দিন পূর্ব্ববঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে নাশিরউদ্দিন গৌড়নগর অধিকার করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া গিয়াসউদ্দিন সত্বর রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নগরের উপকণ্ঠে উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে গিয়াসউদ্দিন সদলে নিহত হন।

গিয়াসউদ্দিন (দ্বিতীয়)—তিনি ১৩৬৭—১৩৭৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। তিনি বঙ্গের অধিপতি সেকেন্দর শাহের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত একমাত্র পুত্র। প্রথম পত্নীর গর্ভে ১৭টী পুত্র জন্মিয়াছিল। বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ অপেক্ষা গিয়াসউদ্দিন সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি বিমাতাকে সন্দেহ করিয়া পিতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং তৎফলে অচিরে পিতা পুত্রে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে গিয়াসউদ্দিনের অনভিপ্রেত হইলেও সেকেন্দর শাহ্ আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। গিয়াসউদ্দিন পিতার মৃত্যুর পরে বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগকে অন্ধ করিয়া কারারুদ্ধ করেন। ইহার পরে তিনি আর কোন নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। ন্যায়পরায়ণতায় ও সুবিচারের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। কথিত আছে একদা তিনি তীর নিক্ষেপ করিয়া এক বিধবার পুত্রকে নিহত করেন। বিধবা কাজী সিরাজউদ্দিনের নিকট বিচার প্রার্থিনী হইলেন। কাজী সাহেব সুলতানকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। ন্যায়পরায়ণ সুলতান কাজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। কাজী বিধবাকে সন্তুষ্ট করিতে সুলতানকে আদেশ করিলেন। সুলতান বহু অর্থ প্রদানে বিধবার সন্তোষ সাধনপূর্ব্বক কাজীর আদেশ পালন করিলেন। কাজী সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন। সুলতানও এই ন্যায়পরায়ণ কাজীকে যথোচিতরূপে পুরস্কৃত করিলেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন, বিখ্যাত কুতব-উল আলমের সহপাঠী ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে বীরভুম নগরের অধি-

বাসী সাধু হামিদউদ্দিনের নিকট ঈশ্বর তত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ লাভ করিয়া ছিলেন। গিয়াসউদ্দিন অতি দক্ষতার সহিত ছয় বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র সীয়াফউদ্দিন বাঙ্গালার অধিপতি হইয়াছিলেন।

গিয়াসউদ্দিন, খাজা—তিনি হজরত আবুবকরের বংশধর ও কাজবিন নগরের অধিবাসী ছিলেন। সম্রাট আকবরের সময়ে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি খুব বিদ্বান্ ছিলেন; সেজন্য সম্রাট তাঁহাকে বকৃসির পদে নিযুক্ত করেন। গুজরাটের যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি খুব খ্যাতি লাভ করেন। তিনি সম্রাটের নিকট হইতে 'আলী খাঁ' ও 'আসফ খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৫৮১ খ্রীঃ অব্দে তিনি গুজরাতেই পরলোক গমন করেন।

গিয়াসউদ্দিন তোগলক (প্রথম)—তিনি অতি গরীবের সন্তান ছিলেন। ফেরিস্তার মতে, তাঁহার পিতা সম্রাট গিয়াসউদ্দিন বলবনের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার মাতা জাঠবংশীয় একজন হিন্দু রমণী ছিলেন। সিন্ধু দেশের পশ্চিমস্থ পার্বত্য প্রদেশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বাল্যকালে এক বণিকের সহিসের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই সময়ে আলাউদ্দিন খিলিজী দিল্লীর সম্রাট এবং তাঁহার ভ্রাতা উলুগ খাঁ সিন্ধু দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। গিয়াসউদ্দিন তাঁহার অধীনে সামান্য পিয়নের কাজে নিযুক্ত হন। তৎপরে অশ্বারোহী সৈনিকের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই সময়ে উলুগ খাঁর শুভ-দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। ক্রমে ক্রমে তিনি অশ্বশালার অধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হন। কুতবউদ্দিন খিলিজীর রাজত্বকালে তিনি পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন। দিল্লীর অকর্ম্মণ্য সুলতান কুতবউদ্দিন খিলিজী তাঁহার মন্দমতি প্রিয় পাত্র হাসন মালিক খুসরু কর্ত্তৃক নিহত হন। নীচ জাতীয় খুসরুর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া সম্ভ্রান্ত আমীর সকল গিয়াসউদ্দিনকে প্রতীকারার্থ আহ্বান করেন। গিয়াসউদ্দিন খুসরুকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজা হইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী রাজবংশের কেহই বর্ত্তমান ছিলেন না বলিয়া অমাত্যবর্গ তাঁহাকেই রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন।

তিনি রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া মাত্র চারি বৎসর (১৩২০—১৩২৫ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। তিনি এই অল্পকাল মধ্যেই রাজ্যে সুশৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের আত্মীয়স্বজনদিগকে নানা উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অমাত্যবর্গের

প্রতি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়া তাহাদের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সম্রাট আলাউদ্দিনের অবিবাহিতা কন্যাদিগকে সৎপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন; উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অনুসারে ন্যায় সঙ্গত ভাবে কর নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা বাহাদুর শা বিদ্রোহী হইলে, তিনি তাঁহাকে স্ববশে আনয়ন করেন। বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটী মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহারই পতনে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন গিয়াস-উদ্দিনের পুত্র মোহাম্মদ তোগলকের ষড়যন্ত্রেই তিনি নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র মোহাম্মদ তোগলক রাজা হইয়াছিলেন।

গিয়াসউদ্দিন তোগলক (দ্বিতীয়) — তিনি ফিরোজ শাহ তোগলকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফতে খাঁর পুত্র। ফতে খাঁ ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন। ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন পিতার বার্দ্ধক্য নিবন্ধন সম্রাট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অত্যাচারে রাজকর্ম্মচারীরা বিদ্রোহী হওয়ায় তিনি পলায়ন করেন। তখন বৃদ্ধ ফিরোজ শাহ স্বীয় পৌত্র (ফতে খাঁর পুত্র) তোগলিককে (পরে গিয়াসউদ্দিন) সিংহাসন প্রদান করেন। তিনি অতি অল্প বয়স্ক ছিলেন বলিয়া রাজকর্ম্মচারীরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। সুতরাং রাজ্যের সর্ব্বত্র অরাজকতা উপস্থিত হয়। ফিরোজের মৃত্যুর পরেই তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ মৃত পুত্র জাফর খাঁর তনয় আবুবকর গিয়াস উদ্দিনকে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়া, সিংহাসন অধিকার করেন। গিয়াসউদ্দিন নামে মাত্র ১৩৮৮ খ্রীঃ অব্দে কয়েক মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন।

গিয়াস উদ্দিন বলবন — এই অসাধারণ ভূপতি নানাবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন। তাঁহার প্রথম জীবনে তিনি ক্রীতদাস ছিলেন। সুলতান ইল্‌তিমাস তাঁহাকে ক্রয় করেন। তাহারই অনুগ্রহে তিনি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিলেন। সুলতান তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইল্‌তিমাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নাসিরউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করেন। বলবন ইল্‌তিমাস হইতে নাসিরউদ্দিনের সময় পর্য্যন্ত চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিশেষতঃ সম্রাট নাসিরউদ্দিনের সময়ে রাজ্যসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই সব কারণে নিঃসন্তান নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পরে, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলে সহজেই সকলে

বশ্যতা স্বীকার করিল। সেই সময়ে অনেক ক্রীতদাস ক্রমশঃ উচ্চ পদে আরূঢ় হইয়া অনেক রাজবংশের বিলোপ সাধন পূর্ব্বক স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন। এই জন্য বলবন সম্রাট হইয়া এই সমস্ত ক্ষমতাশালী ক্রীতদাসদের বিলোপ সাধনে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বৈবাহিক সূত্রে তাঁহার আত্মীয় ও স্বজন ছিলেন। তিনি আপন বংশকে নিরাপদ করিবার জন্য আপন পর নির্ব্বিশেষে কাহাকেও বিষ প্রয়োগে, কাহাকেও প্রকাশ্যে হত্যা করিয়াছিলেন। তিনি অতি কঠোর হস্তে অত্যাচারীর শাস্তি বিধান করিতেন। আমরা ফেরিস্তা ও তারিখ বদাযুনি হইতে কিছু অংশ সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

তাঁহার শাসনের বিরুদ্ধে কেহ বিদ্রোহী হইলে, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের ন্যায় কেবল নেতৃস্থানীয় লোকদিগকেই শাস্তি দিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন না, বিদ্রোহ সংলিপ্ত অতি সামান্য ব্যক্তিরও প্রাণদণ্ড বিধান করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে ভোজপুর ও বদায়ুনে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তিনি সহস্র সহস্র লোককে বধ করিয়া এই বিদ্রোহ প্রশমিত করেন। মেওয়াটের রাজপুতেরা বিদ্রোহী হইলে, তিনি তাঁহাদের এক লক্ষ লোককে তরবারি মুখে সমর্পণ করেন। এই মেওয়াটীরা দুর্দ্দান্ত দস্যু ছিল। তাহাদের অত্যাচারে লোকের ধন প্রাণ নিরাপদ ছিল না। এই বিদ্রোহ দমনের ফলে দেশে দস্যু ভয় বহুকাল পর্য্যন্ত অশ্রুত ছিল। তাঁহার রাজত্বের আর একটী প্রধান ঘটনা বাঙ্গালার বিদ্রোহ। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা তোগরিল প্রথম জীবনে তাতার দেশীয় ক্রীতদাস ছিলেন। সম্রাট বলবন তাঁহাকে ক্রয় করেন, এবং তাঁহারই অনুগ্রহে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া অবশেষে বাঙ্গালার সুবাদার হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বীয় উন্নতির সহায়তাকারী সেই সম্রাটকেই অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহী হইলেন। সম্রাট বলবন ইহা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি প্রথমে সেনাপতি মুলুক আবেকৃতিগিন আমীন খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আমীন খাঁ পরাজিত হইয়া অযোধ্যায় পলায়ন করেন। বলবন এই অপরাধের জন্য তাঁহাকে ফাঁসী কাষ্ঠে বিলম্বিত করেন। তৎপরে সুলতান সেনাপতি তিরমিনিকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরন করেন। তিনিও পরাজিত হন। ইহাতে সুলতান বলবনের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি এই বার বহু সৈন্যসহ স্বয়ং তাঁহাকে দমন করিতে গমন করিলেন। তোগরিল এবার ভয়ে পলায়ন করিলেন। তাঁহার সৈন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাঁহার মস্তক ছেদনপূর্ব্বক

সুলতানকে আনিয়া উপহার দিলেন। বলবন সত্বরগমনে গৌড়নগরে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ধন রত্ন, হয় হস্তী অধিকার করিলেন এবং তোগরিলের অনুচর, আত্মীয়স্বজন, এমন কি তাঁহার স্ত্রী পুত্রগণকে পর্য্যন্ত অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিলেন। তোগরিল একজন ফকিরকে শ্রদ্ধা করিতেন, এই অপরাধে তিনি শতাধিক অনুচর সহিত তাঁহাকে হত্যা করেন। ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের কোন সুলতান বিদ্রোহীর স্ত্রী পুত্রগণকে এইরূপ ভাবে হত্যা করেন নাই।

তিনি যেমন বিদ্রোহীদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতেন, তেমনই ন্যায়বান বিচারকও ছিলেন। বিচার কার্য্যে তিনি অনমনীয় ছিলেন। তাঁহার অতি নিকটতম আত্মীয়ও অন্যায় করিয়া অব্যাহতি পাইতেন না। ক্রীতদাস মালিক বরবক তাঁহার অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি চারি হাজারী মনসবদার ও বদায়ুনের জায়গীরদার ছিলেন। একদা সুরাপানে মত্ত হইয়া তিনি এক চাকরের প্রাণ সংহার করেন। ইহার কিছুদিন পরে সুলতান বদায়ুনে গমন করিলে, ভৃত্যের বিধবা পত্নী তাঁহার নিকট অভিযোগ করেন। সুলতান এই অপরাধে বরবককে বিধবার সম্মুখে হত্যা করিবার আদেশ দেন এবং যথা সময়ে ভৃত্যের লোমহর্ষণ নরহত্যার সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন না করায় তিনি গুপ্তচরদিগকে প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসি কাষ্ঠে বিলম্বিত করেন। হায়বত খাঁ সুলতান বলবনের একজন ক্রীতদাস ও কারবেগ ছিলেন। তিনিও একদা সুরা পানে মত্ত হইয়া এক ভৃত্যের প্রাণ সংহার করেন। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা সুলতানের নিকট অভিযোগ করিলে, তিনি তাঁহাকে পাঁচশত বেত্রাঘাত করিয়া মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। হায়বত খাঁ বহু অর্থ বিধবাকে প্রদান করিয়া রক্ষা পাইলেন বটে কিন্তু এই অপমানে আর গৃহের বাহির হইতেন না। রাজ্যের সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বত্র গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের ভয়ে কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে সাহসী হইত না। এই সদাশয় ও দানশীল সুলতান 'নিরাপদ ভবন' নামে একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তথায় বাস করিলে, তিনি তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতেন। কেহ কেহ বিপন্ন হইয়া এখানে আসিলে আশ্রয় প্রাপ্ত হইত। রাজ্যভ্রষ্ট ও দেশচ্যুত সপ্তদশ রাজপুত্র তাঁহার আশ্রয় ও বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সন্নিধানে অবস্থান করিতেন।

এই ন্যায়বান দানশীল সম্রাট রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি পররাজ্য বিজয়ে মনো-

যোগ না দিয়া, স্বীয় প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতেন। ফলতঃ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মুসলমান সম্রাটদের অন্যতম তিনি ছিলেন। তিনি দ্বাবিংশতি বৎসর (১২৬৫—১২৮৭ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি রাজপদের সম্মান, প্রভাব ও গৌরব বর্দ্ধনে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা আর সম্ভবপর ছিলনা। এই উচ্চ-মনা আদর্শ ভূপতি কখনও হীন কার্য্যে রত হইতেন না এবং অন্যকেও তদনুরূপ কার্য্যে প্রশ্রয় দিতেন না। কি আত্মীয় কি অনাত্মীয় কাহারও সহিত অত্যধিক ঘনিষ্টতা করিয়া, রাজমর্য্যাদা লাঘব করিতেন না। কোনও উৎসব উপলক্ষে তিনি যথেষ্ট আড়ম্বর করিতেন। আশ্রিত রাজন্যবর্গ তখন সিংহাসনের দক্ষিণ ও বাম পার্শে দণ্ডায়মান থাকিতেন। কেবল সৈয়দ বংশীয় দুই জন উপবেশন করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ সভায় নানাদেশীয় বহু বিদ্বান্ ব্যক্তি স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার সময়ে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তাঁহার রাজ সভাই জ্ঞান গরিমায় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহেদের প্রাসাদে প্রতি রজনীতে দার্শনিক, কবি ও ধার্ম্মিক বহু লোকের সমাগম হইত। বলবনের রাজত্বের শেষভাগে মুঘলেরা ভারতের উত্তর পশ্চিম ভাগে সমুপস্থিত হইল। সুলতান স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহেদকে তাহাদের দমনার্থ প্রেরণ করিলেন। তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। শাহেদের সৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল, রাজকুমার শাহেদ ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে একদল লুক্কায়িত মুঘল সৈন্য হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল। সুলতান বলবন এই সংবাদ শ্রবণে অতিমাত্র ব্যথিত হন। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র, বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নাসিরউদ্দিনকে নিকটে আহ্বান করিলেন। ইচ্ছা ছিল তাঁহাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করেন। কিন্তু রাজকুমার নাসিরউদ্দিন পিতার অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই বঙ্গদেশে প্রত্যাগত হন। পুত্রের এই ব্যবহারে অতিশয় দুঃখিত হইয়া অচিরেই তিনি দেহত্যাগ করি-লেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে নাসিরউদ্দি-নের অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র ময়জউদ্দিন কৈকুবাদ ১২৮৭ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গিয়াসউদ্দিন বাহমনী, সুলতান— তিনি দাক্ষিণাত্যের বাহমনী বংশের ষষ্ঠ নরপতি। ১৩৯৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি কয়েক মাস রাজত্ব করেন। তাঁহার পিতা মোহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পরে

তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেনাপতি লালচীন, মন্ত্রীপদ না পাইয়া নিরাশ হৃদয়ে তাঁহাকে অন্ধ করিয়া সাগর দুর্গে আবদ্ধ করেন এবং তাঁহার পিতৃব্য সামসউদ্দিনকে সিংহাসন প্রদান করেন। আলাউদ্দিন হুশেন গঙ্গো বাহমনী দেখ।

গিররাজ—তিনি যশল্মীরের অধিপতি কেহুড়ের বংশধর। তাঁহার পিতার নাম চোহীর। গিররাজসর নামে একটী নগর ও দুর্গ স্থাপন করিয়া তথায় তিনি বাস করিতেন। ইহা এক্ষণে বিকানীর রাজ্যের অন্তর্গত।

গিরি—(১) শঙ্করাচার্য্যের প্রধান শিষ্য তোটকাচার্য্যের পূর্ব্ব নাম। তোটকাচার্য্য দেখ।

গিরি—(২) শঙ্করাচার্য্যের অন্যতম প্রধান শিষ্য মণ্ডন মিশ্র। তাঁহার শিষ্য গিরি, পর্ব্বত ও সাগর। তাঁহারা সকলেই এক একটী সম্প্রদায়ের নেতা। গিরির লক্ষণ—

বাসোগিরিবরে নিত্যং গীতাভ্যাসেহি তৎপরঃ।
গম্ভীরাচল বুদ্ধিশ্চ গিরি নামা স উচ্যতে॥

যিনি নিত্য গিরি নিবাসী, গীতাভ্যাসে তৎপর, গম্ভীর ও অবিচলিত বুদ্ধিবিশিষ্ট তাঁহাকে গিরি বলা যায়। জোষী মঠে ইহার শিষ্য প্রণালী প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

গিরিজা নাথ মুখোপাধ্যায়—বাঙ্গালী কবি ও সাংবাদিক। তাঁহার পিতা যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিষয়ক বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক গুলি এককালে বিশেষ আদৃত ছিল। এফ্-এ (First Arts) পর্য্যন্ত শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি পিতৃ প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য সমাজ' নামক পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করে। তৎপরে, মৃত্যুকালাবধি 'বার্ত্তাবহ' নামক সংবাদ পত্র পরিচালনা করেন।

গিরিজানাথ সুকবি ছিলেন। নবীন চন্দ্র, অক্ষয়কুমার (বড়াল) প্রভৃতির সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল এবং তাঁহারা গিরিজানাথের কবি প্রতিভার সমাদর করিতেন। ১৩৪১ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

গিরিজানাথ রায়(মহারাজা)—দিনাজপুরেরখ্যাতনামা ভূম্যধিকারী। ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে (১২৬৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়ক্রমকালে দিনাজপুর রাজবংশীয় মহারাজা তারকানাথের পত্নী শ্যামমোহিনী গিরিজানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। মহারাণীর যত্নে গিরিজানাথ সুশিক্ষা লাভ করেন। তিনি কয়েক বৎসর কাশীর বিখ্যাত কুইন্স্ কলেজে (Queen's College) অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

গিরিজানাথ কুস্তী, অশ্বারোহণ,

অস্ত্রচালনা প্রভৃতি পুরুষোচিত ব্যায়ামে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ললিত কলার মধ্যে সঙ্গীতেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত রসজ্ঞ ছিলেন।

বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। নিজেও বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সাহায্যে দীর্ঘকাল ঐসকল শাস্ত্র আলোচনা করেন। তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সহিত প্রথম হইতেই ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। কায়স্থ সমাজের সকল প্রকার আন্দোলনাদির সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল।

জনহিতকর বহুকার্য্য তিনি সম্পন্ন করেন। বিদ্যালয় স্থাপন, ধর্ম্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা, সংস্কৃত টোল, বিদ্যালয়াদি সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাস, বয়ন বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা এবং খাল ও কূপ খনন, রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহু সৎকার্য্য তাঁহার জীবিতকালেই সম্পন্ন হয়। তিনি দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি, ও বহুকাল পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি মহারাজা বাহাদুর এবং ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে কে-সি-আই-ই (K. C. I. E.) উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৩২৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে (১৯১৯ খ্রীঃ ডিসেম্বর)-তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তাহার দত্তক পুত্র জগদীশনাথ রায় তাঁহার সম্পত্তি লাভ করেন।

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বি, এল্ — বরিশাল জিলার অন্তর্গত সিদ্ধকাটী গ্রামে বৈদ্যবংশে ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। প্রথমে সিদ্ধকাটী গ্রামের স্কুলে পরে বরিশাল জিলা স্কুলে, ও অবশেষে কলিকাতা সিটি কলেজ স্কুল হইতে প্রবেশিকা, সিটি কলেজ হইতে এফ, এ, প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এ, পাশ করেন। তৎপরে বি, এল পরীক্ষা পাশ করিয়া কিছু দিন বরিশালের জজকোর্টে ও পরে কলিকাতা হাইকোর্টে তিনি ওকালতি করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'গৃহলক্ষ্মী প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ', বঙ্কিমচন্দ্র, ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ, হিতকথা, দম্পতীয়, পত্রালাপ প্রভৃতি। এই উদীয়মান গ্রন্থকার অকালে মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে ১৩০৫ বাঙ্গালার ২২শে ভাদ্র পরলোক গমন করেন। তাঁহার "বঙ্কিমচন্দ্র" নামক বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থের সমালোচনপূর্ণ গ্রন্থ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম-এ —তিনি 'নব বিভাকর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ভারতের বড়লাট লর্ড লিটন মুদ্রাযন্ত্র আইন প্রণয়ন করিয়া দেশীয় পত্রিকার লিখিবার স্বাধীনতা হরণ করেন। সেই দুঃখে 'সোম-

প্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার পত্রিকা বন্ধ করিয়া দেন। এই সময়ে গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহাশয় নববিভাকর পত্রিকা গিরিজা ভূষণের সহযোগে প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা মাত্র এক বৎসর চলিয়াছিল। তৎপরে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সাধারণী পত্রিকার সহিত মিলিত হইয়া যায়।

গিরিজা সুত—তিনি একজন গণপতি উপাসক সম্প্রদায়ের লোক। শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বীয় মতে আনয়ন করিয়া শিষ্য করিয়াছিলেন।

গিরিধর—(১) তিনি একজন পদকর্ত্তা। তিনি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থ পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন।

গিরিধর—(২) নীরভট্টের পুত্র গিরিধর একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। 'জগন্মণি' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

গিরিধর কবিরায়—মধ্যযুগের একজন প্রতিভাশালী হিন্দি কবি। তিনি হিন্দি কবিতায় বহু নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন। 'কুড়লিয়া' নামে খ্যাত হিন্দি কবিতাগুলি সমধিক আদৃত। তাঁহার পত্নীও প্রতিভাশালিনী কবি ছিলেন। তাঁহার কবিজন সুলভ নাম ছিল সাঁই।

গিরিধর দাস—(১) তিনি দিল্লীর অধিবাসী। তিনি বাল্মীকির মূল রামায়ণ হিন্দী পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন।

গিরিধর দাস—(২) তিনি 'স্মরণমঙ্গল সূত্র' পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

গিরিধর, দ্বিজ — প্রাচীন বাঙ্গালী পাঁচালীকার। তিনি খুব সম্ভব বঙ্গাব্দের একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকুলজাত ছিলেন। তিনি সত্যপীরের একখানি পাঁচালী রচনা করেন। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত ভারুহা গ্রামে তাঁহার বাস ছিল।

গিরিধারী মিশ্র—'দৃগ্‌গোল বর্ণন' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ এই পণ্ডিতের বিরচিত।

গিরিধারীলাল রায়—দিল্লীর মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের (১ম) সময়ে ১৭০৯ খ্রীঃ অব্দে, পঞ্জাবে শিখে ও মুসলমানে ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছিল। সেই সময়ে রংপুরের তাজহাটের জমিদার বংশের কোনও পূর্ব্বপুরুষ স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক বঙ্গদেশে আগমন করেন। এই বংশেই গিরিধারীলালের জন্ম হয়। তিনি অতি প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। তিনি বহু আয়াস স্বীকার করিয়া স্বীয় ভাগিনেয়ের বিপুল সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উদ্ধার করেন। তৎপরে তিনিই সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে, তাঁহার স্বনামধন্য পুত্র

রাজা গোবিন্দলাল রায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। গোবিন্দলাল রায়, রাজা দেখ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১) বাঙ্গালা দেশের ইংরাজি শিক্ষার প্রথম যুগের খ্যাতনামা সাংবাদিক। ১২৩৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে কলিকাতা সহরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস নদীয়া জিলায় ছিল। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদের অনেকে নদীয়া রাজ সরকারে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। গিরিশ চন্দ্রের বাল্য শিক্ষা প্রধানতঃ প্রসিদ্ধ ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতেই (Oriental Seminary) হয়। তিনি অতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁহার অপর দুই ভাইও ঐ বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং ইংরেজী ও ফরাসী এই দুই পাশ্চাত্য ভাষায় তাঁহাদের বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল।

মাত্র পনের টাকা বেতনের একটী কেরাণীর কাজ লইয়া গিরিশচন্দ্রের কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। কিন্তু কর্ম্মদক্ষতা ও পরিশ্রমশীলতার গুণে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে করিতে তিনি উচ্চ পদ লাভ করেন। দেশবিখ্যাত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ সময়ে তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম প্রীতি ও সৌহার্দ্দের বন্ধন ছিল।

ছাত্র অবস্থাতেই সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি রচনা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ঐসময়েই গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার অপর কয়েকজন সহাধ্যায়ী মিলিত হইয়া একখানি হস্তলিখিত পত্রিকা প্রকাশ করেন কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়া কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' (The Hindu Intelligencer), কৈলাসচন্দ্র বসু সম্পাদিত 'লিটারারী ক্রনিকেল' (Literary Chronicle) প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ লিখিতেন। গিরিশচন্দ্রের অন্যতম অগ্রজ শ্রীনাথ ঘোষ যখন বেঙ্গল রেকর্ডার নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৫০ খ্রীঃ) তখন তিনি ঘনিষ্ট ভাবে উক্ত পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিছুকাল পরে উহা বন্ধ হইয়া যায়। তাহার কিছু পরে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (The Hindoo Patriot) পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা প্রথমাবধি উহার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তিন বৎসর পরে উক্ত পত্রিকার সম্পাদন ভার হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হস্তে অর্পিত হয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্র উহার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর কিছুকাল গিরিশচন্দ্র উহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই কার্য্যে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। কয়েক বৎসর পর ঐ পত্রিকার কর্ত্তৃত্ব ভার

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের হস্তে পড়ে। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে গিরিশচন্দ্র "বেঙ্গলী" (The Bengalee) পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন' (Mukherjee's Magazine) প্রকাশ করেন। গিরিশচন্দ্র তাহারও একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। তদ্ভিন্ন 'ক্যালকাটা মান্থলি' (The Calcutta Monthly) নামক পত্রিকায় তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইত। উহাতে সিপাহী বিদ্রোহে জন্য উত্তেজিত এদেশবাসী ইংরেজদিগকে উপলক্ষ করিয়া যে সকল প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেন, তৎফলে তিনি ইংরেজদিগের বিশেষ বিরাগ ভাজন হন।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন (The British Indian Association) প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পকাল পরেই তিনি উহাতে যোগ দেন। তদ্ভিন্ন ডালহৌসী ইনষ্টিটিউট (Dalhousie Institute), বেথুন সোসাইটি Bethune Society) প্রভৃতি বিদ্বজ্জন পরিষদের সহিতও তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং উৎসাহের সহিত তাহাদের কার্য্য পরিচালনাতে সাহায্য করিতেন।

বাগ্মীরূপেও গিরিশচন্দ্র বিশেষ খ্যাত ছিলেন। জনহিতকর নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিয়া তিনি নানাভাবে আপনার বিবিধ শক্তির পরিচয় প্রদান করেন।

১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতার সন্নিকটস্থ বেলুড় গ্রামে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তথায় স্থানীয় বিদ্যালয়ের পরিচালক (Secretary), রূপে বিদ্যালয়ের নানারূপ উন্নতি বিধান করেন। তথায় তিনি ছাত্রদের তর্কসভা (Debating Society) স্থাপন করেন। দীর্ঘকাল হাওড়া পুরতন্ত্রের (Municipality) সদস্য থাকিয়া, বহু জনহিতকর কার্য্য সম্পাদন করেন। হাওড়া ক্যানিং ইনষ্টিটিউশন (Canning Institution), 'উত্তরপাড়া হিতকারিনী সভা" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিয়া তিনি যে সকল বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান অথবা প্রবন্ধাদি পাঠ করেন, সে সমুদয়ই বহু উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজ রাজপুরুষদেরও প্রশংসা লাভ করে।

১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে উড়িষ্যায় এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গিরিশচন্দ্র তখন নিজ "বেঙ্গলী" পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়া তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে, অল্পদিনের পীড়ায় এই উদীয়মান প্রতিভাশালী মনীষী ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে (১২৭৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন) পরলোক গমন করেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—(২) বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালার খ্যাতনামা নাট্যকার ও অভিনেতা। তাঁহার পিতার নাম নীলকমল ঘোষ। কলিকাতার উত্তরাংশে বাগবাজার বসুপাড়া লেনের পৈত্রিক ভবনে ১২৫০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে (১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দ) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা নদীয়া কৃষ্ণনগরে বাস করিতেন। গিরিশচন্দ্রের পিতা এক ইংরেজ সওদাগরী আপিসে হিসাবনবীশ ছিলেন। তৎকালে সুদক্ষ পরিশ্রমী সত্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারী বলিয়াও তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিপত্তি সাহেব ও বাঙ্গালী মহলে ছিল।

পল্লীর পাঠশালায় প্রথমে গিরিশচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। তৎপরে কিছুকাল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে (Oriental Seminary) ও পরে হেয়ার স্কুলে (Hare School) ও অন্যান্য কয়েকটি বিদ্যালয়ে তাঁহাকে পড়িতে হয়। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বাঙ্গালী মনস্বীগণ বিভিন্ন সময়ে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। কৈশোরেই পিতৃবিয়োগ ও নানারূপ পারিবারিক দুর্ঘটনায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহার বহু দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। কিন্তু অধ্যয়ন স্পৃহা তাঁহার দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ছিল। তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্যকাল হইতেই পৌরাণিক আখ্যায়িকা পাঠ অথবা তৎসংক্রান্ত যাত্রাগান তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। নিজ পল্লীস্থ এক বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমাদর দর্শনে কবি খ্যাতি লাভ করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ স্পৃহা জন্মে। তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই খ্যাতনামা ইংরেজ কবিদের সহজ সহজ কবিতা বাঙ্গালা ছন্দে অনুবাদ করিয়া কাব্য রচনার ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেন।

যৌবনের প্রারম্ভেই অভিভাবকহীন অবস্থায় থাকার জন্য পল্লীর নিষ্কর্ম্মা যুবকদের সংশ্রবে পড়িয়া গিরিশচন্দ্র কিয়ৎ পরিমাণে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি হইয়া পড়েন। তাঁহার শ্বশুর তাহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহারই পিতার আপিসে তাঁহাকে একটি চাকুরী দেন।

গিরিশচন্দ্রের যৌবনকালে কলিকাতার বিশিষ্ট সমাজে পাশ্চাত্য নাটকের অনুকরণে অভিনয় (থিয়েটার) করার এক বিশেষ প্রাবল্য দেখা গিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র তাহার প্রভাব হইতে মুক্তি পান নাই। তিনি প্রথমে কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে মাইকেল মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক খানিকে যাত্রার পালারূপে গ্রহণ করিয়া অভিনয় করেন। ঐ পালার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কয়েকটি সঙ্গীতও রচনা করিতে হয়। বৎসরাধিক কাল পরে গিরিশচন্দ্রের বন্ধুবর্গকে লইয়া দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'

থিয়েটাররূপে অভিনয় করেন। তাঁহাদের অভিনয় এরূপ প্রশংসা লাভ করে যে অল্পকাল পরেই তাঁহাদিগকে বহুস্থানে ঐ অভিনয় করিতে হয়। উক্ত অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র নিমচাঁদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অসামান্য খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাঁহারা দীনবন্ধু মিত্রেরই 'লীলাবতী', 'নীলদর্পণ' প্রভৃতি অভিনয় করিয়া একাধারে নাট্যামোদী ব্যক্তিদের আনন্দ বিধান ও নিজেদের অভিনয় নৈপুণ্যের সাক্ষ্য প্রদান করেন। 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় করিবার জন্য তাঁহারা নিজেদের চেষ্টায় একটি অভিনয় মঞ্চ প্রস্তুত করেন। শ্যামবাজারস্থ রাজেন্দ্রলাল পালের বাটীতে ঐ রঙ্গমঞ্চ ১২৭৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাই কলিকাতার দেশীয় ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গমঞ্চ। পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রের নাট্য সম্প্রদায় দি বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার (The Baghbazar Amateur Theatre) নামে পরিচিত ছিল। রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রথমে উহার নাম হয় 'দি ক্যালকাটা ন্যাশান্যাল থিয়েটার' (The Calcutta National Theatre)। পরে শুধু 'ন্যাশান্যাল থিয়েটার' নাম হয়। এযাবৎ এই সম্প্রদায় বিনাদর্শনীতেই সকলকে অভিনয় দর্শন করিবার সুযোগ দিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু গিরিশ বাবুর সহকর্ম্মীদের মধ্যে কেহ কেহ অভিনয় প্রদর্শনের জন্য দর্শনীর ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হওয়ায় তিনি উহার সংশ্রব কিছুকালের জন্য ত্যাগ করেন। পরে আবার মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ভীমসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। মাইকেল স্বয়ং সেই অভিনয় ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন এবং অভিনয়ান্তে গিরিশচন্দ্রের অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন।

গিরিশচন্দ্র যে সওদাগরী আপিসে কর্ম্ম করিতেন, তাহার প্রধান অধ্যক্ষের সহিত এক ইয়োরোপীয় মহিলার বিশেষ পরিচয় ছিল। সেই মহিলা অভিনয়দক্ষা ও নাট্যামোদী ছিলেন। তাঁহার সহিত পরিচয়ের ফলে, গিরিশচন্দ্র কলিকাতাস্থ ইয়োরোপীয় সম্প্রদায়ের সখের (Amature) অভিনয় দর্শন করিবার বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হন এবং তদ্দ্বারা নিজের অভিনয় ক্ষমতার উন্নতি সাধনেরও সাহায্য লাভ করেন। পূর্ব্বোক্ত ন্যাশান্যাল থিয়েটার বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে উহার শেষ অভিনয় হয়। গিরিশচন্দ্র উহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন না। সঙ্গীতাদি রচনা, অভিনয় সম্পর্কে পরামর্শাদি দান ভিন্ন স্বয়ং কোনওরূপ আর্থিক দায়ীত্ব তাঁহার ছিল না। কয়েক মাস পরে সিমুলিয়ার শরচ্চন্দ্র ঘোষ নামক

একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি, মাইকেল মধুসূদন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহানুভূতি লাভে উৎসাহিত হইয়া 'বেঙ্গল থিয়েটার, নামে একটী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময় হইতে নাটকান্তর্গত স্ত্রী চরিত্র অভিনয়ের জন্য বারবনিতাদিগকে নিযুক্ত করার প্রথা প্রচলিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় উহার বিশেষ বিরোধী ছিলেন এবং তজ্জন্য নাটকাভিনয়ে তাঁহার সহানুভূতি থাকিলেও বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত কোনও সংশ্রব রাখেন নাই। তাহার কিছুকাল পরে বাগবাজারের ভুবন মোহন নিয়োগী 'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার' (The Great National Theatre) নামে এক রঙ্গালয় স্থাপন করেন। খ্যাতনামা অভিনেতা অমৃতলাল বসু উহার সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিণী' নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া অভিনীত হয়। গিরিশ চন্দ্র উহাকে নাট্যরূপ প্রদান করেন এবং অভিনয়ে স্বয়ং 'পশুপতি'র ভূমিকা অভিনয় করেন। তৎপরে বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসও গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাট্যাকারে গ্রথিত হইয়া ঐ স্থানেই অভিনীত হয় (১৮৭৪ খ্রীঃ)। গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ভুবন বাবু উহা যথাযথ ভাবে পরিচালনা করিতে না পারিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে গিরিশচন্দ্রকে উহা জমা (lease) দেন। গিরিশচন্দ্র উহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় ন্যাশন্যাল থিয়েটার রাখেন।

এই সময়ের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে তদানীন্তন যুবরাজ (পরে সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ড) ভারত ভ্রমণে আগমন করেন। তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইলে, কলিকাতার একজন বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় যুবরাজকে স্বগৃহে আহ্বান করেন এবং পুরমহিলাগণের দ্বারা সম্পূর্ণ দেশীয় প্রথায় তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। এই ঘটনায় দেশে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। জগদানন্দকে বিদ্রূপ করিয়া উপেন্দ্রনাথ দাস "গজদানন্দ" নামে একখানি প্রহসন রচনা করেন এবং উহা গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। ইহাতে আন্দোলন আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং রাজশক্তির সাহায্যে উহার অভিনয় বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। ঐসময়ে আরও কয়েক খানি প্রহসন রচিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কোনওটিতে কলিকাতার উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগকে বিদ্রূপ করা হয়। এই সকলের ফলে ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে এক অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন (Drama-

tic Performance Control Act) বিধিবদ্ধ হয়।

১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে গিরিশচন্দ্র প্রথমে নিজে রঙ্গালয় ভবন জমা (lease) লইয়া ব্যবসায় হিসাবে থিয়েটার পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। তাহার পূর্ব্বে আরও কয়েকজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐভাবে থিয়েটার পরিচালনা করিতে যাইয়া ঋণগ্রস্ত হওয়ায় গিরিশচন্দ্রের অনুজ অতুলকৃষ্ণ শঙ্কিত হন। পারিবারিক সদ্ভাব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য, গিরিশচন্দ্র প্রতিশ্রুতি দেন যে, ভবিষ্যতে তিনি কোনও থিয়েটারের সহিত আর্থিক কোনওরূপ দায়ীত্ব রাখিবেন না। তদবধি মিনার্ভা, ষ্টার, এমারেল্ড, ক্লাসিক প্রভৃতি বহু থিয়েটারে তিনি বেতনভুক্ পরিচালক (manager) রূপে কাজ করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ষ্টার থিয়েটার যখন প্রথম বিডন ষ্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হইলেও স্বত্বাধিকারীর কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে শেষবার তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে কাজ করিতেন।

গিরিশচন্দ্র নাট্য প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর ছিল। অভিনয় ভিন্ন নাটক রচনাতেও তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। পূর্ব্বজ কবি ও সাহিত্যিকদের কাব্য উপন্যাসাদিকে নাটকাকার প্রদান করিতে তিনি বিশেষ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার নিজ লিখিত "সিরাজদ্দৌল্লা", "মীর কাশিম", "শঙ্করাচার্য্য", "বুদ্ধদেব", "চৈতন্য লীলা", "অশোক", "কালাপাহাড়", "ছত্রপতি" প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকগুলি; "বলিদান", "শাস্তি কি শান্তি", "প্রফুল্ল", "গৃহলক্ষ্মী", "বিল্বমঙ্গল" প্রভৃতি সামাজিক নাটক; "পাণ্ডব গৌরব", "জনা", "দক্ষযজ্ঞ", "প্রভাস-যজ্ঞ" প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যের রত্নস্বরূপ। পাশ্চাত্য মহাকবি সেক্সপীয়ারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক "ম্যাকবেথ" তিনি যেরূপ কৃতিত্বের সহিত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন যে, তাহা সকল সুধীজনের অযাচিত প্রশংসা লাভ করে। এমন কি কলিকাতার ইংরেজ পরিচালিত দৈনিক সংবাদ পত্র (অধুনালুপ্ত) "ইংলিশম্যান" (The Englishman) ত উহার অনুবাদ কৃতিত্ব ও অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। হাইকোর্টের জজ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ, স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত 'ইণ্ডিয়ান নেশন' (The Indian Nation) সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ বিদ্বজ্জনমণ্ডলী একবাক্যে উহার প্রশংসা করিয়া, বলেন ফরাসী ভাষায় ঐ নাটকের যে অনুবাদ আছে তদপেক্ষা গিরিশচন্দ্রের বাঙ্গালা অনুবাদ উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম, দুর্গেশনন্দিনী মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি উপন্যাসকে, নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ'কে ; মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধকে' গিরিশচন্দ্র নাট্যরূপ প্রদান করেন। এই সকল ভিন্ন তিনি বহু নাটক ও প্রহসন স্বয়ং রচনা করেন। তাহাদের প্রত্যেকটিই সমভাবে আদৃত হইয়া তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল। প্রধানতঃ অভিনয় ও নাট্যালয় পরিচালনাতেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়া থাকিলেও দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল। জাতীয় উন্নতির মূল কি, জাতীয় আন্দোলন কিভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, এই সকল বিষয়ে তাঁহার যে সকল মতামত নাটকান্তর্গত পাত্র পাত্রীর কথোপকথনের দ্বারা প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইতে ইহা বেশ প্রমাণ হয় যে, তিনি এই সকল বিষয়েও বিশেষভাবে চিন্তা করিতেন। বিভিন্ন নাটক প্রহসনগুলিতে স্থানকালোপযোগী উচ্চ অঙ্গের উপদেশ প্রচুর লাভ করা যায়। তাঁহার সিরাজদ্দৌল্লা, মীর কাশিম ও ছত্রপতি নাটকের অভিনয় রাজনীতিক কারণে বন্ধ করিতে হয়। প্রথমোক্ত নাটকে তিনি সিরাজের চরিত্রে যে কলঙ্ক বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ লেপন করেন, তাহা ক্ষালণ করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন।

পারিবারিক নানা দুর্ঘটনায় একবার গিরিশচন্দ্রের চিত্তবিক্ষেপ ঘটে। সেই সময়ে তিনি যখন মানসিক শান্তি লাভের জন্য বিশেষ ব্যাকুল ছিলেন, তখন পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দিনের সাক্ষাতে গিরিশচন্দ্র বিশেষ আকৃষ্ট হন নাই, ক্রমে ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে পরমহংস দেবের স্বভাব সুলভ সস্নেহ ব্যবহারে ও উপদেশে গিরিশচন্দ্র তাঁহার বিশেষ অনুগত হন এবং তাঁহাকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করেন ; মৃত্যুকালাবধি তিনি পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অটুট ছিল। রামকৃষ্ণের উপদেশ তাঁহার জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। তাঁহার নাটকাবলী হইতে উহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম্মমতে গিরিশচন্দ্র প্রাচীন তন্ত্রের সনাতন প্রথানুরাগী ছিলেন। শেষ জীবনে গুরুবাদ তিনি জীবনে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং উহার স্বপক্ষে মতামতও প্রকাশ করিতেন।

পারিবারিক জীবনে তিনি বিশেষ সুখী হইতে পারেন নাই। একাধিক পুত্র কন্যার ও অন্যান্য অতি নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুতে তাঁহাকে অনেকবার কাতর হইতে হইয়াছিল। তিনি সদালাপী ও বন্ধুবৎসল, পুরুষ ছিলেন। বাঙ্গালার রঙ্গালয়ের ও নাট্য সাহিত্যের

ইতিহাসে তাঁহার নাম জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে এই প্রতিভাশালী ব্যক্তি পরলোক গমন করেন।

গিরিশচন্দ্র দেব—তিনি শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত ছকাপন নামক গ্রামের এক-জন প্রজাবৎসল জমিদার। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি স্বদেশানুরাগী ছিলেন। কংগ্রেস আন্দোলনের সময় বহু দেশনেতা ও কংগ্রেস কর্ম্মী তাঁহার গৃহে স্থান লাভ করিতেন। এজন্য তাঁহাকে নানা প্রকারে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। জনহিতকর সমস্ত কার্য্যেই তিনি যথেষ্ট পরিমাণে দান ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। কুলাউড়ায় কংগ্রেস সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। বহুবার ন্যায়ের জন্য দুর্ব্বলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তিনি সবলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ঐ অঞ্চলের সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহারই উৎসাহে এবং সাহায্যে ছকাপনের পার্শ্ববর্ত্তী কাড়েড়াস্থিত হরিজনগণের মধ্যে একটী বিদ্যালয় ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দে ২৮শে এপ্রিল ছয় পুত্র দুই কন্যা বর্ত্তমান রাখিয়া ৭০ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র বসু—ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালখানগর গ্রামে প্রসিদ্ধ বসু বংশে ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দের আশ্বিন মাসে গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শম্ভুচন্দ্র বসু। গিরিশচন্দ্র মাতুল রামলোচন ঘোষ মহাশয়ের অন্নেই প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন আট বৎসর, তখন তাঁহার মাতুল তাঁহাকে ইংরেজী শিক্ষার জন্য হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। মেধাবী গিরিশ-চন্দ্র স্বকীয় পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে যথাসময়ে হিন্দুস্কুল হইতে স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তৎকালীন কলেজের চল্লিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। কিন্তু দৈবদুর্বিপাকবশতঃ তিনি কেবল এক বৎসর কাল এই বৃত্তি ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কারণ এসময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় সাংসারিক বিপর্য্যয় হেতু তিনি কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ছাত্র অবস্থাতেই তিনি ইংরেজী ও বাঙ্গালাতে সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সে সময়ে কলিকাতার সিমলা নিবাসী কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সাহায্যে 'হিন্দু-ইন্‌টেলিজেন্সার' নামক একখানা ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। বঙ্গদেশে ইহাই সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র এবং ইহাতে সর্ব্বাগ্রে রাজ-নৈতিক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। ইহার কয়েক বৎসর পরে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট'

পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গিরিশচন্দ্র মফঃস্বলে থাকিয়া এই পত্রের সহকারী সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে ইংরেজী পত্রিকার প্রচারক ও সম্পাদক বলিয়া, তাঁহার নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তৎকালের প্রসিদ্ধ লেখকদের নিবন্ধাদির সহিত ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদিত 'প্রভাকর' ও 'রসরাজ' পত্রে, তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। পাঠ্যাবস্থায়ই খ্রীষ্টান মিশনারীদের সহিত তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে মত বিরোধ হয়। তৎকালে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু ধর্ম্মনিষ্ঠ 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রচারক মহাত্মা রাধাকান্ত দেবকে উদ্দেশ্য করিয়া একখানা ব্যঙ্গ নাটক প্রণয়ন করেন। তিনি একখানা সুন্দর পুস্তক রচনা করিয়া, উহার যথোচিত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে বিখ্যাত মিশনারী ডফ্ সাহেব তৎকালীন বিখ্যাত 'হরকরা' পত্রে এই মর্ম্মে এক পত্র প্রকাশ করেন যে, তিনি একটী হিন্দু বালককে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করায় হিন্দুগণ তাঁহাকে মারধর করিতে চাহে। তিনি তাঁহার এই মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে' ম্যকবাম্বু' নাম সহি করিয়া এক সুদীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি পাঠ্যাবস্থার পরে গভর্ণমেণ্টের বহু বিভাগে কার্য্য করেন এবং যখন দেশমধ্যে নীলের গোলমাল ও চতুর্দ্দিকে বিপর্য্যস্ত, তখন তিনি কৃষ্ণনগর এলাকার দারোগা ছিলেন। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি গভর্ণমেণ্টের কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। শেষ বয়সে মুর্শিদাবাদের নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের ম্যানেজারের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। 'নবজীবন' পত্রে তাঁহার লিখিত 'সেকালের দারোগার কাহিনী' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি মৃত্যুর পূর্ব্বে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'সিরাজউদ্দৌলা' সম্বন্ধে 'জন্মভূমি' নামক মাসিক পত্রে তাঁহার কয়েকটি অতি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা নগরী হইতে 'শক্তি' নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন; কিন্তু কিছুকাল পরেই উহা বন্ধ হইয়া যায়। তিনি অতি নিরহঙ্কারী ও অমায়িক স্বভাবসম্পন্ন কর্ম্মনিষ্ঠ সাধু পুরুষ ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার ও জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তৃতির জন্য, তাঁহার খুব উৎসাহ ছিল। তাঁহার চেষ্টায় মালখানগর গ্রামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, পোষ্টাফিস এবং বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে ৭৪ বৎসর বয়সে এই পরোপকারী মহাপ্রাণ ব্যক্তি পরলোক গমন করেন।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—২৪পরগণার অন্তর্গত রাজপুর গ্রামে দাক্ষিণাত্য বৈদিক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বংশে ১২৩০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (১৮২৩ খ্রীঃ) তাহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহ চন্দ্রচূড় সার্ব্বভৌম ও পিতা রামধন বিদ্যাবাচস্পতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। গিরিশচন্দ্র আট বৎসর পর্য্যন্ত গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। বলাবাহুল্য এই সময়ে তাঁহার পিতা কলিকাতায় অবস্থান করিতেন। দুইবৎসর পাঠের পর তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পরীক্ষা দিয়া পাঁচ টাকা বৃত্তি পান। এইরূপে উক্ত কলেজে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া ক্রমে ৮৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকাবৃত্তি পাইয়া ছিলেন। ঘোরতর দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এখনকার দিনে ছাত্রেরা সহজে তাহা বিশ্বাস করিতেও সমর্থ হইবে না। উনিশ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তৎপরেই ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজে ৩০৲ টাকা বেতনে পুস্তকাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তখন হইতে এই বৃহৎ পরিবারের ঘোর দারিদ্র্যদশা ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। মাসিক ত্রিশ টাকায় সাতটী পরিবারের অতি কষ্টেই দিন চলিতে লাগিল। ইহার পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগে তিনি সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করিলেন। ১৮৫২ সালে তাঁহার সম্পাদিত রঘুবংশ মল্লিনাথের টীকা সহ প্রথম মুদ্রিত হইল। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর উক্ত মুদ্রাযন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া লালচাঁদ বিশ্বাসের সাহায্যে তিনি আর একটী ছাপাখানা স্থাপন করেন। দুই বৎসর পরে উহাও বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে একটী মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া 'গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র' নামে চালাইতে লাগিলেন (১৮৫৬সাল)। তখন তাঁহার আয় যথেষ্ট হইতে লাগিল। এদিকে সংস্কৃত কলেজে পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ৪০, ৫০, ৬০, ৭৫, ১০০, এবং ১৫০ টাকা পর্য্যন্ত তাঁহার বেতন হইয়াছিল। ১৮৮২ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ে দেশে বিধবা বিবাহ আন্দোলন খুব চলিতেছিল। তিনি এই বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষভুক্ত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে হইতে পারিল না। তেজস্বী বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রায়শ্চিত্তের হীনতা স্বীকার করিয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিবাহ না দিয়া অন্যত্র দিলেন। তিনি তৎকালীন অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা

শুনিতে যাইতেন এবং তৎসমাজের মুখপত্র "তত্ত্বোধিনী পত্রিকা"র গ্রাহক হইয়াছিলেন। মধ্য বয়সে তাঁহার অন্তঃকরণ শিবদুর্গাদি দেবদেবীর আরাধনায় নিরত হয়। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি বৈদান্তিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি জাতিভেদের পক্ষপাতি ছিলেন না। এমন কি তাঁহার দরিদ্র ভাণ্ডারের দান সম্বন্ধেও হিন্দু মুসলমান ভেদ না করা হয়, ইহাই তাঁহার আদেশ আছে।"

প্রথম জীবনে দারিদ্রের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল বলিয়া, দরিদ্রের উপকার করিতে কখনও ভুলিতেন না। দরিদ্রেরা ভাল খাইতে পায় না বলিয়া, মধ্যে মধ্যে তিনি তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার্য্য প্রদান করিতেন। এই দরিদ্রদিগকে দান করিবার জন্য সতর হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়া ট্রাষ্টিদের হাতে দিয়াছিলেন। মাতার সন্তোষ সাধনার্থ তাঁহাদ্বারা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করাইয়া ছিলেন। এতদ্ভিন্ন স্বগ্রামে সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থ আরও দুইটী জলাশয় খনন করাইয়া ছিলেন। কাশীতে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা, বরাহনগর মন্দির সংস্কার, হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্ম্মাণার্থ অর্থ দান দরিদ্র ভাণ্ডার প্রভৃতি বহু সদনুষ্ঠানে তিনি অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় সংস্কৃত কলেজে কার্য্য করিবার সময়ে সমস্যাপূরণ সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রিত করেন। ১৮৫২ সালে তিনি মল্লিনাথ কৃত সঞ্জীবনী টীকা সহ সমগ্র রঘুবংশ প্রকাশ করেন। ১৮৫৬ সালে বঙ্গানুবাদ সহ দশকুমার চরিত প্রকাশ করেন। ১৮৫৮ সালে 'বিধবা বিষম বিপদ' নাটক, ১৮৬০ সালে ব্যুৎপত্তি যুক্ত 'শব্দসার' নামক সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অভিধান, ১৮৭০ সালে 'উৎকর্ষ বিধান' নামে একখানা স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৭১ সালে, 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' সরল টীকা, পদান, শব্দ ও ধাতুসাধন এবং পাণিন্যাদি ব্যাকরণের সূত্র উল্লেখ পূর্ব্বক প্রকাশ করেন। ১৮৮১ সালে মুগ্ধবোধ সার, 'কাদম্বরী কথা' সরল টীকা সহিত উত্তর ভাগ, ১৮৮৫ সালে 'কাদম্বরী কথা' পূর্ব্বভাগ প্রকাশ করেন। এই পুণ্যশ্লোক মহাপ্রাণ ব্যক্তি ১৩১০ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবারে (৩রা ডিসেম্বর ১৯০৩) মহাপ্রয়াণ করেন।

গিরিশচন্দ্র মজুমদার—ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বীরতারা গ্রামে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ মজুমদার বংশে ১২৪৪ সালের ২৪শে ভাদ্র (সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ খ্রীঃ) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হৃদয়কৃষ্ণ মজুমদার ও মাতার নাম দয়াময়ী। তাঁহারা উভয়ই নানা সদ্‌গুণ সম্পন্ন ছিলেন। হৃদয়কৃষ্ণ

বরিশাল জিলার তৎকালীন অধিকাংশ জমিদারের এষ্টেটের খাস মোক্তারের কার্য্য করিতেন, পরে সরকার পক্ষের সরবরাহকার (Manager, Court of Wards) মনোনীত হন। গিরিশচন্দ্র পিতামাতার নানা সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে গ্রামের কোন সংস্কৃত টোলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। তৎপর ইংরাজী শিক্ষা লাভের জন্য পিতার নিকট বরিশালে গমন করেন। ১৮৬০খ্রীঃ অব্দে তিনি ঢাকা পোগোস স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি ও মেডেল প্রাপ্ত হন। এস্থলে তাঁহার ত্যাগেরও বন্ধু প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালা রচনা পরীক্ষায় তিনি ও তাঁহার সহাধ্যায়ী দীননাথ সেন তুল্য নম্বর প্রাপ্ত হন, বাঙ্গালা রচনার জন্য একটী স্বর্ণ পদক প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ লেখককে উপহার প্রদত্ত হইত, দুই জনই তুল্য নম্বর প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং কিভাবে পদক প্রদত্ত হইবে, যখন এই প্রশ্ন উঠিল, তখন তিনি স্বেচ্ছায় ঐ পদক তাঁহার সহাধ্যায়ীকে প্রদান করিবার জন্য কর্তৃপক্ষকে বলিলেন, এবং তদনুযায়ী পদক দীননাথকে প্রদান করা হইল। গিরিশচন্দ্র যখন ঢাকায় পড়াশুনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অগ্রজ হরিশবাবু বিক্রমপুর বেত্‌কা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত স্কুলে 'বিদ্যোৎসাহিনী' নাম্নী একটী সভা ছিল। গিরিশচন্দ্র ভ্রাতার অনুরোধে সেই সভায় কতকগুলি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই কবিতাময় প্রবন্ধ সকল শেষে 'স্বভাব দর্শন' নামক পুস্তকাকারে অনুজ প্রতাপচন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত হয়। নৈসর্গিক শোভা বর্ণনায়, ভাষা সম্পদে প্রচলিত কুসংস্কারের প্রতি তীব্র সমালোচনায়, স্বদেশ প্রেমিকতায় ও গভীর আধ্যাত্মিকতায়, প্রবন্ধ সকল অতি উচ্চাঙ্গের কবিতার মধ্যে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত।

১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে গিরিশচন্দ্র ঢাকা কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা পাঠ করিয়া, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি ক্রমে তাঁহার অনাস্থা জন্মে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিশ্চন্দ্র মজুমদার ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে এপ্রিল মাসে, বরিশালে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া, আচার্য্যরূপে কার্য্য করিতেন, এবং ঢাকা নগরীতে ব্রজসুন্দর মিত্র প্রভৃতি মহাশয়গণ ব্রাহ্মধর্ম্মের পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, 'তত্ত্ববোধিনী' পাঠ, অগ্রজের আদর্শ, ব্রজসুন্দর বাবু প্রভৃতির দৃষ্টান্ত তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে অধিক আকর্ষণ করে। তৎফলে গিরিশচন্দ্র কলেজ পরিত্যাগ করিলেন এবং

পার্থিব উন্নতির সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহার পিতামাতা ইহা বুঝিতে পারিয়া, ঢাকা জিলাস্থ বীরতারা গ্রামের কৃষ্ণমঙ্গল রায়ের সুন্দরী কন্যা মনোরমার সহিত পুত্র গিরিশচন্দ্রের বিবাহ দেন। গিরিশ-চন্দ্রের অগ্রজ হরিশবাবু কার্য্যোপলক্ষে বরিশাল ত্যাগ করেন ও ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক পরিহার করেন। গিরিশবাবু তখন ঘনিষ্ঠভাবে ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করেন এবং ভ্রাতার স্থলাভিষিক্ত হইয়া, অদম্য উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে স্থায়ী ভাবে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের পদে নিযুক্ত করা হয়। গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ধর্ম্মসাধন, নরসেবা, সমাজ সংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যে সাফল্যপ্রদান করিতে আরম্ভ করিল। বহু যুবক ও প্রৌঢ় তাঁহার ভগবৎভক্তি দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দান করিতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার কয়েকজন উৎসাহী ব্রাহ্ম বন্ধুর প্রযত্নে ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে বিবাহিতা মহিলাদের শিক্ষার জন্য একটী স্কুল স্থাপিত হয়। বরিশালের তৎকালীন জজ সাহেবের পত্নী মিসেস্ বেলফুল আগ্রহে ইংরেজী ও সেলাই শিক্ষার সহায়তা করিতেন। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাদের উৎসাহে 'স্ত্রী জাতীর উন্নতি বিধায়িনী সভা' (Female Improvement Association) স্থাপিত হয়। এই সভা বহু দিন পর্য্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণ, পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি নানা প্রকারে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করিয়াছিল। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময় গিরিশচন্দ্র অদম্য উৎসাহ ও প্রগাঢ় অধ্যাবসায় সহকারে স্ত্রীশিক্ষা প্রচেষ্টায় যোগ দিয়াছিলেন। তিনি বন্ধুদিগের গৃহে গৃহে যাইয়া মহিলাদিগকে লেখাপড়া, সেলাই কার্য্য, রন্ধন ও সঙ্গীত শিক্ষা ইত্যাদি কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না বলিয়া, তাঁহার বন্ধুগণ মহিলাদিগকে শিক্ষাদানের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, স্ত্রীশিক্ষা দিয়া অর্থ গ্রহণ করিবেন না। তিনি স্বদেশা-নুরাগীও ছিলেন। ১৩২০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৯১৩ খ্রীঃ) ৭৭ বৎসর বয়সে এই মহাপুরুষ পরলোক গমন করেন। গিরিশচন্দ্র একাধারে সরলতা, বিনয়, উদারতা, জনহিতৈষণা, তেজ-স্বিতা, দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণ রাশির অধিকারী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, বক্তা, সেবক ও শিক্ষক রূপে তাঁহার দীর্ঘ জীবন বহু ঘটনায় পরিপূর্ণ।

গিরিশচন্দ্র রায়, রাজা—(১) শ্রীহট্টের অন্তর্গত বোয়ালজুর পরগণার চরভুত্যু গ্রামে ১৭৬৬ শকের (১৮৪৪ খ্রীঃ) ৭ই চৈত্র তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দীপচন্দ্র নন্দী চৌধুরী। গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্ব নাম ব্রজগোবিন্দ নন্দী চৌধুরী ছিল। তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়ক্রমকালে বাবু মুরারীচাঁদ রায় মহাশয়ের কন্যা তাঁহাকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার নাম গিরিশচন্দ্র রাখেন। দেশে শিক্ষা বিস্তারের দিকে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে তিনি মাতামহ মুরারীচাঁদ রায় মহাশয়ের নামে একটী কলেজ স্থাপন করেন। এই মুরারীচাঁদ কলেজ ও তৎসংলগ্ন স্কুল, তাঁহারই বদান্যতায় দীর্ঘকাল পরিচালিত হইয়াছিল। পরে গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে কলেজটীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিকে ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে রাজা উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহাদ্বারা সমান-ভাবে উপকৃত হইয়াছে। বিপদে পড়িয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থী হইলে সাধ্যা-নুসারে তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিতে বিমুখ হইতেন না। হিন্দু বিধবাদের জন্য কিছু করিবার তাঁহার বিশেষ আকাঙ্খা ছিল। তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে মাকে প্রণাম না করিয়া কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ১৮৯৭ সালের ভূমি-কম্পে অতি আশ্চর্য্যরূপে তিনি বাঁচিয়া যান। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২রা বৈশাখ (১৯০৮ খ্রীঃ) এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি পরলোক গমন করেন।

গিরিশচন্দ্র রায়, রাজা--(২) নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের রাজা। তাঁহার পিতা রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর মাত্র ষোড়শ বৎসর বয়সে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন (১৮০২—১৮৪১ খ্রীঃ)। তিনি কোন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না; কিন্তু সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় কথা কহিতে ও বুঝিতে পারিতেন। তিনি কৃষ্ণনগরে দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ৺আনন্দময় নামে এক শিবমূর্ত্তি ও ৺আনন্দময়ী নামে এক কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি নবদ্বীপে দুইটি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ৺ভবতারণ নামে এক শিব মূর্ত্তি ও ৺ভবতারিণী নামে এক কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের সেবার্থে নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করেন। তিনি অতিশয় অপব্যয়ী ছিলেন। পৈতৃক জমিদারীর অন্তর্গত ৮৪ পরগণার মধ্যে তাঁহার সময়ে মাত্র ৫।৬ খানি পরগণা ও কতকগুলি নিষ্কর গ্রাম মাত্র থাকে। তাঁহার সময়েই তাঁহাদের জমিদারীর সারভূত প্রসিদ্ধ উখড়া পরগণা নিলাম হইয়া যায়। এই

দারুণ দুর্ঘটনার পর তিনি একজন তান্ত্রিক ব্রহ্মচারীর প্ররোচনায় নিতান্ত সুরাসক্ত ও অমিতব্যয়ী হইয়া পড়েন। তিনি নিঃসন্তান হওয়ায়, তাঁহার মাতুল পুত্রের গর্ভবতী পত্নীকে রাজবাটীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই রমণী ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। বালক ষষ্ঠ বর্ষ মাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি তাঁহাকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া, শ্রীশচন্দ্র নাম রাখিয়াছিলেন। এই দত্তক পুত্রকে জমিদারীর ভার দিয়া ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে তিনি লোকান্তরিত হন। তিনি গুণি-গণের উৎসাহদাতা, কাব্যরসামোদী ও সঙ্গীতাদীর অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার সময়ে দিল্লীর প্রসিদ্ধ গায়ক কায়েম খাঁ ও তাঁহার তিন সুবিখ্যাত পুত্র মিয়া খাঁ হস্মু খাঁ ও দেলাওর খাঁ কৃষ্ণনগরে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হন।

গিরিশচন্দ্র সিংহ, রাজা—তিনি পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের পুত্র। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে তিনি এই বংশের প্রতিনিধি হন। তিনি তাঁহাদের আদি বাসস্থান কাঁদি গ্রামে একটী হাসপাতালের জন্য এক লক্ষ পনর হাজার টাকা দান করেন। তাঁহার পুত্রাদি ছিল না বলিয়া, মধ্যম ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের পুত্র শ্রীশচন্দ্রকে পোষ্য-পুত্র রূপে গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রচন্দ্রের পুত্র মনীন্দ্রচন্দ্র ও ফণীন্দ্রচন্দ্র। ১৮৮৭ ইং সালে গিরিশচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

গিরিশচন্দ্র সেন, মৌলবী ভাই—তিনি আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অন্তরঙ্গ প্রচারক বন্ধু ছিলেন। সম্ভবতঃ ১২৪৩ বাঙ্গালার (ইং ১৮৩৬) বৈশাখ মাসে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মাধব রাম সেন রায়। তাঁহার খুল্ল প্রপিতামহ দর্পনারায়ণ রায়, বঙ্গের সুবাদার নবাব আলী বর্দ্দী খাঁর সময়ে উচ্চ রাজ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার জন্ম স্থান ঢাকা জিলার অন্তর্গত পাঁচদোনা গ্রাম। বাল্যকালে বাঙ্গালা সংস্কৃত ও ফার্সি অধ্যয়ন করেন। পরে ঢাকা ও ময়মনসিংহে ফার্সি শিক্ষা করেন। এই সময়ে ২৫ বৎসর বয়সে ময়মনসিংহ সহরে একটী নকলনবাশি কাজে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরেই ইহা পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে নর্ম্মাল স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া উত্তীর্ণ হন এবং তত্রত্য হার্ডিং স্কুলে শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ফার্সি গোলস্থান গ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া হিতোপাখ্যান নামে মুদ্রিত করেন। ইহা স্কুল পাঠ্য হইয়া বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার দিকে তাঁহার খুব অনুরাগ ছিল। নর্ম্মাল স্কুলে অধ্যয়ন কালেই স্বামী স্ত্রীর কথোপকথন ও প্রশ্নোত্তরচ্ছলে স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতা

প্রতিপাদনপূর্ব্বক 'বনিতা বিনোদন' নামক পুস্তক পদ্যে রচনা করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

যৌবন প্রারম্ভেই মূলপাড়া নিবাসী কুলগুরু পণ্ডিত বিশ্বনাথ পঞ্চাননের নিকট শিবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর প্রত্যহ স্নানান্তে পুষ্পাদিদ্বারা শিবার্চ্চনা করিতেন। কিন্তু এই প্রকার নিষ্ঠা বেশী দিন স্থায়ী হইল না। ক্রমে শিথিলতা আসিল, এই সময়ে ময়মনসিংহে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইয়াছে তাঁহার ভগিনীপতি জমিদার কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়, ব্রাহ্ম সমাজের খুব অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের নামও শুনিতে পারিতেন না। কিন্তু মানুষ ভাবে একরকম হয় অন্য রকম। কিছুদিন মধ্যেই তাঁহার উপার্জ্জনক্ষম অগ্রজ হরচন্দ্র রায় কলেরা রোগে পরলোক গমন করেন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। এই বিপদে তিনি বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। কিছুদিন পরে ময়মনসিং সহরে যাইয়া অগ্রজের বন্ধুদের সহ মিলিত হইলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তন্মধ্যে মুড়াপাড়ার জমিদার রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। তাঁহার সহিত ঘনিষ্টতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার ব্রাহ্মবিদ্বেষ দূর হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হন। ১৮৬৫ ইং সালে ময়মনসিংহ নগরে 'কৃষি প্রদর্শিণী' মেলা হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সেই সময়ে সাধু অঘোর নাথ রায়কে সঙ্গে করিয়া ময়মনসিংহ সহরে গমন করেন। বলাবাহুল্য তাঁহার বাগ্মীতায় সকলে মুগ্ধ হইলেন, ব্রাহ্মসমাজে নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ময়মনসিংহ নগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বক্তৃতা উপদেশ শ্রবণে সহরে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। কেহ কেহ উপবীত ত্যাগ করিলেন। ইহাতে প্রাচীন হিন্দু নেতারা অতিশয় বিচলিত হইলেন। ব্রাহ্মদের উপর নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। অনেকে সমাজ ভয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিল ও ব্রাহ্ম সংশ্রব পরিত্যাগ করিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্র দৃঢ় রহিলেন। তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ব্রহ্মময়ী তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন। এই সংগ্রাম ও নির্য্যাতন যাইতে না যাইতেই পত্নী ব্রহ্মময়ী বসন্ত রোগে পরলোক গমন করেন। বৈরাগ্য প্রবণ গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে আরও প্রবল বৈরাগ্যানুরাগ সঞ্চারিত হয়। তিনি কলিকাতা আসিয়া ধর্ম্ম বন্ধুদের সহিত মিলিত হইলেন। তাহার পরেই তিনি কিছুকাল ভারতের নানা তীর্থ ভ্রমণে যাপন করেন। পরে কর্ম্মস্থল ময়মনসিংহ নগরে আসিয়া

কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রচারক হইবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা আগমন করেন এবং কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতআশ্রমে স্থান লাভ করেন। এই সময়ে তিনি সুলভ সমাচার নামক পত্রিকার কোন কোন কার্য্যে সহায়তা করিতেন। তৎপরে তিনি ঢাকায় আসিয়া কিছুদিন 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকা সম্পাদন করেন। তিনি পৈত্রিক বিষয় সমস্ত ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে লিখিয়া দিয়াছিলেন। কথা ছিল তাঁহাকে আজীবন মাসিক ৭৲ টাকা করিয়া দিতে হইবে। এই সাহায্য ক্রমে ৮, ১০, ১২ টাকা পর্য্যন্ত করিয়া তাঁহারা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রচারক ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, এই সাহায্য স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া প্রচার ভাণ্ডারে দান করিতেন। তাঁহারাই তাঁহার সমস্ত ব্যয় বহন করিতেন। এই সময়ে তিনি আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে, কখনও বা একাকী বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের নানাস্থানে প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ সালে কেশবচন্দ্রের আদেশে তিনি লক্ষ্ণৌ নগরে আরব্য ও পারস্য ভাষায় অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য গমন করেন। তথায় কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া, পরে কলিকাতা ও ঢাকা নগরেও কয়েকজন মৌলবীর নিকট অধ্যয়ন করেন। এই অধ্যয়নের ফলে বঙ্গভাষা জননী বিশেষ ধনে ধনী হইয়াছেন। তিনি আরব্য ভাষার অমূল্য রত্ন ধর্ম্ম গ্রন্থ কোরাণ ও হদিশ অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। পারস্য ভাষা হইতেও বহু গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালী পাঠকদের বহু উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার অনূদিত তাপসমালা (মুসলমান সাধকদের জীবনী) বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য গ্রন্থ।

শেষ বয়সে ভারত মহিলা নামে একখানা মাসিক পত্রিকা, বঙ্গ মহিলাদের উপকারার্থে প্রচার করিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি তাহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতেন না। বঙ্গভঙ্গের তিনি বিরোধী ছিলেন না। বরং বঙ্গভঙ্গের দ্বারা বাঙ্গালী জাতির পরম কল্যাণ সাধিত হইবে, এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

এই নীরব কর্ম্মী একনিষ্ঠ সাধক, সংযমী মহাত্মা ১৩১৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৯১২ খ্রীঃ) মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

গিরধারীরায়—বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বল্লভাচার্য্যের পৌত্র ও বিত্তল নাথের পুত্র। বিত্তল নাথের গিরধারী রায়, গোবিন্দ রায়, গোকুলনাথ, বালকৃষ্ণ, রঘুনাথ, যদুনাথ ও ঘনশ্যাম নামে সাত পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই সম্প্রদায় কর্ত্তা।

গির্ব্বাণযুদ্ধ বিক্রম—ইনি নেপালের রাজা রণ বাহাদুর শার পুত্র। মহারাজ রণ বাহাদুর ত্রিহুত জিলার এক ব্রাহ্মণ বিধবাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহারই গর্ভে গির্ব্বাণযুদ্ধের জন্ম হয়। রণ বাহাদুর অতি বিকৃত বুদ্ধি ও অত্যাচারী রাজা ছিলেন। সেই জন্য রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরা ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে কাশীতে নির্ব্বাসিত করেন বিংশতি বৎসর পরে আবার দেশে যাইয়া অত্যাচার আরম্ভ করিলে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সের বাহাদুর কর্ত্তৃক নিহত হন। গির্ব্বাণযুদ্ধ স্বহস্তে রাজ্য ভার লইয়া দশ বৎসর শাসন করেন। তিনি সম্মিলিত নেপালের চতুর্থ রাজা। ১৮০৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভীমসেন থাপাকে রাজ্যের প্রধান শাসনকর্ত্তা ও প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন।

গিরীন্দ্রচন্দ্র বসু—১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গোপাল চন্দ্র বসু। গিরীন্দ্রচন্দ্র বঙ্গদেশের প্রথম ইলেক্ট্রিকেল ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিনের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে তিনি তাঁহার একজন সহকর্ম্মী ছিলেন। তিনি ১৮৯৬ সালে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এ-আই-ই-ই উপাধি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি সাহিত্য-অনুরাগী ছিলেন। যৌবনে তিনি কয়েকখানা শিশু সাহিত্য গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৩৩ খ্রীঃ অব্দের ২২শে ডিসেম্বর ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—বাঙ্গালী চিকিৎসক। চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা যোগেন্দ্রনাথও চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে গিরীন্দ্রনাথ সেণ্টজেভিয়াস' কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে বিশেষ কৃতিত্ব সহকারে এম-বি উপাধি লাভ করেন ও অস্ত্রবিদ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করায় 'ম্যাকলিয়ড' স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। এম-বি পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দ্বারভাঙ্গার রেসিডেণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত করেন। ১৯০৮ সালে তিনি যকৃতের চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্-ডি উপাধি প্রাপ্ত প্রাপ্ত হন। ১৯০৯ হইতে ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (Fellow) ছিলেন এবং ঐ সময়ের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিভাগীয় কার্য্য পরিচালনা সভার

(Faculty) সভ্য হইয়াছিলেন। কিছুকাল তিনি অবৈতনিক বিচারপতি এবং আলিপুরস্থ নাবালকদিগের বন্দীশালার (Juvenile Jail) বেসরকারী পরিদর্শক এবং দক্ষিণ কলিকাতা হিন্দু মহাসভার সহঃ সভাপতি ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও তিনি বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভাটপাড়ার পণ্ডিতসভা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে 'ভিষগাচার্য্য' উপাধি প্রদান করেন। তিনি এক সময়ে দক্ষিণ কলিকাতা আশুতোষ কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় বহু বিদ্যামন্দিরের কার্য্যকলাপের সহিত তিনি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীঃ অব্দের ৯ই আগষ্ট তিনি পরলোক গমন করেন।

গীষ্পতি কাব্যতীর্থ—বাঙ্গালী পণ্ডিত ও রাজনৈতিক বক্তা। ১৯০৫ হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদের সহকর্ম্মীরূপে রাজনৈতিক বক্তৃতা প্রদানাদি করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

গুগা—অম্বরের (জয়পুরের) রাজা পৃথ্বীরাজের সপ্তদশ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে প্রধান দ্বাদশ পুত্র হইতে দ্বাদশটী সর্দ্দার বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। এই দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম গুগা হইতে গুগাবৎ সর্দ্দার বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহাদের জায়গীর ধুনী নামক স্থান।

গুজর সিংহ—একজন শিখ সর্দ্দার। পানিপতের যুদ্ধে আহমদ শাহ আবদালীর পরাজয়ের পর তিনি বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঐ সময়ে শিখ শক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, এক পরাক্রান্ত শিখরাষ্ট্র গঠনে যাঁহারা প্রধান কর্ম্মী ছিলেন, গুজরসিংহ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি কর্ম্মদক্ষ শাসনকর্ত্তাও ছিলেন। দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন।

গুজরাণ খাঁ—বাঙ্গালার সুলতান দাউদ খাঁর একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহের সেনাপতি মৈনাম খাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তিনি মুঘলদিগকে যখন বাঙ্গালা দেশ হইতে বিদূরীত করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কপালে তীর বিদ্ধ হইয়া অশ্ব হইতে পতিত হইলেন। তাঁহার পতনেই দাউদ খাঁর পরাজয় হইল।

গুজরি—তিনি শিখ গুরু তেগ বাহাদুরের ধর্ম্মপত্নী ও সুপ্রসিদ্ধ গুরুগোবিন্দ সিংহের জননী। গোবিন্দ সিংহ দেখ।

গুড় গুড়ে ভট্টাচার্য্য—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য দেখ।

গুড়ব মিশ্র—গুরব মিশ্র দেখ।

গুড়রী—নাথপন্থীদের অন্যতম সিদ্ধাচার্য্য। তাঁহার রচিত চর্য্যাপদ বা কীর্ত্তনের গান পাওয়া গিয়াছে। সহজিয়ামতে তাহাদের টীকাও রচিত হইয়াছিল। সে সকল পরবর্ত্তীকালে ভুটিয়া ভাষায় অনূদিত হয়।

গুণক বিজয়াদিত্য তৃতীয়—তিনি বেঙ্গির (পূর্ব্ব চালুক্য) চালুক্যবংশীয় নরপতি পঞ্চম কলিবিষ্ণু বর্দ্ধনের পুত্র। তিনি ৮৪৪—৮৮৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চালুক্য ভীম দ্রোহার্জ্জুন ৮৮৮—৯১৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

গুণকাম দেব—নেপালের একজন রাজা। তিনি খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করিতেন। নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডু (প্রাচীন নাম কান্তিপুর) নগরী তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া নেপাল রাজবংশীয় ইতিহাসে উল্লিখিত হয়।

গুণচন্দ্র গুণি—জৈন আচার্য্য ও গ্রন্থকার। তিনি একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাকৃত ভাষায় 'মহাবীর-চরিতম' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

গুণনিধি চক্রবর্ত্তী—তিনি একজন পাঁচালীকার। বর্দ্ধমানের অন্তর্গ কালশয় তাঁহার বাসস্থান ছিল।

গুণপ্রভা—তিনি একজন দার্শনিক পণ্ডিত। কথিত আছে তিনি কনৌজের বর্দ্ধনবংশের নরপতি হর্ষবর্দ্ধনের (শিলাদিত্য) একজন উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি শতাধিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তিনি খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন।

গুণবতী—ত্রিপুরার গোবিন্দ মাণিক্যের মহিষী। স্বামীর ন্যায় তিনিও নানাবিধ সৎকার্য্যদ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কসবাথানার অধীন জাজিয়ারা গ্রামে একটী প্রকাণ্ড জলাশয় খনন করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই জলাশয় 'গুণসাগর' নামে খ্যাত হইয়া এখনও রাজমহিষীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

গুণবর্ম্মণ—প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ধর্ম্ম প্রচারক। তিনি কাশ্মীরের কোনও রাজার পুত্র ছিলেন। খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীতে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ভিক্ষু বেশে সিংহলে গমন করেন। তথায় 'বৌদ্ধধর্ম্ম' ও 'দর্শনে' কৃতবিদ্য হইয়া ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে প্রথমে যবদ্বীপে গমন করেন। যবদ্বীপে তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। গুণবর্ম্মাই প্রথম তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চীনদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। নানকিং-এর সুঙ্‌বংশীয় সম্রাট গুণবর্ম্মাকে চীনদেশে লইয়া যাইবার

জন্য যবদ্বীপাধিপতির নিকট অনুরোধ পত্র সহ দূত প্রেরণ করেন। গুণবর্ম্মা চীনদেশে উপস্থিত হইয়া, প্রভূত সম্মান লাভ করেন (আনুঃ খ্রীঃ ৪৩১ অব্দ)। তিনি চীনদেশে বৎসরাধিক কাল মাত্র ছিলেন। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এগার খানি বৌদ্ধ শাস্ত্র চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার শেষ জীবনের কোনও বিবরণ পাওয়া যায় নাই। গুণবর্ম্মার প্রচেষ্টারই চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই সেই দেশে প্রথম বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

গুণবিষ্ণু— প্রাচীনকালের একজন বাঙ্গালী বৈদিক পণ্ডিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'ছান্দোগ্য মন্ত্র ভাষ্য'। তিনি খুব সম্ভব খ্রীঃ একাদশ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। মতান্তরে তিনি গৌড়াধিপতি বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ ছিলেন (খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দী)। গুণবিষ্ণুর মন্ত্র ভাষ্য আট ভাগে বিভক্ত। উহাতে বিবাহাদি সংস্কার, সন্ধ্যা এবং শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের উপযোগী মন্ত্র সমুদয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালের অনেক স্মার্ত্ত পণ্ডিত গুণবিষ্ণুর মত গ্রহণ বা আলোচনা করিয়াছেন। ছান্দোগ্য মন্ত্র ভাষ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ, সূত্র, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি হইতে বহু বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন 'ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ মন্ত্র ভাষ্য', 'পারস্কর গৃহ্য ভাষ্য' প্রভৃতি গৃহ্যকর্ম্মের উপযোগী বৈদিক মন্ত্র সকলের ভাষ্যও গুণবিষ্ণু কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

গুণবৃদ্ধি—প্রাচীন কালের সংস্কৃত কথাকার। তিনি খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে, তাঁহার গুরু আর্য্য সঙ্ঘসেন সংকলিত পঞ্চতন্ত্রের ন্যায় আখ্যান গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করেন।

গুণভট্ট—তিনি একজন দার্শনিক পণ্ডিত। কেশব মিশ্র বিরচিত 'তর্ক-ভাষা' গ্রন্থের তিনি উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছেন। কেশব মিশ্র খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

গুণভদ্র—(১) একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি মধ্যভারতের এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে প্রচলিত ধর্ম্মমতে দীক্ষিত হইয়া তৎকালীন ব্রাহ্মণোচিত বিদ্যা শিক্ষা করেন। জ্যোতিষ চিকিৎসা, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মে আস্থাবান হইয়া তিনি ভারতের নানাস্থানে পর্য্যটন পূর্ব্বক প্রথমে হীনযান ও পরে মহাযান মত আয়ত্ব করেন। অতঃপর সিংহলে গমন করিয়া কিছুকাল বাস করেন এবং তৎপরে খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে জলপথে চীনদেশে গমন করেন। চীনদেশে তিনি ত্রিশ বৎসরের

অধিকাল বাস করিয়াছিলেন এবং সেই দেশেই (আনুঃ ৪৬৮ খ্রীঃ অব্দে) পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেন। স্বয়ং চীন সম্রাট ও তাঁহার অধীনস্থ কোনও ভূপতির আহ্বানে তিনি বহু বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র চীন ভাষায় অনুবাদ করেন তন্মধ্যে এপর্য্যন্ত যে ত্রিশটির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে নিম্ন লিখিত গুলি প্রধান—শ্রীমালা সিংহনাদ সূত্র; লঙ্কাবতার সূত্র; রত্নকারণ্ড ব্যূহ; গুণকার ভব্যূহ সংযুক্ত আগমন; অতীত প্রত্যুৎপন্ন হেতুফল সূত্র; বসুমিত্র রচিত অতি ধর্ম্ম প্রকরণ পদ শাস্ত্র।

গুণভদ্র—(২) জৈন সন্ন্যাসী ও গ্রন্থকার। তিনি 'উত্তর পুরাণ' ও 'আত্মানুশাসন' প্রভৃতি জৈনধর্ম্ম প্রতিপাদক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি খুব সম্ভব খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

গুণমতি— তিনি একজন দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি বসু বন্ধু বিরচিত 'অভিধর্ম্ম কোষ' গ্রন্থের একটী মনোরম ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তিনি ৬৩০—৬৪০ খ্রীঃ অব্দ মধ্যে নালন্দা বিদ্যাপীঠে বর্ত্তমান ছিলেন।

গুণরত্ন সূরী—এই জৈন পণ্ডিত জ্যোতিষ শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—অবচূর্ণী।

গুণরাজ খাঁ—গুণরাজ খাঁ কর্ত্তৃক রচিত শ্রীধর্ম্ম ইতিহাস, লক্ষ্মী চরিত্র, যোগতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রামায়ণ মহাভারতের বিবিধ উপাখ্যান প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থের লেখক একই ব্যক্তি না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন গুণরাজ খাঁ কাহারও নাম নহে উপাধি মাত্র।

গুণশ্রী—তিনি মাধ্যমিক মতের একজন দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন।

গুণাকর—তিনি একজন জ্যোতিষের গ্রন্থকার। বিশ্বনাথ কৃত হোরা স্কন্দ নিরূপণ গ্রন্থে গুণাকরের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। 'হোরামকরন্দ' তাঁহার রচিত। ১৪১৮ শকের (১৪৯৬ খ্রীঃ) পূর্ব্বে ইহা রচিত হয়।

গুণাকর রায় গুপ্ত—তিনি সাঁতোড়ের রাণী সর্ব্বাণীর অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। রাণী মৃত্যুকালে তাঁহার অপুত্রক পুত্র বধূ সত্যবতীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মন্ত্রী গুরুগোবিন্দ শর্ম্মা চৌধুরী ও গুণাকর রায়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন গুণাকর নাবালিকা রাণী সত্যবতার নাম জারী করিবার জন্য ঢাকা গমন করিলে, নাটোরের রামজীবন রায় সাঁতোড় আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। গুণাকর ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, এই সংবাদ অবগত হইলেন। এই অন্যায়ের প্রতীকার প্রার্থী হইয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে সম্রাট

আওরঙ্গজীবের দরবারে উপস্থিত হইলেন। এবং তথা হইতে জমিদারী প্রত্যর্পনের আদেশ লইয়া স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে এই সংবাদ রাণী সত্যবতীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রামজীবন এই সংবাদে অতি মাত্র বিচলিত হইয়া, রাণীর বধ সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। অর্থ লোভে রাণীর মাতুল রাণীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিলেন। গুণাকর দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই সংবাদ শ্রবণে অতি মাত্র ব্যথিত হইলেন। রাম জীবন অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া প্রভুভক্ত বুদ্ধিজীবী গুণাকরকে স্বীয় মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন।

গুণাকর শ্রীভদ্র—মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্য প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের একজন আচার্য্য ছিলেন। তিনি 'তত্ত্ব সংগ্রহ কারিকা' নামক বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক মত সংবলিত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। উক্ত গ্রন্থে সাংখ্য, জৈন প্রভৃতি দার্শণিক পণ্ডিতদিগের মত সমালোচিত হইয়াছে।

গুণাঢ্য—প্রাচীন সংস্কৃত কথা গ্রন্থকার তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'বৃহৎকথা'। গুণাঢ্য ভারতবর্ষের কোন্ স্থানের অধিবাসী ছিলেন এবং কোন সময়ে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা লইয়া পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎ কথা মঞ্জরী' সোমদেবের কথা 'সরিৎসাগর' ও জয়রথের 'হরচরিত চিন্তামণি' এই তিনখানি পুস্তক হইতে গুণাঢ্যের যে জীবন কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে অলৌকিকত্ব অনেক রহিয়াছে। সে সকল বাদ দিলে মোটামুটী ইহাই জানা যায় যে, গুণাঢ্য দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী তীরস্থ প্রতিষ্ঠিত অথবা প্রতিষ্ঠান নগরের অধিবাসী ছিলেন। প্রতিষ্ঠান পতি শাতবাহনের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ছিল। গুণাঢ্য শাতবাহনকে ছয় বৎসরে সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী করিয়া দিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কিন্তু কাতন্ত্র ব্যাকরণের রচয়িতা শর্ব্ববর্ম্মা তৎপরিবর্ত্তে ছয় মাসের মধ্যে রাজাকে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিয়া দিতে সম্মত হন। গুণাঢ্য তখন প্রতিজ্ঞা করেন যে, শর্ব্ববর্ম্মা সফলকাম হইলে, তিনি সংস্কৃত, প্রাকৃত অথবা কথ্য ভাষা কোনটিতে গ্রন্থ রচনা করিবেন না। তজ্জন্য তিনি পৈশাচী ভাষায় বৃহৎকথা রচনা করেন।

গুণাঢ্য রচিত মূল গ্রন্থের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রায় সাত লক্ষ শ্লোকে নিবন্ধ যে গ্রন্থাংশ রক্ষা পাইয়াছে তাহাও মূল সমগ্র গ্রন্থের প্রায় চতুর্থাংশ মাত্র। গুণাঢ্যের মূল গ্রন্থ কেবল শ্লোকেই রচিত হইয়াছিল, না গদ্য পদ্য মিশ্রিত ছিল, তাহা লইয়াও বিশেষজ্ঞ দিগের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

গুণাঢ্য পৈশাচী ভাষায় বৃহৎ কথা রচনা করেন। পৈশাচী কোন্ জাতির অথবা কোন্ স্থানের ভাষা তাহাও গবেণার বিষয় রহিয়াছে। বৃহৎ কথায় উল্লিখিত পিশাচ অর্থাৎ ভূতযোনীদের ভাষা যে নহে, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অনুধাবন করিবেন। ভারতীয় ভাষা তত্ত্বজ্ঞ গ্রীয়ারসন সাহেব (Mr. Grierson) মনে করেন বর্ত্তমান উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রচলিত কোন কোন প্রাচীন ভাষার নাম পৈশাচী। কিন্তু এই মত অধিকাংশ পণ্ডিতই গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের অনেকের মতে বিন্ধ্যাটবীর প্রান্তবর্ত্তী দাক্ষিণাত্যের কোনও ভাষার নাম পৈশাচী। বর্ত্তমান সময়ে 'প্রাকৃত' নামে পরিচিত কয়েকটি প্রধান প্রাচীন ভারতীয় ভাষার একটির নাম পৈশাচী।

গুণাঢ্য কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন তাহাও নিশ্চিত রূপে অবধারিত হয় নাই। সুবন্ধু, বাণ, দণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণের গ্রন্থাবলীতে নানারূপ মুখ্য ও গৌণ উল্লেখ হইতে তাঁহার সময় নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছে পাশ্চাত্য সংস্কৃত সাহিত্য কোবিদ কীথ (A. B. Keith) সাহেবের মতে গুণাঢ্য খুব সম্ভব খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে নিবদ্ধ আখ্যায়িকাগুলি হইতে অনুমান করা যায় যে, তিনি উজ্জয়িনী, কৌশাম্বী প্রভৃতি রাজ্যগুলির আভ্যন্তরিণ ঘটনাবলীর সহিত সবিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তাহা হইতেই কোনও কোনও পণ্ডিত অনুমান করেন যে, তিনি উজ্জয়িনীর অধিবাসী ছিলেন।

গুণাঢ্যের বৃহৎ কথাকে অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তীকালে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। তন্মধ্যে বুধস্বামীর শ্লোক সংগ্রহ; ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎ মঞ্জরী এবং সোমদেবের কথা সরিৎ সাগরই প্রধান। শেষোক্ত পুস্তক দুইখানি প্রাচীন সংস্কৃত কথা সাহিত্য ভাণ্ডারের উজ্জ্বল রত্ন। ইহা হইতেই বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে, গুণাঢ্যের গ্রন্থ কি পরিমাণে জনপ্রিয় ছিল। অন্যান্য যে সমুদয় সংস্কৃত কবি গুণাঢ্যের নিকট ঋণী, তাঁহাদের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ—খুব সম্ভব এই বঙ্গীয় দার্শনিক পণ্ডিত খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি তাঁহার রচিত। (১) অনুমান দীধিতি বিবেক, (২) আত্মতত্ত্ব বিবেক দীধিতি টীকা, (৩) গুণবৃত্তি বিবেক, (৪) ন্যায় কুসুমাঞ্জলী বিবেক, (৫) ন্যায় লীলাবতী প্রকাশ দীধিতি বিবেক, (৬) শব্দালোক বিবেক।

গুণানন্দ সেন—এই কবির রচিত একখানা মনসার ভাসান পাওয়া গিয়াছে।

গুণাভিরাম বড়ুয়া, রায় বাহাদুর—আসামের এই সুসন্তান কামরূপ জিলায় জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালাভার্থ তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার হিতৈষী আত্মীয় আনন্দরাম ঢেকিয়ান ফুকনের অকালমৃত্যুতে, সেই পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণভার তাঁহার উপরে পতিত হওয়ায় তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে তিনি এষ্ট্রা এসিষ্টেন্ট কমিশনারের পদ প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে আসাম প্রদেশ বাঙ্গালাদেশের সহিতই সংযুক্ত ছিল। ১৮৭৪ ইং সালে বড়লাট লর্ড পর্থব্রুকের সময়ে আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইয়া, একজন চীপ কমিশনারের অধীন হয়। সেই সময়ে তিনি আসাম প্রদেশে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিদ্বারা সম্মানিত করেন। তিনি যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখনই ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবাধীন হন। তিনি প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে পুত্র কন্যাদেরে এই সমাজেই বিবাহ দেন। আসামী স্বতন্ত্র ভাষা না হইয়া বাংলার সহিত এক হইয়া যায়, ইহা তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। তিনি পূতচরিত্র, নিরহঙ্কার, অমায়িক, কৌতুকপ্রিয়, দেশপ্রেমিক ও সাধুপুরুষ ছিলেন। আসামী স্বতন্ত্র ভাষারূপে গৃহীত হইলে, সেই ভাষার উন্নতি কল্পে তিনি লেখনী চালনা করেন। আসাম বুরুঞ্জী নামে আসামের একখানা ইতিহাস তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সদাশয় ব্যক্তি ১৮৯৪ সালে পরলোক গমন করেন।

গুণাম্ভোধি দেব—শঙ্করগণের পুত্র প্রথম গুণাম্ভোধি দেব ভোজদেবের সহিত মিলিত হইয়া অথবা তাঁহার সামন্তরূপে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রথম গুণাম্ভোধি দেবের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ সোঢ়দেব ১১৩৪ বিক্রমাব্দে (১০৭৮ খ্রীঃ) সরযূপারের অধিপতি ছিলেন।

গুণার্ণব (প্রথম)—তিনি উড়িষ্যার গঙ্গাবংশের প্রতিষ্ঠাতা বীরসিংহের তৃতীয় পুত্র। তিনি দন্তপুরে রাজত্ব করিতেন। প্রথম কামার্ণব দেখ।

গুণার্ণব (দ্বিতীয়)—তিনি উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতি তৃতীয় কামার্ণবের পুত্র। তিনি দন্তপুরে সাতাশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার জিতাঙ্কুশ, প্রথম গুণ্ডমান, চতুর্থ কামার্ণব ও বিনয়াদিত্য নামে চারি পুত্র ছিল। তাঁহারা পর পর সকলেই রাজা হইয়াছিলেন। প্রথম কামার্ণব দেখ।

গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর—তিনি কলিকাতার মহারাজ রমানাথ ঠাকুরের পুত্র ও প্রিনস্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৮০০ ইং সালে তাঁহার

জন্ম হয়। তৎকালে উপযুক্ত বিদ্যালয় না থাকায় স্বগৃহেই উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গাল ভাষায় যথেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করেন। তিনি সংস্কৃত 'বিক্রম উর্ব্বশী' নাটক বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। সঙ্গীতাদি কলা-বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি অপরিণত বয়সেই দেহত্যাগ করেন।

গুণ্ডমান (প্রথম)—তিনি উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতি দ্বিতীয় গুণার্ণবের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিতাঙ্কুশের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র কলিগলাঙ্কুশ ১২ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তিনি রাজা হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা চতুর্থ কামার্ণব পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করেন। কামার্ণব প্রথম দেখ।

গুণ্ডমান (দ্বিতীয়)—তিনি উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতি তৃতীয় বজ্রহস্তের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি তিন বৎসর রাজত্ব করেন। কামার্ণব প্রথম দেখ।

গুরগণ খাঁ—তিনি আর্ম্মিনিয়ান বণিক খাঁজা পিক্রর (দেখ) ভ্রাতা। খাজা পিক্রু ব্যবসায় বুদ্ধির চেয়ে রাজনৈতিক কুট বুদ্ধিতেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। গুরগণ খাঁর প্রকৃত নাম খাজা গ্রেগরী। তিনি নবাব মীর কাশিম আলী খাঁর অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। এই বিশ্বাস ঘাতক সেনাপতি ইংরেজদের সহিত মীর কাশিমের যুদ্ধ কালে, মীর কাশিমের পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক, ইংরেজ পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু অচিরেই মীর কাশিম আলীর প্রেরিত গুপ্তচরের হস্তে তিনি নিহত হইলেন।

গুরু গোবিন্দ শর্ম্মা চৌধুরী—তিনি সাঁতোড়ের জমিদার রাণী সর্ব্বাণীর অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। রাণী সর্ব্বাণী অষ্টাশিতি বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বিধবা ত্রয়োদশ বর্ষিয়া পুত্রবধূ সত্যবতীর অভিভাবক রূপে গুরু গোবিন্দ শর্ম্মা চৌধুরী ও গুণাকর রায় গুপ্ত মন্ত্রীদ্বয়কে নিযুক্ত করেন। রাণী সর্ব্বাণীর মৃত্যু সংবাদ প্রচার হইবামাত্র নাটোরের রামজীবন রায় সাঁতোড় আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। পরে সন্ধি হইলে রাণী মাসিক এক হাজার টাকা ও সাঁতোড় নগরটী যাবজ্জীবন নিস্কর পাইলেন। গুরু গোবিন্দ কাশিমপুর পরগণা পাইলেন। অবশিষ্ট ২১ পরগণা নাটোর রাজ্যভুক্ত হইল। হাইকোর্টের জজ স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরী বারিষ্টার মহাশয় এই গুরু গোবিন্দ চৌধুরীরই বংশধর ছিলেন।

গুরু গোবিন্দ সিংহ—স্বনাম খ্যাত শিখধর্ম্ম নেতা। তাঁহার পিতার নাম গুরু তেগ বাহাদুর। ১৬৬১ খ্রীঃ অব্দে পাটনা নগরে গোবিন্দের জন্ম হয়।

শিখ ধর্ম্মের প্রচারকর্ত্তা গুরু নানক

যে ধর্ম্ম বিশ্বাসী, ধীর প্রকৃতি, সংযত চরিত্র ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া যান তাহার অনেক নেতা তৎকালীন একাধিক মুঘল সম্রাটদের স্বধর্ম্ম প্রিয়তার যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত হন। (অর্জ্জুন, হরগোবিন্দ ও তেগ বাহাদূর দ্রষ্টব্য) তৎফলে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম ও জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য বিশেষ চঞ্চলতার সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে শিখ সম্প্রদায় যে যোদ্ধৃ জাতীতে পরিণত হয়, উহা সেই চঞ্চলতারই পরিণতি। শিখদিগকে সাধারণ ধর্ম্ম-ভীরু, ভগবৎ বিশ্বাসী, উদার সম্প্রদায় হইতে যোদ্ধৃজাতীতে যাঁহারা পরিণত করেন, তাঁহাদের মধ্যে গুরু গোবিন্দই প্রধান। পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরু দিগকে এবং তন্মধ্যে নিজ পিতাকে বিধর্ম্মীদের হস্তে নিষ্পেষিত ও নিহত হইতে দেখিয়া বালক গোবিন্দের মধ্যে যে ধর্ম্ম ও জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য তীব্র আকাঙ্খার উৎপত্তি হয়, তাহা হইতে শিখ জাতীর প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হয়।

গোবিন্দের মাত্র কিশোর বয়সে, তাঁহার পিতা তেগ বাহাদূর মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজীবের আদেশে দিল্লীতে নীত হইয়া, রাজাদেশে নিহত হন। তেগ-বাহাদূর সম্রাট্ সকাশে গমন করিবার পূর্ব্বে গুরুদত্ত তরবারী পুত্রকে প্রদান পূর্ব্বক বলিয়া যান যে, যদি দিল্লীতে তাঁহাকে বধ করা হয়, গোবিন্দ যেন তাঁহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। গোবিন্দও তাহা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

যথাসময়ে গোবিন্দ পিতার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথমে কয়েক-জন বিশ্বাসী শিষ্যের সাহায্যে পিতার মৃতদেহ আনয়ন পূর্ব্বক যথাবিধি সৎকার করেন। অতঃপর কিরূপে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন, তাহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল।

অনন্তর গোবিন্দ পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ লইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার জন্য, লোকালয় হইতে অপসৃত হইয়া, দীর্ঘ বিংশতি বৎসর কাল হিমা-লয়ের পাদমূলে অরণ্যে যাইয়া, বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তিনি ধীর স্থির সংযত জীবন যাপন করিতেন। গভীর চিন্তা, অধ্যয়ন, স্ব ধর্ম্ম বিশ্বাসীদের সহিত ধর্ম্মালোচনা, তাহাদের ঐহিক উন্নতির চেষ্টা, এই সকলই তখন তাঁহার চিন্তা ও কর্ম্ম ছিল। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি বহু শিষ্য লাভ করেন। প্রাচীন মহাপুরুষদের বীরত্ব ও মহান চরিত্রের কাহিনী বর্ণনা করিয়া তিনি নিজ শিষ্য-দিগকে বীর্য্যবান ও মহৎ চরিত্র করিবার প্রয়াস পাইতেন। তিনি নিজেকে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের দীন সেবক বলিয়া বর্ণনা করিতেন। তাঁহার উপদেশ ছিল "ঈশ্বর কোনও নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে আবদ্ধ নহেন। হৃদয়ের